বেদবাণী

[আচার্য্য শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার উপদেশাবলী]

প্রথম খণ্ড

৺সরলা দেবী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক
লিখিত

কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৫৪, জ্যৈষ্ঠ

প্রকাশক
পণ্ডিত শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী (ব্যারিষ্টার-এট্-ল)
৮।১, নিউ রোড, আলীপুর।
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

গুরুর বাণী মায়ের লেখনীবদ্ধ ছিল। আমি তাহা গুরুভাইদের হাতে তুলিয়া দিলাম।

দীপক

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১	অর্জ্জুন বল্লেন,—	অর্জ্জুন বল্লে না,—
৯০	২১	তাত্মতত্ত্বে	আত্মতত্ত্বে
১৪৯	১৬	বধা	বাধা
২০০	২২	সাংঘাতিক	সাংঘাতিক।
২০৬	২২	মুখু	মুখে
২৩১	৯	বাকা	বাক্
২৩৩	৩	পবিণামের	অপরিণামের



আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

ভূমিকা

নকিপুরের বন্ধুবর যতীন রায় চৌধুরী আমার বাড়ীতে অধ্যাত্ম-সঙ্ঘে কোন পণ্ডিতপ্রবরের উপনিষদ্‌ব্যাখ্যানে তৃপ্তি না পেয়ে হাওড়ায় তাঁর 'ঠাকুরে'র কথামৃত শোনাতে আমায় একদিন নিয়ে যেতে চাইলেন। শনিবার, ২২শে জুন, ১৯৩৫ সালের সকালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

সেখানে বিজয়কৃষ্ণ নামধেয় পুরুষটির দেহমন্দিরে যে ঠাকুরের বাস, প্রথম দিনই তাঁর সমীপস্থ হওয়া মাত্র তিনি পোঁ করে তাঁর সানাইয়ে একটি সুর ধরে শুনিয়ে দিলেন। রৈক্ক রাজার গল্পচ্ছলে গুরুতে শ্রদ্ধায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করার কথাটা কাণে তুলে দিলেন।

আমি গুরুকরণের জন্যে যাই নি। শুধু যতীনবাবুর কথায় প্রখ্যাত বিজয় চাটুজ্যের উপনিষদের রসাত্মক ব্যাখ্যান শোনবার প্রলোভনে গিয়েছিলুম। আর তাঁকে অনুরোধের অভিপ্রায়ে গিয়েছিলুম, যদি আমার বাড়ীর স্বাধ্যায়মণ্ডলীতে উপনিষদ্‌তত্ত্ব শোনাতে মাসে এক আধ বার আমায় কৃপা করেন। একটা সিংহকে ধরতে গিয়েছিলুম—নিজে বাঁধা পড়ে গেলুম!

পরে দেখেছি, নতুন কোন লোক গেলে তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করেন,—"কি উদ্দেশ্যে এসেছ? শুধু আলাপ পরিচয় করতে, না উপদেশ নিতে?" কিন্তু আমার বেলায় কেন জানিনে, ধরেই নিলেন, আমি জিজ্ঞাসু, উপদেশার্থী হয়েই এসেছি।

আমার নামধাম, পরিচয় তখনও বোধ হয় জানেন না, অথচ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের কথাই ব্যক্ত করতে লাগলেন। সে সম্বন্ধের এমন ব্যাখ্যান দিলেন যে, শির নমিত হল, অহঙ্কার-অভিমানের কঠিন প্রাচীর শিথিল হয়ে ভাঙ্গবার উপক্রম হল। মন তাঁকে মনে মনে জ্ঞানদাতা গুরু বলে স্বীকার করলে।

বল্লেন,—"গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তখনই হয়, যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার হচ্ছে না, বোঝা যায়। তোমার ভিতর যে আলো বা আত্মা রয়েছে, আর আমার ভিতর যে আলো বা আত্মা রয়েছে, সেই আলোতে আলোতে অধ্যাত্ম ব্যবহার হবে। আমার আত্মা তোমার বুকে আত্মার নিত্যদর্শন ফুটিয়ে দেবে—গুরুকৃপায় এ ক্ষমতা আমার হয়েছে। তোমায় কোন চেষ্টা চরিত্র করতে হবে না, গুরুই সব কিছু করবেন।" আরও বল্লেন,—"প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া—এই ভাবে এলে তবে গুরুর কাছে উপদেশ পাওয়া যায়। সেবা মানে কায়িক সেবাই মাত্র নয়, সেবা মানে উপদেশ পালন।"

আমার সামাজিক সম্ভ্রমজ্ঞান, পদমর্য্যাদা ও বিদ্যার অভিমান, সব আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে খসতে লাগল। যে শির কোথাও নমিত হতে চায় না, তা এই উপদেষ্টার প্রতি আনত হতে থাকল। মন প্রণিপাত স্বীকার করলে, বিনয় ধারণ করলে।

সামনের মঙ্গল বারে আমার ফের যাবার দিন ধার্য্য হল। বল্লেন,—"যতীনকেও টেনে এনো।" ভালই হল। তাঁরই অভিমতে এতটা দূর যতীনবাবুর সঙ্গেই যাতায়াতের সুবিধে হয়ে গেল।

সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর মঙ্গলবার সকাল এল। এই দ্বিতীয় দিনে দুটি অমূল্য কথা পেলুম। এক—গুরু বাইরে নেই, গুরু আমার এবং সকলেরই বুকের ভিতর আছেন। যাঁর স্বচ্ছ বুকে ভিতরের সেই গুরুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তিনিই বাইরের গুরু। দ্বিতীয় কথা—আমার ভিতর দুটি কর্ত্তা আছে। এক, যে বাইরের দৃষ্টিতে চলছে, ফিরছে, বলছে, কইছে। আর এক, যে আমার ভিতরে থেকে কাজ করছে, আমার যৌবন জরা, জন্ম মৃত্যু সংঘটন করছে। আমার বাইরের কার্য্যকলাপও ভিতরের সেই শক্তি থেকেই চালিত হচ্ছে। আসল কর্ত্তা আমি নই, কর্ত্তা আমার ভিতরে সেই চৈতন্যশক্তি, যে শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন। সেই ভিতরের শক্তিময় কর্ত্তাকে ধরতে হবে, তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

আমার তত্ত্বজ্ঞানের আগ্রহ দেখে আজ থেকে আমার জন্যে হপ্তায় তিনটি করে দিন নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন, যে তিন দিন আমাকেই বিশেষ করে উপদেশ দেবেন, ভিড় সরিয়ে দেবেন।

তৃতীয় দিন পরের শুক্রবারে ঐ জ্ঞানী পুরুষের সমীপস্থ হতে বল্লেন,—"আমরা প্রতিদিন শাক ভাত ডাল, ফল মূল, মাছ মাংস, ছাই পাঁশ যা কিছু খাচ্ছি, পেটের ভিতর ফেলছি, আর সেগুলো হয়ে যাচ্ছে কি? রক্ত, মন, প্রাণ! কি অদ্ভুত ব্যাপার রে! ভিতরে যে চৈতন্য-পুরুষ রয়েছেন, তাঁর ছোঁয়া লেগে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে প্রাণ। কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক দেখেছ, কত কেমিষ্টের নাম শুনেছ, কেউ এক ফোঁটা রক্ত তৈরি করতে পেরেছে কি? অথচ সেই রক্ত প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে এই

সকল জড়, তুচ্ছ, অপদার্থ খাদ্য বস্তু দিয়ে—এক পরশমণির স্পর্শে। এরা যদি তাঁর স্পর্শে প্রাণ হতে পারে, তা হলে তুমি যদি তোমার বুদ্ধি, মন, দেহ, সব তাঁতে নিবেদন কর, বল—'হে পরশমণি, নাও আমায়, তোমাতে লীন কর, চেতন কর', তা হলে কি তুমিও তাঁর পরশে তাই হয়ে যাবে না?"

এই স্থলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন,—"বলছ, এরা স্বভাবতই হয়ে যাচ্ছে, এদের বিশেষ করে আত্মনিবেদনটা করতে হচ্ছে না, তোমার বেলায় তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মনিবেদন-রূপ চেষ্টা করতে হবে, তার ফলাফল অনির্দ্দিষ্ট।"—"তোমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিবেদন করাই তো তিনি চান। তিনি জোর জুলুম করেন না তোমার উপর। বাপ মা যেমন ছেলেকে স্বাধীনতা দেয়, তেমনি তিনি তোমায় স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় ঘোর ফের, সংসারলীলা কর। যে দিন শ্রান্ত হয়ে, ধাক্কা খেয়ে তাঁর দিকে ফিরে বলবে, 'আর চাইনে এ সব, আর চাইনে স্বাধীনতা, আর চাইনে স্বতন্ত্রতা, আমায় নাও, তোমার করে নাও, তোমাতে মিলাও'—সে দিন তিনি তোমায় কোলে তুলে নেবেন, নিজেতে মেলাবেন।

সে গল্প জান? রামচন্দ্র অহল্যার গায়ে পা দিতে পাথর মানুষ হয়ে উঠল। তার পরে তিনি নৌকা পার হয়ে ওপারে যাবেন বলে মাঝিকে ডাকলেন। মাঝি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি না রামচন্দ্র? তোমার পা ঠেকলে পাথর মানুষ হয়ে যায়—সেই তুমি না? না গো, আমি পারব না তোমায় নৌকায় তুলতে। রামচন্দ্র বললেন, কেন রে? মাঝি বললে,

মহারাজ, আমি এ নৌকা বেয়ে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করি, তোমার পা লেগে এ নৌকা যদি মানুষ হয়ে ওঠে, তা হলে আমার উপায় কি? আমি খাব কি করে? রামচন্দ্র বললেন,—কোন ভয় নেই, তোর নৌকা মানুষ হবে না। মাঝি ভয়ে ভয়ে স্বীকৃত হল। নৌকাতে তাঁকে পার করলে। ওপারে তাঁকে নামিয়ে নৌকার পানে চোখ পড়তে দেখে, তার নৌকাখানা সোনা হয়ে গেছে। যাঁর স্পর্শে পাথর মানুষ হয়, কাঠ সোনা হয়, সেই স্পর্শমণির স্পর্শ পেলে মানুষ চেতন হয়ে যাবে না কি? তাঁর শক্তিতে অঘটন ঘটে।

একটি ক্ষুদ্র বীজকে মাটির নীচে পুঁতলে কাদা জল মেখে তার থেকে হয় একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ, আবার সেই বৃক্ষে ধরে শত শত ফল, আর সেই প্রত্যেক ফলের ভিতর সহস্র সহস্র তেমনি বীজ ভরা থাকে, যেমন বীজটি থেকে ঐ বৃক্ষটা হয়েছিল। আবার ঐ প্রত্যেক বীজ থেকে ঐ রকম বৃক্ষ হবে, আবার তাদের প্রত্যেকের থেকে ঐ রকম অগণ্য বীজ হতে থাকবে—এই হল Recurring Infinity। কি অদ্ভুত মহিমা! কি অদ্ভুত শক্তি! ঐ শক্তি তোমার হবে, যদি তুমি নিজেকে তাঁতে নিবেদন কর, তিনি হয়ে যাও। অঘটন ঘটনা সব হবে, যদি তুমি তাঁর উপর সব ছেড়ে দাও। তোমায় কিছুই করতে হবে না, তিনিই সব করবেন।” এত কথা বলে শেষ কালে একটি কথা বল্লেন,—“অর্জ্জুন ঠকে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের কথাটা ধরতে পারলে না, সে নিমিত্তমাত্র রয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।

মযৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ তুমি অস্ত্র না ধরলেও এরা মরবে—আমিই মেরে রেখেছি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। তখন অর্জ্জুন বল্লেন,—আমায় নিমিত্ত করে কেন রাখ আর, তুমিই ধর অস্ত্র—তুমি বলেছ 'মামেকং শরণং ব্রজ'—আমি তোমার শরণ নিলাম। যেখানে গীতার শেষ, সেইখানে চণ্ডীর আরম্ভ। তাঁর উপর ছেড়ে দাও, তোমায় কিছুই করতে হবে না, তিনিই সব করবেন।"

বাড়ী ফিরে একটা ভাব মনের ভিতর আলোড়ন করতে থাকল। সেটা ছুদিন পরে কবিতাকারে ফুটলো। যাঁকে উপদেষ্টা বলে, জ্ঞানী বলে শরণ নিয়েছি, যাঁর উপদেশ শুনতে আনাগোনা করছি, তাঁকে একেবারে 'গুরু' বলে কবুল সম্বোধনের সঙ্কোচ ধূলিসাৎ করলুম এত দিনে। দৃঢ়ভূমি, বদ্ধমূল সংস্কারের এক একটা প্রাচীর অতি কষ্টে, অতি অনিচ্ছায় যেন একে একে পড়ে যেতে লাগল। সে কবিতাটি যখন গুরুদেবের হাতে গিয়ে দিলুম, ছুবার মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন, বল্লেন,—"বেশ! কবিতা হিসাবে বলছি নে, ভাবের বিষয়ের দিক্ দিয়ে।" সে কবিতা এই :—

গোত্রান্তর

গুরো!

চৈতন্যে কর সম্প্রদান!
গোত্রান্তর কর মোরে
হে মঙ্গলনিদান!

জন্ম যার ঘোর মৃত্যুগৃহে,
নিরানন্দের কুলে,
অমৃত-পাত্রস্থ কর তারে,
দাও আনন্দ-গোত্রেতে তুলে !

ভয়েতে বিমূঢ় যেই চমকায়
প্রতি বায়ুহিল্লোলে,
সঁপো তারে ভয়ানাং ভয়ে,
অভয় গোত্রে যাক্ সেই চলে !

নাহি যার শক্তি সাধ্য লেশ,
অনন্ত শক্তির সনে
বাঁধ তার দক্ষিণ পাণি,
শক্তি গোত্র হোক্ শুভখনে !

অহংনিলয়ে ভেদভাবে করে
আপন পর যে জ্ঞান,
আত্মা-আবাসে নিবসিয়ে
তারে, রাখ সব ভূতগতপ্রাণ !

গুরো

আমার আমিরে দেখাও দেখাও !
করাও অভিজ্ঞান !
আনন্দ, অভয়, শক্তি, প্রেম
হউক নিত্য তব অবদান !

তৃতীয় দিন আমি বলেছিলুম—এত অমূল্য কথা সব বলেন, আর এত অনর্গল, বলার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ডে বা short hand-এ লিপিবদ্ধ করবার বন্দোবস্ত করতে পারলে ভাল হত। বহুদিন ধরে বহু জনের কাজে আসত। আজ চতুর্থ দিনে যখন গেলুম, প্রথমেই বললেন,—"এই বিশ্ব-রেকর্ডে প্রতিদিন কোন্ গায়কের গান ধরা থাকছে? আমরা রেকর্ডই শুনছি, কিন্তু গায়ক যে, তাকে দেখলাম না। তাকে দেখতে ইচ্ছে যায় না কি?"

তার পর বললেন,—"শুনেছি, তুমি না কি বেশ গাও।" যতীনবাবু বলে উঠলেন, "চমৎকার!" তিনি বললেন, "একদিন শুনাইও।"

উপসন্ন শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে গল্প বললেন,—"এক বাদশা তাঁর প্রধান মৌলবীদের ডেকে বললেন—তিনটে প্রশ্নের উত্তর দাও। না দিতে পারলে গর্দ্দান যাবে। প্রথম প্রশ্ন—ভগবান্ কি করতে পারেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তিনি কি করতে পারেন না? তৃতীয় প্রশ্ন—তিনি এখন কি করছেন? মৌলবীরা বলল—এ আর কি কঠিন প্রশ্ন? প্রথমের উত্তর, তিনি সবই করতে পারেন। দ্বিতীয়ের উত্তর, তিনি করতে পারেন না, এমন কিছুই নেই। তৃতীয়ের উত্তর, তিনি ঠিক এখনি কি করছেন, তা কেউ বলতে পারে না। বাদশা এ উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। শেষে এক হিন্দু-সাধুর কাছে গিয়ে ঐ প্রশ্ন করলেন। সাধু বললেন—তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, ভগবান্ অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন, আর সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, তিনি আর সবই পারেন, খালি একটি জিনিষ তিনি কখন, কস্মিন্ কালে করতে পারেন না ; জীবকে তিনি তাঁর বুকের বাইরে কখন ফেলতে পারেন না। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর, ভগবান্ এই মুহূর্তে তোমার চোখে গুরুরূপে, আর আমার চোখে শিষ্যরূপে এই গুরুশিষ্য-সম্বাদ করছেন।"

এই গল্প বলে আমায় বললেন,—"বিজয়কৃষ্ণ তোমার গুরু নয়, সরলা দেবী আমার শিষ্য নয়। তোমার ভিতরের ভগবান্ শিষ্যরূপে, আমার ভিতরের ভগবান্‌কে গুরুরূপে আশ্রয় করে তাঁর উপদেশ শুনছেন, এইটে জেনো। নয়ত বিজয়কৃষ্ণ ও সরলা দেবীর পরস্পর ব্যবহারে তোমার কোনই উপকার হবে না।"

আমি বললুম,—"আমার ভিতরে থেকেই তা হলে ভগবান্ আমায় উপদেশ দেবেন না কেন ? আপনার ভিতর স্থিত হয়ে দেবার কি প্রয়োজন ?"

বললেন,—"তোমার ভিতরে ভগবান্ এখনও ঢাক্‌না-চাপা রয়েছেন, আমার ভিতরে ঢাক্‌না খোলা হয়ে গেছে। আমি তোমায় দেখাব সেই অঘটন ঘটাতে পটু ভগবান্, সেই Miraculous God, যিনি বিধির বিধান ভাঙ্গতে পারেন, যিনি তোমার ভিতর miracle ঘটাবেন। যে চেতনাভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রহ্লাদ বলেছিল, 'আমার ভগবান্ এই স্তম্ভে আছেন', সেই চেতনাভূমিতে তোমায় নিয়ে যাব। যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি ডাক দিলে ভগবান্ মূর্ত্ত হয়ে বেরিয়ে আসবেন। অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাছে দিব্যদৃষ্টি পেয়ে দেখেছিল, সেইরকম

আমি দেখাব আর তোমরা দেখবে, তিনি মূর্ত্ত হয়ে, দেবতা হয়ে বেরোচ্ছেন।

মানুষের ভিতর একটা সংস্থান আছে, যাকে বলে রুদ্রগ্রন্থি। সেইখানে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সংযোগ। সেই গ্রন্থিতে আমি তোমাদের নিয়ে যাব। এত দিন এভাবে উপদেশ দিই নি। এবার আমার জীবনের এই mission পূর্ণ করে যাব। দুই-এক জনকে তৈরি করে যাব। আমি তোমাদের বলব না—মন্ত্র জপো, যোগ করো; নিজেকে ঘষো মাজো। আমি বলছি, তোমায় কিছুই করতে হবে না, গুরুই তোমার হয়ে সব করবেন। তুমি খালি দেখবে, আমি তোমায় দেখাব।"

আজ পঞ্চম দিনে আমি আরম্ভে বলেছিলুম—বাড়ী ফিরে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উদয় হয় মনে। কিন্তু সেগুলি উত্থাপন করে আপনার অনর্গল ভাষণে, অজস্র দানের ধারায় বাধা দিতে ইচ্ছে করে না। বললেন—"প্রশ্ন করবে বৈ কি। বলেছি ত—প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। পরিপ্রশ্নের দ্বারা সন্দেহভঞ্জন করে মীমাংসিত সত্য করে নেবে।"

এর পরে আজ যা সব বললেন, অদ্ভুত কথা। মন্ত্রচৈতন্য বুঝিয়ে দিলেন,—"মন্ত্রচৈতন্যে তিনটি জিনিষের দরকার—মন্ত্র, গুরু ও দেবতা। মন্ত্র মানে একটা শব্দ। মননাৎ ত্রায়তে—আর সব কিছুর মনন থেকে উদ্ধার করে, ঐ একটি শব্দে মনকে যুক্ত করে। গুরু ঐ শব্দগত জ্ঞান অর্থাৎ ঐ শব্দের জ্ঞান উৎপন্ন করিয়ে দেন। দেবতা মানে ঐ শব্দের যে অর্থ বা ঐ শব্দবাচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তার গাঢ় অনুভূতি। অনুভূতি

যখনই অত্যন্ত প্রবল, অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত ঘন হয়, তখন সেই দেবতার আবির্ভাব হয়।

শব্দ মাত্রই মন্ত্র। 'সরলা' এই শব্দ একজন মানুষ উচ্চারণ করলে সরলা সম্বন্ধে জ্ঞান তার ভিতরে উদয় হয়। যদি সেই জ্ঞান এত প্রগাঢ় হয় যে, তাতে সরলা একেবারে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়, তবে 'সরলা' এই মন্ত্রের চৈতন্য হল। রজ্জুতে সর্পভ্রম সেরূপ তীব্র হলে সত্যিকার সর্পও সেখানে উপস্থিত করাতে পারে। সর্প না হলেও সর্পের তীব্র বোধজনিত ফল তো হবেই। একজন মেয়ে রাত্রে মশারি টাঙ্গাতে টাঙ্গাতে হঠাৎ মশারির দড়িটা তার হাতে পড়ায় তার মনে হল, সাপ পড়ল তার হাতে। সে জ্ঞান এত তীব্র হল যে, সাপের বিষের জ্বলনবোধে সে অস্থির হল। ডাক্তার ওঝা সব ডাকা হল। তারা সাপের দংশনের কোন চিহ্ন কোথাও পেলে না, কিন্তু সে মেয়ের সেই অনুভূতিই রয়ে গেল যে, তাকে সাপে কামড়েছে। আর তার সেই অসহ্য জ্বলনেরও উপশম হল না। বছরখানেক পরে তাকে আমার কাছে নিয়ে এল। বিশেষ চেষ্টায় তার ভ্রম গেল, বিষের জ্বালাও গেল। এই হচ্ছে দৃষ্টান্ত—তীব্র অনুভূতিতে অ-বস্তুতেও বস্তুগত ফল কি রকম হতে পারে।"

আজকের দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় হল রুদ্রগ্রন্থি সম্বন্ধে—যেখানে প্রাজ্ঞ পুরুষ অবস্থিত। প্রতি দেহে ভগবান্—ঈশ্বর—সেইখানে আছেন, প্রত্যেককে ভালবেসে ব্যাপ্ত করে আছেন, প্রত্যেকে ভগবানের পক্ষে মধু, ভগবান্ প্রত্যেকের পক্ষে মধু। এই গ্রন্থি খুলে গেলে আপ্তকাম বা আত্মকাম হয়—যখন যা চাই,

তাই হতে পারি। সেই অবস্থা আমায় প্রাপ্ত করাবেন বললেন।

এ সব বলা শেষ হলে যে একটি শেষ কথা যেন মৃদুস্বরে কথায় কথায় বললেন,—"গুরুকে সব ছেড়ে দাও না, আমায় সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেল না।" বাড়ী ফিরে আজ মনের ভিতর বিশেষ রকম আলোড়ন চলতে লাগল। আজ ওঁর বলায় "গুরুকে সব দিয়ে ফেল না, আমায় সব ছেড়ে দাও না।"—সন্ধ্যেবেলা থেকে তিনি যেন আমায় possess করতে লাগলেন। আমার নিজের ১০।১১ বছর আগেকার রচনা একটি গান মনে পড়ল। "সৃষ্টিছাড়া ভিখারী এমন দেখি নাই কভু আর!"

সন্ধ্যেবেলা যতীনবাবু এলেন আমার বাড়ী। তাঁকেও গানটা শোনালুম। খুব মুগ্ধ হলেন। 'গুরুদেবকে একদিন শোনানো হবে,' স্থির হল।

যতীনবাবু চলে গেলে ক্লান্তশরীরে নিদ্রাতুর ভাবে শুতে গেলুম। কিন্তু ঘুম কিছুতেই হল না। মাথার ভিতরে ঐ সব কথাগুলো ঘুরতে লাগল, সেগুলো মনের ভিতর একটা ঝনঝনা জাগিয়ে রাখল। এরোপ্লেনের buzzingএর মত আমার সমস্ত nervous system-এ যেন একটা buzzing চলতে থাকল। সত্যিকার শব্দ নয়, একটা নাড়া-খাওয়ার ভাব।

গুরুপদারূঢ় এই মানুষটি যখন সকালে তার কাছে উপসন্ন শিষ্যকে বল্লে, "আমাকে সব ছেড়ে দাও না",—তখনই গুরুতে সব ছেড়ে দেওয়ার ভারতীয় সংস্কারান্বিত মন রাজী হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রশ্ন করেছিল—"ছেড়ে দেওয়ার

বুকমটা কি হবে?"—সে বিষয়ে পরের বারে বিশেষ করে পরিপ্রশ্নযুত আলাপ করব ভেবে রেখেছিলুম। কিন্তু গুরুকে প্রশ্ন করে উত্তর পাবার জন্যে পরের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। আপনি আপনি আজ রাত্রে মীমাংসা হয়ে গেল। আমার নিজের গানের কথাই মনে হল—

যে নিঃশেষে দেয় নির্ভাবনায়
তোমারে জগৎ-পাতা!
যোগক্ষেম তার, হয় তব ভার
আপনারে হও দাতা!

কিন্তু অশরীরী ঈশ্বরে প্রযুজ্য এই কথাটা শরীরী গুরুবাচ্য মানুষে কি করে প্রযুজ্য? হঠাৎ তার রহস্যও খুলে গেল। এর খানিকটা আগে থেকেই একটা অনুভূতি হচ্ছিল—এই মানুষটি, যাকে গুরু বলে মন স্বীকার করেছে, সে যেন একটি ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি। তার ভিতরে আর একটা চৈতন্য বাসা নিয়েছে, সেই যেন কথা কয়। স্বাভাবিক আর দশটা মানুষের মত যে normal মানুষ বিজয়কৃষ্ণ চাটুজ্যে—সে আমার সঙ্গে কথা কয় না। নয় তো এমন অস্বাভাবিক কথা সব সে এমন সহজ বিশ্বাস-উৎপাদক ভাবে কি রকম করে বলে যায়? সে কোন্ সাহসে দাবী করে, আমার ভিতর যে প্রাজ্ঞ পুরুষ আছে, তাকে সে ফুটিয়ে দেবে, আমায় আপ্তকাম, আত্মকাম করে দেবে, সে শক্তি তার আছে। যে সব কথা শুধু কেতাবের কথা, শাস্ত্রের কথা, শুধু তত্ত্বের কথা, ঋষিদের যোগলব্ধ প্রত্যক্ষের কথা—আমাদের পক্ষে theory মাত্র, thesis মাত্র, সেগুলো আমার পক্ষে জীবন্ত সত্য

করে দেবে, এ কথা বলে কেমন করে—কোন্ আত্মপ্রত্যয়ে ? এ কি একজন মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথা মাত্র ? একজন বুজরুগের বুজরুগী ? না, সত্যের stamp রয়েছে তার প্রতি শব্দে, প্রতি বাক্যে ; বীর্য্যের ছাপ-মারা হয়ে বেরোচ্ছে তার প্রত্যেক উক্তি, প্রত্যেক assertion, জীবনীসত্তায় ভরা তার প্রতি উচ্চারণ। বিজয়কৃষ্ণ নামধেয় কোন মানুষ নয়, যে এ কথা বলছে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগত experience এ নয়, তার থেকে ভিন্ন কোন একটা উপলব্ধির স্তরের থেকে সে এ কথা বলছে, তার ভিতর আর কোন এক চৈতন্য আবিষ্ট হয়ে বা প্রবুদ্ধ হয়ে তাকে ঐ কথা বলাচ্ছে। সেই চৈতন্য, সেই ভূত, আমার ভিতরটা আলোড়ন করতে থাকল। ঘুম আর আসে না, চোখ আর বোঁজে না। তার পরে হঠাৎ realisation এল—এই যে ভূত বা এক অদ্ভুত চৈতন্য বলছি, যে তাঁর ভিতর থেকে কথা কইছে, যে চৈতন্যে অবস্থান তাঁর পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গেছে, সে ভগবৎ-চৈতন্য, তাঁর ভিতরকার ফোটা প্রাজ্ঞ পুরুষ। সেই ভগবতীশক্তিই ওঁর ভিতরে 'ঠাকুর', তিনিই আমার গুরু—নেদং যদিদং দৃশ্যতে। মানুষী তনু আশ্রয় করে, মানুষী করণ দিয়ে সেই চৈতন্যই আমার সঙ্গে কথা কইছে, আমার কাছে নিজেকে ব্যক্ত করছে। সেই প্রথম দিনই সানাইয়ে সুর তুলে আমার কাণে যে কথা ভরে দিয়েছিলেন, মনে পড়ল—"অর্জ্জুন ঠকে গিয়েছিল—'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'—তাই রয়ে গেল। 'মামেব শরণং ব্রজ' এ কথাটা ধরতে পারলে না। 'ঋতেঽপি ত্বাং' 'সব কিছুই হবে, আমি সবই করব, এরা সবাই মরেই আছে

—তুমি নিজের কর্ত্তব্যস্বরূপে নিমিত্তবুদ্ধিতে মাত্র কাজ করে যাও —অর্জ্জুন তাই করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের শরণ একমাত্র করে অস্ত্র ছাড়লে না। তাই যেখানে গীতার শেষ, সেখানে চণ্ডীর আরম্ভ। চণ্ডীতে বিপন্নেরা নিষ্ক্রিয় রইল, চণ্ডী তাদের হয়ে অস্ত্র ধারণ করলেন।"

সেই শ্রীকৃষ্ণ আজ বিজয়কৃষ্ণনামধেয় মানুষের দেহে অধিষ্ঠান করে আমায় ডাকলেন, "মামেব শরণং ব্রজ। আমায় সব ছেড়ে দাও, আমার হয়ে যাও, আমি সব করব।"—নয় তো একটা দীন দুর্ব্বল মানুষ আমাকে কোন্ সাহসে ডাকে তার হয়ে যেতে, এত বুকের পাটা কি সাধারণ মানুষের হতে পারে? মানুষী তনু-আশ্রিত যে ভগবৎচৈতন্য ও ভগবৎশক্তিবোধ, সে-ই এই দেহে ঠাকুর। আজ এতক্ষণে সত্যি আমার ঠাকুর দর্শন হল, এত দিন শুধু বিজয়কৃষ্ণনামীয় মানুষকে দেখে আসছিলুম।

আমি যে একদিন গান গেয়ে ভগবান্‌কে বলেছিলুম—

যে নিঃশেষে দেয় নির্ভাবনায়
তোমারে জগৎপাতা!
যোগক্ষেম তার হয় তব ভার
আপনারে হও দাতা।

সে ভগবান্‌কে এত দিন দর্শনে শ্রবণে পাই নি, তিনি অব্যক্ত ছিলেন—শুধু মননেই পেয়েছিলুম। আজ তিনি গুরুরূপী প্রতীকে ব্যক্ত হয়ে মানুষের কণ্ঠে, মানুষী ভাষায় আমায় জীবন্ত ভাবে ডাকলেন। আমার পক্ষে অর্জ্জুনাদির জগতে যেমন, তেমনিই সত্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও জীবনে ব্যাপ্তি হল।

এ কি মহান্ কথা—কি মহাসৌভাগ্যের সহসা উদয়। আত্ম-বিসর্জ্জনের এ সুযোগ যদি ছাড়ি, ভয়ানক বোকামি করব।

প্রথম দিন এই গুরু বলেছিলেন, "তুমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী বলে জেনো। তুমি আমার সঙ্গে এই মুহূর্ত্তে বসে এই পরমাত্মতত্ত্বের আলাপ করছ, আর এই মুহূর্ত্তে অন্ততঃ এক লক্ষ লোক মৃত্যুর কবলিত হচ্ছে।"

বাস্তবিকই মহাসৌভাগ্যবতী। কত দিন মাস বর্ষ ধরে গুরু খুঁজছি। হঠাৎ সেই দুর্লভ গুরু পেয়ে গেলুম—মথুরায় নয়, বৃন্দাবনে নয়, হরিদ্বারে নয়, পুষ্করে নয়, হিমালয়ে নয়, অরণ্যে নয়—এই কলকাতার সহরে বসেই—এই হাওড়ায়—আমার বাড়ী থেকে মোটরে করে খানিক দূর গিয়েই গুরুলাভ। যেমন তেমন গুরু নয়, শুধু একটা দীক্ষা দিয়ে, শুধু একটা মন্ত্র কাণে দিয়েই যে নিশ্চিন্ত, নিষ্কৃত নয়। যে আমার মত যেমন তেমন সামান্য লোককে একেবারে Viceroyalty দিতে উদ্গ্রীব, যে শুঁড়ে তুলে আমায় রাজগদীতে বসাতে চাচ্ছে। তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, না দিলে তার শান্তি নেই জানাচ্ছে।

আজ রাত্তিরেই এই সব ভাবতে ভাবতে মনে মনে স্থির করলুম, আমি আর রাশ ধরব না, তাঁরই হাতে রাশ ছেড়ে দিলুম, তাঁর আপন হয়ে গেলুম, তাঁর শরণ নিলুম। মনে মনে নিজের সর্ব্বস্ব তাঁকে ছেড়ে দিলুম—তিনি সব কিছু করুন—নিজের কর্ত্তৃত্ব আর রাখলুম না। যদি তিনি অন্তর্যামী হন, আজ রাত্রে তাঁরও জ্ঞানগোচর হয়ে যাবে আমার এই আত্মসমর্পণ, এবং তিনি তুলে নেবেন আমার বোঝা, অস্ত্র ধরবেন আমার হয়ে।

একটা মানুষকে এতবড় pedestal-এ বসালুম!—তার যোগ্য কি না, ফলেতে পরিচয় পাওয়া যাবে। যদি তত দূর যোগ্যতা না থেকে গুরুত্ব অভিমানে মাত্র আমায় ডেকে থাকেন—তার চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা আর নেই। তবু তারও থেকে আমার সমুদ্ধর্ত্তা হবেন তিনি, যিনি এঁর ভিতর আছেন ভেবে আমি এঁতে আত্মসমর্পণ করলুম। কিন্তু এ মানুষটির কি হবে, যে বৃথা অভিমানে, বৃথা ডাকে আমায় ডাকলে, স্তোকবাক্যে ভোলালে। দেখা যাক্। সন্দেহে কাজ নেই। অটল শ্রদ্ধা থাকুক।

সপ্তম দিনে আমি প্রথম একলা গেলুম হাওড়ায়। সে দিন যতীনবাবু যান নি।

পঞ্চম দিনের আমার মনে গুরুতত্ত্বের রহস্য খুলে যাবার বর্ণনা করলুম মুখে, এবং গুরুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণের মানসিক সম্মতির কথাও বললুম। কিন্তু তার বাহ্যিক বিধান কি হবে জানতে চাইলুম। বললেন, পরে বলবেন। গুরুপক্ষে স্বীকার করলেন, গুরুর function দুটি—এক জ্ঞানের আলো দেওয়া, দ্বিতীয়, আত্মনিবেদিতের যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করা। গুরু নিজের দায়িত্ব স্বীকার করলেন। আমি যখন বললুম—হনুমান্ যেমন সমস্ত ত্রিভুবনেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ দেখতেন, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা ছিল ঐ রামচন্দ্রের দেহস্থিত তদ্রূপে, আমিও তেমনি স্থির করেছি, সমস্ত ভুবনময় যে ভগবান্ রয়েছেন, আমারও ভিতর যিনি আছেন, তাঁর আলো স্ফুরিত হবে আমার কাছে গুরুর দেহস্ফটিকের ভিতর থেকে। ঐ দেহাশ্রয় করে, ঐ দেহের

করণের দ্বারা আমার সঙ্গে কথা কইছেন, আমায় উপদেশ করছেন, এটা এখন থেকে অনুভব করছি। সেই ঠাকুরই ঐ দেহে রয়েছেন, যিনি আমায় আহ্বান করে এসেছেন এত দিন—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম॥" আমি এই কথা বলতে বলতে গুরুদেবের শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা বৈদ্যুতী প্রবাহ খেলে গেল—তিনি চমকিত হয়ে ভগবান্‌কে স্মরণ করে প্রণাম করলেন।

এই গুরু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে আমায় যে সব উপদেশ দিয়েছেন, যাতে করে আমার মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আমি আলোকের নিকটস্থ হচ্ছি বলে মনে করি, অপর সকলের নিকট সেই সব উপদেশ এগিয়ে ধরার আমার এ যত্ন এই কারণে যে, তারাও এর আস্বাদ পেয়ে ধন্য হোক। ইতি—

শ্রীসরলা দেবী

বেদ-বাণী

[আচার্য্য শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার উপদেশ-সংগ্রহ]

৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৭।

জ্ঞান—জানা হল আত্মার কর্ম্মময়তা বা জীবন। ভাব হল আত্মার অন্নগ্রহণ। ভাবের অন্ন না পেলে আত্মার পুষ্টি হয় না—শীর্ণতা আসে। এই যে জীবাত্মা, সে সাত্ত্বিক ভাব, ভক্তি, চমৎকারিত্ব ও উন্নয়নের দ্বারা মণ্ডিত হলে তবে তার অধ্যাত্ম-জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ হতে থাকে। জীবাত্মা এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পথে পরমাত্মায় বা পরমেশ্বরে লীন হন। অথবা তাঁর অন্তরে জীবভাব সরে গিয়ে সেখানে ঈশ্বর-ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই ঈশ্বরভাব বা বোধের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর মহিমা একে একে ফুটতে আরম্ভ করে। এই হল তাঁর ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত চিৎশক্তিতে প্রবেশ। এর মূল ভিত্তি হল, জীবের ভক্তি ও শ্রদ্ধাবৃত্তির চর্চ্চা, আশ্চর্য্যপরায়ণতা, প্রীতিময়তা, আনন্দময়তা, প্রতি বিষয়ে, প্রতি ব্যক্তিতে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি।

দ্বিতীয় কথা—প্রত্যেক ভোগটির পরে সে ভোগ কোন্ অন্তর-বার্ত্তা (**inner message**) দিয়ে গেল, তা কাণ পেতে শুনবে, তার লেখাটা বুকের ভিতর খুঁজে পড়ে দেখবে। ভোগ

বলতে সুখ-দুঃখ দুরকমেরই ভোগ। ভোগ বলতে যে যে প্রেরণামূলক কার্য্য করলে, সেই কার্য্যের কারণও এবং সেই কার্য্যের দরুণ যে নতুন রেখাপাত হয়ে থাকল মনের উপর সংস্কাররূপে, সেই রেখাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করে একে একে তার মধ্যে অসদৃশ রেখাগুলিকে মুছে ফেলে দেবে, সুসদৃশ রেখাগুলিকে সাজিয়ে উজ্জ্বল করে খাড়া থাকতে দেবে; বিচারের দ্বারা তদনুযায়ী ভাবে সংস্কারের উপর স্ববশ্যতা আন্‌বে; এতে ভবিষ্যতে তাদের কার্য্য হয়ে জন্মাবার উপর তোমার প্রভুত্ব থাকবে। যা গাওয়া যায়, শব্দায়িত করা যায়, সবই রেকর্ড হয়। কিন্তু রেকর্ডের খানিকটা আবার নিজের হাতেই মুছে দেওয়া যায়; কল ঘোরালে মোছা জায়গায় একটা ঘরর্ ঘরর্ শব্দ হবে মাত্র, কিছু বাজবে না। সুতরাং প্রয়োজন হচ্ছে, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনখানা স্ববশে আনার জন্য এ জীবনে যা কিছু হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে বিচার করে দেখে তার খানিকটা খানিকটা মন থেকে মুছে ফেলে দেওয়া, খানিকটার তামসিক ভাবকে সাত্ত্বিকের রং মাখিয়ে দেওয়া; আর যেটুকু সাত্ত্বিক, তাকে স্বরূপেই থাকতে দেওয়া, বরঞ্চ পুনঃ পুনঃ মননের দ্বারা তাকে পুষ্ট করে রাখা।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৭, সোমবার।

নিজের ভিতর অবগাহন করলে, বাইরের আমিকে সরিয়ে রেখে নিজের অন্তঃসত্তায় (inner being) একীভূত হলে,

অনাহত শব্দ (voice of the silence) শোনা যাবে, যে শব্দ দুই ভৌতিক বস্তুর পরস্পর আঘাতে জাত নয়, যে শব্দ বিশুদ্ধ চিন্ময়ের আভাষিত। চিন্ময় আত্মায় যখন জীব-আমি লগ্ন হই, তখন আমার ভিতর কি দেখি—কি পাই? প্রথমতঃ, জীবন-প্রবাহ, শ্বাস-প্রশ্বাসমূলক সে প্রবাহ জীব-আমির দ্বারা প্রচালিত নয়। আমার ভিতর নিয়ন্ত্রিণীশক্তিময় কোন এক সত্তা তার পরিচালনার মূলে, তাকে নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছেন। আমারও নিয়ন্ত্রণ তার উপর চল্‌তে পারে তাকে ছোট বড় করার দ্বারা, দীর্ঘশ্বাস হ্রস্বশ্বাস করার দ্বারা, খানিকক্ষণ স্তম্ভিত করে রাখার দ্বারা। কিন্তু আমার চেষ্টা অতিক্রম করে তার যে কতকগুলি ব্যবহার, একটা বাঁধা নাড়ীর পথে চলা প্রভৃতি, সেটা আমার ভিতরের কোন উচ্চতর সত্তার জিম্মা। সেই সত্তার প্রতি মন দিয়ে রাখ্‌লে, কাণ পেতে থাকলে, অন্তরে তাঁর যে বাণী শোনা যায়, তা ধরা অভ্যাস করা দরকার। জীবনী-শক্তির অন্তর্ভূত বহু শক্তি আমার ভিতর কার্য্য করছে ; মনের চোখ চেয়ে, কাণ পেতে তাদের দেখা ও তাদের বাণী শোনা হল আমার কর্ত্তব্য।

———

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

জীবকর্ত্তৃত্ব ও ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব কোথায় এবং কখন্, আমি আছি ও ভগবান্ আছেন, কেমন করে আমা থেকে কর্ম্মটা ভগবানে গিয়ে পড়ে, সেই বিজ্ঞানটা দেখিয়ে দেব। 'পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্

শ্রোত্রম্' ইত্যাদি—তিনি'দেখে চোখ হলেন, শুনে কাণ হলেন, প্রাণন করে প্রাণ হলেন, ইহা বেদবাক্য। কাঠটা কঠিন। এ কঠিনত্ব পেলে কে ? জ্ঞান ? আত্মবোধযুক্ত জ্ঞান ? তা হলে আত্মাই কঠিন হলেন ? আত্মবোধযুক্ত জ্ঞানই অন্ধকার, জ্ঞানই আলো। আলো যদি কথা কয় ত বলবে, তুমিই আমার আত্মা, অন্ধকার যদি কথা কয় ত বলবে, তুমিই আমার আত্মা।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। 'ধী' তাঁর জ্যোতি (radiation)। ধী—জ্ঞান, প্রাণ, মন, সবই। ঋষিদের ক্রমাগতই কথা, 'বেদ বেদ, য এবং বেদ'। বেদন প্রকাশ হলেই নাদ প্রকাশ হবে, নাদ প্রকাশ হলে ভাব প্রকাশ হবে, তা হলেই অম্ভৃণ বামন প্রকাশ হবে। নাদশক্তির উপর দিয়ে যে বেরিয়ে আসবে. সেই কুণ্ডলিনী।

সাধনা দুরকম—আত্মতত্ত্বে প্রবেশ ও পরমাত্মতত্ত্বে প্রবেশ। জামাজোড়া ছেড়ে গর্ত্তে ঢোকা আত্মতত্ত্বে প্রবেশ, আর কিছু না ছেড়ে সবটা নিয়ে রাজপথ দিয়ে চলা পরমাত্মতত্ত্বে প্রবেশ, কোথাও কিছু বাধবে না। পরমাত্মতত্ত্ব থেকে নির্গুণ আত্মা জাত হয়েছে। নির্গুণ ব্রহ্ম=অক্ষর ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম= পরমেশ্বর।

বিশুদ্ধ নিজত্বের প্রকাশ ছাড়া পরত্বের লেশমাত্র নেই যেখানে, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম।

গাছের রস জমে জমে কাঠ হয়েছে। জ্ঞানশক্তি জমে জমে শরীরের গঠন ও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। পাথরের ভিতর একটি বীজ

একটু জল পেয়ে পাৎলা শিকড় নিয়ে ঠেলে ঠেলে ক্রমে পাথর ফাটিয়ে উঠে পড়ল। সেই পাথর দিয়ে মারলে শিকড় গুঁড়ো হয়ে যেত, অথচ সেই শিকড়ই আস্তে আস্তে তাকে ঠেলে ভেঙ্গে দিলে। সূক্ষ্ম শক্তির এই ক্রিয়া। একটু Insulin শরীরের সব শর্করাকে (sugar) কি ভাবে পরিণমিত করলে! সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শক্তিব এই সব কাজ। শক্তি দিয়েই ঈশ্বর অনুভব (realise) করা যায়। কে এই যক্ষ, দেবতারা ততক্ষণ তাঁকে চিনতে পাবেন নি, যতক্ষণ না শক্তিরূপিণী উমা এসে বলে দিলেন যে, ইনিই ব্রহ্ম। তাই ভাষা অবলম্বন করেই অনির্ব্বচনীয় তোমাকে পাই। সেই তোমাকে দেখব গরিমময় করে, মহিমময় করে। এই একটু জ্ঞান, বহু দূর হতে পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়ার মত একটু প্রকাশ এই জ্ঞান, আপনিই জ্বলছে। দুটো সংকল্প অনুযায়ী, কামনা অনুযায়ী যা হচ্ছে, তাকে ব্যবহারে লাগাচ্ছি। বাকী ফেলে দিয়েছি। অথচ সে জ্বলছে, নানা দিকে জ্বলছে। ভগবান্‌কে পেতে হবে মানে, জ্ঞানকে পেতে হবে। জ্ঞানতত্ত্বে কৃতনিশ্চয় হলে তোদের ভবসমুদ্র পার হওয়া হয়ে গেল। ভবসমুদ্র মানে, ভূত দেখা, ভূতমাত্রায় বিশ্বকে দেখা।

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" জীব-পরিত্রাণের এ অপৌরুষেয় বাণী। জ্ঞান মানে তত্ত্বজ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, তদুৎ করণ, সেটা ভৌতিক, সেটা জ্ঞানের ক্রিয়াপ্রসূত, ভূতমাত্রায় জ্ঞানের প্রকাশ। প্রতি জ্ঞানক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূতমাত্রায় ইন্দ্রিয় নতুন করে হচ্ছে; কেন না, ভূতমাত্রা পরিবর্ত্তনশীল, শক্তিও রূপান্তরিত

হন। যে কোন বস্তুর ভিতর দুটো জিনিষ আছে, সত্তা ও সত্তার ধর্ম্ম। এই দুটো সকল জিনিষে, সকল জায়গায়। শক্তিটা ব্যক্ত অব্যক্ত দুই হচ্ছে, সত্তা ঠিক আছে। শক্তি পরিবর্ত্তনশীল (everchanging), সত্তা অপরিণামী (neverchanging)। এই পরিবর্ত্তনশীলা ও অপরিণামা জিনিষটি ভগবানে ও ভূতে, জড়ে ও চেতনে সর্ব্বত্রই দেখতে পাবে। জ্ঞানতত্ত্বেও এই বিজ্ঞান অবলম্বন করতে হবে। তাই সত্তা আত্মা, পরমাত্মা শবল—অপরিণামী, আর তা থেকে যত বোধ বা জ্ঞানক্রিয়া হচ্ছে, তা পরিবর্ত্তনশীল। এই দুই মূল বিকাশ জ্ঞানের স্থির ও ক্রিয়াময়। সুতরাং পদার্থের যেমন দুটো আয়তন (phase), তেমনি জ্ঞানেরও দুটো আয়তন। যেমন অপ্‌তত্ত্ব ঠিক আছে, বরফ প্রভৃতিতে তার পরিণাম (variation)।

———

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, রবিবার।

অব্যক্ত ক্ষেত্রে ঢোকবার কথা ত এবার ? সে দিন তাঁকেই সচ্চিদানন্দ বলেছি, আজ তাঁর একটু শব্দতত্ত্ব বলছি। ভূমিকা আমরা পেয়েছি। হৃদয়ে যেখানে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ সমস্ত অন, তার মাঝে আমরা তাঁকে 'জ্ঞ' করে দেখছি। এখানে ধ্যানস্থ হয়ে দেখবার অবসর বা অধিকার এখনো হয় নাই। তাঁকে দেখবে এখন ভূতে ভূতে। হৃদয়গ্রন্থি মানেই হল, যেখানে সমস্ত ভাবের ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে তিনি বিরাজমান থাকেন। এই

গ্রন্থিময় ভূমিকে আমরা যেমন 'জ্ঞান' বলে দেখে নিলুম, যে যা ভোগ করছি, জ্ঞান বই আব কিছু নয়, তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হতে লাগ্‌ল। তখন থেকে ভোগগুলো আর পরতন্ত্র রইল না, স্বতন্ত্র হতে লাগ্‌ল। এই হৃদয়গ্রন্থিতে আমরা তাঁকে কি রূপে পেলুম, এখানে তাঁকে কি রূপে দেখলে? তিনি বুকের ভিতর, সর্ব্বভোগের ভিতর, তার তলায় তলায় রয়েছেন অর্থাৎ ভূতে ভূতে রয়েছেন। এই ভূতে ভূতে অর্থাৎ 'অনে অনে' দর্শন বেশ পরিষ্কার করে নেবে। প্রতি জ্ঞানে জ্ঞানে দেখলুম—অন্ন-ভূমিতে,মাটিব তলাতে নিজবোধ অবস্থান করছেন। এই দর্শনে যে মূর্ত্তি পেলাম, তার নাম পরামূর্ত্তি। আত্মত্বই 'পর' বা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জিনিষ আত্মা। আর অবর তিনি হয়েও যেন তাঁ থেকে আলাদা, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া-সম্বলিত। যেখানে তিনি জ্ঞানক্রিয়াসম্বলিত, সুখ-দুঃখের ভোক্তা, সেখানে তিনি হলেন কামময় আত্মা। এখানেই ত যত কামনা ফুটছে, আর তার তলায় তলায় তিনি ফুটছেন—পরাবরমূর্ত্তি। এই উভয়, পর ও অবর, সর্ব্বভূতের আত্মা ও সুখ-দুঃখ-ভোক্তা আত্মা, একই আত্মা, ইহা দেখা হইলে ঋষি বলেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

আত্মা, অথচ জীবাত্মা—এখনও জীবভাব যায় নি, অথচ আত্মা বটে। তার পরেই ঋষি বললেন, "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" এইবার নিষ্কল ব্রহ্ম দেখার কথা হল। ওখানে

হল সকল ব্রহ্ম। এবার নিষ্কল শব্দটি প্রয়োগ করলেন। দেখা গেল, ঋষি এখন অব্যক্ত আত্মার কথা বলছেন, যখন নিষ্কলত্ব পূর্ণ মাত্রায় ফুটেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখছিলাম, যত ফুটে আছে কামনা বাসনা ভোগ ইত্যাদি। এবার এগুলো অব্যক্ত হয়ে গেলে তবে না নিষ্কল দেখা যাবে। ব্যক্ত, যাঁকে গীতা বললেন, 'প্রত্যক্ষাবগমং' ব্রহ্ম, এইখানে ধরা হলে তার পর ইনি নিষ্কল হবেন। অব্যক্ত মানেই কষ্ট নয়, যদিও সব অব্যক্তই আপাতদর্শনে কষ্টকর। এই ব্যক্ত ভূমিতে তাঁকে দেখলে আর অব্যক্ত কষ্ট নয়। এগুলি অব্যক্ত যেখানে, সেই কেন্দ্রে গেলে না শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তরূপে এঁকে পাওয়া যাবে। তাই বললেন, 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।'

আমি বলে দিয়েছি,—কণ্ঠই হল অব্যক্ত ও ব্যক্তের সংযোগস্থল। এর উপর থেকেই সব অব্যক্ত হতে আরম্ভ হল। এখান থেকে আছে জন, তপঃ, সত্য। কণ্ঠ জনভূমি, ললাট তপোভূমি, আর মস্তক সত্যভূমি। এখানে সব অব্যক্ত হয়ে আছে। এইখানে তাঁকে পেলাম আমরা প্রেরকরূপে। কি করে? এই তপঃকেন্দ্রে এমন এঁর অধিষ্ঠান যে, এইখানে কেন্দ্রস্থ হয়ে ইনি চোখ, কাণ, জিভ ও অধরকে পরিচালিত করছেন অর্থাৎ এই সব ইন্দ্রিয়গণকে চালিয়ে রেখেছেন। হৃদয়ে দেখেছিলুম, সব ভোগ করছেন, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি গ্রহণের জন্য যত কিছু ইন্দ্রিয়কে এইখানে ইন্দ্রিয়াকারে কেন্দ্রীভূত করছেন। দর্শনাদি শক্তিক্রিয়া সম্পাদন হচ্ছে,

বিষয়কে পাবার শক্তি পরিচালিত করছেন। চোখে আছে রূপতত্ত্ব, ঠোঁটে স্পর্শ ইত্যাদি ; এইরূপ ভাবে নিজে ওই তত্ত্ব ফুটিয়ে ছড়িয়ে রেখেছেন। এই ভাবে এইখানে সব তত্ত্বগুলো ফুটছে। এইখানে পদার্থ অব্যক্ত হয়ে যায়, তার তত্ত্ব মাত্র থাকে (ভোগের ঘরে যা ফুটছিল, সেইগুলোর)। অব্যক্ত ভূমিতে যা রয়েছে, সেইগুলো নিষ্ফল বলে পেলাম। এখানে সুধু শক্তি আকারে আছে। অব্যক্ত—ভোগের বাইরে যাওয়া ; ব্যক্ত—ভোগ করা। 'অন'গুলো ছড়ান রয়েছে। তার তলায় তিনি বসে আছেন হৃদয়ে দেখলাম। উপরে দেখলাম যে, পদার্থের যাহা মূল, অর্থাৎ শক্তি, তিনি তারই ভোগে রয়েছেন। এখানে আত্মত্ব সকল শক্তির তলায় তলায় ; এখানেও সংশ্লেষ নেই, ওখানেও নেই। হৃদয়ে ভোগের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, উপরে তাও নেই। বীজ ভোগ্য, না বীজ বৃক্ষ হলে ভোগ্য হয় ?

সংশ্লেষের নাম ভোগ। রসতত্ত্ব আছে সব জিভের গোড়ায়, সেটা ভোগের অবস্থা নয়। যেটা রস নয়, অথচ সব রস হয়ে ফুট্‌তে পারে, তার নাম রসতত্ত্ব। শব্দ স্পর্শাদি সব তত্ত্বই এইরূপ। যেমন জিভে কিছু দিলেই রস ফোটে, ওতে রসতত্ত্ব আছে বলে ফোটে, কিন্তু তাই বলে সর্ব্বদাই ফোটে না —ফোটাবার আকার অনুসারে ভোগ হয়। তাই এখানে যিনি আছেন, তিনি তত্ত্বমালা-বিভূষিত। হৃদয়ে জীবভাবটা ফুটেছিল, এখানে অসংশ্লিষ্ট থেকে তত্ত্বগুলো ফুট্‌ছে, একটু কিছু উদ্দীপক কারণ পেলেই ফুটছে, বুকে আসছে। ফোটার নামই ভোগ।

জালিক যেমন জাল পেতে বসে থাকে, সেইরূপ ইনি বসে আছেন তত্ত্বজাল ছড়িয়ে ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যা আসছে, সব ধরা পড়ে যাচ্ছে। এখানে ইনি ভোগসমারূঢ় আত্মা নন, শক্তিসমারূঢ় আত্মা। সেই জন্য আমরা গুরুর ধ্যানে পড়ি,—'জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতম্।' 'অন্' এখানে তত্ত্বের আকারে, ওখানে ভোগের আকারে। এই গেল দ্বিতীয় স্তর—তপোভূমি। তার পরে চলে গেলুম সত্যভূমিতে। এখানে গিয়ে ঋষি বললেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" তার পরে "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" ইত্যাদি বলে ঋষি বললেন, তাঁকে ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমে পেলুম ব্যক্ততার ভিতরে তিনি, তার পর অব্যক্ততার ভিতর তিনি, শেষে সবই তিনি। আত্মতত্ত্বের তিনটি বিভাগ—পরাবর আত্মা, নিষ্কল ব্রহ্ম, অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম। আত্মার পূর্ণ ব্রহ্মত্ব হল এখানে ; এখানে আর কিছু বলার জো নেই, যা কিছু বেরোয়, তিনি আপনিই ফুটে বেরুচ্ছেন। এখানে অন্-পদবাচ্য আর কিছু নেই। প্রথমে অন্ অন্নের আকারে, দ্বিতীয়ে শক্তির আকারে ফুটে আছে ; তৃতীয়ে অন্ আর নেই ; কেবল নিষ্কল আত্মত্ব ; তার পরে সবই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম। এই হল আমাদের গতি। তা হলে দেখ, এই যে আত্মবোধ বলে পেয়েছি নিজেকে, এখানে ভোগের ঘরে ঢুকে

পড়েছি। আর ঐখানে, ঊর্দ্ধে নিজেকে দেখার নাম হবে তপোভূমিতে, ব্রহ্মভূমিতে এসেছি। আর ঐখানে লক্ষ্য করতে হবে তাঁর বহুত্ব। যেমন তিনি ভোগের দিকে যাচ্ছেন, অমনি বহু হচ্ছেন ; এক একটি ভোগ করছেন, এক একটি আত্মা হয়ে যাচ্ছেন ; এক একজন ভোক্তা পুরুষ ললাটে অব্যক্ত হতে হৃদয়ে ব্যক্ত হচ্ছে।

যে অবস্থা পেয়েছিস, তাকে দক্ষিণাভিমুখী কর, ব্রহ্মমুখী কর। কাজ করে দক্ষিণা দেওয়া মানে, তাকে বর্দ্ধিত করা, ব্রহ্মাভিমুখী করা।

নিজবোধটি পেলেই মনে করবি না যে, ভগবান্‌কে পেলুম। ইনি ভোক্তা আত্মা এবং এ ভূমির নাম পরাবরভূমি। অব্যক্ত আত্মা অব্যক্তভূমি। সুইচ টিপ্‌লে আলো বেরিয়ে পড়ে, এইখানে ভোগ হয়। ললাটে সুইচ টিপতে হবে, বুকে ভোগ হবে। ব্যক্ত বুক, অব্যক্ত বুক, ব্যক্তাব্যক্তের বুক—সবই বুক। পরাবর আত্মা, নিষ্কল আত্মা, অনির্ব্বচনীয় আত্মা। বোধ ছাড়া হবার জো নেই, ইহা মনে রাখিস, তা হলেই বিশ্ব প্লাবনময় হবে। সমুদ্র মন্থন করে একটি অমূল্য রত্ন পেয়েছি, সে এই নিজবোধ বলে আত্মতত্ত্ব। কিন্তু এঁর ঈশ্বরত্ব না দেখার জন্য শিবত্বের মূল্য হয় না। এই আত্মত্বই পরম ঈশ্বরমূর্ত্তি, এ দেখলে সব শোক দূর হয়ে গেল। ঈশ্বর, যাঁর অনুশাসনে এই সব ফুটছে এবং এখান থেকে শক্তির বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে। অনির্ব্বচনীয় আত্মা দ্বিধাবিভক্ত হন—এক দিকে তত্ত্ব, এক দিকে তত্ত্বাধিপ এবং

সে আর কেউ নয়—তুমিই। আমি বলেছি, আমাদের এবার যেতে হবে অব্যক্তভূমিতে ; তার মানে, আমাদের কণ্ঠচ্ছেদ করতে হবে। কম ফাটিয়ে ঠয়ে যেতে হবে। যে মন্ত্রের প্রভাবে কামনাসমুদ্র উদ্বেলিত হয়, তার নাম ঠ। যেখানে সংস্পর্শ হচ্ছে চাঁদেতে আর সাগরে, ভক্‌ভক্ করে ভাব বেরোচ্ছে কণ্ঠ দিয়ে, চাঁদের কিরণ ঐখানে ঠেক্‌ছে ত ? 'ঠ'য়ে ও 'কমে'তে যোগ হয়েছে কোন্‌খানে ? তা হলে আমাকে উপরে উঠতে হলে ঐটে কাটতে হবে ত ? রসময় জিহ্বা দিয়ে খাচ্ছ লক্‌লক্ করে। অলিজিহ্বা এবার বোঝাব।

নিষ্কল ব্রহ্মে উঠতে হলে গলা কাটতে হবে, এবার বুঝতে পেরেছ ? সমুদ্র না দেখে চাঁদ দেখা ?

পঞ্চ বর্গে পঞ্চ তন্মাত্রা কেমন করে গাঁথা আছে, পরে বোঝাব। 'কম্' ও 'ঠ'র মত দুটো শব্দ ভেঙ্গে তোদের ওখানে একেবারে তুলে দেব। আমি যে উপদেশ দিচ্ছি, উপনিষদ্ খুলে দেখলুম, ঠিক ঐ পথে পথে ঋষি শিষ্যদের নিয়ে গেছেন। ঐখানে যেতে যদি প্রস্তুত থাক, তবে সব ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে যাবে। 'আমি' মেশান না থাকলে ভোগ হয় না। 'আমি' যত বিলয় হয়ে যাবে নিজতত্ত্বে অর্থাৎ **assertion**টা যত বন্ধ হয়ে যাবে, ততই সদাজ্ঞাত তত্ত্বরূপে অবস্থান করবে। ফুটেই আছি, এতে কোন **energy** ব্যয় নেই, চেষ্টা নেই, স্বতঃসিদ্ধ আলোকবৎ জ্বলে থাকবে। তিনি মস্তিষ্কে বলেন, অহং ব্রহ্মাস্মি। পরে ললাটে নিজেকে তত্ত্বরূপে ফুটিয়ে, হৃদয়ে ভোক্তা হয়ে শরীর প্রকাশ করেন। গলা কেটে

দিলে ভোগ ফুরিয়ে যাবে না; উহার পরতন্ত্র ভাব গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ পাবে। "ঠ"এর প্রভাবে সকলি পরিচালিত হয়। মস্তকে দেখবে, আপনিই সব ভোগ, তুমিই ভোগের আধার। ঐখানে গিয়ে সমস্ত আত্মতত্ত্ব-বোধ জাগে, তাই জগৎ সত্য। নিষ্কলে গিয়ে বৌদ্ধরা বিজ্ঞানবাদী হল, শঙ্কর মায়াবাদী হল। বিশ্বলীলা যদি এত নগণ্য, এত কদর্য্য, তবে তিনি তার ভিতর এত লিপ্ত রাখেন নিজেকে? আনন্দত্বই সেখানে আমার আত্মত্ব, পৃথক্ আর কেউ নেই। করাল মূর্ত্তিও আনন্দ, কমনীয় মূর্ত্তিও আনন্দ। জীবচ্ছন্দে বাস করছিস, তাই সবটা আপেক্ষিক ভাবে আসছে। তখন ব্রহ্মচ্ছন্দে বাস করবি। 'আবাহয়তি যো মাং স মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ।' মনকে প্রাণকে পাঠিয়ে নয়, নিজেকে যেতে হবে; তবে আবাহন। শিবের বাহন দক্ষিণাগ্নি, যা ব্রাহ্মণরা জ্বালে। ঐ অগ্নি জ্বালার নাম আবাহন করা। আপনি তাঁর বাহন হলে তবে আবাহন করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, রবিবার।

বীজমন্ত্র তন্ত্রীতে ঘা দেবার, মুখে উচ্চারণ করবার নয়। তেজের গতিকে নিয়মিত করাই বীজ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। সচরাচর জপের উদ্দেশ্য—একটা অর্থ মনে নিবিষ্ট (concentrate) করে তাকে চেতনায় নিয়ে যাওয়া। অর্থটি চেতনায় গেলে

তখন বীজ ক্রিয়া করবে, হ্রীং শ্রীং যা বল, ফুটবে ; দেবতা আবির্ভূত হবেন।

নির্গুণ ভগবান্ আত্মা, অক্ষর। তিনি অধ্যাত্মে যেমন অক্ষর, বিরাটেও তেমনি। অধ্যাত্মে এক একটি জীবে, স্তম্ব থেকে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত, অণু আত্মা হয়ে অবস্থান করছেন ; ঐ অণু আত্মাই অক্ষর। আবার তিনিই বহু বহু হয়ে যাচ্ছেন ; এটি তাঁর বহুলতা, কেটে কেটে যাওয়া ; কেটে যাচ্ছেন, অথচ শক্তির পূর্ণ বিধৃতি আছে। আমি সুখদুঃখে গোটাটাই নিমগ্ন হলাম। প্রতি চিন্তাটার ভিতর আমি গোটাটাই নিমগ্ন হচ্ছি। আবার একটা থেকে উঠে আর একটায় গোটাটাই নিমগ্ন হচ্ছি। এই বিভিন্ন নিমজ্জনময় আত্মার এক টুক্‌রো আনন্দভুক্, এক টুক্‌রো অণুভুক্। ভয়, বিস্ময়, স্নেহ, প্রীতি, কত কি আনন্দ ভোগ কচ্ছি, আবার এত রূপে ভোক্তা বা ক্ষরিত হয়েও একজন ঠিক বসে আছি। তেমনি আবার চিন্তা করলি "জল খাব"। তৃষ্ণায় ঐ জল ফুট্‌ল মনে শব্দের আকারে, তাতে চারিটি হরফ "জল খাব" ; তার মধ্যে তৃষাতুর আত্মা ঢুকেছে ; সে জল খেলে তৃষিত আত্মা অব্যক্ত হয়ে গেল। জল খাওয়ার যে সুখ, সেই সুখময় আত্মাকে নিয়ে তবে একজন হয়ে বসে রইলি। এ পর্য্যন্ত বুঝলি, প্রতি বোধের তলায় তলায় অব্যক্ত আত্মা থাকে, এইরকম করে তার প্রকাশ হয়। জ্ঞানের যত ভঙ্গিমা হয়েছে, তার প্রতি প্রকাশের (detail) তুই দ্রষ্টা। গোটা "জল খাব" কথাটা বলতে গিয়ে যতগুলি শব্দে আঘাত দিয়েছিস, তার প্রত্যেকটির

দ্রষ্টা কাল। তৃষ্ণা পেলে বলবি না 'আগুন খাব'; ঐ 'জল খাব' বলবি। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ক্ষরিত হয়ে হয়ে জ্ঞানকেই ফুটিয়ে তুলছেন। এই শরীরের অণুতে অণুতেও সেই আত্মা ফুটে রয়েছে। এই ভাবে। তা হলে আমার চোখ কত ছোট যে, আত্মত্ব খুঁজতে ছ্যাঁদার ভিতর যেতে হয়! অথচ পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আত্মাই আছেন, এই আমার মূর্ত্তি, এমনি আমার আত্মত্ব। তা হলে আমার শরীরে আত্মাংশ প্রধান, না রক্তমাংস প্রধান? এটা ভর্ত্তি কিসে, আত্মত্বে নয়? তা হলে শরীর আত্মার মন্দির? ঋষি বললেন, একেবারে আত্মাই শরীর হয়েছেন। তা হলে তিনিই আমায় একেবারে ভর্ত্তি করে রেখেছেন। অহং মানে, অ থেকে হ পর্য্যন্ত অক্ষর-শ্রেণী; এর ভিতর সব অক্ষরগুলিই এই আত্মত্বে ভর্ত্তি। খালি 'আমি' ভাব নয়, এর প্রতি কণা **(grain)** আত্মা।

এত প্রগল্ভ আমরা, এত বাচাল, চঞ্চল, শিশুজীব আমরা যে, 'ভগবান্' এই শব্দটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলি। কত সংস্কার, কত বোঝাপড়া নিয়ে তবে 'ভগবান্' এই বোধে যেতে কত অন্বেষণ, কত খোঁজাখুজি। এমন শিশু যারা, তারা আশা করছে এঁকে লাভ করার। যারা এঁর প্রত্যয় সম্বন্ধে এত কাঁচা, অথচ গৃহপ্রত্যয় সম্বন্ধে কেমন পাকা; সে সব টপ্কাস করে বেরোয়। চিরপুরাতন ভগবান্ যতক্ষণ প্রাপ্তিপূর্ণ না হন, পুরাতন না হন, ততক্ষণ এমনি চলবে। ভাবের ধাক্কা সামলে তার ভিতর সুন্দর শান্ত স্থির হয়ে থাকা, তাঁকে ব্যবহার করা

কত উচ্চ অধিকার দেখ। যদি একটা খুব আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, সে কি সাক্ষাৎভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি হল না? এই যে আমার ভিতর প্রাণাদির আকারে শক্তি খেলা করছে, এ যে চিরপুরাতন ভাগবতী শক্তি, এই কথাটি বলতে শিখলে, স্বীকার করতে শিখলে, এবং এই বিজ্ঞান অবলম্বন করলে পূর্ণ স্বীকৃতি আসবে। আলোর দীপ্তি যেমন আলোকে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমার ভিতর যে সব শক্তি আছে, সেই শক্তিই তেমন আমায় দেখিয়ে দিচ্ছে ভগবান্‌কে। সূর্য্যরশ্মি ধরে যেমন দৃষ্টি চলে যায় সূর্য্যে, তেমনি ভগবদালোক ধরেই ভগবান্‌কে দেখতে হবে। অং আং কং খং ইত্যাদি বর্ণমালাই তাঁর জ্যোতি, এইগুলো ধরে তাঁকে দেখতে হবে। এরই নাম ভগবৎপ্রত্যয়। এই অস্মিতা এক দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্ত্তা, আর এক দিকে চিরসংন্যস্ত ভগবানের গায়ে। আমি মাঝে। অ আ ক খ তা হলে প্রত্যেকটার তলাতেই আছে, যাকে নিজ বলি। কি সূক্ষ্ম জ্ঞান! তবে কি অহং দেখতে গিয়ে অ আ, ক খ এত দেখতে হবে? না; শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছি। যেমন নুন খাবার সময় বোঝাতে হয় না—সবটা নুন কি না, তখন তার প্রতি কণাই (particle) নুন জানা যায়, সেইরূপ ভগবদ্‌ব্যবহারের সময় এ সব নয়, ইহা মাত্র বোঝবার সময় প্রয়োজন। এখন বোঝবার জন্য দেখ্‌তে হবে যে, ভগবৎজ্যোতি প্রতি অক্ষরেতেই আছে।

আকাশ দুটি—একটি দহরাকাশ, একটি বাহ্যাকাশ। বাইরের শূন্য ছেড়ে দহরের শূন্য ধরলে গোটা আত্মার উপর

আধিপত্য আসবে। তিনি যেমন বিসর্জ্জন করে তোকে জগতের দিকে ঠেলেছিলেন, তুই তেমনি জগৎকে বিসর্জ্জন করে আত্মত্বের দিকে ঠেল দিলি। অ থেকে বিসর্গ পর্য্যন্তের স্থান কোথায়? কণ্ঠে। হৃদয়তত্ত্ব সম্বন্ধে বলব, না এই অ আ বলব? জটিল বোধ হয় ত আবার হৃদয়ং ব্রহ্ম বলি। ভাবে ভগবতী আর চলবে না, একেবারে শক্তিময়ী চাই। এইখানে চাই সমাধি। বিশ্বাসের তারতম্য আছে। বিশ্বাস হল ক্ষণিক বিজ্ঞান, একবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম ভগবান্ বলে। তাতে স্থিতি হল সমাধি। বস্তু একই, বিশ্বাস বিগতি শ্বাস—গতিশূন্য শ্বাস। যেখানে গিয়ে ঠেকব, সেখানে আর গতি চলে না, স্রোত চলে না, স্রোতকে সে গ্রাস করে নেয়। সে allow করলে গতি ছোটে, না করলে গতি চলে না। ঐখানটায় গতি হয় একমুখী, একধারা। ভেকুয়াম যেমন সব চুষে নেয়, তেমনি আমার সমস্তটাকে যে চুষে নেবে, সেই ভগবতীর কাছে চলেছি। নমঃ আত্মনে।

যতক্ষণ এর সঙ্গে চিন্তা থাকবে, বুদ্ধি খাটাতে হবে, ততক্ষণ গতিহীন আছিস। যখনই শোনবামাত্র স্থির হবি, জানবি—বিশ্বাস এসেছে, প্রত্যয় এসেছে। তা হলে দেখ্‌লুম, একটি বন্ধনের দিকে, নীচের দিকে গতি, একটা হকারের দিকে গতি। দুটোই গতি হল; এতেও যেতে হবে, ওতেও যেতে হবে। আমার কি কেউ কোথাও নেই? আমায় আর চলতে হবে না, আমায় কোলে করে নিয়ে যাবে? গতির কথা, সেই চলার কথাই ত হল।

আমি যে প্রচেষ্টায় অক্ষম, শ্রান্ত, ক্লান্ত। উর্দ্ধমুখী পথে চলা বিপুল জোরের দরকার, আমার ভাগ্যে তা দুরাশা মাত্র। আমার এমন কি কেউ নেই, যে আমায় নিয়ে যাবে; আমি চলেছি, এ কথা জানতে পারব না? আছে রে—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" ঐ যে গন্তব্য ক্ষেত্র, যাতে যেতে হবে, যে ভগবানের কথা বলছি, ঐ পাহাড়ের চূড়াতেই কি তিনি বসে আছেন, আমার ঘরে কি তিনি নেই? যদি তিনি পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার ঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই থাকেন, তবে তিনিই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, যদি তাঁকে ধরতে পারি। তা হলে উনিই ত নিয়ে যাবেন ওঁর পরম স্থানে। সুতরাং এই ভগবতীর অ আ ইত্যাদি শক্তি আমার বুকে কেমন করে আছে, সেইটি দেখতে হবে। কি ভাব প্রকাশ করে ইনি সত্যি সত্যি নিয়ে যান? এর নাম হার্দ্দ শক্তি, ক আর ঠ; হৃদয়ের নাম কঠ। সেই কঠশক্তি যদি পাই, ভাবে নয়, সত্যি যদি পাই, তবেই সর্ব্ব আশা মিটে যাবে। অ আ, ক খ, সব তলা-ভর্ত্তি আছে? এই অক্ষরগুলি তোর শরীরে আছে? তা হলে যে ঘরটায় বসে আছি, ঐখানে বসে থাকলেই ভগবান্ পাওয়া যাবে? অ থেকে হ পর্য্যন্ত শরীর, আর প্রত্যেকের তলায় তলায় আত্মা। গোটাটা ঝসৌ বীজ। তা হলে এখানে আত্মত্ব পেলে সে সর্ব্বব্যাপী হবে না তড়িতের মত? এখন আর ভাবের নয়, জ্যান্ত শক্তিমান্ সত্যিকার

ভগবান্ যদি পাস, তবেই সব সাধনার পরিতৃপ্তি। অক্ষরের আকারে যে জ্ঞানগুলো রয়েছে তোর ভিতর, সেইগুলো কোথায়? বোধের ঘরেই ত? বোধের ঘরেই কাঠ, বায়ু, আগুন, প্রাণ, ভগবান্, সবই হয়। কোথায় যাস্ পুনঃ পুনঃ বেরিয়ে অবিদ্যার ঘরে? বোধই কাঠ হয়, বিশ্বাদি হয়; এ সব কার চেহারা? বোধের? কে রে? এমন যে বীর্য্যের ঘর, শক্তির ঘর, সেইখানে তোদের নিয়ে যাচ্ছি। যেখানে গেলে একেবারে কাঠ হবি, আগুন হবি। এক ঋষি লাউ-মাচার নীচে ধ্যানে বসেছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গার পর লাউয়ের উপর উপবিষ্ট একটি মশা দেখে যেমন বললেন—বাঃ! বেশ মশা ত! অমনি তিনি মশা হয়ে গেলেন। ঐ কথাটা বলতে তর সইল না, তৎক্ষণাৎ মশা হয়ে গেলেন। এইখান থেকে দেওয়ালটা ভেঙ্গে সশরীরে চলে যাবি ওখানে। এই ক্ষেত্র না পেলে কি হবে? দশ হাজার বার ভগবান্ ভগবান্ বলেও কিছু পেলিনে। এ ভূমি যতক্ষণ না পাবি, ততক্ষণ ভগবানের হাজার বিজ্ঞান কানে ঢুকুক, কিছুতে পরিত্রাণ পাবিনে।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এ বল হল আত্মবল। তোমার বলতত্ত্বের উপলব্ধি যতক্ষণ না ফোটে, ততক্ষণ তোমায় পাবার জো নেই। তুমি যে বলবতী ভগবতী। ঋষি নিজের মহাকাশে উচ্চারণ করলেন 'বিমান' এই শব্দ। তৎক্ষণাৎ বিমান হল। তার গতি দিলেন সূর্য্যলোকে, সেখানে ছুটছে বিমান। কি সাঙ্ঘাতিক শব্দ উচ্চারণ রে! তিনি ভক্তি করে আরাধনা

করতে বসলেন না। রাজার ভাণ্ডারে যেমন সব কিছু থাকে, তেমনি দেবশক্তি সব তাঁর কাছে যুক্তহস্ত। হব্যবাহী আগুন তাঁর ভিতরে আছে। তাঁর বাক্‌রূপ অগ্নি সমস্ত দেবতাকে খোরাক যোগাচ্ছে, তাদের লীলাশীল করে রাখে তাঁর বাক্। আদর, ভক্তি, ভালবাসা, মনন, চিন্তা ঢের হয়েছে, এখন এই ভূমিতে আসতে হবে। হর হর শিব ব্যোম!

এবার সাধনার কোন্ স্তরে ঢুক্‌লে? ভাবের ঘর গেল, শক্তিতত্ত্ব এল। এখন অক্ষরের কথা, শক্তির কথা বল্‌ছি। হৃদয় প্রাণ ইত্যাদি স্থূল কথা, উহা মৌলিক বা সূক্ষ্ম নয় এবং উহা পরিমিত। এখন অপরিমিতের কথা হচ্ছে। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারছ? হৃদয়ের চেয়ে সূক্ষ্মতা। শক্তিত্ব যে একটা গভীরতর স্তর, সেইটে বেশ দেখতে পাচ্ছি। বুকের তলায় কে আছে? অক্ষর ছাড়া কিছু নেই। জয় মা ভগবতী বাঙ্ময়ী! এই অক্ষর পুরুষকে বা অক্ষরা মাকে ব্রহ্মযোনি বলে। "তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।" অনাচার অভক্তি যা কিছু তোমারই দান। ব্রহ্মতত্ত্বে পাপী অপাপী বিচার নেই। আমি চিন্তাময়! তুমি চিন্তামণি!

২৮এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, রবিবার।

বর্ণতত্ত্বের দ্বারা কি লাভ হবে? একে কেমন করে প্রয়োগ করতে হবে? এর ব্যবহার কি করে হবে? যে শব্দ প্রকাশ হয়, তাতে একটা গতি ফুটে উঠতে লাগল, সেটা বায়ুর সাহায্যে

পরিচালিত হল। যেমন ঈথরের কম্পন অবলম্বন করে আলোক-রশ্মি গতিময় হয়, তেমনি শব্দ যখন প্রকাশিত হয়, তার গতি হয় বাতাসের কম্পনের দ্বারা। শব্দটি এমন জিনিষ, বায়ুর সাহায্যে শব্দিত হয়ে বেরিয়ে আসে। বাহ্য বায়ুও স্পর্শ, প্রাণ, অন্তর্বায়ুও স্পর্শ; আত্মায় স্পৃষ্ট হয়ে যা ফুটে ওঠে, সেই স্পর্শের গতি নিয়ে চলে, সেই গতিবান্ প্রাণবায়ু। তাই বাইরের বায়ু আর ভিতরের বেদন ও শব্দ সমবায়ী জিনিষ। ঐটে বাইরের বায়ু অবলম্বন করে বেরিয়ে আসে। প্রাণতত্ত্ব ও স্পর্শতত্ত্ব এক কথা। আত্মা বেদনময় হলেন মানে, প্রাণবন্ত হলেন। বেদন হলেই গতি আছে। সেই যে ছুটে চললে, সেটা বাইরের বায়ুর সঙ্গে সমবায়ী জিনিষ। কি রূপ হল? বেদনময়, বোধময় চলা। বাইরে বোধটি ভৌতিক চলা। শব্দ উচ্চারণ করছি মানে, আমার একটা বেদন ছুটে চলেছে। এই জন্যে উপনিষদে আছে, 'যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ, যঃ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা।' মূলে সব তত্ত্ব পাওয়া যায়। তবে যেটা প্রধান ভাবে থাকে, তাকে বিশিষ্ট নাম দেওয়া হয় মাত্র। শব্দ = তেজ = গতি। বাক্ ফুটলেই তার গোড়াতে আছে বেদন ও আকাশ। শব্দময় আকাশ বেদিত হলে শব্দ ফোটে। এই যে প্রাণশক্তি, এ শক্তি তোদের ভিতর নিহিত রয়েছে। সেই শক্তির স্পর্শ যেখান যেখান দিয়ে যাতায়াত করছে, তার একটা নিয়ম আছে। আত্মার এই ধাবমান অবস্থা স্পর্শনামীয় জিনিষকে ফোটাচ্ছে। এই স্পর্শধর্ম্ম যেমন করে যাচ্ছে, সেখানে সেই অনুপাতে আমার ভিতরে ভাব, রস,

স্পর্শ ইত্যাদি ফুটছে। সুতরাং শব্দ-সাহায্যে এই বেদনের গতিকে আঘাত দিতে হবে। 'সং' বলতে যে বিশিষ্ট বেদনের মূর্ত্তি হল, তার অনুকরণে 'সং' বললে তবে সং জাগ্রত হবে। এই বাক্ই প্রধান জিনিষ, এর ভিতর অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে। তড়িৎগতিও এর কাছে জড়, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও সে বেদন দ্রুতগামী; সুতরাং অলক্ষ্য; সাধারণ জ্ঞানে ধরা যায় না। তবে স্ফুটগুলো দেখে বলতে পারি, এত মাত্রা শক্তি ধাবিত হল; অনুভূতি যেখানে বিশিষ্ট শব্দের আকার নিচ্ছে, পর পর সেই মাত্রা (degree) ধরতে পারি। আসল কথা, আত্মার স্পর্শ-ধর্ম্ম বা শক্তি থেকে সব ফুটে উঠেছে। এই শক্তি সব রূপকে ধরে রেখে দেয়, সমস্ত অস্তিত্ব নাস্তিত্ব নির্ভর করে এর উপর। আসল ব্যাপার এই স্পর্শপ্রবাহ। তাই তন্ত্রের সাধনা এই স্পর্শকে অবলম্বন করে। যোগ, এর জ্ঞানাংশকে নিয়ে কাজ করে।

তন্ত্র সেই স্পর্শ, স্পৃশ্যমান আত্মাশক্তিকে নিয়ে কাজ করলে। জোর দিলে মূল প্রাণের, শক্তির উপরে। আর অর্থাংশকে যোগ নিলে। কেল্লা ততক্ষণ জয় হবে না, যতক্ষণ আত্মবিশ্বাসী না হবে, ভগবদ্‌বিশ্বাসী না হবে। আত্মা মানেই, তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন মূলরূপে। স্বয়ং ভগবানের প্রকট মূর্ত্তি আমার নিজত্ব। অপ্রকট তিনি ঈশ্বররূপে, প্রভু নিয়ন্তারূপে, এই কথাটা মাথায় একেবারে ধরে রাখবে। ভক্তিতে তাঁকে পাব না, যতক্ষণ না তিনি নিজত্বে পর্য্যবসিত

হবেন এবং সেই নিজত্ব ভগবানে গিয়ে ঠেকবে। এ যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ঠেকান, এই স্পর্শতত্ত্ব যতক্ষণ না পাবে, ততক্ষণ হবে না। 'নিজে চল, মনকে পাঠাসনে', এই কথা আমি তোদের ক্রমাগত বলি।

এই যাওয়াটি কেন হয় না? মন চলে গেল, আমি যেতে পারলুম না। এই যে পাথর হয়ে আছে, তাকে হতে হবে গতিশীল। "নিজ নিজ" বললে ভগবান্ মনে হয় কৈ? ইনি বিশ্বের কেন্দ্র, এ কথা বুঝেছি; কিন্তু ইনি ত নিজে চলেন না, মন চলে। সব চলে, ইনি ত পাথরের মত বসে আছেন! "ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ," এই আত্মা যে সব বিজ্ঞান জগতের ধর্ত্তা, তা দেখেও দেখলে না। এই আত্মত্ব শক্তিবৎ পরিচালিত হচ্ছে। এই আত্মা কেমন করে বিষয়ের নিয়ন্তা হবে, তাই দেখতে হবে। আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ফুটছে আত্মার উপর; সে ক্ষণিক জ্ঞানবিলাস দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু আবার এই সব ভাবের ক্রীতদাস হয়ে আছি। এই দাসত্বের সংস্কারের দ্বারে ঘা না দিলে হবে না। ঐ সংস্কারে আঘাত না দিলে এই সব হতে বাধা। একটা সুযোগ পাচ্ছিস, তাই মুহূর্ত্তের মত দেখে আবার ফিরে আসছিস্। ওই সংস্কারগ্রন্থিকে না দেখলে তাঁকে দেখতে পাবি না। সংস্কারগ্রন্থির পরিচালনা করছেন সাক্ষাৎ ভগবতী। ওখানে তোমার হাত নেই। তোমার আধিপত্য হল ভাব ও মনের ঘরে। তোমার বুকের উপর জগৎ ফুটছে দেখতে পাচ্ছ,

বিশ্বজ্ঞানের আধার তুমি, তাও দেখতে পাচ্ছ ; কিন্তু সেই জগৎ-প্রকাশকে রোধ করা, পরিচালনা করা, এ তুমি পারছ না। ভূমা প্রভৃতি যা দেখছ, তা মুখে বলেই যাচ্ছ ; তাতে কোন সার্থকতা আসেনি। যে ব্রহ্ম তোমার ভিতর অনুশাসন করে জগৎ ফোটাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না। তুমি নিজেকে এইরূপ-ভাবে আঘাত দেবার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে চল। নিজে চল, মানে, নিষ্কল শুদ্ধ হয়ে যেতে হবে ; কাদামাটি মেখে যাবার জো নেই। এই যে আত্মত্ব, চিৎ, তা ঐ ভগবান্ই, আনন্দতত্ত্বই। তোমাকে এই বিশুদ্ধ আত্মার আনন্দতত্ত্ব স্পর্শ করতে হবে। এই আনন্দ-ময়েতে আমাতে কোন ব্যবধান নেই। 'আমি' বিলয়ের নাম আনন্দত্ব। 'আমি' জ্ঞান থাকলে সে আত্মত্ব নয়। পিছনে আনন্দঘন সত্তা থাকলে এই 'আমি'টি টুপ করে হারিয়ে যাবে। এই আনন্দময়ত্ব হল পরমাত্মার ধর্ম্ম। আমি যেমনি এদিক্‌কার অংশ ছাড়ব, অমনি তাঁতে পড়ব। কলকাতায় যাওয়া আগে জ্ঞানে, তার পর ভৌতিক জগতে সম্পন্ন হয়। তেমনি জ্ঞানে আগে কলকাতা স্বীকারের ন্যায় মূলে আনন্দময়ের স্বীকার না থাকলে কেমন করে যাবে ? 'আমি বিশ্বধর্ত্তা' মাত্র জানলে আর আনন্দ-ময়ে যেতে পারবে না। এই আত্মত্বের পিছনে আছেন আনন্দময় পরমাত্মত্ব। অবিশুদ্ধত্ব ছাড়লেই আমার পিছনে আছেন তিনি। আমি আঘাত পাচ্ছি, কিন্তু যেতে পারছি না। কেন ? ওই তোমার পেছনে আছে অ আ, ক খ গ ঘ ঙ। যে জাতীয় পরশ উঠেছে, এখন তা অন্তরায় করেছে পরমাত্মানুভূতির। সুতরাং

আমার আত্মত্ব ও ত্রিবৃৎ, একে ভাল করে আঘাত না দিতে পারলে যেতে পারব না। ওই তিন পাকে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, স্বর্গ মর্ত্ত অন্তরীক্ষ রচিত হয়েছে। মন, প্রাণ ও সংস্কারগ্রন্থি বা রুদ্রগ্রন্থি রচিত হয়েছে। 'তেজঃ অজায়ত,' তৈরী হল প্রাণ। মনঃ অজায়ত। নিজত্ব আধ পাক ও তার তিন পাক হল আমার কুণ্ডলিনী। এখন আমি নিজত্ব-বোধের দ্বারা তিনটি পাকে ঠোকর দিলে তৎক্ষণাৎ খুলে যাবে। এর মানে, শিবকে বেষ্টন করে ঐ বায়ুর দ্বারা আঘাত দাও, ও তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। ঘোড়া তিন পাকে বাঁধা; সে বাঁধন খুললে তবে তার উপর তুমি আধিপত্য করবে। যেমন বুঝবে, অমনি আঘাত দেওয়া হবে। আঘাত দেবার জন্যই এত আলোচনা করছি। এর নাম ভগবতী-সাধনা, আরাধনা; যোগস্থ হয়ে মন্ত্রদ্বারা জাগরণ। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবতীশক্তি আমার ত্রিবৃৎকে পরিচালনা করছেন। এঁকে আমায় এমন করে পেতে হবে। আত্মবোধ সকলেরই আছে। তাকে পেলেই ঘা দিতে সক্ষম হব ও পরমাত্মত্বে পৌঁছান হবে। এই ঘা দিতে শিখতে হবে। সংস্কার মানে, আত্মার শক্তিরূপে থাকা। তাই ভগবান্ বললেন, সব করাই আছে, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। এখানটিতে যেতে পারলেই ঘা দিতে পারবে। ঐখানটি এমন স্থল, যেখানে সব বিশ্ব লুকান আছে; আমার সমস্ত সংস্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ তত্ত্ব কালের প্রভাবে একীভূত হয়ে লুকিয়ে আছে। ভূমাতে আঘাত দিতে পারলেই সব পাব। যদি কণ্ঠে একটা বড় ছ্যাঁদা করতে

পারি, তা হলে সব পাব। ললাটে অব্যক্তভাবে সকল তত্ত্ব নিয়ে অক্ষরাত্মা অবস্থান করেন। বহুকে কেন্দ্রস্থ করে, একজন হয়ে, জমাট হয়ে, একীভূত আত্মা ললাটে বসে আছেন। আর হৃদয়ে নেমে ভোক্তা হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হচ্ছেন। একটা হাউই লাল ফুল ছাড়ছে, একটা বেগুনী ফুল ছাড়ছে। ছাড়ছিস্ ললাটে, ফুটছে বুকে। অব্যক্তের সঙ্গে তুলনায় হৃদয়ে একজন নয়, বহু বহু বহু। কালের কুচির ধারা ক্ষণ, মাস ইত্যাদি, আত্মার কুচির ধারা বুকে সংগৃহীত হয়ে, বসে আছিস্ অব্যক্ত ভূমিতে। ফুটলি কখন সুখ, কখন জ্বালা বলে, বলতে বলতে নিভে অব্যক্তে মিলিয়ে গেলি। প্রতি চেতনায় অক্ষর আত্মস্রোত, অস্মিতা, মহানাত্মা, এই হল বুকের ধর্ম্ম। 'আমি আছি'—অস্মিতা; এই জ্ঞানের স্থান হৃদয়, আত্মত্বের ব্যক্ততা; অস্মিজ্ঞান নিবলে হল অব্যক্ততা। এই তত্ত্ব অধিকার করলে দেখ্‌ব, অনেক 'আমি' উঠ্‌ছে। সব তত্ত্বের গোড়ায় আছে সংস্কার। বুকের তলায় সব আছে, ধরা পড়লেই ভোগ হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সংস্কার গঠিত ও ধ্বংস হয়: জীবের হবে, এ ত সাধারণ জিনিষ। এখন এই আত্মা, যাঁকে নির্গুণ বলে দেখলি, ললাটে নিলে আমি এঁকে সব ভোগের তলায় তলায় পাব। রূপ রস ইত্যাদির তলাতেও আমি আছি। একদিকে তত্ত্বের মূলে, একদিকে সেগুলোর আঘাতে তত্ত্বটা ফুটছে। এখন নিজে আঘাত দিলে সব তত্ত্ব ফোটাতে পারবে না? যে অক্ষরমূর্ত্তি পরমেশ্বরেই অবস্থান করে, সে পারবে।

ভগবানের কোন্ শক্তি সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে প্রলম্বিত হয়েছে, তাকে ধরতে হবে। এত দ্রুত ঘা দিতে হবে, যাতে টকাস্ করে রূপ ফুট্‌বে। এই স্পর্শশক্তিকে ভাল করে ধরতে পারলে আমাতে যা কিছু ফুটেছে, সেই সবগুলোকেই ধরা হবে। ভৌতিক তত্ত্বে যেতে হয়, আর জ্ঞানে ফুটলেই যাওয়া হয়। জ্ঞানতত্ত্বে সকলই ফুটবে। স্পর্শের পরিস্ফুটাবস্থা আত্মস্পর্শ ছাড়া আর কিছু নয়; ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে আঘাত করে তাকে ফোটাবে।

স্পর্শ দুটো জিনিষ,—(১) গতি, উষ্মা, প্রাণ। (২) একটা জ্ঞানের অনুভূতি। গতি স শ ষ হ, উষ্মবর্ণ (হ স এক কথা) চারটে শব্দ গতিবাচক। মধ্যিখানে য র ল ব—অন্তঃস্থ, মধ্যে বাস-করা বর্ণ। গতি বা স শ-এর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত (regulate) করছে, সীমারেখা রচিত (line of demarcation create) করছে—য র ল ব, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, জল তত্ত্ব, তাত্ত্বিক শব্দ। গতিকে স্থূল (materialise) করতে গেলে স্থূলত্ব (matter) যে তত্ত্বের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাকে স্পর্শদ্বারা আঘাত করতে হবে। তিনটে গতি মূলাধারে—ব **শ ষ স**। মূলাধারের চারটে পাঁপড়ি, একটা অন্ত্যস্থ ব ও তিনটে গতিব্যঞ্জক। একটা উষ্মবর্ণ হ রেখেছি মাথায় গতিচক্র সম্পূর্ণ (circuit complete) করার জন্য। যাওয়া এবং আসা, অণ্ডের আকারে। মূল প্রাণ বা গতি সহস্রারে। জৈব গতি—সৃষ্টি স্থিতি—লয়, ফোটা, থাকা, বিলয় প্রাপ্ত হওয়া; প্রতি প্রকাশই (every unit) গতি।

যে স্পর্শের প্রবাহ গতি, সেই গতিকে লক্ষ্য করে শ ষ স উচ্চারণ করলে এবং শেষ গতি হ-কে দেখে উচ্চারণ করলে ঐ গতির প্রবাহ দেখতে পাব। নিজের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দিনের ভিতর কবার করে এইরূপ দেখলে, আর গতি ও স্পর্শ ধরিয়ে দিলেই দোরস্ত হয়ে যাবে।

হ আর স—ং=ব্রহ্ম। এই যে হ থেকে স-এ গতায়াত, ব্রহ্মকে তার অন্তঃস্থ করলেই ভরপূর হয়ে গেল। স্বরবর্ণ-গুলোর নাম কি? সর্ব্ব ব্যঞ্জনা ক থেকে আরম্ভ। ষ=নিধন। প্রকাশ থেকে নিধন পর্য্যন্ত যেখানে একীভূত হয়ে আছে সমবায় ভাবে, তার নাম ক্ষ। সৃষ্টি ও লয় হল ওর তেজ। কুণ্ডলিনী শক্তির এত দ্রুত গতি যে, সে অপ্রত্যক্ষ (imperceptible), ধরতে পারবে না ; স্থির সৌদামিনীর মত, অথচ চলছে। যেমন নদী চলছে ঠায়, অথচ একটা চাদরের (sheetএর) মত পড়ে আছে। তেমনি একটা গতির sheet পড়ে আছে। যেমন চোখ পড়েছে, কি দেখতে পাচ্ছি? আর 'ঐং' যে দিকে গিয়ে বসে আছেন, অক্ষর পুরুষ বসে আছেন সব সংস্কার নিয়ে, চন্দ্রলোক নিয়ে (পিতৃলোক=চাঁদ)। চন্দ্রমায় অক্ষর পুরুষ হচ্ছেন আলোকিত। জয় যোগেশ্বরী! প্রতি গতিটা একজন একজন চেতন আত্মা, শরীরময় যত কিছু শক্তি, সব এক একজন দেবতা ফুটে আছেন। এই বর্ণনা করতে সকালে ১॥০ ঘণ্টা গেছে। ক্রিয়াটুকু করতে লাগে এক মুহূর্ত্ত। যেমন তলোয়ারের ব্যবহার জানলে এক কোপ, না জানলে অনেক। ভাবনা চিন্তা

নেই ; কারণ, আনন্দময়ীর বুকেই একেবারে রয়েছিস্। এই ছবিটা আঁকবার দরকার ছিল না আজ। মাকে জন্মের মত পাবার জন্যে, যাতে আর নামতে না হয়, তাই এত বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছি। প্রযোজ্য তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গেই ; অ আ ইত্যাদি শব্দ মাত্র নয়, স্পর্শ ও গতি, ছোঁয়া ও যাওয়া। এই বিভাগটা ধরিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে গেল। মধ্যে অন্তঃস্থ রেখেছি চাকা চলার মত য র ল ব। এই যে উপর নীচু দেখাচ্ছি, কোথায় বল দিকিন্? শুধু জ্ঞানে। ইনি বলেন যদি উঁচুনীচু, তবেই উঁচুনীচু ; তা না হলে কিছু নেই। তার মানে, এখানে দিক্‌জ্ঞান নেই। দেখতে পেলি ? এই আত্মতত্ত্বটি নিজ ? এঁকেই উঁচুনীচু দেখছিলি তা হলে ? এঁতে ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে পেলিনে ? তা হলে কালজ্ঞান নেই আত্মতত্ত্বে ? দিক্ ও কাল নেই. এমন জায়গায় গতি মানে, আত্মায় গতি। এই দিক্-কাল জ্ঞানশূন্য গতিই হচ্ছে স্পর্শ, ঠোক্কর। মূল ঠোক্করটি হবে সেইখানে, যেখানে কাল ও দিক্ অপরিস্ফুট। এই ঠোক্করটা দেখিয়ে দিলেই রূপ ও রস হড়্ হড়্ করে বেরোবে, যোগৈশ্বর্য্য পাবি। ঐং জ্ঞানমূর্ত্তি। ক্লীং কলন, কামনাবীজ।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, রবিবার।

আমার সাধন-জীবনকে যদি ফুটিয়ে তুলতে চাই, তবে সর্ব্বদাই এমন করতে হবে যে, জগৎব্যবহার করিতে গিয়ে ভগবৎ-চ্যুত না হই। এই বিচ্যুতি অবিদ্যাজাত, সুতরাং ইহা

সত্য নয় ; দেখার তারতম্য মাত্র। জগৎকে ঠিক করে দেখতে পারলে দেখতাম, প্রতি প্রকাশেই ভগবান্ আছেন, আমি আছি, আর সেই পদার্থ আছে। এমন কোন জিনিষ জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্তের ভিতর নেই, যাতে ভগবান্ আছেন,সেই জিনিষ আছে অথচ আমি নেই। এইটে যদি দেখতে পাই, তা হলে কোন পদার্থ দেখতে গিয়ে আর ভগবান্ থেকে চ্যুত হইনে। জল আছে, মাটি আছে, তার ভিতর ভগবান্ আলাদা আছেন, এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে হলুম ভগবদ্‌বিচ্যুত। যদি দেখতিস্, ভগবান্ আছেন, আমি আছি, সেই জিনিষ আছে, তা হলে ভগবদ্‌বিচ্যুতি হত না। কোথা ভগবানের সঙ্গচ্যুত হবি ? ভাত খেতে বসে, তরকারি কুটতে বসে ? আমি আছি ভগবানের সঙ্গে, এই চোখ দিয়ে দেখলে সে দেখা সত্যি হল। আত্মায় তাঁকে না আনলে ভগবান্‌কে ঠিক দেখা হল না। প্রত্যগাত্মত্ব হল পরাশক্তি। বহু হওয়ার গতির নিদর্শন আত্মা। জ্ঞানগোচর হওয়ার নাম থাকা, জ্ঞানগোচর না হওয়ার নাম না থাকা। তাই দুটো জগৎ, একটা অস্তিত্বের জগৎ, একটা নাস্তিত্বের জগৎ। আত্মত্ব ছাড়া তিনি আর কিছু দর্শন করলেন না যখন, তখন 'ন কিঞ্চন অস্তি'—নাস্তি নয়, নাস্তিরূপে প্রতিভাত মাত্র। নাস্তিত্বের জ্ঞান, সেও একটা জ্ঞান। অস্তিত্বময় ব্যক্ত জগৎ, নাস্তিত্বময় অব্যক্ত জগৎ। সবই আছে—দেখছিনে মাত্র। ফল কি হল ? নাস্তিত্বময় জগতে অস্তিত্ব চলে গেছে।

বীজ মানে, সে নাস্তিজ্ঞানে চলে গেছে। এখন জ্ঞান করে

নিতে পারলেই হল। এ কি সাংঘাতিক জিনিষ! আমি যদি বললুম আছে, তবে আছে; যদি বললুম্ নেই, তবে নেই। "যচ্চ অস্য ইহ অস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।" জ্ঞান-তত্ত্ব কি ভয়ানক তত্ত্ব, দেখ একবার। এই জিনিষ তুই নিজে। দেখ্ রে বাবা, কি ভয়ানক! অস্তিময় জগতের মূল্য বেশি নয়, নাস্তিময় জগতের মূল্য ভয়ানক। অগাধ জল সমুদ্রে, নদী নালায় নয়; যদিও নদীনালা সেখান থেকেই ছড়ায়। জ্ঞানমূর্ত্তি আমার অকূল পাথার! হর হর, কে জেগে আছে রে! ঐ মহাপাথার, ঐ মহাদেব যদি ওঠে, জাগে, তবে সে কি দেখবে? "ন কিঞ্চিদস্তি" দেখবে। তা হলে প্রথম সম্বেদন হবে "নান্যৎ আত্মনঃ অপশ্যৎ।" তন্ত্র একে বলে, আদ্যা কালিকা। শিব তখন কালীশক্তির দ্বারা বিভোর হয়ে আছেন। কালী দেখছেন কি, না 'ন অন্যৎ কিঞ্চিৎ অপশ্যৎ।' এই জন্যে সে দিন পূজা করবার সময় ঐ যে প্রত্যগাত্মত্বের গতির কথা বললাম, ওর নাম বজ্রিণীশক্তি; ঐ শক্তিকে শিবের মাথা থেকে নামিয়ে রেখে শিবপূজা করতে হয়।

সুখময় সুশির, ছিদ্র, অবকাশ, ছ্যাঁদা। সেখানে অস্তিজ্ঞান লয় হয়ে গেছে; তবেই আকাশ হল না? সব নিয়ে, নাস্তির আকারে পূরে, 'নাস্তি' এই বলে ধরলে সব ছ্যাঁদা হয়ে গেল; ফাঁক হয়ে গেল। জিভে সব রস ফাঁক হয়ে আছে, ঠোক্কর দিলে বেরোবে। সুশির ছিদ্র, ব্রহ্মরন্ধ্র, অপ্রাণতত্ত্ব; প্রাণও বয় না সেখানে। যেখানে জেগেছেন, সেখানে ভগবৎতত্ত্ব; যেখানে

প্রলীন করেছেন, সেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব। 'নাস্তি' বললেই সব সাবাড় হয়ে গেল, নাস্তির চেহারা দর্শন হল। নাস্তিতত্ত্বই অস্তিতত্ত্ব হয়ে যায়; সেই হল ব্রহ্মবাদ। ঐ যে নাস্তিত্বের, অব্যক্তের দারুণ তামসী মূর্ত্তি, যেমন মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ খেলা করে, তাকে জল করে গলিয়ে খেলা করে, তেমনি এই পরাশক্তি তুমি আমি, ঐ নাস্তিকে তড়িদ্‌বৎ ফুটিয়ে তুলি; ওর নাম তাই বজ্র। আমরা কোন্ ভূমিতে এসে পড়লাম হে? একটা বোকার মত মানুষ, একটা নির্দ্দিষ্ট আত্মবৎ তত্ত্ব, আমার গতিতে জেগে উঠবে দিকে দিকে অস্তিত্ব! আবার আমি যদি যাই শয়ন করতে, আমার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ যাবে নাস্তিত্বে!

কার বুকে থেকে এই দর্শন, আমার এই স্বরূপ-দর্শন পেয়েছি? এত বড় যে খেলার কথা বললুম, যেন একটা ভয়ঙ্কর তেজ, এই ভাবে দেখলাম। সাধারণ কাজে তুই বুড়োর মত অচল স্থবির; কিন্তু চোর ধরলে তোর গায়ে যে জোর আসে হঠাৎ, এই রকম কি? না; ইহাই তোর স্বভাব-সিদ্ধ, এ তোতে ফুটেই আছে; যেমন সূর্য্যে জ্যোতি ফুটেই আছে। খালি কথা। তুই যদি নিজেকে বজ্রিণী বলে দেখিস্, তবে ঐ শক্তি ফুট্‌ছে দেখবি। বাক্ ফুট্‌ছে মানে কি? নিজে ফুট্‌ছিস্। আমি না থাকলে বাক্ ফুটবে? জল থাকবে না, ঢেউ ফুটবে? আমি থাকব না, বাক্ ফুট্‌বে? নিজেই বাক্‌রূপা। পরাশক্তি ও পরমাত্মার কথা হচ্ছে। যে শক্তিকে জাগ্রত করে ভগবান্ বিশ্বরূপ ধরেন, তার নাম বজ্রিণীশক্তি,

আত্মা, প্রত্যগাত্মা। অন্য শক্তির নাম অপরা। অপরাজ্ঞান, ভৌতিক জ্ঞান। পরাজ্ঞান, আত্মজ্ঞান। এই উভয়ই ব্রহ্মের শক্তি। তিনি এই আত্মত্বকে নেড়ে জগৎ ফোটান ও মারেন। সুতরাং জগৎ ফোটা ও মারা কোথায় রইল? ঐ আত্মত্বে?

পুরুষোত্তম, যিনি এই জগৎকে ভরণ করছেন; "যো লোকত্রয়ং আবিশ্য বিভর্ত্তি।" তা হলে আত্মত্বের যে বহ্রিণীভাব, তার পৃষ্ঠেই ত জগৎ ফুটছে? আমি যদি জানি, এই আমার আত্মত্ব, আত্মত্বের প্রকাশই এই কথাগুলো, এমন কথা একটাও নেই, যাতে আত্মত্ব নেই; কথা কইতে গিয়ে কথার তলায় আছি আমি, এবং আমার তলায় আছেন ভগবান্, কথা বলেই বললাম, অক্ষরমালা বা অ আ বললাম না, এই জ্ঞান প্রকাশ করে যদি কথা বলি, সে কথা ব্যর্থ হবে না। যেমন সূর্য্যের গতি নেই, পৃথিবী ঘুরছে, গ্রহ ঘুরছে, এটা সাধারণ দৃষ্টি। আবার অসামান্য দৃষ্টি যে, সূর্য্যও ঘুরছে; কাকে ঘিরে ঘুরছে, তাহাও দেখ্ছি। এইরূপ জগতের হিসেবে আত্মা স্থির; কিন্তু ভগবান্‌কে বেষ্টন করে সেও গতিশীল। আমি চলেছি কোন্ দিকে? ভগবানের দিকে। পৃথিবী ঘুরছে জানতে পারিসনে; তেমনি আত্মার গতিও জানতে পারিসনে। এ কথা শুধু শক্তিত্ব ধরাবার জন্য বলছি, বেদব্যাস আত্মত্বকেই পরাশক্তি বলে ধরলেন কেমন করে, তাই বোঝাবার জন্যে বলছি, অনির্ব্বচনীয়ত্বে বিলীন হবার জন্য বলছি। না গল্‌লে আনন্দময়ত্ব ফুট্‌বে না, সম্যক্ ব্রহ্মমৈথুন হবে না, 'আমি'

বিগলিত হবেনা। নাস্তুর্ন বাহ্য অবস্থিতি। এটা কি লাভ করতে হবে বহু দূর গিয়ে? এক আত্মত্ব খুঁজে বার করা, তার অসঙ্গত্ব দেখা, আবার তাকে গতিশীল দেখা, এ ত আমরা নাগাল পাচ্ছিনে। তা নয়, যেখানেই তোদের আনন্দ হচ্ছে, সেইখানেই এ হচ্ছে। কথার দ্বারাই আনন্দ ফোটে। যে কোন প্রিয়বস্তুর গভীরে ঢুকতে হয় না, কথার ব্যবহারেই আনন্দ হয়। কি সাঙ্ঘাতিক তত্ত্ব! সবই যে জ্ঞান, আর জ্ঞানের প্রকাশের নাম কথা। ভগবান্‌কে যতক্ষণ না হাতের চেটো পর্য্যন্ত আনতে পারবি, ততক্ষণ ভগবান্ হাতে আসবে? জ্ঞানস্বরূপ গুরু কথা কইছেন সবার বুকে বুকে; আপনি বলছেন, আপনি শুনছেন; তিনি শুনে হয়েছেন কাণ, বলে হয়েছেন মুখ। তাঁর দিকে এমন ভাবে চলেছি, চোখে আছে শুধু 'জ্ঞান; দেখতে পাচ্ছি তাঁর ব্রহ্মমূর্ত্তি, আত্মমূর্ত্তি, অব্যক্তমূর্ত্তি, বিশ্বমূর্ত্তি। ইনি একজন, এই জনের নাম জ্ঞান; "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" এ পাশে খালি কথার ঝুড়ি, ও পাশে বচনহীন। কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছিস তুই! আর এইখানে গুরু সাড়া দিচ্ছেন,— "বৎস রে! এই বাক্যের দ্বারাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব লাভ করবি। এই আমার আদি শক্তিমূর্ত্তি।" কি ভয়ানক!

সে দিন কুণ্ডলিনী ধরিয়ে দিয়েছিলাম। কি দিয়ে বল্ ত? আনন্দের খবরে তড়াক করে জেগে উঠলি, দুঃখের খবরে বসে পড়াল। এমন একটা গাঁট আছে, যেটা একেবারে খোলে না। গোটাটা ফুটে উঠে দাঁড়াল, যার নাম পূর্ণমাত্রা আনন্দ। যে

কেন্দ্রটা দেখলি, এইখানে সে গুটিয়ে থাকে, আবার এইখান থেকেই ওঠে। সাপের মত যেখান থেকে ফণা ধরে উঠিস বসিস, ঐটেকে যদি ঠকাস করে খুলে দিতে পারি, তবেই ত হয়ে গেল। কিন্তু পরোক্ষে থাকলে কি এ উঠবে? আবার নিজে যদি নিজেকে চিনি, তা হলে খুলেই আছি ত? তুমি নিজেই গুলি পাকিয়ে বসে আছ; কোন্‌খানটায় দেখাব? কাপড় জড়িয়ে থাকলে যেমন সাঁতার কাটা হয় না, তেমনি কোথায়ও তুমি গুটিয়ে আছ, যাতে করে ব্রহ্মতত্ত্ব হাজার জেনেও কিছু হচ্ছে না। যেন 'বলাদিব নিয়োজিত' হচ্ছে। ঐখানে যদি আত্মত্বের বজ্র প্রয়োগ করতে পারি, তা হলেই খুলে যাবে। তুমি, স্বাধীন, অব্যাহত গতিশীল ব্রহ্ম; তুমি ছিদ্রময়, অবকাশময় হয়ে গেছ। এই অস্তিত্বে জগতের মত কাঠিন্য নেই। আমি যদি চালনা করি, তবে জগৎ ফুট্‌বে, নয় ত ফুটবে না। তুমি যেখানে আছ, তারই তলায় ভগবান্ আছেন? খালি আঘাত করবার পদ্ধতিটা দেখিয়ে দেব। সেটা কিছুই নয়।

এই সুশির ছিদ্র, ব্রহ্মাকাশ, ব্রহ্মনাড়ী, এটা খালি দেখিয়ে দেওয়া। ঐ ছ্যাঁদার ভিতর তোমাদের ফেলতে পারলেই কুণ্ডলিনী ঐ শূন্যের টানে একেবারে সিধে হয়ে যাবে; আর কিছু করতে হবে না।

কত সঙ্কুচিত হয়ে কথা কইতে হয়। ভগবান্ যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন,—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং

নমস্কুরু।” বাইরের লোকে ভাব্‌বে, দেমাকে ভরা। কিন্তু এ ক্ষেত্রের ভাষাই ঐ; ও কোন ব্যক্তিগত ভাষা নয়। ঐ স্তরে গেলে তুইও ঐ কথা বলবি।

যদি ঐ কুণ্ডলিনীকে তুলতে পারি, তবে স্বতঃসিদ্ধভাবে সব দেখতে পাবি; সর্ব্ব রস, সর্ব্ব শব্দ, সর্ব্ব স্পর্শ খুলে যাবে স্বয়ং ঈশান পঞ্চানন; এই পাঁচটা খুললেই আপনাকে ঈশান বলে জ্ঞান হবে। ঐ লেজটা সোজা করে আঘাত দেব অক্ষরতত্ত্বে। সংস্পর্শ থাকবে—দেহত্যাগ হতে দেব না। বহির্জ্ঞানে অংশতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে দেখছি বলে বাইরে মনে হচ্ছে; চোখ দিয়ে দেখলুম, নাক দিয়ে শুঁকলুম, এই মনে করি। বাহ্য বলে যে গ্রহণ, সেটা ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতরই হচ্ছে। বহির্জগৎ নিতে গেলেই ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে নিতে হবে। অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং। শরীরের সর্ব্বত্র আবৃত করেও দশাঙ্গুল উপরে আছেন। এই ব্যবহারে নিত্য আছি আমরা; খালি দেখিনি বলে বুঝছিনে। ভগবানে আছি মানে, ব্রহ্মে আছি—নাস্তিতত্ত্ব থেকে অস্তিতত্ত্ব পর্য্যন্ত। ললাটে যে তুই অব্যক্ত আছিস, তোকে ফোটাব কোন্‌খান থেকে, তা আজ দেখালুম। ঠিক স্তরে স্তরে পর পর বলে যাচ্ছি।

———

২৫এ মার্চ্চ, ১৯৩৭, বুধবার।

যে জ্ঞান দ্বিতীয়-দৃষ্টি সরিয়ে একদৃষ্টি দেন, যে জ্ঞান মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে আলো করেন, শোক ঘুচিয়ে শান্তি আনেন, ব্যথালোক থেকে আনন্দলোকে তুলে বসান, সেই জ্ঞান যে আধার হতে স্ফুরিত হচ্ছেন, সেই আধারে অবস্থিত, আমার আত্মায় প্রসৃত ও তার উদ্বোধক আত্মভূত আনন্দঘন. চিৎঘন জ্ঞানকে প্রণাম। সেই জ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছেন যে আধার থেকে, সেই আধাররূপী গুরুকে প্রণাম।

আধার ও আধেয়-ভেদদৃষ্টি-বিলোপকারী জ্ঞানকে, পরম-গুরুকে, পরমশিবকে, পরমাত্মাকে, পরমাত্মভূতকে প্রণাম।

এই জ্ঞানকে প্রাণ দিয়ে প্রাণে স্থাপন, বুকের আসনে বসান হল গুরু-অনুভূতি বা গুরু-প্রণতি। গুরুরূপে জ্ঞানস্বরূপ আমাকে এই একটা প্রধান জ্ঞান দিলেন যে তিনি, সেই চিন্ময় ব্রহ্ম, যিনি আমার ত্রিকালের নিয়ন্তা, আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁর নিয়ন্ত্রণ অনুসারে গতিপ্রাপ্ত হচ্ছে; আমার অতীতে যা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে এবং বর্ত্তমানে যা হচ্ছে—সুখদুঃখ, মান অপমান, ক্ষতিলাভজনক বাইরের ঘটনা, শান্তি অশান্তি, ক্ষমা, ক্রোধ, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রেম হিংসাময় মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষজনক গতির মানচিত্র যাঁর দ্বারা লেখা হয়েছে ও প্রতি মুহূর্ত্তে লেখা হচ্ছে, আমার সমগ্রটা যাঁর অঙ্কন (design), যাঁর মানসসৃষ্টি, যাঁর

জ্ঞানসম্ভূত, সেই নিয়ন্তার মঙ্গলমসীতে ডোবান লেখনীর দর্শনে, তাঁর সেই চলনশীল অঙ্গুলীর দর্শনে অর্থাৎ একটা জীবন্ত অঙ্গুলী মহাকাশে নড়ছে, লিখছে, অদৃষ্ট থেকে দৃষ্টকে ফোটাচ্ছে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করে তুলছে, এই দর্শনে যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তাঁতে যেন বিশ্বাসপূর্ণতা থাকে, শ্রদ্ধাপূর্ণতা থাকে। তিনি যাই কিছু লিখুন, সেই হাতের লেখাটি যেন প্রিয় হয়, মিষ্টি হয়; কেন না, সে প্রিয়ের হস্তাক্ষর। তা হলে সেটা ছিঁড়ে ফেলার, একরকম লেখা পালটিয়ে আর একরকম লেখা লেখাবার প্রযত্ন প্রচেষ্টা করব না। যা করেন, করে যান তিনি, চেষ্টা প্রেরণা, তিনি দিলেই আসবে, না দিলে নিশ্চেষ্ট-স্বীকৃতি হবে।

৩১এ মার্চ্চ, ১৯৩৭, রাত্রি।

এই বাক্‌স্রোতে তোর ক্ষুদ্র বাক্ পড়লে সেও চলে যাবে। যে বাক্‌স্রোতে বিদ্যুৎ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর খেলিয়ে যাচ্ছে, গড়ছে, ভাঙ্গছে, সেই বাক্-স্রোতে তোর বাক্ মেশা। কার বুকে রয়েছিস? বিশ্বম্ভর-শক্তির বুকে। ভগবতী বল্! যদি কেউ দেবী থাকে ত এই বাক্‌দেবী। যদি কেউ শক্তি থাকে ত এই বাক্‌শক্তি।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৭, রাত্রি।

জাগবার সময় সেই "আমাকে" স্মরণ করে, সেই "আমাকে" বুকে করে বেরিয়ে আসি যেন, যাঁতে আমি ঘুমিয়েছিলুম এবং যাঁ থেকে এই আমি জাগ্রত, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, দুর্ব্বল পুরুষ বেরিয়ে এলুম। সেই "আমি" এই আমির কর্ম্মবীজস্বরূপ, যাতে আমার সমস্ত কর্ম্ম কারণরূপে গাঁথা আছে। সেই "আমার" বুকেতে আমি, এই তুচ্ছ আমি গাঁথা আছি, যে "আমি" অপার অনন্ত চিৎশক্তি, আমার ভূত ভবিষ্যৎ, আপাদ মস্তক সবটা যেখানে জাজ্বল্যমান। যে "আমি" মহীয়সী শক্তি, যে "আমি" বিভুত্বময়, যে "আমি"তে, যে বিভু সত্তায় এই আমি বসে আছি, তাঁকে প্রণাম।

২১এ এপ্রিল, ১৯৩৭, বুধবার।

ভগবান্ আপনার মহিমায় আপনি সব হয়ে ফুটেছেন এবং 'আমি'ও হয়ে রয়েছেন। স্বয়ং আমি ও আমার সর্ব্বজ্ঞান ও ক্রিয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁর নাম স্বয়ম্ভূ; আমি স্বয়ম্ভূর বিভূতি। স্বয়ং বলতে আমার নিজের বিষয় আমি কিছু চিন্তা করতে হবে না, তাঁতে কেবল ভগবদ্ধর্ম্ম দেখব; 'আমি'টার কথা আদৌ মনে থাকবে না। যে একজন সর্ব্বশক্তিমান্ সব হয়ে আছেন, সেই তিনি কি করেন, ঐখানে চেয়ে

থাকলে তবে আমার গতি হবে। এদিক্কার কথা মাথায় থাকলে তাঁতে ঢোকা হয়নি বুঝতে হবে। স্বয়ম্ভূ মূর্ত্তিতে ঢুকে তখন স্বয়ম্ভূর ভাষায়ই কথা বলব—'শক্তি হোক'; না জীবের মত বল্‌ব,—'শক্তি দাও?' এখানকার দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার বিন্দুমাত্র যদি ওখানে টিকে না থাকে, তবেই আমার ভাষা বীর্য্যবান্, ফলপ্রসূ হবে। যতক্ষণ স্বয়ং অর্থাৎ ভগবান্ বলাব সঙ্গে সঙ্গে জীবের চেতনতা ও প্রাণবত্তা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ বুঝবে, স্বয়ম্ভূতে যাওয়া হয়নি। আমার বুকে দর্শন শ্রবণাদি যত কিছু শক্তি, এ তাঁরই, আর কারো নয়—শিবের, এই ভাবে সাক্ষাৎ শিবত্বে যাওয়া অভ্যাস করতে হয়। আমার ভিতর যে সব শক্তি খেলা করছে, এ একান্ত নিবিড়ভাবে মাই, সত্যি মা, এতে কোন ভুল নেই, এইরূপ দর্শনই হল অভ্যাস। ঐ তত্ত্ব অনুসারে আমি যে দেখছি, শুনছি, সে আমি নয়, তিনিই; সেই দর্শনময়ী শক্তি, শ্রবণময়ী শক্তি দেখছেন, শুনছেন; মনন করছেন মননময়ী শক্তি, কথা বলছেন বাঙ্ময়ী শক্তি, আমি নয়। কামনা করছেন কামময়ী শক্তি, আমি নয়। সেই শক্তি স্বয়ং বলছেন, আমি এই বিষয়ে কামময়ী, আমি আপ্তকামা, আমি কথা উচ্চারণ করলেই তাই হয়। আমি উচ্চারণ করছি, আমার প্রাকৃত বিভূতি, প্রাকৃত সার্থকতার জন্যে, ধর্ম্ম অর্থ কামের প্রচুর প্রাপ্তিবিষয়ে সর্ব্ব বিঘ্ন অপসারিত হোক।

———

২৩এ এপ্রিল, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

১। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। ২। তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত। ৩। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি তৎ ব্রহ্ম। তোমার ভিতর এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে দেখলে ব্রহ্মকে দেখতে পাবে। যে কোথাও ভগবানের ভও দেখতে পায়নি এত দিন, তার কি এমন একটা সার্থকতা আসবে জীবনে যে, সে ভগবানে উঠ্‌ছে বস্‌ছে, আসছে যাচ্ছে, এটা দেখতে পাবে ?

৪। শুশ্রূবাংসো অনূচানা উপলভন্তে। শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, এ সব না হলে ভগবৎলাভ হয় না। টাকা-অন্বেষীর বদলে তুমি হলে ভগবদন্বেষী ; কে জানে সংসার, কে জানে ধন, কে জানে মান, চাই একমাত্র ভগবান্‌কে, এই জ্ঞানে যদি উঠতে পারি, তবেই ভগবৎলাভের যোগ্যতা আসে।

৫। এই হলে তখন গুরু ডেকে বলেন,—"তৎ ত্বমসি"। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপাস্য, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট্, আমিও তাই ? দিক্ নির্ণয় করে দিন। কোন্ দিক্ দিয়ে ঐ জ্ঞানে যাব ? বটের বীচির ভিতর কিছু নেই দেখলে ; কিন্তু তারই ভিতর মহীরুহ। সেইরূপ তোমার ভিতর মহান্ ব্রহ্ম। এই যে একান্ত নির্দ্দিষ্ট আমার ভিতরে একান্ত অনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম অবস্থান করছেন, এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর পৌনঃপুনিক আনন্ত্য। তুমি মন্ত্রভূ পুরুষ তখন লুণ্ঠিত হবে

ঐ গুরুর পায়ে, 'আমাকে ঐখানে তুলুন।' সেই শ্রদ্ধা, সেই নিষ্ঠা না দেখলে, গুরুর কথা যেখান থেকে বেরোবে, সেখান থেকে বেরোতে পারে না। বেরোয় হৃদয় থেকে, হৃদয়ই ব্রহ্মের বাসস্থান। জড়কে নাড়ায় গতি (motion), জ্ঞানকে নাড়ায় ভাব (emotion)। 'তোমার এ বাণী সফল হোক্ এদের হৃদয়ে।' তোদের মধ্যে যারা অনুভূতিবান্, তারা দেখতে পাচ্ছিস, এক শক্তি এখানে খেলা করছে ; যদিও তোরা এখন তাকে ভৌতিক শক্তি বলে দেখতে পাচ্ছিস, দৈবী শক্তি নয় ; তবু পাচ্ছিস। যতক্ষণ না এঁকে ধরবি, ততক্ষণ কার্য্য-কারণের নিয়মে ইনি একেবারে গাঁথা। যখন এঁকে ধরবি, সব আইন সেখান থেকে সরে গেছে। সেখানে আইন হল তাঁর ইচ্ছা ; তাই বাক্যের আকারে সেথা চাইতে হবে।

২৪এ এপ্রিল, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

ভৌতিক শক্তি যেমন জড়শক্তি, ভৌতিক জ্ঞানও তেমনি জড়জ্ঞান। এর উপরে হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞান ও চিন্ময়ী শক্তি। চিন্ময় জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান বা আত্মবোধ। এই আত্মজ্ঞান জড়জ্ঞানকে পরিচালিত করে। আত্মজ্ঞানকে পরিচালন করেন পরমাত্মা।

'বৈদ্যনাথ' এই মন্ত্র শুনে তার ধারণা ও উপলব্ধি হল, জ্ঞানের একটি আয়তন রচনা হল, তার ফল হল ব্যাধির উপশম।

শক্তির একটা প্রকাশ (aspect) হল অনুভূতি, একটা প্রকাশ হল ভূতি। বোধ করা এবং তাই হওয়া (to realise and to be), তাই জ্ঞানের নাম দিলুম মহাদেবী। আত্মা অণুত্ব নেবার পর ভাষা বেরোয়। অ বললুম, একটা পদার্থ (matter) তৈরী হল, আ বললুম, একটা পদার্থ তৈরী হল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের প্রকাশ ও পরিণতি (transformation) হচ্ছে। তিনি অণু হলে তবে অনুত্তর ভাষা হয়। অণু, জড়জ্ঞান। আত্মজ্ঞান শব্দে রূপান্তরিত হয়েই হয়ে গেল জড়জ্ঞান। জল বুঝতে, আগুন বুঝতে ভগবানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। জড় থেকে জড়শক্তি, জড়শক্তি থেকে জড়জ্ঞান, জড়জ্ঞান থেকে আত্মশক্তি, তার থেকে আত্মজ্ঞান, তার থেকে অক্ষর পরমাত্মজ্ঞান। ভূতস্থিতি মানে, মহাশক্তি পরিচালিত হচ্ছেন একটা স্থিতির আকারে।

২৫এ এপ্রিল, ১৯৩৭, রবিবার।

তাঁকে স্মরণ করলে মনটা জেগে ওঠে ত বটেই, কিন্তু যতক্ষণ না মাটি, জল ছুঁলে তাঁকেই ছোঁয়া হল, এই মনে হবে, ততক্ষণ জানবি, ঠিক ব্যবহারশীল হয়নি। এই যে দ্বিধাজ্ঞান, মাটি জল অচেতন, চেতন থেকে আলাদা, এ জ্ঞান ভাঙতেই হবে। এরা যে নেই, তা নয়; কিন্তু স্তরে স্তরে স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগ-সকল রয়েছে।

এ বিভাগ, কোন কিছু বাদ দেওয়ার জন্য নয়। এই শরীর আর তুই এক সঙ্গে লেপচেই রয়েছিস। শরীরকে সেবা করা মানে, তোকে সেবা করা। তেমনি এই স্থূল বিশ্ব তোকে তাঁর উপলব্ধি দেবে। এটা সম্ভব হয়? মনে হয় সম্ভব? এ ভগবদ্‌বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত জিনিষ। জ্ঞানতত্ত্ব জীবিত তত্ত্ব। মাটির গায়ে যেমন মাটি লেগে থাকে, জীবনের গায়ে তেমনি জীবন লেগে আছে। জীবন মানে কি? জ্যান্ত বলে ক্রিয়াশীল হয় কে? তাঁর নিজ-বোধ বলে যে জিনিষটি। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেবন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" এঁ থেকে জন্মায়? এই যে নিজবোধাত্মক জ্ঞান, এঁ থেকে সত্যি সত্যি জন্মায় এ সব? এ সমস্ত জন্মায় শব্দ বা বাক্ থেকে। যেমন বাইরে ঈথর বা ব্যোমতত্ত্ব হল শব্দতত্ত্বের জন্ম-স্থান এবং তা থেকে জগতের ভৌতিক তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি বাক্ থেকে সব হয়েছে। এই শব্দতত্ত্ব হল একমাত্র মহাশক্তি, যিনি নিজেকে, আত্মত্বকে নিয়ে এত ভাঙ্গাগড়া করছেন। শক্তির দিক্ থেকে দেখছি, এ দেবীর মূর্ত্তিই হল বাক্। এঁতে একান্ত শ্রদ্ধা করবে।

যেমন জ্ঞান বলতে ভগবান্ ছাড়া আর কোথাও যেন নজর না পড়ে বলেছি, তেমনি ভগবতী বলতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এই বাকে, এটি বিশেষ ভাবে মনে রাখবে। সূর্য্যের গায়ের কিরণ যেমন, তেমনি বাক্ এঁর গায়ের কিরণ। ভাঙ্গা গড়া সব নির্ভর করছে এই বাক্‌শক্তির উপর। তা হলে দেবতা

ও দেবশক্তির মূল কোথায় দেখালাম? শক্তিত্বের মূল বাক্ এবং উপাদান জ্ঞান। বাক্‌শক্তি যে ভাবে যে রূপে মাকে আবাহন করবে, তিনি সেইরূপে আসবেন। "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো যদি বা ন মহিম্নীতি।" যখন শুধু তাঁকে চাচ্ছি, তখন মহিমাদি মনে আসবে না। যখন মহিমাদি দেখতে চাইব, তখন তিনি বাক্‌শক্তিময়ী—এই দেখতে থাকব। আমি যদি হই বাঙ্‌ময়, আর ভগবান্ যদি হন বাঙ্ময়, তা হলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কইব।

এই বাক্যকে ভেঙ্গে দেখেছি, কথা আর কিছু নয়, কতকগুলা অক্ষরের উচ্চারণ এবং তার দ্বারা প্রাণ পরিচালিত হয়; ভাল কথা বললে একরকমে, মন্দ কথা বললে আর একরকমে। প্রাণ আর মন, এই দুটা হল শব্দের ব্যাপার নিয়ে খেলা। সংস্কারগ্রন্থিতে শুধু বাক্যের আকারে থাকে। এত তেজোময় যে, না ফুটে থাকে না। ভুঁইচাঁপার আগে ফুল ফোটে, পরে গাছ গজায়। তেমনি আমাদেরও আগে বাক্ ফোটে, তার পরে ভাব, জগৎ, এই সব ফোটে। এইখানেতে বাক্‌দেবীর নাম অপ্রাকৃত বা পরাপ্রকৃতিশক্তি। জীবাত্মা সেজে বেরোন, এইখানে অণুআত্মত্ব গ্রহণ করেন, তার পরে বাক্য হয়ে ফোটেন। 'কলকাতা' বলা মানে, সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় যাওয়া। ভাল করে বললে শুধু কথার দ্বারাই কলকাতায় একেবারে হাজির হতুম; কথার নৌকা আমায় বহন করে নিয়ে যেত। যদি কথায় কথায় দুনিয়ায় আত্মকামত্ব, আপ্তকামত্ব ফোটাতে পারি, তা হলে

এই শক্তিকে সাক্ষাৎ ভগবতীশক্তি বলব না ? যাতে পিতৃলোক, মাতৃলোক বললে সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই লোক ফুটবে ?

অজ্ঞ বলে আমায় শিখতে হয় ; ভগবান্‌কে শিখতে হয় না ; তাঁর ভিতরে সব লুকান আছে। তোমার ভিতরেও ব্যথা ও 'উঃ' শব্দ, তুটোই লুকান আছে। ছুচ ফোটালে তবে বেরোয়। তেমনি যত কিছু শব্দের ভিতর ভগবতী নিহিত আছেন। তিনি শুধু ফোটবার সময় একটা শব্দ নিয়ে ফোটেন। যে শক্তি এক দিকে ভাষা, এক দিকে অনুভূতি (feeling) চালনা করেন, তিনিই চুম্বকপ্রবাহ (magnetic flow)। ঐ ভাবটা যেমন ফটতে থাকে আব মূর্ত্তি নিতে থাকে, তেমনি আমাদের নানারকম চেহারা হয়ে যায় কথার দ্বারা। সেই শক্তি তুটোর যেটাকে বাইরে বৈত্যুতিক শক্তি (electric force) বা চুম্বকপ্রবাহ (magnetic flow) বলি, ঐ শক্তির সমতুল্য, ঐ জাতীয়, অথচ সূক্ষ্ম একটা শক্তি অন্তবে খেলা করে। মনে গাছের ছবি তৈরী কবে যে শক্তি, আর বাইরে গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শক্তি, এ তুটোই এক। এইটে দেখিয়ে দেব। মনের ভিতর গাছ বা মানুষ তৈরী করতে কোন বেগ লাগে ? অনায়াসে তৈরী করছি একটা অস্পষ্ট চেহারা কথার সঙ্গে সঙ্গে। এই তৈরী হওয়াটা যদি পর পর দেখিয়ে দিতে পারি, কি করে হল মনের ভিতর, বাইরেও বৃক্ষ তৈরী হওয়া সেই বিজ্ঞান। এইটে জ্ঞাত হলে সে বৃক্ষকে এমনভাবে তৈরী করতে পারব, যাতে এ বৃক্ষ আর সে বৃক্ষেতে কোন তফাৎ থাকবে না।

গাছ তৈরী করবার জন্য চেষ্টা করছিনে, মাকে চেনবার জন্য চেষ্টা করছি। মায়ের এই খেলা, এই বিজ্ঞান দেখে পূর্ণমাত্রায় মা বলতে না পারলে তাঁকে পূর্ণমাত্রায় চিনবিনে। আর এ সব পেতে যন্ত্রপাঁতি নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে না। মা বললেই পাব। মাটিকে 'বিশ্লেষিত হও' বললেই হবে না, রাসায়নিক প্রক্রিয়া (chemical process) নিলে হবে। কিন্তু যে চেহারায় মাকে দেখতে চাই, মাকে বললেই তিনি সেই চেহারায় আসবেন।

চিন্ময়ী মা, আপনি আপনাকে যিনি জানেন, তিনিই ঐ বৃক্ষ সেজেছেন। চিন্ময়ী, আত্মবোধসম্পন্না। আমি যখন মাকে বৃক্ষ হতে বলব, সে সঙ্কল্প কেমন করে করতে হবে? আত্মবোধযুক্ত যে মা আমার, তাঁকেই বলছি, তোমার পিতৃমূর্ত্তি দেখব। বলা আর পিতৃলোকের আবির্ভাব তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে। এইরূপ গন্ধ, মাল্য ইত্যাদি সব লোক সম্বন্ধে। রকমফের পাবার জন্য রকমফের শব্দ প্রয়োগ করতে হবে মাত্র। যেমন এক জিভে সব রস পাই, এক চোখে সব রূপ দেখি, এক কাণে সকল শব্দ শুনি, তেমনি এক এই মায়েতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু পাই। আমার বাড়ীতে আর কেউ নেই, দ্বিতীয় মানুষ নেই; খালি মা আর আমি, এই সংসার। আমার বাড়ীতে ঢুকে কাপড়ের দরকার হলেই বলব, কাপড় কই গো? ভাত কই গো? জল কই গো? তলায় তলায় জানি, মা ছাড়া আর দেবার কেউ নেই, আমার ভগবতী ছাড়া আর দেবার

কেউ নেই। এমনি ভাবে সমগ্র দৃশ্য গুটিয়ে নিয়ে বসবি মায়ে? Spaceএর ব্যবধান, দৃশ্যের ব্যবধান সব নিয়ে নিয়ে কত জন্ম কাটালি? আজ তিনি কথা দিচ্ছেন, আমার চারি দিকে ঘুরে ঘুরে জন্ম জন্ম কত কষ্ট পেয়েছিস; আজ তোকে সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে তুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু চাস, সব পাবি। আমার অনন্ত জীবনের ছড়াছড়ি ব্যাপার; তাতে তুই কত রকমে উৎক্ষিপ্ত, জর্জ্জরিত হয়েছিস্, রকমফেরের আর সীমা নেই। ঐ মায়েই ঘুরেছিস, শুধু আত্মা, এই যোগটা ছিল না বলে এত কষ্ট পেয়েছিস্। আজ সেই যোগটা দিচ্ছি। কত বড় সার্থকতা এনে দেবে এই আত্মবোধ। শুধু ইহ জন্মের নয়, চিরজন্মের কি প্রকাণ্ড ব্যাপার হতে চলেছে, না? "তস্মাৎ আত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েৎ ভূতিকামঃ।" আত্মজ্ঞান পাইয়ে না দিলে সর্ব্বসিদ্ধির আশা কিছুতে পাবি না। এই আত্মা প্রথমে অণু হন, তার পর ভাষা যোগায়, অনুত্তর বাক্‌শক্তি। এইটে হবে এখন তোদের শিক্ষার বিষয় যে, কেমন করে আত্মা অণুত্ব নেন এবং তার পরে অনুত্তর ভাষায় দিক্‌দিগন্তে ছোটেন। এই আত্মায় সব পেয়েছি এবং যাকে পেয়েছি ভগবতী। 'অহং ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ, জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।' তিস্রঃ, বাক্ প্রাণ মন; এর ভিতর অনুপ্রবেশ করব জীবাত্মরূপে এবং এদের নাম রূপ দেব। এখন আমি ঐরূপে অনুপ্রবেশ করলে নাম রূপ দিতে পারব ত? জল-তন্মাত্রার ভিতরে যখন অনুপ্রবেশ করলাম, অমনি বিশ্বের

জলতন্মাত্রার ভিতর প্রবেশ করলাম; সেটাও আমার ভিতর **accumulated** হয়ে গেছে, এসে গেছে। তখন আমার জলজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় হল। তখন জল আপনি এসে যাবে। ভগবান্ সব তত্ত্ব হয়ে আছেন; যা যা ধারণা করবে, সেই সব তোমার ভিতর থেকে হুড়হুড় করে এসে পড়বে। আমার খালি স্মরণ করা। বাক্ প্রাণ মন নিয়ে তিনি জল সেজে বসে আছেন। এখন যদি আমি জানি যে, বাকে জল ও জল শব্দ, দুটোই একসা হয়ে আছে আমার ভিতর, তখন আমি 'জল' শব্দ এমন করে বলতে পারি যে, বাইরে জল এসে হাজির হবে।

অণু আত্মা স্রষ্টা নয়, ভোক্তা। ভূমা আত্মায় দৃষ্টি পড়বে; কিন্তু অণু আত্মা, অসঙ্গ আত্মা **function** করবে। আত্মতত্ত্ব এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হলেন ব্রহ্ম। 'সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম' কেমন করে হয়ে বসে আছেন, সেই কৌশলটা জানতে হবে। জল ধারণা করলে জলের ভিতর থেকে মা সাড়া দেন কি না, দেখতে হবে। তার মানে, তত্ত্বে প্রবিষ্ট হতে হবে। আত্মতত্ত্বই এই মা; এঁকে চিরে বার করে জলের ভিতর নিয়ে যেতে পারি কি না, দেখতে হবে। অনুপ্রবেশ অর্থাৎ জলজ্ঞানে আত্মজ্ঞান প্রবেশ করাতে হবে। আত্মাকে তত্ত্বে ফেলা মানে, মাত্র তত্ত্বকে চেনা নয়, কিন্তু তত্ত্বও যে আত্মারই একটি মূর্ত্তি, এইটি ঠিক ঠিক জানা। যোগীরা বলেন, জল ভাবতে ভাবতে জল হয়ে যাব। ও পথ আমাদের নয়। আমাদের কৌশল,—জলে ঢুক্‌বো না, ঢুক্‌বো সেই জ্ঞানে, যে জ্ঞান হচ্ছে, 'জল' একটা শব্দ, 'আত্মাও' একটা

শব্দ। আত্মাই জল, এ কথা স্বীকার করা যাক (let it be granted)। আমরা আত্মাকে নেব এবং নেব অনুত্তর ভাষা। আত্মা অণু হয়েছেন এবং তাঁর অণুত্ব সম্পূর্ণ (fulfil) করার জন্য ভাষা হয়েছেন। ভাষাই ব্যক্ততা দেবে। ভাষা নিয়ে তিনি বেরোন একসঙ্গে। পরিস্ফুটতা এনে দেবে শব্দ। মা বললেই মা এসে গেছেন। এখন খালি ভাষায় তাঁকে পরিস্ফুট করছি। ভগবান্ বললেই আগে ভগবান্ এসেছেন, পরে বাক্যের সাহায্যে তাঁর শক্তিত্বের লীলাবিলাস হবে মাত্র। যখন মা বলবি, তখন তোর সমস্তটা মা বলে ছুটবে ; শুধু তোর মন ছুটলে হবে না। এই পর্য্যন্ত পেলে, মা যে অসম্ভব-সম্ভবকারিণী, তা বিশ্বাস হবে। উপনিষদে এই তত্ত্বের নাম মধুবিদ্যা। "অয়মাত্মা সর্বেবষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।" এই নিগূঢ় জ্ঞান দিতে গেলে আপনাকে sacrifice করে দিতে হয় ; যেমন দধীচি মুনি দিয়েছিলেন। আমার সেবা কর অর্থাৎ আমি যা বল্‌ব, গুরুবাক্য বলে তা গ্রহণ কর—'হবেই' এই জ্ঞানে।

২৬এ এপ্রিল, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

আত্মা যুগপৎ বহু ও অক্ষর। কখন সুখী, কখন দুঃখী ইত্যাদি ; অথচ তাদের মূলে এক অক্ষর। শক্তিকে চালাচ্ছেন অক্ষর। আমার আত্মত্ব শক্তিত্বে দেখতে হবে। একই আত্মা

এজতি নৈজতি, এই বিপরীতমুখী। অসঙ্গও থাকেন, শক্তিও পরিচালন করেন। একটি আর একটির আশ্রিত। অবিচঞ্চল শক্তিপাদ রয়েছেন। এটা আত্মার যে শক্তি এক হয়েও বহু করেন নিজেকে, সেই পরাশক্তি। পরাশক্তির বুকের উপর আমার গতি তৈরী হচ্ছে দেখতে হবে। অসুপ্তঃ সুপ্তান্ অভি-চাকশীতি, তিনি এক অংশে জীব হয়ে ভোগ করছেন; তাই হতে গিয়ে আশ্রয়স্বরূপ হয়েছেন জগতের। যুগপৎ তিনি যে স্থির শক্তি—আশ্রয় এবং ক্রিয়মাণা শক্তি—আশ্রিত, এইটে দেখতে হবে। আত্মাকে মা বলি এই জন্য যে, একদিকে নাস্তি (negative) হয়ে রয়েছেন, আর একদিকে পরিমাপে মেপে মেপে সব সীমাবদ্ধ (limited) করে দিচ্ছেন। আত্মার দুই বিভাগ; প্রথমে পরিণামী ও অপরিণামী। পরিণামীর তিনটি বিভাগ—মন, প্রাণ, বাক্। অপরিণামীর দুইটি বিভাগ—আত্মা ও তাঁর বহু আত্মা হওয়া। খণ্ড আত্মা পরমাত্মদৃষ্টিতে আবার একাত্মবোধমাত্র হয়। যোগের পন্থায় মন কেন্দ্রীভূত (concentrated) করে, তন্ময় হয়ে তবে পেতে হবে, এ কথা আমরা বল্‌ব না। এ পন্থায় আমরা প্রথমেই মাকে দেখ্‌ব এবং বল্‌ব, মারই বুকে আমরা রয়েছি। এ সব উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করে বলতে হবে। একটাও বিচারের (logic) সাহায্যে, অথবা অন্ধ হয়ে blindly বলতে হবে না। রসগোল্লার রস খেয়ে উপলব্ধির মত সত্য করে বলতে হবে।

২৮এ এপ্রিল, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

তোমাকে চক্ষুষ্মান্ না দেখলে আমি হই অন্ধ, তোমাকে প্রাণময় না দেখ্‌লে আমি হই প্রাণহীন, তোমাকে শক্তিমান্ না দেখলে আমি হই শক্তিশূন্য। তোমাকে ধনবান্ বললে আমি হব ধনী, তোমাকে শ্রীমান্ বললে আমি শ্রীমান্। তোমাকে পূজা দিলে, তুমি প্রাণময় করে সেই পূজা ফিরিয়ে দিলে আমাকে। তোমায় শক্তিমান্ বলে আমার যতটুকু শক্তির পুঁজি ছিল, তা দিলুম; তুমি ফিরিয়ে দিলে আমায় সর্ব্বজ্ঞত্ব, অসীম শক্তিমত্তা। এ সব তোমার, তোমার, এতে তুমি পূজিত হও।

চারি ধারে শূন্য রচনা করে বসে আছিস, অস্বীকার করে আছিস ভগবান্‌কে, কি অসুর হয়ে আছিস্। এখান থেকে যদি ত্রাণ পাস, সে কত বড় মুক্তি তোর। কত পুড়ছিস্, জ্বল্‌ছিস্; হাম করেঙ্গা, আমি আমি, শূন্য ঘিরেছিস আমির দম্ভে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বুক ত বটেই, আত্মাকে পেতে দাও ভগবানের আসন করে। অয়মাত্মা ব্রহ্ম; অসুর দেখলে আপনাকে; জীবভাবটা তার ফুলে উঠল। ব্রাহ্মণ দেখলে নিজে; বিলীন হয়ে গেল তাঁতে। আসুরিক বলের জন্য ডাকছিনে, অসুরত্বের বিধ্বংসের জন্য ভগবান্‌কে ডাকছি। কর্ম্ম রুদ্রগ্রন্থিতে অপেক্ষা করছে; মা সেগুলো মেপে মেপে দিচ্ছেন। যা তোর স্বভাবগত অভ্যাস হয়ে গেছে, সেইগুলো দিচ্ছেন। চিরকালই তাই বলে সাগু বার্লি খাবি? মা অপেক্ষা করছেন মানে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি অপেক্ষা করছেন। "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং

পুরুষোত্তম।” দশ হাজার গোলা মারলে অন্ধকার যাবে না। একটা দেশলাই জ্বাললেই অন্ধকার সুর সুর করে পালাবে।

তোমাকে নিয়েই, এই আত্মত্ব নিয়েই আমি জ্ঞানময়, প্রাণময়, দর্শনময়, শ্রবণময়। খালি আমার বুকে নয়, এর বুকে, তার বুকে, ওর বুকে। সুতরাং আমাতেই খালি আত্মবোধ নয়, ভূতে ভূতে আত্মবোধ। স্তরে স্তরে এই আত্মবোধে যেতে হবে। আত্মত্বের ভিতর দিয়ে অন্যের ভিতরও যেতে পারব, শরীর দিয়ে নয়। তখন দেখব, এই আত্মাই বহু হয়ে বসে আছেন। আমি জ্যান্ত, হরে, নরে, মশা জ্যান্ত, শুধু ভগবান্ জ্যান্ত দেখতে পাসনে? নমঃ না বলে, হাত জোড় না করে থাকা যায়? যেখানেই তোমাকে প্রণাম করতে যাই—গাছে, আকাশে, নদীতে, সমুদ্রে, দেখি—মাথা ঠেকেছে আমারি বুকে। তবে কি তুমিই আমার বুক? এঁকে নেবার জন্য আজও জিহ্বায় জল এল না? এখনও গুরুকে বেত হাতে করে বলতে হচ্ছে—পড় রে, পড় রে, পড় রে! দুনিয়া, তোর শরীর, আর ভগবান্, এই তিনের মধ্যে কাকে বেশী সুস্পষ্ট ভাবে (vividly) দেখ্ছিস্? নিজের শরীরকে? আত্মবোধযুক্ত বলে।' তোর এ আত্মত্ব কিন্তু সর্ব্বআত্মতত্ত্ব নয়। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই বিশ্ব-ভোগ হচ্ছে। আর আত্মজ্ঞানই ভগবৎমূর্ত্তিতে প্রকাশ হচ্ছে।

এই ঘর দেখতে পাচ্ছিস্? না, মাত্র তার রূপটা? ঘর দেখতে পাসনি। ইট, কাঠ, চূণ, সুরকী, শক্ত, তিত, আওয়াজ, গন্ধ, এ সব কিছু পাচ্ছিসনে, খালি রূপটা দেখতে পাচ্ছিস।

আলোর দ্বারা খালি আলো ধরা পড়ছে। জগৎ দেখছিস্ যখন বললি, কি দেখতে পাচ্ছিস্? আলো ও রূপ যেমন এক কথা, তেমনি জগদ্দর্শন মানে, গাছ, মাটি, রূপ দেখছিস যখন, তখন কি দেখছিস? এখানে জ্ঞান হল আলো। জ্ঞানের দ্বারা কি দেখছিস? জ্ঞানের জগৎমূর্ত্তি প্রকাশ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? তোর জ্ঞান, আমার জ্ঞান বলে কিছু লেখাপড়া করা নেই। সবই জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারা জগতের জ্ঞানমূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছিস। মেজের উপরও আলো পড়েছে, খড়মের উপরও আলো পড়েছে; আলোর প্রতিফলিত রূপই (reflections) তাই দেখছিস। তেমনি জ্ঞান যেমন পড়েছে, তেমনি জগৎ দেখতে পাচ্ছিস। জ্ঞানের মানে যদি হত সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়, তা হলে গাছ দেখে গাছের খালি রূপাত্মিকা জ্ঞানমূর্ত্তি না দেখে শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি সব মূর্ত্তি দেখতিস। পঞ্চ তত্ত্ব ধরার মত শক্তি যদি ওখান থেকে মিলত, তা হলে জগৎ দেখে পঞ্চ তত্ত্বই ধরে ফেলতিস। অর্থাৎ গাছটি দেখেই গাছের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এই কটাই পেতিস একসঙ্গে। গাছ না দেখে আমাকে দেখলেও এখানে যত কিছু আছে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, সব পেতিস।

তা হলে তুই এখন জ্ঞান-কাণা; জ্ঞানের সবটা দেখতে পাসনে। যেমন একটি শিশু এই ছবিখানা দেখলে এর ভিতর-কার মানুষ দেখতে পাবে না, শুধু একটা রং ধরতে পারবে, তেমনি জ্ঞান যদি তোর সুপরিস্ফুট হত, তা হলে একসঙ্গে সবটা

দেখতে পেতিস। একসঙ্গে যে সবটা দেখতে পায়, তাকে কি বলি? সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, অক্রমজ্ঞানদর্শী পুরুষ। জ্ঞানকে যে ভগবান্ বলতে পারছিনে, তার আর একটা deficiency এই অংশে রয়েছে, দেখতে পেলি? যার দ্বারায় দেখলি জগৎকে ও আপনাকে, যার দ্বারায় আন্দাজ করলি ভগবান্‌কে, সে জিনিষ কি? তিনিও জ্ঞান। ভগবানেতে আর প্রত্যগাত্মাতে তফাৎ কি? কখন একে বলি ভগবান, কখন বলি প্রত্যগাত্মা? ভগবান্ অনন্ত অনন্ত প্রত্যগাত্মাকে চালাচ্ছেন, অনন্ত অনন্ত ক্ষেত্রের ভিতর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ হয়ে চালাচ্ছেন, তিনি অক্ষর কূটস্থ পুরুষ। কূটস্থ, রাশিস্থ। আর কেবলমাত্র আমাকেই যিনি জানছেন, তিনি হলেন প্রত্যগাত্মা। অনন্ত জীবসঙ্ঘের ভিতর আত্মারূপে অবস্থান করে যিনি রয়েছেন, তিনি অক্ষরাত্মা।

তা হলে আমি ঈশ্বরের দিকে উঠতে গেলে আগেই আমার নজরে পড়বে অক্ষর আত্মা ; মানে, গাছে নদীতে পাহাড়ে এবং আমারও ভিতর যিনি আছেন। তা হলে জগৎ দেখতে গেলাম, এই হিসেব থাকবে, না, জগন্নাথ দেখতে গেলাম, এই হিসেব থাকবে? আত্মত্বকে প্রধান করে দেখতে গেলে অমনি নজরে পড়ে যাবে, এখানে যেমন এই নিজত্ব প্রধান, ঐ অনন্ত ভূমিতেও সেই নিজত্ব প্রধান। তা হলে এই অক্ষরাত্মাকে দেখার অনু-শীলন হলে, তবেই আমি বুঝব, প্রত্যগাত্মার কূটস্থ স্বরূপ ঠিক বুঝেছি। এখন নিজেতে আর অক্ষর পুরুষে পার্থক্য

দেখতে পেলি ? একদিকে একই বটে, অথচ একটু পার্থক্য। আত্মবোধে এক, সমষ্টিত্ব ও ব্যষ্টিত্বে পার্থক্য। তার পরে দেখবি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে···সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" আমি এবং চন্দ্রসূর্য্যও ? যখন বল্‌লি, বিধৃত হয়ে রয়েছে, তখন আপনাকে তাঁতে সন্নিবিষ্ট দেখতে পেলি ? আত্মত্ব, পরমাত্মত্ব মানে কি ? সেই জিনিষ কি, যা থেকে মন প্রাণ হৃদয় যা কিছু প্রকাশ পায় ? "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।" এইরূপ সর্ব্বধর্ম্মময়, সর্ব্বহৃদয়ময়, সর্ব্ব-প্রাণময় পুরুষকে দেখলি, যখন অক্ষরপুরুষকে দেখলি ? এ তত্ত্বকে যুক্তির সাহায্যে নিবি না। বলে দিয়েছি, পঞ্চ তন্মাত্রাই যদি আমার জ্ঞানে ফোটে, তা হলে সেই রকম যত শক্তি, যত হৃদয়, যত প্রাণ, সমস্তের আভাস নিয়ে এই অক্ষরকে দেখব। তবে তুই জীবিত অক্ষর আত্মাকে দেখছিস ? জীবনের অনুভূতি তোর ভিতর ফুটছে 'আত্মা' এই কথাটি স্মরণে ? এই স্মরণে গাছের ভিতর, সূর্য্যের ভিতর, আকাশের ভিতর জীবন্তের অনুভূতি আসছে ? এই সবে আত্মা আছেন বলে এই পৃথিবী জ্যান্ত ? এই জল জ্যান্ত ? অগ্নি জ্যান্ত ? আকাশ জ্যান্ত ? কূটস্থ পুরুষ এ সকলের ভিতর আছেন বলে, তাঁকে দেখছি বলে ? মৃত্যু জ্যান্ত ? নমঃ ! এর নাম যমদর্শন। 'মৃত্যু' এই শব্দের তলায় কূটস্থ পুরুষ আত্মরূপে আছেন। আকাশ, জল, মাটি জ্যান্ত, এবং মৃত্যু যে জিনিষ, তাও জ্যান্ত। এই জ্যান্ত পুরুষকে "ওগো আমার জীবন,' এই কথা বলে যদি আদর করতে যাই,

তা হলে আমি প্রকাণ্ড জ্যান্ত হয়ে পড়ি? আরও জীবন ভেসে ওঠে? 'ওগো আমার জীবন' বলে এই খড়মের ভিতর যদি আদর করি এই পুরুষকে, কি হবে? খড়ম জীবন্ত হয়ে উঠবে। "অস্মিন্ প্রবীণো গিরিকাননাদীন্ প্রচালয়েৎ কিং পুনরাত্ম-যুক্তান্॥" কাঠের চেতন হওয়া বড় দূরের কথা হল? না। কেন না বলছিস? যাঁর কথা বলছিস, তিনি ভগবান্; সুতরাং তিনি কূটস্থ পুরুষ। সুতরাং তিনি আমার প্রত্যগাত্মা। তা হলে 'আমার আত্মা' এই কথা বললে প্রত্যগাত্মা কূটস্থ আত্মাকে আদর করছে, সঙ্গে সঙ্গে এই কথা আসছে। 'আমার ভগবান্' বলে কার আত্মা যাবে? বামনদাসের, না তোর? প্রত্যগাত্মা চলেছেন কূটস্থ পুরুষকে আদর করতে, এই মনে পড়ে যাবে 'আমার আত্মা' বলতে। এই না? এ আদর হয়? সঙ্গে সঙ্গে আপনি শুদ্ধ সমাদৃত হয়ে যাবে। এই মিলনটা যে ভূমিতে হচ্ছে, তার নাম হৃদয়ভূমি, সেখানে ঐ প্রত্যগাত্মাতে আর ঐ কূটস্থে মিলন হচ্ছে।

এই যে কূটস্থ পুরুষকে দেখলি, হৃদয়ে, না intellectএ? হৃদয়ে তিনি ঈশ্বর, আমি জীব; ঐখানে আদান প্রদান হয়। হৃদয়ের সীমা হল একাত্ম হওয়া পর্য্যন্ত। আমি যখন কূটস্থকে বললুম, 'এই আমার আত্মা,' কূটস্থকে আদর করলি? কূটস্থ পুরুষকে? আমাকে নয়। আত্মা বলে আদর করলি, অথচ কূটস্থকে। হয় নিয়ে ফেলবি কূটস্থকে, নয় নিজেকে, জীবত্বকে নিয়ে ফেলবি। জীবত্বকে নিলে ভুল করবি। জীবত্ব অদৃশ্য

হয়ে যাবে, কূটস্থ ফুটে উঠবে। আত্মবোধ বলে তা হলে ঐ কূটস্থকেই ধরবি। জীবত্ব যাবে উড়ে, আর কূটস্থ পুরুষের অনুভূতি থাকবে জাগ্রত। হে আমার আত্মা—নমঃ!

জীবত্ব সরছে? কূটস্থ পুরুষ আসছেন? তার লক্ষণ কি? তখন মনে হবে কি? এই আত্মত্বই যেন সকলকার আত্মা, এই জাতীয় একটা অনুভূতি আসতে থাকবে। 'ইনি আমার আত্মা' বলে যখন তাঁকে লাভ করলি, তখন তোর জীবাত্মা বিস্তৃত হয়ে গেল। এই জ্ঞানে যখন উদ্বুদ্ধ হলি, সেই অবস্থায় এর মাথায় বেলপাতা চড়ালে চলে যাবে ঐ গাছতলার শিবে? শ্রীকৃষ্ণ এক কণা শাক খেয়ে যেমন দশ হাজার শিষ্যের তৃপ্তি এনেছিলেন, তুইও সেই রকম করতে পারবি। যিনি এইখানে আত্মা, তিনিই ঐ দশ হাজার শিষ্যের ভিতর? "এতৎ সামান্যং সোপকরণং নৈবেদ্যং কূটস্থাত্মনে স্বাহা।" আত্মনে মানে? যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে সদা জ্ঞাত, এমন পুরুষকে। জ্যান্তকে দিলি, না মড়াকে দিলি? আমরা সবাই যদি বলি, ও ত মড়া ভগবান্‌কে দিলি; তুই আমাদের কথা বিশ্বাস করবি? এই জ্ঞানে নতুন জন্ম লাভ করলি? সত্যি দ্বিজ হলি? এখন বুঝতে পেরেছিস, কেন ব্রাহ্মণরা বলে গেছেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো বেদে অধিকার নেই? কূটস্থ আত্মাকে যে জানে, সে ব্রাহ্মণ। এই তত্ত্বে অধিকার হলে তবে সে ব্রাহ্মণ হতে পারে। যার অধিকার নেই, সে শূদ্র, সর্ব্বদা শোকগ্রস্ত। এই জ্ঞান তোর যতক্ষণ না ছিল, তুই ক্ষুদ্র ছিলি। তোকে ভূতে সব

দিচ্ছিল। এখন কে দিচ্ছে? কোথাও থেকে যদি কিছু পাস ত সেই কূটস্থ পুরুষ থেকেই পাচ্ছিস ত? সূর্য্য থেকে রৌদ্র পেলে কি বলব? কূটস্থ পুরুষ দিলেন। জল থেকে রস পেলে, আগুন থেকে তেজ, বাতাস থেকে প্রাণ পাস যদি, কে দিলে? সেই সেই তত্ত্বাভিমানী দেবতারূপ কূটস্থ পুরুষ। দেবতা দেখতে পেলি? আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা? এই চোখ ব্যবহার করবিনে ব্রাহ্মণ হলে? এখন দেখলি, কোথায় শূদ্র বলে, আর কোথায় ব্রাহ্মণ বলে?

"পৃথিবী-পতয়ে নমঃ।" পৃথিবীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে গেলি? ঢুকে গে'ছিস পৃথিবীর ভিতব? পৃথিবী তোর অঙ্গ হয়ে গেল? এই ছিল রক্ত-মাংসেব শরীর, এখন কিসের শরীর হল? মাটিব? অনুভব করতে পারছিস? ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের গতি কোন্ দিক্ দিয়ে, বুঝতে পারছিস এখন? "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" যেতে পারলি সূর্য্যে? সূর্য্যশরীরী হতে পারলি? এই যে বলে, অমুক ঋষি চলে গেলেন সূর্য্যলোকে, চন্দ্রলোকে। ঐ যে ম্যাটির মধ্যে ঢুকেছিলি, একটুখানি বোধ করতে পারলি? যদি ভাল করে পারতিস, একেবারে মাটি হয়ে যেতিস। মাটির মধ্যে যদি কোথাও কাঁকড় থাকত, বুঝতে পারতিস। "যস্মাৎ ঋষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈঃ, দ্রুতমস্য রূপং উপলভ্যতে তস্মাৎ উচ্যতে রুদ্র ইতি।"

১লা মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

নয় রকমের তুষ্টি আছে, যা সাধনার অন্তরায়। আত্মতত্ত্বের দুটো দিক্ প্রধান, একটা নেওয়া, আর একটা দেওয়া। জীব আমরা দিতে জানিনে, শক্তিহীন। নিতেই জানি। কিন্তু আমরা কি দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। তিনি আমাদের গড়েছেন তাঁর আত্মত্ব দিয়ে। সুতরাং আমরা তাঁর দেওয়া আমাদের আত্মাকেই তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করব। আত্মার যে দাতৃত্ব, তাহাই ঈশ্বরত্ব; সেইটি আমরা মোটে দেখতে পাইনে। সুতরাং ঐশ্বরিক গুণ (Godly faculty) আমাদের ভিতর কি আছে, দেখতে হবে। সম্পূর্ণ শক্তিহীন হলেও আমরা কি দিতে পারি, সেইটে দেখলে আমাতেও দানকারিণী শক্তি প্রস্ফুট হবে, ভগবতী আমাতে ফুটবেন। যেমন নেওয়ার একটা অনুভূতি আছে 'পাচ্ছি' বলে, তেমনি দান করেও বলবি, 'বেশ দান করলাম।' এ ভাব সর্ব্বত্র, শুধু ভগবান্ সম্পর্কেই নয়। গ্রহণপ্রধান বুদ্ধি জীবের, আর দানশীল বুদ্ধি ভগবানের। যে দান হৃদয়ের সম্পর্কে হচ্ছে প্রতি দিন, সেইটি যে ভগবতীর তরফ থেকে আসছে, এইটি দেখলেই নজর ঠিক রাখা হল। আমার প্রাণ ভাত চাইছে, এও যা, আমার প্রাণ ভগবান্‌কে চাইছে, এও তা; উভয়ই অভাব-পূরণ। ভাত চাওয়া শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য, ভগবান্ চাওয়া হৃদয়ের অভাব পূরণের জন্যে। পূর্ণ হৃদয় থেকে যখন হৃদয় ঢালতে থাকব, সে এক কথা, আর অপূর্ণ হৃদয়কে পূর্ণ

করবার তৃষায় হৃদয়ের যে ক্ষুধা, সে আলাদা জিনিষ। সেই জন্য যতক্ষণ না আত্মত্বে ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করি, ততক্ষণ তেত্রিশ কোটি দেবতা এলেও তাদের দিকে চাইব না; বলব, যতক্ষণ না তোমাদের দেখব এই আত্মাতে, ততক্ষণ তোমরা অতিথি মাত্র।

'ব্যোম্' বলে আত্মা, মহাদেব হয়ে গেলেন। আগে হলেন ওম্', তার পরেই হলেন 'ব্যোম্'। বিশিষ্টভাবে 'ওম্' হল ব্যোম্'। ওঙ্কারের বিশিষ্ট (specific) প্রকাশের নাম হল ব্যোম্। ওম্ হল প্রথম প্রকাশ; তার পরে যেখান থেকে **material** প্রকাশ আরম্ভ হল, সেই ব্যোম্।

যেমন দুগ্ধরূপ অমৃতলাভের জন্য গো-সেবা করিস, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্বরূপ অমৃতলাভের জন্য গুরুসেবা। দুগ্ধ ত খড়ে, জলে, খোলেও আছে; কিন্তু যতক্ষণ না ঐ সব গরুর পেটে ঢোকে, ততক্ষণ দুধ বেরোয় না। তেমনি ব্রহ্মও সর্ব্বত্রই আছেন; কিন্তু গুরুর ভিতর দিয়ে না পেলে তাঁকে বিশিষ্টরূপে পাওয়া যায় না। গুরু যা কিছু দেখেন শোনেন, সবই তাঁর ভিতর জ্ঞান-দুগ্ধে পরিণত হয়। হারাণ গরু যেমন গোয়ালে ফিরে এসে শান্তি পায়, তেমনি আশ্রয়-আশ্রয়ী ভাব যেন যথার্থ হয় তোমাদের। সেইটের উপর ভয়ানক ফল নির্ভর করে।

ভগবান্ বললেন, বিভক্ত হব। বিভক্ত হবার পর কোন্ বিজ্ঞানের বলে তিনি বিভক্ত থাকেন, সেইটি দেখছি। সে বিজ্ঞান হল এই,—আমি দেখছি শক্তিকে, আমার শক্তি অর্থাৎ আমা থেকে একটু বাইরে। আবার শক্তিও দেখছেন, আমি

তোমার শক্তি অর্থাৎ তোমা থেকে একটু বাইরে। দুজনের একটু বাইরে বাইরে পরস্পরের এই যে বোধ, এর দ্বারা বিভাগ হয়ে রইল। সুতরাং দুজনের ভিতর রইল টানাটানি, আদান প্রদান, যার নাম হৃদয়। হার্দ্দ ক্রিয়াই (Emotional activity) জীবন (emotion, life), কাল। আত্মা যখন শক্তিকে দেখেন, তখন তিনি শক্তির মুখাপেক্ষী। 'ওগো আমার দর্শন', এই দেখাটাই মুখাপেক্ষিতা। আবার শক্তি যখন আত্মাকে দেখেন, তখন তিনিও আত্মার মুখাপেক্ষী হন। দুয়ের পরস্পর মুখাপেক্ষিতায় আমি যেতে চাচ্ছি তোমার দিকে, তুমি আসতে চাচ্ছ আমার দিকে ; এই উভয়মুখী গতি থাকার জন্য নিস্তরঙ্গ, অবিভক্ত যে স্থিতি, সেখানে যাওয়াটা সম্ভব হয় না।

২রা মে, ১৯৩৭, রবিবার।

আমি কাল বলছিলুম, ব্যাপ্ত হওয়া আর ব্যাপ্তির আশ্রয়-ভূত হওয়া ; তাকে অবলম্বন করে থাকা। আমি ব্যাপ্ত হয়ে গেলাম, আবার তাকে আশ্রয় করে থাকলাম। আমি ব্যাপ্তিকে প্রকাশ করলাম, আবার আমিই ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত হলাম। ব্যাপ্তি আমার আশ্রয়, এই কথাটা দার্শনিক হিসেবে অদ্ভুত হলেও এ কাণ্ডটা আমাদের ঠায় হচ্ছে। ব্যাপ্ত হওয়া আর মহান্ হওয়া এক কথা। অনির্ব্বচনীয়তায় আমি কি ছিলাম,

আগে দেখিনি। তোমাকে, অস্মিতাকে বা মহত্তত্ত্বকে দেখতে ছুটলাম। তোমা পর্য্যন্ত ছুটলাম, ব্যেপে গেলাম। ভগবান্ যখন ব্যাপ্তি নেন এই রকমে, তখন তাঁর নাম হয় মহৎতত্ত্ব। জীবে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রথম বিকাশ হয় 'আছি'তে, 'অস্মি' এই জ্ঞানে। আছি জ্ঞান ফুটলেই জীব নিজেকেও আছি জানে, আর যত কিছুতে 'আছে' এই বুদ্ধি হয়। এইরূপে অস্মিতা বা 'আছি'-বুদ্ধি বিশ্বের আশ্রয় হল। জীব স্বাধীন নয় বলে নিজে এটাকে ফোটাতে পারে না। এই 'আছি' হল ব্যাপ্তির আশ্রয়। আমি জীব, আমার জ্ঞান পরাধীন। কিন্তু ভগবান্ যখন তৈরী করেন, তখন 'আছি'তে নানারকম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, শব্দাত্মিকা, গন্ধাত্মিকা ইত্যাদি 'আছি'রই বৈশিষ্ট্য। এর নাম জগৎ তৈরী হওয়া।

আমরা ঘুম থেকে জাগলে আগে জ্ঞান হয় 'আমি আছি'। অমনি সেই থাকা আশ্রয় করে যাকে যাকে স্বীকার করেছিলুম, ব্যক্ত বা অব্যক্ত জগদ্দর্শন ফুটে উঠল। 'আছি'র সঙ্গে জগদ্দর্শন ফোটে আর নেবে; শুধু জগৎ নয়, অস্মিতাও আছিটাও। ভগবান্ও যখন 'আছি'কে গ্রহণ করলেন, ব্যাপ্তিময় হলেন, আবার ব্যাপ্তি যখন তিনি সংহরণ করলেন আপনাতে, আত্মাতে, তখন তিনি হলেন যোগনিদ্রাময় পুরুষ। আমরা জীব; হয় জগৎ দেখব, নয় মরে যাব। এতে পরমতত্ত্বের কাছে গিয়েও যেতে পারলুম না।

ভগবান্ প্রকাশ করলেন ও লীন হলেন। তাঁর পক্ষে

যাতায়াত সম্ভব হল। তিনি এর ভিতর কি রেখে দিলেন, কি কৌশল অবলম্বন করলেন, যাতে এই বাড়াটায় যত দূর বেড়ে যান, আপনাকে হারান না? আপনি মানে? শক্তি যেমন যত দূর বেড়ে যাক, সেই বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি থাকে, সেই রকম ভগবান্‌ও বাড়াটায় যত দূর বেড়ে যান, তত দূর তিনি নিজেও থাকেন। জড়শক্তির বেলায় বুঝলুম যে, থাকে। আত্ম-শক্তির থাকা বলতে কি বুঝতে হবে? তাঁর আত্মবোধ নিয়ে তিনি সব জায়গায় থাকেন। তা থাকুন, কিন্তু তাতে জগতের কোন আস্বাদন থাকে কি? হাতটা বাড়ালে কোঁচ্‌কালে তাতে কোন মাধুর্য্য থাকে কি? আমি জানলুম মাত্র, এ একটা মাধুর্য্য নয়। মাধুর্য্য হৃদয় ব্যাপার। জানার ভিতর থাকে কি? জানা যেখানে ফুটল, সে অনেক রকমের ফুটতে পারে, নিজ-বোধ জানা, আমিই জানলাম, আমি সঙ্গে (touch) আছি, জেনেও নিরপেক্ষ থাকতে পারি। কিন্তু একটা অনুভব করলাম, ছুরি লাগ্‌ল, সাপ দেখলাম, এতে নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। এ একটা অন্য রকমের ভোগ দিলে; ধড়ফড় করলাম, বিত্রস্ত হলাম। কিম্বা একটা আনন্দের জিনিষ এল, তখন মন থেকে অন্য সব সরিয়ে দিলাম। এই ভোগাত্মক জানা যদি না থাকত, তা হলে ভগবান্ যে ব্যাপ্তিতে বয়ে গেলেন, সে ব্যাপ্তি টিকত না, সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে যেত। যেমন কতক জল পাথরের উপর দিয়ে এ পাশ থেকে ও পাশে বয়ে গেল, তাতে স্থায়িত্ব থাকল না, কিন্তু সেই পাথর যদি গুঁড়ো হয়ে বালি হয়ে যেত, তার উপর

দিয়ে জল বয়ে গেলে খানিকটা খানিকটা বিধৃত হয়ে যেত, শোষিত হয়ে যেত, খানিকটা খানিকটা রয়ে যেত। ব্রহ্মা যখন ভগবানের আদেশে সৃষ্টি করলেন, তখন সৃষ্ট জীব পরমতত্ত্বকে দেখে তাঁতে মিশে যেতে লাগল। ব্রহ্মা দেখলেন, এ ত বড় মুস্কিল। যেমন সৃষ্ট হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়। জিজ্ঞেস করলেন, কি করি? ভগবান্ বললেন, "ওদের বিভক্ত কর।" তখন ব্রহ্মা তাদের দ্বিধা বিভক্ত করলেন; এক অংশ স্ত্রী, এক অংশ পুরুষ করলেন। যা সৃষ্টি করলেন, তাতেই স্ত্রীও আছে, পুরুষও আছে। তখন তারা আত্মত্বের দিকে নজর না করে, পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল; সৃষ্টি স্থায়ী হয়ে গেল। স্ত্রী মানে, আত্মশক্তি পুরুষ মানে, প্রত্যগাত্মা। আত্মা সেখানে দেখলে আমার স্ত্রী, সেখানে দেখলে পরিচালিনী শক্তি। স্ত্রী দেখলে আমার পরিচালক। তুমি পরিচালনা করবে বলে রচিত হয়েছ। আমি পরিচালিত হব বলে রচিত হয়েছি। **negative** ও **positive** বিদ্যুতের মত পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থা ক। একীভূত হল, জোড় আরম্ভ হল; কিন্তু ঐ যে দুটো অভিমান পরিচালকত্ব ও পরিচালিত, এই দুটো যতক্ষণ না একসা হয়, ততক্ষণ আত্মা ও শক্তি একসা হয় না; পরমাত্মত্ব লাভ করে না। অর্থাৎ আমরা মোক্ষলাভ করছিনে, একটা যে কোথায় কেটেছে, সেখানে জোড় না খেলে। 'পরিচালকত্ব ও পরিচালিত পাকা জোড় নয়; খানিকটা জোড়; সাপে ছুঁচো গেলার মত জোড়। এ দুটোকে জুড়তেও

পারছিনে ; কারণ, দুটো ভিন্ন অভিমান এখনও আছে। এই দুটো যতক্ষণ না এক হয়ে যাবে, উপরের ছাল জুড়বে না। ভিতরের মাংস হাড় জুড়েছে। একসা মন্ত্র বললি, যখন বিয়ে করলি,—“অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি” ইত্যাদি, কিন্তু একসা হল কি ?

দেখলুম, এই কাটা-জোড়া ব্যাপারটা যেখানে হচ্ছে, তার নাম হৃদয় ; শক্তির মূল আলোড়নভূমি। সেই ভূমি থেকে তরঙ্গ আকারে যা কিছু সব ফোটে এবং সেগুলোই বস্তু বা ব্যাপাররূপে পরিণত হয়। সুতরাং হৃদয়ই বিশ্বের আধার। এই গ্রন্থির আলোচনায় বলেছি, এখানে ধ্যেয়ের ও ধ্যাতার সঙ্গে একত্ববোধ, সারূপ্য হয়ে যায় অর্থাৎ দুটো হৃদয় দুদিক্ থেকে বেরিয়ে মিলিত হয়। সেইটেই হৃদয়গ্রন্থির পরিসমাপ্তি। তার পর খালি একত্ব, ‘সলিলে সলিলমিব’ এক হয়ে গেল। আবার দুটো হতে হলে, হৃদয় হয়ে অর্থাৎ হৃদয়নামক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা তাকে কাটতে হবে অর্থাৎ দুদিকে দুটো সলিল টুক্‌রো হয়ে যাবে। ঐ আত্মত্বকেই কাটতে হবে আত্মার ভিতর হৃদয়রূপ একটা শক্তি তৈরী করে, তাই দিয়ে ঠেলে ছিঁড়ে। ঐ কাটা, ঐ জোড়া, সেই ব্যাপারটি আবার আরম্ভ হল। এর নাম হল হৃদয় তৈরী হওয়া। হৃদয় মানে, একটা চলনশীল তত্ত্ব, একটা coil systemএর call-bell battery, অনন্ত সূক্ষ্ম coil বা তারের জটিলতায় নির্ম্মিত। আত্মতত্ত্বের কাটা গড়াই সাভাবিক। যতক্ষণ না দেখতে পাবে, আত্মাই

বহু হচ্ছেন, ততক্ষণ হৃদয় coil springএর ভিতর দিয়ে কিছু দেখা হল না। জোড়ার লক্ষণ কতকটা দেখতে পাই, আবার কাটার লক্ষণও দেখতে পাই, যখন নিজেকে তা থেকে অসঙ্গ দেখতে পাই। আত্মা থেকে হৃদয় coil currentএর ছুটাছুটি, সৃষ্টি করা-করি বেরুল, আত্মা অসঙ্গ দ্রষ্টা রইল। ছটফট করছি ও পাশে, স্থির আছি এ পাশে। একটু অসঙ্গত্ব দেখ; আবার ফিরে যাও, থাকতে পার না। মানে, আত্মায়, দ্রষ্টায় দৃশ্য জুড়ে নিয়েই ফের। বহু হবার ইচ্ছায় কাটি, মমত্বে জুড়ি। হৃদয় হল আত্মার ভিতর একটা প্রবাহের current কুণ্ড, আনন্ত্যের, সূক্ষ্মতার অনন্ত দিকে প্রবাহ। অনন্ত ব্যাপারে ও বস্তুতে বিকাশ। তাতে আছে আত্মার দ্বারা পরিচালিনী শক্তি। অসঙ্গ বিজ্ঞানাত্মা থেকে সঙ্গবান্ হৃদয় জাত হল 'আমি' জ্ঞান নিয়ে প্রথম। সেই হৃদয় সব সৃষ্টি করতে থাকল। বহুত্বের ইচ্ছা ও একত্বের ইচ্ছা, এই দুই ইচ্ছাই হৃদয়ের রস, হৃৎশক্তি, হৃন্ময়তা। এই জন্য ছাড়া বলে একটা জিনিষ দেখতে পাই, জোড়া বলেও দেখতে পাই। কিন্তু পূর্ণভাবে দুইই দেখতে পাইনে। কাটা জোড়া দুটো ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানটার নামই হৃদয়।

পুত্রকে ভালবেসে খানিকটা তার হয়ে গেছি, কিন্তু আমার সবটা তাকে দিতে পারিনি। আমার আনন্দ, ব্যথা, সবটা দিতে পারিনি, কিছু দিই। কাটা হই দেখতে পাই, জোড়াও দেখতে পাই। হার্দ্দ অনুভূতিগুলো বিশ্লেষণ করলে কাটা

জোড়া ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। হৃদয়ের এই ধর্ম্ম শিখলে আমরা কাটা জোড়ার উপরে অধিকার পেতে পারি। হৃদয় আনন্দে বহু হয়, নিজেকে বহুত্বে ছড়িয়ে দেয়। আত্মা অসঙ্গ থেকে আবার আনন্দেই তাদের নিজের সঙ্গে এক করে নেয়, জুড়ে নেয়। এজন্য বলে, 'হৃদয়স্থিতলোচনাং।' আমরা খণ্ড আত্মা, বুক দিয়ে সব দেখি। কাউকে দেখে হৃদয় জ্বলে' যায়, কাউকে দেখে ঠাণ্ডা হয়। সুতরাং হৃদয়ের এই কাটা-জোড়া তত্ত্বটি দেখতে পেলে আত্মাকে কেটে এক টুকরো দিতে পারব, সন্তান উৎপাদন করতে পারব। এখনকার দেওয়ার চেয়ে তখন সাক্ষাৎ তাঁকে দেওয়া, তাই হওয়া হবে। এইরূপ ভাবে কাটা ও জোড়া শিখতে পারলে আর তাতে বিকল্প থাকবে না, তাঁর থেকে বেরিয়ে খণ্ডিত তত্ত্বে আসতে হবে না, তাঁতে জোড়াই থাকব। এখন ভালবাসি বটে, কিন্তু জোড় ঠিক থাকে না, ভেঙ্গে যায়। নিজের অস্তিত্ব এতটুকু দিচ্ছিস না। পান থেকে চূণ খসলে কাটা হয়ে যাস। তখন পাহাড় পর্ব্বত চলে গেলেও একটাই হয়ে থাকবি। সুতরাং কাটতেও শিখিসনি, জুড়তেও নয়। ভাল কাটতে শিখলেই অর্থাৎ আপনি বহু হয়ে যেতে শিখলেই ভাল জুড়তেও শিখবি। তা হলে ঋষি যে বলেছেন, ভগবান্ এক থেকে বহু হতে পারেন, তিনি কূটস্থ হয়েছেন, সেটা ভাল করে বুঝতে পারলুম। তিনি কাটাগুলোকে যদি বলেন, জুড়ে এস, তবে সব জুড়ে আসবে; কাটার ঘায়ের দাগ পর্য্যন্ত থাকবে না। পুত্রের, পত্নীর হয়েছি

খানিকটা, দিয়েছি খানিকটা, কেটেও দিয়েছি, জুড়েও নিয়েছি। কাটলেই প্রকৃতি (nature) জুড়তে থাকবে।

ভগবান্ জুড়ে আছেন, এক হয়ে আছেন, তত্রাচ তাঁর পেট ভরছে না। আপনাকে বহু করে আবার এক করলেন। তোরাও নিজে বহু না হলে ভগবান্ যে বহু হয়ে আছেন, তা জানতে পারবি না। কূটস্থ পুরুষকে দেখতে পাবি না। তাঁকে ভাল করে দেখার জন্য এই কাটা-জোড়ার ব্যাপার দেখতে হবে। যেখানে ঐ ক্রিয়াটা হয়, তার নাম হৃদয়, আত্মতত্ত্ব।

কোথা দিয়ে পাঁঠা কাটি, এইবার দেখ। এই যজ্ঞ—যজ্ঞ মানে, একীভূত হওয়ার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা, একীভূত হওয়া। এরও প্রমাণ পেলুম উপনিষদে। ঋষিরই বাণী বলছি; ভগবান্ আগে বললেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। তৎ তেজোঽসৃজত।' প্রথম ধাপ যে বলা, তা থেকে জন্মাল তেজ। তেজের পর 'আপোঽসৃজত'। তার পরে 'অন্নং অসৃজত।' তিন বার তিনি তিন ক্ষেত্র (stage) থেকে বললেন, 'বহু স্যাম্।' তার পর বললেন, 'অহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ।' 'হন্তাহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ, জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" এই তিন দেবতা যে হলাম, একে—এই ত্রিধা বিভাগকে গ্রহণ করে, তাকে টুকরো টুকরো করে, অনু-প্রবিষ্ট হয়ে, নামরূপ প্রকাশ করব। আমাদের কথা হল, আগেই বললেন—'হন্ত'। 'আহা,' ওই জাগালে কাটাজোড়ার ব্যাপার। ঐ যে হর্ষাত্মক, হার্দ্দি ধর্ম্মাত্মক শব্দ করলেন,

ঐটেই হল সর্ব্বনাশ। 'হন্ত' 'আহা' বটে, কিন্তু ওর মানে—কাটা। তার মানে, বুক তৈরী করে, হৃদয় তৈরী করে, তবে কাটাজোড়ার ব্যাপার চলেছিল। আপনাকে কাটব, কেটে বহু হব, খণ্ডিত আত্মত্ব প্রকাশ করে তিন প্রকারের খেলা তৈরী করব—তেজের, জলের, অন্নের—যার এতটুকু নড়ন-চড়নে 'আহা' 'উহু' বেরোতে থাকবে। ব্যথা দিয়ে তুমি তৈরী করেছ আমাদের, এই চালাকি খেলেছ। একেই মধুময় বলব পরে। তা হলে কল্পনার কথা নয়, শ্রৌত কথা, 'হন্ত' থেকে দেখিয়ে দিলাম। 'আহা' বলাতেই তৈরী হয়ে গেল। অহঃ, অহং, আহা, সব হয়েছে ওর থেকে। অহঃ—দিবা ও রাত্রি-প্রকাশ। অ=দিবা, হঃ=রাত্রি। এইটেই আহা, হার্দ্দ ধর্ম্ম। এইটে অধিকার করে ধর্ম্মে নিয়েছি যখন, তখন অহং। অর্থাৎ এই দুটোই ব্যেপে আমি ধরে আছি। আমিই যুগপৎ এই উভয়-বিপরীতধর্ম্মী। এইগুলি সমস্তই হার্দ্দ ভাবের পরিচয়—'আহা'। এর বিসর্গের উপর জোর দিলে, কাটার উপর জোর দিলে হয় 'হঃ'। এই হল দেবভাষার দেবত্ব, প্রতি শব্দে সেই প্রকাশের সমস্ত বিজ্ঞানটি নিহিত (**impregnated with the whole science of thing in itself**)। হৃদয়, হার্দ্দ শক্তি ঐ বিজ্ঞানের ভিতর থেকে যায়। শক্তি মানেই হার্দ্দ শক্তি।

আত্মার বহুত্ব যদি শিখতে হয়, হৃদয় নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। হৃদয়ের প্রতি ব্যবহারের ভিতর চোখ দিলেই তাহার

খেলার তলা দিয়ে একটা কাটা-জোড়ার বিধান আছেই আছে, সুন্দর দেখতে পাবে।

তা হলে যদি কাটা-জোড়া শিখতে হয় এবং তা একই জায়গায়, এটা ঠিক হয়, তবে আত্মত্বেই কাটতে হবে বা জুড়তে হবে। ঐ জায়গাটা বিশেষ ভাবে যদি ধরতে পারি, তবেই কাটাজোড়ার অধিকার বিশেষ ভাবে এসে যাবে। ঋষি বলে দিয়েছেন, যখন কোন অনুভূতি হবে, তখন সে অনুভূতির উপর বিশেষ চোখ না দিয়ে, দেখতে হবে যে, সে এইখান থেকেই বেরুল, আর বেরুলেও এইখানেই সে জোড়া আছে। এই-খানেই তার এক পা আছে, এক পা বেরিয়েছে ; দু পা বেরুবার জো নেই। 'আমার পুত্র রে,' এখানেও এক পায়ে আত্মত্বে দাঁড়িয়ে আছিস্, এক পায়ে পুত্রত্বে বেরিয়ে এসেছিস। একটা পা এইখানে গ্রথিত রয়েছে, প্রতি অনুভূতিতে যদি ভাল করে দেখিস, এক দিনে এক শ ঘটনায়, আর সাত দিন যদি এরূপ করিস, তা হলেই দেখবি, তুই বেরিয়েও ঠিক আছিস। নিজের স্থিরত্ব ঠিক থাকবে। এতটুকু পেলেই কাটা-জোড়ার কৌশল পাবি ; সমাধিস্থ হতে হবে না। "এই যে রয়েছি, এই যে রয়েছি। ওঃ, এইখানেই রয়েছি। না না, আমি কিছু হারাইনি, এইখানেই রয়েছি।" একটা লম্বা, একটানা, অবিরাম, সাত দিনে সাত শ, তা হলে জগৎব্যাপারে কি এল গেল। কাটা দেখতে পাব না, জোড়াই দেখতে পাব। "যচ্চাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বমস্মিন্ সমাহিতং।" তখন নজর পড়বে—'ওঃ, সব এইখানে।' বসাটা

বদ্ধমূল হয়ে যাবে—দেখ্‌বি, এমন হয়ে বসে গেছে, আর যাবে না। দুশ একশ বার হলেই পাকা হয়ে যাবি। এইখানেই, আর কোথাও কিছু নেই। এইখানেই ভগবান্‌, ঈশ্বর, এই-খানেই খণ্ডিত জীব। তিনি শেখাচ্ছেন এই কথাটাই। এ কথাটা যখন বদ্ধমূল হবে যে, এইখান থেকেই কাটে জোড়ে, এইখান থেকেই জাত হয়, এইখানেই লয় হয়, তখনই আমরা হৃদয়বান্‌ পুরুষ অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেলাম। ঠিক এইখানে **positively** বলতে হবে, এমনি করে চেপে, আর কোথাও নয়, এইখানেই। দিনের ভিতর দুটো একটা আকস্মিক ঘটনাকেও যদি বলতে পারিস এইখানে, তবেও হবে।

জ্ঞান তৈরী হচ্ছে মাথায়, ভোগ হচ্ছে বুকে। জানা হল ওখানে, ভোগ নাম হল এখানে। কাটা পড়ল। প্রথম ঈক্ষণ হল শুধু জানা। দ্বিতীয় ঈক্ষণ হল ভোগ, উপদর্শন, অনুদর্শন, অনুভব—টুকরো হয়ে ভোগে প্রবিষ্ট হলেন। সুখ বা দুঃখ, যে জানাটা ফুটল, সেই জানায় প্রবিষ্ট হওয়ার নাম ভোগ। তৃতীয় দর্শন হল সংস্কার। একবার যেটার আস্বাদ হয়ে যায়, সেটা হয় সংস্কার। সেই সংস্কার টাঙ্গিয়ে রেখে দেন, তার নড়চড় হয় না। সংস্কার মানে, জ্ঞানের ভিতর আমি টুকরো টুকরো হয়ে, কাটা হয়ে আছি। ভবিষ্যৎও আত্মতত্ত্বে নিহিত, অতীতও আত্মতত্ত্বে নিহিত, বর্ত্তমান ত বটেই। অনন্ত আত্মা এক আত্মতত্ত্বে

নিহিত। ব্রহ্মের আত্মত্ব নিয়ে কাটাছাঁটার ব্যাপার এইখানেই হচ্ছে। এইখানে ভগবান্, জীব, জগৎ, সব তৈরী হচ্ছে। সেই কারখানায় এসেছি ?

এইরূপ পুনঃ পুনঃ দেখার দ্বারা এত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়বি যে, আমার অতীত ভবিষ্যৎ আর কোথাও নেই, দুনিয়াও নেই। এই যদি হয় প্রত্যগাত্মা, আত্মার স্বরূপ, তা হলেই আত্মা হল ব্রহ্ম। কাল দেখেছি, কি কালময় পুরুষ হয়ে গেছি। এই জ্ঞান-বিভাগ নিয়েই ত কালবিভাগ। চিন্তা করতে হবে না। ভাববার কথা কিছু বলিনি। চিন্তার দিক্ দিয়ে মোটে যাবে না। ঐ অভ্যাসটি ছাড়। শুনলে ; যে ছবি ফুটল, ঐ গুরুমূর্ত্তিতে নজর কর। তাতে যদি কোথাও অস্পষ্টতা থাকে ত ঠিক করে নাও। চিন্তা করতে গেলেই ডুবে যাবে। 'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং, নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং, নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥' তপস্যা মানে, চারি দিক্ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে মনকে এক জায়গায় বসানর যে চেষ্টা। আরাধন মানে, ভাবে বসা। হার্দ্দ ভাব নিয়ে থাকার নাম আরাধনা। চিন্তাত্মক ভাব নিয়ে থাকার নাম তপস্যা। আত্মতত্ত্ব যে কেউ আলোচনা করেছে, আত্মা নিগু'ণ, অসঙ্গ, ইত্যাদি বলেই শেষ করেছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য, আত্মা থেকে যে জাত, তাকে আর আত্মা বলতে কেউ সাহস করে নি। যে একা, অথচ বহু হয়। ওরা খালি আত্মাকে চাপা দিয়েছে নিজেদের logicএ। কেউ বলে, জীব কখন

ভগবানে ঢোকে না কি সাংঘাতিক ব্যাপার! ঋষিদের কথাকে চাপা দিয়েছে।

৫ই মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

ইঁটে আছে মাটি, জল, আগুনের সংহতি। ইঁট নিজেকে ওসব থেকে আলাদা ভেবে self assertion যখন করলে, তার স্থূলতত্ত্বের অধীনতা চলে গেল। বীচির ভিতর বৃক্ষ রয়েছে অর্থাৎ তার পর পর বিকাশের ক্রমধারা রয়েছে। তেমনি পরমাত্মতত্ত্বের ভিতর একটি জীবের পর পর বিকাশের চৈতন্যময় উপাদান রয়েছে। 'আমি' কোন্ জ্ঞানের পরে কোন্ জ্ঞান ধরে বিস্তৃত হয়েছি, এটা না ধরলে, মোটের উপর আগাপাছতলা যে আমাকে গড়েছে, সে যে জ্ঞানই, এ সংস্থানে সিদ্ধিলাভ না করলে আমার ভগবতী বলা হয় না। এই দৃষ্টি নিয়ে ভগবতীকে দেখতে পারলে তবেই দেখতে পাই, সাক্ষাৎ ভগবতীর, সাক্ষাৎ চিন্ময়ীর গর্ভে আমরা রয়েছি। এই হল আমাদের প্রকৃত ইতিহাস।

নিজত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে বিস্তৃতি লাভ করা (assertion)। সে যত নিজেকে প্রসারিত করে, ততই যা থেকে বেরিয়েছে, যার উপর নির্ভরতা ছিল, তাকে ভুলে যায়। চিৎগর্ভে চিৎতত্ত্বের জাগরণ ও বিলয় কি এই রকম করে দেখেছিলাম? আত্ম-

প্রসারণ (self assertion) করতে গিয়ে ভোগময়, দাহময় ব্যাপার হচ্ছে। কিন্তু অসঙ্গত্ব আমার একটি উপাদান, এমন করে ত দেখা হয়নি। তার বুকেই আছি। যদিও আমাতে নানা-রকম সঙ্গ, নানারকম ভোগক্রিয়া গঠিত হচ্ছে, তবু আমার যিনি দেবী, তিনি অসঙ্গ। অণুতে অণুতে তুমি আছ, এটা কি ভাবের কথা? না এটা সত্য? এটা যদি সত্য হয় ত সমস্ত স্তব্ধ হয়ে যায় না? তোমার কথা কয়ে লাভ করব কি, হচ্ছে কি, হবে কি, এ সব কি স্বীকৃতির কথা? যতটুকু স্বীকৃতি আসবে, সেখানেই লুটিয়ে পড়ব। কার্য্য-কারণকে দেখতে পাচ্ছে, এমন করে স্বীকৃতি না এলে কি মাকে দেখা হল? এমন স্থানে দাঁড়িয়ে মাকে না দেখলে, সে কি মন্ত্রপ্রয়োগ হল?

স্বয়ং বিশ্বেশ্বরী থেকে, তাঁর ইচ্ছা থেকে, ঐ জীবটির ইচ্ছা, কর্ম্ম, সংস্কার, সব নিয়ে একটা প্রকাশে (outcome) ঐ ঘটনা (factus)। এখানে কি factusএর মূল্য দেবে, না যে বসে আছে ওকে কোলে করে, তার মূল্য দেবে? কি দম্ভে আমরা ঘুরে বেড়াই! স্বীকৃতির কত স্থূলতম অংশে আমরা পড়ে আছি। না কি? পরের বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলে পরিচয় দিয়ে, অনৃতের দ্বারা নবাবী করে যেমন দণ্ডিত হবার যোগ্যতা আনি, তেমনি এই দেহটাকে আমার বাড়ী বলে পরিচয় দিয়ে, মায়ের স্বীকৃতি না থাকলে দণ্ডিত হবার যোগ্য হচ্ছি না? যতক্ষণ জড় অবলম্বন করে থাকব, ততক্ষণ এ স্বীকৃতি কি আসবে? আসবে না।

তত্ত্বের দ্বারা যে ভগবতীকে দেখবার জন্য আমরা কৃত-সঙ্কল্প হয়েছি, সে কেবলমাত্র কথার মা নয়, ব্যবহারশীল মা। আকাশে একখানা মেঘ জমে আছে দেখলে। তার ভিতরে গেলে তখন দেখবে, সে কাপড়ের মত চাপ চাপ নয়, ফাঁক ফাঁক কি রয়েছে, অণু অণু কতকগুলো টুক্‌রো এমন হয়ে একখানা মেঘ সেজে আছে। তার পরে চিনলে, সব টুক্‌রোগুলোই জল। জানলে, জলই টুক্‌রো হয়ে, আবার বাঁধা একত্বের একটা মেঘ দাঁড় করিয়েছে। এমনই কি তোমার আমার অস্তিত্ব এই মহাপ্রাণময়ী দেবীর একত্বের উপর নির্ভরশীল? ওঁরই ইঙ্গিতে এমনি করে ভাঙ্গে আর জোড়ে? এরূপ বলেই কি আমরা আমাদের আত্মা বলি এঁকে? আমাদের এই ব্যাপ্তিকে ওঁর ব্যাপ্তি বলি? এই আত্মাকে যতক্ষণ এই রকম ব্যবহারময়, আমাকে গঠন-মারণময় না দেখব, ততক্ষণ কিছু দেখা হল না। এই রকম না দেখলে ব্রহ্মবীণা কি বাজবে? না ধর্ম্মের ঢাক-ঢোল বাজবে। তত্ত্বাভিঘাত, তত্ত্বস্ফোটন সেই জন্য এত দামি জিনিষ। এ যতক্ষণ দেখতে না পারবে, ততক্ষণ বিশেষ কিছু পাওনি। খালি ঢাক-ঢোল পেয়েছ। বাইরের জগতে যেটাকে যত জেনে নিলে, তার অসাধারণত্ব তত চলে গেল। কিন্তু এ যার কাছে যাচ্ছ, যতই যাবে, ততই অসাধারণ, অসাধারণ। ঐ অসাধারণ, অসাধারণ করতে করতে তুমি গ্রসিত (consumed) হয়ে যাবে, ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাবে। আহা হা! আহা ভগবতি!

এক চিন্ময় সত্তা, সত্তা হিসাবে ব্রহ্ম, পরিচালক হিসাবে ঈশ্বর, ভোক্তা হিসাবে জীব। জ্ঞানশক্তির একটা বিস্তার-স্বরূপ বলে মোটের উপর সব বিশ্ব দেখব, ভিতরে তার যত জটিল ক্রিয়াই থাকুক। এই জ্ঞানচক্ষু গুরু যতক্ষণ না দেবেন, ততক্ষণ তাঁর কাছে ঠিক পাওয়া হল না। ঐটি পাবার প্রণালী একটি মন্ত্র,—'তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত।' ঋষি এই এক কথায় গুরুগম্ভীর বাণীতে সব বলে দিলেন। যেমন জলে বরফ সাক্ষাৎভাবে থাকে, তেমনি। এই ভূমা চিন্ময় ভগবানে আমি রয়েছি, আমাকে এঁতে গলে মিশে যেতে হবে। উপাস্যকে পেতে হবে, যেমন বলে দিলাম। উপাসনার প্রণালী হল এই,—আমি আমাকে দেখব তাঁতে জাত ও স্থিত। এই প্রণালীকে অতি শীঘ্র সার্থকতায় আনতে হলে তার একটি কৌশল আছে; সেটি শিক্ষণীয়। তার নাম মন্ত্রচৈতন্য, সেটি পেলে অতি সহজে উপাসনা সফল করা যায়।

আমার কর্ম্ম আমাতেই পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে এবং তা থেকেই আমার অদৃষ্ট বেরোচ্ছে। ঐখানে, জ্ঞানসংস্থিতির ঐ ভাঁড়ারে ভগবান্ একেবারে সাক্ষাৎভাবে আমায় ধরে আছেন।

৮ই মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

শরীর-টরীর নেই। ব্যাপ্তি বল, ব্যাপ্তি আছে; না বল, নেই; শুধু জ্ঞানস্বরূপ আছেন। জ্ঞানময় আমি জেগে উঠলে

আমার ভিতর কামময়ত্ব এল অর্থাৎ আমার সুন্দর হতে ও পেতে সাধ গেল। তাতে আমার রচনা হল একটি হৃদয়। সেই আনন্দে আমি আপনাকে সুন্দর দেখতে লাগলুম জ্ঞানেতেই। জ্ঞানেতে সৌন্দর্য্যবোধ, আনন্দবোধ জেগে উঠল আমাতে; একটা প্রীতি, একটা আনন্দ ফুটে উঠল। সে আনন্দ দ্বিতীয়ের দ্বারা আশ্রিত নয়; সুতরাং অবাধ আনন্দ হল। যদি আটকাত ত অবাধ হত না। ভৌতিক সম্পর্ক নিয়ে আনন্দ বোধ করতে গেলে কোথাও না কোথাও আটকে যেত। এই জ্ঞান যখন অবাধ হল, তখন ব্যাপ্তিলিপ্সা অর্থাৎ ব্যাপ্তি জেগে উঠল। আমি কল্পনা করলুম, আমার আনন্দের আর সীমা নেই। এই নিয়ে কি করব? সৌন্দর্য্য, ঘ্রাণ, স্পর্শ, দেখা, শুনা সব করব, সৌন্দর্য্যময় হয়ে থাকব। আনন্দময় স্পর্শ, ঘ্রাণ, দর্শন ইত্যাদি সব নিতে লাগলুম জ্ঞানে। যখন 'আমি'র পাঁচ মুখে এই রকম আনন্দ—দৃশ্য, শ্রোতব্য, রসয়িতব্য, স্পর্শয়িতব্য ইত্যাদি আনন্দ এল, তখন একটা আনন্দভূমি ফুটল, আর তাতে দাঁড়িয়ে রইল এই পঞ্চ জ্যোতি। আমি আমাকে এইরূপে পাঁচমুখো করেছি। যেমন পাঁচটা মুখ তৈরী করলুম, অমনি অবাধত্ব ঘুচে গেল; এটা করতে ওটা বেধে যেতে লাগল, ওটা করতে এটা বেধে যেতে লাগল। অক্রম জ্ঞান থাকলে যুগপৎই এই পাঁচটা দেখতে পেতাম—যেখানে ওদের সাম্য, সেই ঘরে। কিন্তু তা না করে আমি দর্শনে গেলাম, সে শ্রবণ থেকে আলাদা, শ্রবণে গেলাম, সে স্পৃশন

থেকে আলাদা, এইরূপ অন্য সব। তা হলে আমি একবার যখন ঘ্রাণে গেলাম, তখন ঘ্রাণানন্দে ঢুকিয়ে দিলাম নিজেকে। সেখান থেকে আবার স্পর্শানন্দে ইত্যাদি। যখন আমি এই পাঁচটাব ভিতর কোনটায় বিশেষ ভাবে যাই, সেইটি হল আমার তাতে আত্মপ্রদান। যে অংশ গিয়ে ঘ্রাণে পড়ল এবং ঘ্রাণটা ভোগ করতে লাগল, তার কাছে স্পর্শ তখন আবৃত রইল; সুতরাং তাব তৃষা জন্মাল। যে দর্শন পেল, সে শ্রবণ আছে বলে জানল, তাতে যেতে তৃষিত হল, লালায়িত হল। এর নাম হল কামনাময় হওয়া। হৃদয়ে দান আর গ্রহণ চলতে লাগল। আত্মা এক একটা বিশেষ জ্ঞানে প্রবেশ ও তার ভোগ নিতে লাগলেন। দুটো জিনিষ এসে সমতা লাভ করতে লাগল ঐখানে। বিষমতায় দর্শন থেকে শ্রবণে, শ্রবণ থেকে ঘ্রাণে ইত্যাদিরূপে ছোটে। যদি তার সাম্যের ঘরটা খোলা থাকত, যদি জানত, একসঙ্গে যুগপৎ সব পাওয়া যায়, তা হলে অক্রম জ্ঞান হত। তাতে করে বৈষম্যও থাকত, সাম্যও থাকত।

তোমরা দেখেছ, রেলগাড়ীর বন্ধ সার্সির কাছে বোলতা ঘোরে। তাকে চেষ্টা করে অন্য খোলা জানলার কাছে নিয়ে গেলেও সে ঘুরে-ফিরে ঐ বন্ধ কাচের কাছেই আসে। সেইরূপ আমাদেরও যদি কেউ কামনার ঘর থেকে সাম্যের ঘরে নিয়ে যায় ত আমরাও ঘুরে ফিরে সেই কামনার ঘরেই আসি। তৃষ্ণা নিয়ে গেছি বলে এক ঘরের আনন্দ মরে গেল, অন্য ঘরের আনন্দ জীবিত হল। সকল বৈষম্য এসে মিলিত হয়েছে একটা জায়গায়; কিন্তু

গতি সব বিপরীত হতে থাকল। এই যে সমতার ঘর অথচ তা থেকেই সব বৈষম্য বেরোয়, এই ঘরটার নাম হল হৃদয়। এইখানে দান ও গ্রহণ চলছে। দান ও গ্রহণের বেলায় বৈষম্য, এক ও বহুর বেলায় বৈষম্য; প্রকাশ মানেই বৈষম্য। সৃষ্টির যে এত বৈচিত্র্য, দুটো বালুর কুচি একরকম নয়, দুটো মানুষ একরকম নয়, এইরূপ ভাবেই প্রকাশ হতে লাগল। কিন্তু ঐ যে সাম্যের ঘর, সমতার ঘর, ওরই ভিতর দিয়ে সব যাতায়াত করতে লাগল; অথচ কেউ ওকে পেতে লাগল না।

জগতে এত যে বিচিত্রতা দেখলাম, তোমাতে আমাতে বৈষম্য, পিঁপড়েতে পোকাতে বৈষম্য, আমরা দেখতে পাই. একমাত্র মনুষ্য এই সমতার কাছাকাছি। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকল এমন একটা সামঞ্জস্যে এসেছে, যা পশুতে নেই। তাদের কারো রাগ, কারো ঘ্রাণ, কারো স্পর্শ বেশী। দেবতাতেও একটা একটা ধর্ম্ম বেশী। কিন্তু মানুষে সমতার ভিতরই সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে যাচ্ছে—যেমন সোনার বেনেদের মধ্যে প্রবাদ আছে, সব ফল আনিয়ে একটু একটু করে কুচিয়ে খেতে হবে। তেমনি শারীরিক ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই হৃদয়ই ভগবানের কাছে যাবার রাস্তা। এখানেই যত বৈষম্যকে এনে খাপ খাইয়ে আমরা একরকমে কাজ চালাই। আমাদের এই সমতানতা, এই জিনিষটি এনে দেয় ঐ ভূমি। এই জন্যে হৃদয়ের মধ্যেই আত্মতত্ত্বকে অনুসন্ধান করতে ঋষি উপদেশ দিয়েছেন। হৃদয়ের

ভিতর দিয়ে ভগবান্‌কে অন্বেষণ করবে, এ কথা বলায় আমরা খুঁজতে গেলুম, হৃদয়ে কোথায় ছ্যাঁদা আছে। তাতে কার্য্যতঃ ঢুকলাম মনের ভিতর। আমাকে 'কে তুমি' জিজ্ঞাসা করলে বলব, 'আমি জীব'। তার মানে, আমি জীবত্বে অনুপ্রবিষ্ট। এইটে প্রকৃতপক্ষে জীবত্বের উপাসনা। হৃদয়ের ভোগে যদি ডুবি, যেমন জীবত্বের ভোগে ডুবে আছি, তবেই আমার হৃদয়ের উপাসনা হবে। তাই আমরা ভগবান্‌কে হৃদয়বান্ বলে গ্রহণ করলাম। আজ তিন চার দিন ধরে হৃদয়ের পরাকাষ্ঠা যে প্রকাশ, তা ব্যাখ্যা করছিলাম। তাতে দেখলাম, তিনি খালি শারীরিক বা খালি মানসিক বিজ্ঞান প্রয়োগ করে কিছু তৈরী করেন না; কিন্তু তিনি তাঁর সবটার, সমস্ত আনন্দেব পূর্ণ বিকাশটা নিয়ে একটা অণু, পাহাড়, সাপ বা মানুষ গড়েন। এতে তিনি নিজেকে করেছেন উপাদানস্বরূপ, তাই দিয়ে গড়েছেন, যেমন মা গর্ভস্থ সন্তানকে গড়ে, তার ভিতর নিজের সবটা ঢেলে দিয়ে, তেমনি আমাদের ভগবতীও গড়েছেন নিজের সবটা ঢেলে দিয়ে, প্রয়োজন অনুসারে তারতম্য করে, সমগ্র হৃদয় দিয়ে গড়ে তোলেন একটা জীবকে। আমি ভগবানে বসে আছি এই রকমে। স্বর্গীয় নন্দনলীলা হয়েছে আমার উপজীব্য, তাইতে আমি বিধৃত হয়ে রয়েছি।

হৃদয় বলে যতটুকু পরিচয় হয়েছে, সেইটে যদি আমার ভোগে আসে, তবেই হৃদয়বানে পৌঁছবার রাস্তা পেলাম। ঋষি বলে দিলেন, এই যে হৃদয়, এতে সমস্ত নিহিত আছে। যা কিছু

আছে, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, সবই হৃদয়ে ন্যস্ত; তখন তুমি আমি বাদ যাব না, এতে আর কোন ভুল নাই। এই যে ভগবতী পরমেশ্বরী, যাঁর এইরূপ হৃদয়মূর্ত্তি চোখে ঠেকছে, এ কি আমার মনে হচ্ছে, হৃদয়ের বহির্ভূত কোন স্থানে বাস করছি? না। এখন তুই সতীশচন্দ্র সেন নেই, এখন তুই ব্রহ্মপুরের অধিবাসী; এখন তোর পুঁজি খালি জ্ঞান। মাটি, জল, হাড়, মাস কিছু থাকবে না জ্ঞান ছাড়া। আর-সবেতে তোর মৃত্যু হবে। যদি কিছু থাকে ত থাকবে এই জ্ঞান, চেতনা, হৃদয়, আত্মা। জ্ঞানের ঘরে চলে এসেছ, হৃদয়নামীয় জ্ঞান সে ঘরে ভাসমান রয়েছে।

আত্মা আগে হন হৃদয়বান্; তার পরে তা থেকে সব বৈচিত্র্য বৈষম্য বার করতে থাকেন। হৃদয়বান্ বলতে কিন্তু আমরা বুঝি ভালবাসাময়; দোষেও ক্ষমাযুক্ত, স্নেহযুক্ত, প্রীতিযুক্ত, অক্রোধময়, নিরন্তর সমভালবাসাময়। তার ভিতর বৈষম্যের স্থান নেই। হৃদয়ময়ী ছাড়া আর কোথাও যাচ্ছিস? না, কোথাও যাসনি। আমি আশে যাই, পাশে যাই, উত্তরে যাই, দক্ষিণে যাই, হৃদয় ছাড়া আর কোথাও যাচ্ছি না। হৃদয় মানে, সৌন্দর্য্যবোধ, আনন্দ, প্রীতি। তৃষা মানে, অপ্রীতিকর, অশান্তি। অপ্রীতিকর কিছু থাকবে না ওখানে। বাক্সে টাকা থাকলে ধনীর লক্ষণ বুকে খেলা করে। তেমনি, পকেটে না থাকলেও এর ভিতর আমার সর্ব্বানন্দ আছে,—এই জ্ঞান হলে আর কিছু অভাব থাকবে?

এই হৃদয়ের পঞ্চধা বিভাগ অবলম্বন করে যত কিছু শক্তি তৈরী হয়েছে। শক্তি মানে গতি; প্রকাশ পায়, থাকে ও বিলীন হয়। এই রকম করতেই সে অনবরত চলছে। এই হৃদয়ের পাঁচ প্রকারের গতি; যত কিছু শক্তি জাত হয়েছে এই মূল তত্ত্ব থেকে। এইরূপে এই তত্ত্ব-দেবতা-সকল জাত হন এই হৃদয় থেকে। তুমি দেখলে, তোমার চক্ষু বলে এক শক্তি আছে। তার দ্বারা দেখলে। তার মূলে দর্শনের একটা কামনা, লিপ্সা, হার্দ্দি তৃষা আছে না? একটা শ্রবণের লিপ্সা তা করে রয়েছে শ্রবণের তলায়, তবেই শ্রবণ করছি। এই রকম দর্শন স্পর্শন সবের বেলায়। হৃদয় যদি কামময় হয়, তা হলে তুমি হৃদয়ময় হয়ে আছ না? তা হলে এই যে তুমি বসে আছ, এ শুধু শক্তিময় নয়; এর তলায় একজন কামময় তুমি বসে আছ। কামনার অনুসারে যে সব শক্তি বেরোচ্ছে, সেই মানুষ তুমি? এই তুমি ভগবান্‌কে দেখতে চাইলে কি দেখবে? যিনি এই কামময়কে জাগিয়ে তুলছেন, তাঁকেই দেখবে না?

জীবভাবে বসে আছ। হাজার কিছু বললেও সে ভাব যায় না, যাতে তুমি ডুবে আছ। এখন দেখলে, কামময়, তৃষাময় আসল মূর্ত্তি তোমার। এখন ভগবান্‌কে দেখলে কি দেখবে? আমার দেবতা কামময়, এই দেখবে না? এই কামময় মূর্ত্তি যে দেখে, সেই পুরুষ হয়ে যায় আপ্তকাম। যেমন এখানে জড়ের উপাসক হয়ে ভগবান্‌কে জড়রূপে চারি দিকে পেয়ে গেছ অন্তর্বাহ্যে, তেমনি কামময় ভগবানে গেলে তাঁকে পাবে সর্ব্বকামময়রূপে,

আশে পাশে আর কিছু থাকবে না। এই আলোচনায় হৃদয় বলে জিনিষের কিছু আস্বাদ পেলে ?

তা হলে এই যে জগৎকে এত ভালবেসে স্ত্রী পুত্রে, ধনে মগ্ন হচ্ছি, এ ত হৃদয়ের একটা গতি ; একে মেরে না ফেলে সমভূমিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা ভাল না ? এই সমভূমিতে নেওয়া আর ত্যাগ করাতে কত তফাৎ ? কামময়তাকে সমভূমিতে নেওয়া মানে, উর্দ্ধমুখী (sublimate) করা। ত্যাগের পথ দিয়ে হৃদয় শুকিয়ে যায়। সমতায় হৃদয় রচিত হয়। আত্মত্বে নিয়ে যাওয়া আর আত্মত্বের বহির্ভূত করায় কত তফাৎ ? একটা, হৃদয়ের ঘরে সব জিনিষ ফুটিয়ে ফুটিয়ে আত্মত্বে পোরা, আর একটা, আত্মত্ব থেকে সব বের করে দিয়ে আত্মত্বকে রিক্ত করা। ত্যাগের দ্বারা লাভ হয় প্রত্যগাত্মা, হৃদয় দিয়ে লাভ হয় পরমাত্মা। হৃদয়ের ঘরে সবকে একীভূত করেন পরমাত্মা ; যিনি সব জিনিষ প্রকাশ ও ধারণ করেন। তাই মনে থাকেন অসঙ্গ আত্মা, হৃদয়ে থাকেন পরমাত্মা। তোমরা যে আত্মবিভূতিতে যেতে চাচ্ছ, সে এই পরমাত্মাই ত ? এঁকে হৃদয়ে দর্শন ভিন্ন পাওয়া যাবে ? আর হৃদয়ের সব চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত পেতে হলে মায়ের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। শুধু সন্তান তৈরী করতে মায়ের যে মাতৃত্ব দেখতে পাও, সমগ্র সৃষ্টিতেই সেই মাতৃত্ব। সুতরাং জগতের গোড়ায় সেই হৃদয় দেখ। আর ছেলে মানুষ করতে মায়ের যে হৃদয় দেখ, জগৎ তৈরির মূলেও তেমনি ভাবে মায়ের হৃদয় দেখতে হবে। কেন না, জগৎ মানে সন্তান। এমন একজন

ছেলেও কি আছে, মায়ের বুক দিয়ে যার জন্ম হয়নি? আমরা যদি তার বুক ছাড়া না হয়ে থাকি, তবে মাটি কাঠ জলও তার বুক ছাড়া জন্মায়নি। তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ঐ মাতৃত্বের হৃদয় দিয়ে সৃষ্ট। জ্ঞানমূর্ত্তির মাকে দেখলি? মূর্ত্তি মানে, জ্ঞানের আয়তন। 'মা' এই শব্দটি একটি আয়তন। অনুভবের নাম যদি হয় দেখা, তা হলে দেখতে পাচ্ছিস? ভগবতী তফাতে তফাতে ঠেকছে, না গায়ের সব জায়গায়? আত্মত্ব বলতে পরতে পরতে মধু, সজাগ, জাগ্রত রক্ষাকর্ত্ত্রী, ত্রাতা মা, এইরকম একটা ভাব এসে গেল? একেবারে বুক দেখতে পাচ্ছিস? বুকের স্পর্শ পাচ্ছিস? সে অনুভব হচ্ছে কোন্‌খানে দেখা। হৃদয়ে যখন হৃদয় মিলে, তখন কি এ হৃদয় ও হৃদয় আর থাকে? তাকে ছোঁয়া, আর এ হৃদয়কে ছোঁয়া এক কথা হয়ে গেল না?

৯ই মে, ১৯৩৭, রবিবার।

ও ঘরে যাবার যোগ্যতা তারই হবে, যার জগৎতত্ত্ব শুনতে গেলেই বা গুরুর সামনে এলেই মনে পড়ে যাবে, আমি জ্ঞানময়, বিশ্ব জ্ঞানময়, ভগবান্ জ্ঞানময়। এইটি যার দুরস্ত হয়ে যাবে, সে-ই ও ঘরে যাবার যোগ্য হবে। তত্ত্ব বুঝতে পারছিস? ভূত, পাথরের মত যে শক্ত, সে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে. জ্ঞান হয়ে গলে যাচ্ছে। এখনও ঠিক বুঝতে পারছিসনে এই জন্য যে, এই পরম দেবীতত্ত্বে এখনও আস্থা আসেনি; জ্ঞান বলতে কি বোঝায়,

এখনও গ্রহণ করতে পারিসনি। দিন তিন চার ধরে যে হৃদয়ের কথা বলছি, এ না বললে কোন ক্ষতি ছিল? হৃন্ময় না হলে হিরণ্ময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। এত দিন শুনে শুনে হৃদয় জিনিষটার সম্বন্ধে একটা অনুভূতি জাগছে? একটা খোঁটাতে যদি একটা পচা মড়া পুতে রেখে দেওয়া যায়, সে পচে পচে ধুয়ে যেতে লাগল বা জানোয়ারে খেতে লাগল; তার শেষ খণ্ডটি পর্যান্ত খোঁটা ধরে আছে; সব বেরিয়ে গেছে, তবু একটু ধরে আছে। তোমাদের ভূত ধরার সংস্কারটা তেমনি কিছুতে যাচ্ছে না। একেবারে খোঁটার মত ধরে আছে। এইটুকু, এই সংস্কারটা বড় শক্ত জিনিষ।

সবই গুরু, এখন এই দর্শন করছিস? আকাশমূর্ত্তি গুরু? যেমন ভূতেতে খোঁটা-ধরা হয়ে বসে আছিস, এই যে জ্ঞানমূর্ত্তিতে গেলি, কথার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিস এক লোক থেকে আর এক লোকে, এখানে কোন খোঁটা আছে? আছে—নিজবোধ। এই নিজবোধ কিসের দ্বারা বেষ্টিত? শক্তিপ্রবাহ প্রথম ফুটে উঠছে কিসের আকারে? হৃদয়, কাম। এই হৃদয়ে আর নিজবোধে তফাৎ কি? এই হার্দ্দি উল্লাস, হৃল্লেখা; আর তারই গর্ভে যে নিজত্ব, এর ভিতরে পার্থক্য কোথায়? হৃদয়টি ফুটে উঠেছে এবং যাতে ফুটে উঠেছে, যিনি হৃদয়ময় হয়েছেন, এতে পার্থক্য আছে? হৃদয়ের ভিতরে আত্মত্ব জাত, না আত্মত্ব থেকে হৃদয় জাত? শেষটার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মত্ব। প্রথমটা জীবত্ব।

তা হলে তিনি হৃদয়-মূর্ত্তি ধরে আপনাকে জাত করছেন

বহু মূর্ত্তিতে ? এই হল বিশ্বের ছবি। এই তোর বুকে তিনি হৃদয়মূর্ত্তি ধরে আপনাকে বহু করছেন, কখন সুখী তুমি, কখন দুঃখী তুমি জাত হচ্ছ। এগুলো কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ? বিপরিলোপ হচ্ছে না এ অনন্ত মূর্ত্তির। যেমন কিছু স্ত্রী, কিছু পুত্র, কিছু বিষয়ে খানিকটা হৃদয় লেগে আছে দেখতে পাই। তা হলে এই অন্তভূমিতে 'স্ত্রীর আমি', 'টাকার আমি' এই রকম ভাবে রয়েছিস। এই সমস্ত 'তুই'গুলো ঐ হৃদয় দিয়ে তৈরী হয়েছে ? সবগুলো ? দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি সব কিছু হৃদয় দিয়ে তৈরী হয়েছে ? তা হলে বহু খণ্ডে খণ্ডিত তুই পড়ে রয়েছিস এর ভিতর দেখলি, যাকে একসা মনে করেছিলি।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের এই যে ত্রিধা খণ্ড, মোটামুটি এও দেখতে পাচ্ছিস। এই ত্রিধা খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে পড়ে রয়েছিস। এই ভিতরেই দেখা যাচ্ছে ? ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিসনে, অতীতও অনুমান করছিস। এই যে এত খণ্ডিত আত্মা, এ সব ঐ হৃদয়েই সমাচ্ছন্ন। ঐ হৃদয়কে নিয়েই এক এক টুকরো হয়েছে, অন্য কোন জিনিষ নিয়ে নয়। এই যে হৃন্ময় প্রকাশ, এ পরিচালিত হচ্ছে কার দ্বারা ? পরিচালিত, পরিচিত, সুতরাং ভোগ হচ্ছে কিসের দ্বারা ? চিতের দ্বারা। চিৎ প্রকাশ করছেন, হৃৎ খেলা করছেন। এটা বিভাগ করে বলতে গেলে এই রকম ভাষা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু চিৎ যেমন প্রকাশ হলেন, তাঁর নাম হল হৃৎ। তা হলে যুগপৎ সৎ চিৎ আনন্দ নয় ? যেমন কথা কইতে, কাজ করতে আমার একটা ব্যবহারে

কিছু ফুটে উঠ্‌লে আমার প্রকৃত অন্তরের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি আমার হৃৎএর প্রকাশ দেখেই চিৎকে চিনতে পারি, তার পরিচয় পাই। হৃৎ বলতে একটি মাত্র ব্যবহার নয়, যত কিছু ব্যবহার হতে পারে, হৃদয়ই তার যথার্থ পরিচয়স্থান। হৃদয় ছাড়ালেই সে হয়ে গেল অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত। এই হৃদয়েই যত কিছু শক্তি প্রকাশ হয়ে আছে। তা হলে আত্মত্বের দর্শন কিরূপ হবে, হৃন্ময়? মাটির ভিতর, জলের ভিতর কি দর্শন হবে, হৃন্ময়? যেখানেই আত্মত্ব স্থাপন করতে যাব—চন্দ্রে, সূর্য্যে, আকাশে, পাতালে, সেখানেই তার হৃন্ময় পরিচয় অর্থাৎ আমার হৃন্ময় চেতনা চন্দ্র, সূর্য্য রূপ ধরেছে। গুরুর কাছেও হৃন্ময় হয়ে যাব? কোন একটা চেতন তত্ত্ব লাভ করতে গেলেই হৃন্ময় না হলে হবে না।

তার বাইরে শক্তি ইত্যাদি থাকবে, তা হলেও সে শক্তি হৃৎশক্তি, সে ব্যবহার হৃদ্‌ব্যবহার, এটা ঠিক? এখন তোরা এই যে জ্ঞানতত্ত্বকে, জ্ঞানদেবতাকে দর্শন করছিস, এটা হৃদয়ময় দর্শন বলে অনুভব করছিস? ঐ যে আত্মত্ব, তাকে তোমরা হৃদয় দিয়ে বেষ্টিত দেখতে পারবে যে মুহূর্ত্তে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার জানা হয়ে যাবে যে, এই হৃৎ আর ঐ চিৎ, এই দুইই তাঁর উভয়বিধ প্রকাশ। তাঁর সামঞ্জস্য নিয়ে ফুটে ওঠার নাম ঋতপ্রকাশ, সত্যপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশ হৃৎ-জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে যখন প্রকাশ হল, তার নাম হল ঋতপ্রকাশ বা সত্যপ্রকাশ। যেমন আকাশ একটা শূন্য বলে মনে হয়, অথচ

আমরা বিজ্ঞানে শিখেছি যে, যত জড় জগৎ জাত হচ্ছে, সমস্তেরই মূল কারণ আকাশ। ব্যোম হল ওঙ্কারের স্থূল প্রকাশের আরম্ভ। অথচ তা দেখায় যেন মহাশূন্য। একে মহাশক্তিগর্ভ বলে ধরতে পারছিনে, অথচ বিজ্ঞানে জানছি। তেমনি গগনসদৃশ জ্ঞানমূর্ত্তি যখন পেলাম (এই জ্ঞানগগনই 'হ'), এও তেমনি শক্তিগর্ভ, এই আকাশ থেকে যখন ঐ আকাশ জেগেছে। ঐ আকাশ যেমন শক্তিগর্ভ, জ্ঞানাকাশও, জ্ঞানগগনও তাই শক্তিগর্ভ।

সমস্ত বৈপরীত্য যেখানে এসে সমতা প্রাপ্ত হয়, একত্ব প্রাপ্ত হয়, তার নাম হৃদয়। আমি একজনকে আদর করতে যাচ্ছি বা মারতে যাচ্ছি, এ দুটোই শক্তিপ্রকাশ হিসেবে একই; একটা motion, একটা গতি; কিন্তু আসল পার্থক্য ওইখানে, কি ভাব নিয়ে যাচ্ছি। আমি এই হৃদয় নিয়ে ভগবান্‌কে পাবার জন্যও শক্তিপ্রয়োগ করতে পারি, তাঁকে বহিষ্কার করার জন্যও শক্তি-প্রয়োগ করতে পারি। এই হৃদয় নিয়েই বহু হবার জন্য জগতে বন্ধন রচনা করতে পারি। এ সমস্ত জিনিষ, বন্ধন ও মুক্তি, ভগবত্ত্ব ও জীবত্ব, এই ভূমিতে, এই হৃদয়েই পেতে পারি, যদি এই ভূমি ঠিক আয়ত্ত হয়। তা হলে যখন তত্ত্ব পরিচালনা করতে যাব, তখন এই হার্দ্দ ভূমি, এই জিনিষকে নিয়ে আলোড়ন করতে যাব না? শুধু জ্ঞান নিয়ে, বুদ্ধি (intellect) নিয়ে যাব না, হৃদয় নিয়ে যাব। জানা আর না জানা নিয়ে যত গোলমাল। হৃদয় নিয়ে যাচ্ছিই; কিন্তু জানলে, জেনে গেলে যাওয়া হল, না হলে

নয়। আত্মা ও হৃদয় দিয়েই ফুলটি দেখছি, কিন্তু তা গ্রাস্তে আসছে না। মনে হচ্ছে, ফুল দেখছি। এ ভৌতিক বদ্ধতা। আত্মিক বদ্ধতায় দেখব, এত আলোড়ন, এত কাণ্ড করলেও ঠিক আত্মত্বেই বসে আছি। যেমন অনির্ব্বচনীয়, তেমনি রয়ে গেল। এখানে যেমন ভূতক্রিয়াই প্রধান রয়ে গেল, চেতনক্রিয়া অনুভূত হল না, তেমনি আত্মতত্ত্বে হৃদয়ের এত বড় নিত্য খেলা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ যে আত্মত্ব, তাই রইল। সাক্ষাৎ হৃদয়, সাক্ষাৎ আত্মত্ব দিয়ে গড়লাম খালি প্রাণ, মন, শরীর ; আত্মদানময় ক্রিয়া করেও যেমন পূর্ণ ঢলঢল, তেমনি রয়ে গেলাম। এই হল ভগবৎতত্ত্বের অপরূপ মহিমা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজে পাগল না হয়ে পাগল করেছিলেন একটাকে নয়, দশ হাজারকে। তাঁকে hypocrite বলা যেতে পারে না। বাইরে লীলা করি, মুগ্ধতায় নয় বললে এ কথাটা যেন ভুল হয়। সত্যই পূর্ণ হৃদয়ের খেলা, অথচ পূর্ণ অসঙ্গতা। তা হলে সেই যে পূর্ণ ঢলঢল, সে কত পবিত্র : যথার্থ আত্মদানের খেলা প্রকাশ করেও সে ঠিক শান্ত হয়ে রয়েছে। জগতে আত্মদানের খেলায় দেখতে পাই রিক্ত হয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া। সত্য কি সেটা রিক্ততা, না পূর্ণতা ?

হনুমান্ অনেক খেটেছিলেন বলে সীতা তাঁর গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিলেন। হনুমান্ তা দাঁতে করে কেটে ফেললেন। লক্ষ্মণ চটে গিয়ে বললেন, "জানোয়ারকে মুক্তার মালা দিলে। তার কি বুদ্ধি!" হনুমান্ বললেন, "আমার কাছে ওর কোন মূল্য নেই। আমার বুকে রামনামের মালা আছে।" এই বলে বুক চিরে

দেখালেন। তিনি রামকে আত্মদান করে রিক্ত হয়েছেন কি? না পূর্ণ হয়েছেন। আমি কাউকে ভাল বাসলে পূর্ণমাত্রায় তাকে নিয়ে নিয়েছি। ভগবান্ যখন হৃদয় নিয়ে খেলা করেন, এমনি রিক্ত হয়ে খেলা করেন। তাতে তিনি সত্য রিক্ত হন কি, না পূর্ণ হন? সেই বস্তু নিয়ে পরিপূরিত হচ্ছেন আপনাতে। এই দুটো ব্যবহার হৃদয়ে দেখতে পাই। বিষয়ে ঢুকে পড়লে একদিকে বিষয়ে ডুবি, একদিকে তাকে সমগ্রভাবে পাই। তেমনি সমগ্র বিশ্বে যে ডুবেছে, সে একদিকে তাতে ডুবেছে, একদিকে তাকে পেয়ে পূর্ণ হয়েছে।

আমি ফুল দেখলুম। আমার জ্ঞানের, হৃদয়ের, আত্মত্বের খানিকটা খানিকটা তাতে দিলাম। তাতে আমি ফুলময় হলাম। দিতে গেলাম ফুলে, হলাম ফুলময়। বিলোতে গেলাম স্ত্রী পুত্রেতে, হয়ে গেলাম স্ত্রী-পুত্রময়। যত দিতে যাচ্ছি, তত পেয়ে যাচ্ছি। বিদ্যা-ধন নিতে পারে কেহ নাহি কেড়ে। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥ দানেন বর্দ্ধতে নিত্যং বিদ্যারত্নং মহাধনং।

তা হলে হৃদয়ের যে দান ও আহরণ, এ কি সাংঘাতিক! এই শক্তিটি পরিদৃশ্যমান হয়ে যাবে হৃদয়ের চর্চ্চার দ্বারা। ভগবান্ আমাদের দ্বারা আহৃত হবেন, ভগবানে আমরা আহৃত হব হৃদয়-শক্তি দ্বারা। হৃদয় জিনিষটার ধারণা এখন একটু একটু ফুটে আসছে? সহস্রারে চিৎপ্রকাশ হল। হৃদয়ে ভোগ হল। এই চিৎই এক জায়গায় দানশীল, এক জায়গায় আহরণশীল। বিশুদ্ধ চিৎও ভোগ। চেতনতত্ত্বের আহরণের নামই ভোগ।

যেটা পূর্ণমাত্রায় আহরণ হল, সেটাই ভোগ হল। যে জিনিষ যত জোরে আহৃত হয়, তত জোরে ভোগ হয়। অল্প ভোগ, মনে দর্শন। তাব চেয়ে ভোগ, হৃদয়ে দর্শন। তার চেয়ে বেশী আত্মায় দর্শন।

প্রত্যেক ব্যাপারেই হৃৎক্রিয়া আছে। সমাজ দেখি, কি পরিবার দেখি, কি গাছ দেখি, সব ব্যবহারেই হৃৎক্রিয়া আছে। কিসের দান আহরণ? চেতনার? কি সাংঘাতিক! বাইরে এক ঘটি জলেব প্রয়োজন, পয়সা দিয়ে নিচ্ছি; এ সবও চেতনার দান, আহরণ? তোরা এসেছিস ছুটোছুটি করে, আমি এসেছি ছুটোছুটি কবে, এ সব চেতনার দান, আহরণ? তা হলে ভূত একেবারে অগ্রাহ্য? শুধু চেতনাব দান ও গ্রহণ? এই হল বিশ্বলীলার একমাত্র ব্যাপার? এই আনন্দময়, চিন্ময় পুরুষকে এখন দেখতে পাচ্ছিস, এই যিনি দান করছেন ও আহরণ করছেন? এঁরই নাম ভগবান্? আমি বলে দিয়েছি, আত্মত্ব বা চেতন স্পর্শ করলেই সমস্ত জিনষ হয়ে যায় জীবিত; আর তা ছাড়লেই হয়ে যায় মৃত। তা হলে জগতের ধূলির কুচি থেকে ভগবৎ সংস্কার বা শব্দ পর্যন্ত জ্ঞানমূর্ত্তিতে হৃদয়ভূমিতে অবস্থান করছে? আর কিছু নেই? তুমি চাচ্ছ ওঁকে, পূর্ণমাত্রায় পেতে চাচ্ছ, জাগ্রত করতে চাচ্ছ। কোথায় গেলে তা হবে? মৃত জ্ঞানমূর্ত্তিকে যদি বাঁচাতে চাস, কোথায় প্রবেশ করবি বল্ ত? কাতে ঠেকবি? চেতনায়? এ শুধু ঠেকানোর

কৌশল? ঠেকে তো আছেই, শুধু সেইটা দেখা। এইটি দেখতে পেলেই ঐ ধূলাটা জ্যান্ত হয়ে উঠবে। এই ফুলটা এখানে পড়ে আছে। ঠেকে আছে বুকে? ভোগ বোধ করছিস? আমি তোর হৃদয়ে ঠেকে আছি? ইস্! ওঃ! নমঃ!

হৃৎ আর চিৎ, এই হল আমাদের খেলবার ঘর। যা কিছু করতে হবে, এই হৃৎ আর চিৎ। হৃদয় থেকে 'ঋ' আর চিৎ থেকে 'ত' নিয়ে ঋত প্রকাশ করব। পারবি? মাটিতে বসে থাকলে, ভূতে বসে থাকলে পারবি? এই ঘরে ঢুকলে তবে ত পারবি।

এখন তুই আছিস? দুনিয়া ভেঙ্গে গেলেও আছিস? দুনিয়া ভেঙ্গে গেলেও যদি চিৎ 'আমি' থাকি আর হৃৎ 'আমি' থাকি, আনন্দময়তাই যদি হয় আমার বপু, আর আমার নিজের থাকাটাই তার আত্মা, তবে আর কি চাই? .গলেই বা আর সব। 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে', এই হৃৎকোষই হিরণ্ময় কোষ। এখন পূজা করতে যদি যাস এই হিরণ্ময় পুরে, এই পুরুষকে পূজা করতে পারবি? এই যে পুর বলে বিবেচনা হল, যেখানে আগে বসে ছিলি, এ কি তার চেয়ে অন্তর্নিহিত বলে বোধ হল? এখানে কি হাত বাড়িয়ে ভগবতীকে ধরতে হয়? না, ভগবতী বললেই স্পর্শ পাস? বাড়াতে হয় না কিছু? তা হলে যে জ্ঞানগগন দেখছিলি, সে কি জ্ঞানগগন, না হৃদ্গগন? হৃদ্গগন। এর নাম হার্দ্দাকাশ। হার্দ্দাকাশ চিদাকাশ একই কথা। তুই

এতেই আছিস? এইখানেই ফুটে আছিস? একদম? আর কোথাও নেই? দেখ্ দেখ্; দেখে বল। হৃদয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিস? হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি। উদয়াস্তবিহীনশ্চ কথং সংধ্যামুপাস্মহে॥ এখন কি মনে হচ্ছে? ঠাকুর-ঘরে এসেছিস? হৃদয় মানে ত মর্ম্মস্থল? এখানে একগাছা চুল যদি পড়ে, অনুভূত না হয়ে যাবে? একটা ধূলোর কুচি, বাতাসের কুচি অনুভূত না হয়ে যাবে? আহা হা! গোঁজা-মিল দিসনে। না পেলে বলবি। এই ভূমি পরিষ্কার করে পেলেই এখানে ভগবান্ এসে দাঁড়াবেন।

রূপে রসে, গন্ধে শব্দে যে রস আছে, সে সমস্ত রস এই-খানেই, এ বোধ পাওয়ার জন্যই হৃদয়ে বসার এত মূল্য। একটা শব্দ শুনলে পাগল হয়ে তার পেছনে ছুটতাম না, আমাতেই রইতাম, যদি এই হৃদয়ে তার স্থিতি দেখতাম; যদি জানতাম, এই সবই হৃদয়ের রস। বুঝছিস কথা? 'রসো বৈ সঃ'। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই যে সব আয়তন, এ সব পূর্ণ কিসে? রসে। সেই জন্য এরা প্রত্যেকেই পাগল করতে পারে, প্রত্যেকের ভিতর রস আছে। তার পর দেখছি, ও সব বাইরে নয়, ভিতরে। যদি দেখতিস্, এরা বাইরে নয়—এইখানে, তা হলে পাগল হতিস? ভোগের তারতম্য কিছু হবে? ওটায় মুহ্যমানতা (**hypnotic**), এটা প্রাপ্তি (**realisation**)।

খেতে পরতে পাই না পাই; ফুল চাই। যদি বুঝি, ওর রস বাইরে নয়—ভিতরে, আত্মস্থে, তা হলে ওর ভিতর যত রস

আছে, সব আমাতেই উৎসাবিত আছে; তাকে তখন ভোগ করতুম মুক্তজ্ঞানে; বাইরে আছে বলে দেখ্‌লে বদ্ধজ্ঞানে। ফুল যদি বলে, 'আমি যাব,' তুই বলবি, 'তোমার ক্ষমতা থাকে যাও।' তেমনি দেবী যদি বলে 'যাব,' তুই বল, 'ক্ষমতা থাকে যাও।' দেখছিস্ সব, যাবার উপায় নেই। 'মন্ত্রেণ সম্বদ্ধা দেবী মন্ত্রেণৈব প্রপূজিতা।' এইখানে বাস, যাবে কোথায়! আমিই হয়েছি সেই রস: 'রসো বৈ সঃ, রসোঽহম্'। যাবার উপায় আছে? রস পাচ্ছিস্? তৃপ্তিপ্রদ হচ্ছে? অং কং খংএর চেয়ে এইগুলো ভাল লাগছে? অং কংএর বাজীটা শেখাব, না এই শিখবি?

৯ই মে, ১৯১০, সন্ধ্যা।

এ ভূমি কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে ভোগে তারাই ডুবে থাকে, যাদের সংযম নেই। সুতরাং সংযম করে কর্ম্ম করা দরকার। তাই 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' একই কাজ অধিকারী হিসাবে খারাপ এবং ভাল, এই দুই মূর্ত্তি নেয়। আবার যখন ঊর্দ্ধ ক্ষেত্রে দৃষ্টি থাকে, তখন কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য থাকে না। এই জন্য জগৎটা বড় মুস্কিলের জায়গা। তবে একটা পরিত্রাণ এই আছে যে, যে যত ভগবান্‌কে আশ্রয় করতে পারে, সে তত এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। তিনি যেমন ভাবে চালনা করলেন, তেমনি করলুম ভেবে শান্তিও পায়; সেই জন্য ভগবদ্‌যুক্ত হয়ে কাজ

করা আর যুক্ত না হয়ে কাজ করার অনেক তফাৎ হয়। আবার বাইরে থেকে যা কর্ত্তব্য বলে করবে, অন্তর্দৃষ্টি ফুটলে, ভবিষ্যৎ বা অতীত দেখলে তা করবে না। যেমন একজন চোরের বিষয় সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ হল যে, সে চুরি করেছে; তখন তাকে শাস্তি দিলাম। তার পরে অন্য প্রমাণে দেখলাম, সে চুরি করেনি। তখন অপদস্থ হলাম, লজ্জা ও অনুতাপ হতে লাগল। কিন্তু শাস্তি দেবার সময় যদি একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ থাকত, সে বলত, 'কি করছ তোমরা?' সেই জন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলে, বিজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চলবে। নিজের বুদ্ধি যতই ভাল হোক, বিজ্ঞের কথা কখন লঙ্ঘন করবে না।

অশৌচ বা শোক দুই রকমে তিনি দূর করেন। এক, ভগবৎ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়ে। এক, কালমূর্ত্তিতে—ধীরে ধীরে চলে যায়। ভগবতী যখন হৃদয়ে বিচ্ছেদমূর্ত্তিতে বেরোন, তার প্রকাশই হল কান্না। হৃল্লেখা আমার বুকে কান্নার মূর্ত্তিতে ফুটলেন। একটা বিচ্ছেদের মূর্ত্তি, যার পোষাক হল কান্না, সেই মূর্ত্তিতে তিনি বেরোলেন, সুতরাং আমায় কাঁদতেই হল। আবার যখন চিনে নেব যে, ঐ মূর্ত্তিতে কে বেরোল, তখন আর কান্না থাকবে না, তখন স্বস্থ হয়ে যাব।

১৩ই মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

কত ঘটনা ঘটছে, কত চিন্তা হচ্ছে, যার উপরে আমার কোন আধিপত্য নেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমি একটা নীচের স্তরে রয়েছি; আমার উপরের স্তরে আর একজন আছেন। যেমন গোমুখী দিয়ে জল বেরোচ্ছে, কিন্তু আসছে জল গঙ্গোত্রী থেকে। গোমুখী যদি বলে, আমিই জল বের করছি, কত ভুল হবে। তেমনি আমরা যদি বলি, আমিই সব করছি, তবে সে কথা কত ভুল। সব হচ্ছে সেই উপর থেকে। সুতরাং 'সাধনা করব, সাধনা করব' ভাবাও ভুল। তুমি যা করাচ্ছ, তাই হচ্ছে, এ কথা বলাই ঠিক।

কে তুমি! কত মূর্ত্তিতে আসছ! কে তুমি! কত বিলাস তোমার! এখন আমাতে আর আত্মাতে তফাৎ বুঝতে পারলে? আছি মানে—অস্মি, বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব। আত্মা নেই, এ কখন হতে পারে? আত্ম এবং থাকা, দুই-ই চিরন্তন আছে? ভগবানের থাকাটা কখনও উড়ে গেছে? অস্মিজ্ঞান তাঁতে থাক আর না থাক, 'থাকা' বলে বোধক্রিয়া করুন বা না করুন, চিন্ময় থাকাটা আছে ত? সত্তা আছে? হারান্‌নি? বোধ করুন আর না করুন। আর যেখানে 'আছি' বলছেন, সেখানে 'আছি'টি আছে, তিনি নেই, এ কি হয়? না। দুই-ই আছে। যৌগপদ্য দুই স্থলেই আছে। জ্ঞানও আছে, থাকাও আছে। তাঁতেই আছে? সুতরাং সেখানে যুগপৎ জ্ঞান

ও থাকা আছে। যখন বেরোল 'আছি' বলে, তখন থাকাকেই জ্ঞাপন করলে ত? এক জায়গায় 'আছি' কথাটা ফোটেনি, এক জায়গায় ফুটেছে। এই জন্যে যৌগপদ্য দুই স্থলেই রয়েছে।

এই জড়ের বিস্তার যেমন দেখতে পাচ্ছিস স্বতঃসিদ্ধভাবে, ভাবনা চিন্তা করতে হয় না, এই রকম স্বতঃসিদ্ধভাবে জ্ঞানবিস্তার দেখতে পাচ্ছিস? এই দেখার নামই সাধনা। কি ভাবছিস কপাল কুঁচকে? ঐ ত সে! ভাবটা যার ধর্ম্ম, তাকে তুই কোন্ আক্কেলে ভাবছিস? এক অদ্ভুত রাস্তা এনে ধরেছি তোদের সামনে। কিছু করতে হবে না, ধ্যান ধারণা, নাচা কাদা কিছু না, খালি বসে থাক আমার কাছে। জয় দেবতা! মুখ কোঁচকাচ্ছিস কেন? মুখে ব্রহ্মবিভাস কই? আনন্দময়ী কোথায়? দেবি! জয় বিশ্বেশ্বরি! আনন্দময়ি! হর হর হর!

গঙ্গার প্রবাহ কি যে সে ধরতে পারে, মহাদেব হয়ে জটা না পাতলে? আমি যে পড়ব, সে বেগ ধরবে কে? শিবস্বরূপ আত্মবোধ সহস্রারে প্রকাশ হলে তবেই এই বেগ ধরতে পারবে। এ বেগের ভিতর কত চাঁই ভেসে ভেসে আসছে, আবার কত পদ্মও ভেসে আসছে। কে সামলাবে? যাতে হাড় পাঁজরা গুঁড়িয়ে যায়? ছেলেটার অসুখ, মকদ্দমায় হেরে গেলি, দশ লক্ষ টাকা বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ না শিবত্বের আভাস পাবি, এ সবকে দেবী বলে বরণ করতে পারবি?

এখন যা শুনছিস, 'উপলব্ধিতে আর শ্রুত জ্ঞানে খাপ খেয়ে আসছে? এখন জ্ঞানরাজ্যের সান্নিধ্য বোধ হচ্ছে? দূরে নয়, তোতেই। জ্ঞানরাজ্যে ঢুকছিস? যাত্রা শুনতে গেছিস, ঢুকতে পারছিসনে ভিড়ে। একটু আধটু তলোয়ারখানা উঁচুতে দেখতে পাচ্ছিস, একটু আধটু কথাও শুনতে পাচ্ছিস।

১৫ই মে, ১০৩৭, সন্ধ্যা।

রমা নাড়ী—পুণ্যেন পুণ্যং নয়তীতি রমা। অরমা নাড়ী—পাপেন পাপং নয়তীতি অরমা। ইচ্ছা নাড়ী—যৎ কাময়তে তৎ আপ্নোতি। অপুনর্ভবা—ন পুনরাবর্ত্ততে ইতি অপুনর্ভবা। প্রত্যেক রথের তলায় অপুনর্ভবা আছে। কিন্তু টেঁকে না, সরে যায় সব হার্দ্দ বৃত্তি থেকে, যদি তার তলে তলে সেই অপরিণামী, অসঙ্গ আত্মত্বকে না দেখা যায়। তোমাকে পেয়েছে অনন্ত আর্ত্তনাদের রাস্তায়। মন ও ইন্দ্রিয়ের ছুটোছুটি, তন্মুখী প্রচেষ্টা, সকলেই তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছে মাপকাঠি নিয়ে। কিন্তু হৃদয় বলে বরণ যেখানে, সেখানেই মাপকাঠিটা চলে যায়। তুমি কত বড়, কিছু জানিনে; আমাকে তোমার করে নাও; তুমি ঈশ্বরী, তুমি সব করতে পার। এই অপুনর্ভবা নাড়ী হৃদয়ের শেষ (ultimate)। হৃদয়ের একটা কেন্দ্রে গিয়ে পড়লে আর ফিরতে পারি না এদিকে চেষ্টা করেও। সেখান থেকে যথার্থ নাম হল অপুনর্ভবা গতি, ব্রহ্মপুরে গতি, আর ফিরবে না।

১৬ই মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

বিশ্বনাথ বলতে আগে বিশ্বনাথে চলে গেছ, তবে বিশ্বনাথ বলেছ। ভগবতী বলতে আগে ভগবতীলোকে চলে গেছ, তবে ভগবতী বলেছ। আগে যাওয়া, তবে বলা। আমরা বাক্, প্রাণ, মন দিয়ে জড়াচ্ছি জড়কে। সেই বাক্, প্রাণ, মনের পুঁটলি বেঁধে, পুঁটলিটা ছুঁড় ভগবতীতে। যে ভগবতী নিজেই বাক্, প্রাণ, মন, সেই বাক্, প্রাণ, মন দিয়ে বাক্, প্রাণ, মনকে জড়া, আঠা দিয়ে আঠা জড়ানোর মত। জ্ঞানে লোক থেকে লোকান্তরে যাওয়া এইরকম করে হয়। বাক্, প্রাণ, মন, এই তিন রকম জ্ঞান একত্র করে লোক থেকে লোকান্তরে চল। আত্মা আগে যান, পরে দেবতারা যান। এই যে জ্ঞান, আত্মা— আমার, তোমার, এর, ওর বুকে, যেমন একটি বীচির ভিতর সমগ্র বৃক্ষটি নিহিত থাকে, তেমনি এই জ্ঞানের বুকে সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি লয়ের, যুগযুগান্তের ঘটনা নিহিত আছে।

২০এ মে, ১৯৩৭, রবিবার।

মুখে অশুচি ভাব প্রকাশ থাকে ত ঋষিরা তার সঙ্গে কথা কন না জানিস? রাজর্ষি ভরত রাজ্য ছেড়ে ঋষির আশ্রমে বাস করতেন। অন্য ঋষিরাও সেখানে আসতেন। ঋষিরা তাঁকে দেখে ভারি খুশী। জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে?" পরিচয় পেয়ে ঋষিরা বিশেষ আনন্দিত হলেন। পরের বছর ঋষিরা আবার

এসে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজর্ষি কোথায় ?" ঋষি বললেন, "তিনি আশ্রম করে পাশেই আছেন।" সেখানে গিয়ে ঋষিরা তাঁর মুখ দেখে বললেন, "আপনার কি হয়েছে ?" "কিছু না।" "তবু ?" "একটা হরিণ শিশু পুষেছিলাম, সে কোথায় পালিয়ে গেছে; তাই মন চঞ্চল আছে।" ঋষিরা বললেন, "তোমার মুখে আর ব্রহ্মজ্যোতি দেখছিনে ; আমরা চল্লুম।" এমন আদর্শ! সবাই যে এতটা পারবে, তা নয়। তা হলেও তারি ভিতর এতটুকুও ব্রহ্মাবিভাস নেই মুখে, ব্রহ্মলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা এতটুকুও নেই, এ হলে ত চলবে না।

তোর কাল কি হবে জানিসনে, পরমুহূর্ত্তে কি হবে জানিসনে। একটা ঘরে সব্ সর্ করে জল পড়ছে, সাপ ঢুকে ফোঁস ফোঁস করছে, দেয়াল টল্মল্ করছে, চাপা পড়তে পারিস ; এ সময় বাইরে কিছু আশ্রয় আছে কি না আছে আগে ভাব্‌বি, না বেরিয়ে পড়াটাই আগে ভাব্‌বি ? নোঙর তোল। বল, "আমি এই ভূমিতে আর থাকতে চাইনে। যদি কোন উন্নত ভূমি থাকে এর চেয়ে, গুরো! আপনি আমায় নিয়ে চলুন।" অহরহ মৃত্যুর দংশন, শোকের আর্ত্তনাদ, সব সহ্য করতে পারতুম। কিন্তু এই যে 'একান্ত জৈবী সংকীর্ণতা চার দিক্ থেকে এনে দিয়েছ আমাকে, দিনের পর দিন এ সহ্য করব কেমন করে ?

অন্ততঃ হৃদয়ের সে ছিদ্র পেয়েছিস, যাতে একটু দম ফেল্‌তে পারিস। তবু নিরেট হয়ে রয়েছিস ; ফুসফুস (lungs) সব ভরাট (blockedup) হয়ে গেছে—গেলি বলে। সুষুম্না খুজি

কেন ? ঐ দম ফেলার জায়গা পাই বলে। আঃ ! বাঁচলাম, ফাঁকে এসে বাঁচলাম। তোরা না হয় অচেতন আকাশের তলায় যাস, আমি সচেতন আকাশের তলায় যাই। বলে দিয়েছি, হৃদয় হল পরমদেবতার বাসস্থান, অর্থাৎ তিনি যেখানেই থাকেন, আগে হৃদয় রচনা করেন, করে তাতে বসবাস করেন। হৃদয় হল ভোগের যন্ত্র বা ভোগের ক্ষেত্র বা ভাবের ক্ষেত্র। এই হার্দ্দাকাশ দিয়ে তৈরী হয় এক দিকে অচেতনতা, যার গতি জড়ত্বের দিকে (going to wards materiality), এক দিকে সচেতনতা। এক দিকে তিনি হন সুখসম্পন্ন, ভোগ বা রসসম্পন্ন, এক দিকে হন শক্তিসম্পন্ন। এই সুখ ও শক্তি, দুয়ের খেলা নিয়ে যিনি থাকেন, এই নিয়ে বিহার করেন, তাঁর নাম পরমদেবতা। এই শক্তির প্রথম মূর্ত্তি হল প্রাণ, হৃদয়ের ব্যক্ততার নাম প্রাণ, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবের বাহ্য রূপের ব্যক্ততা। সুখে যিনি থাকেন আত্মস্থ, তাঁর নাম রসস্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁরই বহির্ম্মুখী গতির নাম প্রাণ, প্রাণ থেকেই শরীরগঠন। আনন্দের ক্রিয়াময়তা (active functions) হল প্রাণ। আমার বুকের ভিতর যত সুখবোধ থাকে, তত আমি প্রাণময় হই অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা (activity) বেড়ে যায়। যত দুঃখ থাকে, তত ম্লান হই। এই প্রাণ বা আনন্দ বা রসের ক্রিয়া থেকে অচেতন জগৎ তৈরী হল, ভাবগুলি স্থূলত্ব নিয়ে পদার্থ (materialised) হতে থাকল। বাইরের দিকে যখন শক্তির প্রথম বিকাশ হল, তার সঙ্গে সঙ্গে রচিত হতে লাগল দিক্। দিক্, দেশ, এক কথা। শক্তি

একটা গতি নিলে, সেই গতি একটা দিক ফুটিয়ে চলতে লাগল।

যিনি চিন্ময়, যার বুকে আমি ও তোরা বসে আছিস, যিনি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে, টুকরো টুকরো করে এই ব্যষ্টি ভাব-সকলের মধ্যে অবসর বা অবকাশ দিয়েছেন, যে যার আপনার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসে আছি তা এই অবকাশ আকাশ দিয়ে তৈরী করেছেন। যেমন বাহ্যাকাশকে নির্দ্দিষ্ট করে দিচ্ছে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বস্তু, তেমনি আমাদের এই বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা চিদবচ্ছিন্নতা নির্দ্দিষ্ট করে দিচ্ছে অন্তরাকাশ। এই বহিরাকাশ থেকে ভূতসকল যেমন জাত হচ্ছে, তেমনি অন্তরাকাশ থেকে রূপময়, গন্ধময় ইত্যাদি অনুভূত-সকল জাত হচ্ছে। এই সব বহিঃপদার্থ যত জাত হচ্ছে, যত ভিন্ন ভিন্ন গোলক জাত হচ্ছে, বিপুল ভয়ঙ্করী শক্তির প্লাবন ফুটে উঠছে, যা ঐখানেই, ঐ বহিরাকাশেই ছিল। তেমনি আমাদের অন্তরাকাশে যত জ্ঞান প্রভৃতি ফুটে উঠছে, নানা ভাবের আবর্ত্তন জাত হচ্ছে, হুলস্থুল হচ্ছে আমার তোমার। এ সকলই স্বার্থভাব মণ্ডিত। বাইরে যেমন প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য যাতে জাত হয়েছে, সেই শক্তিরই সাহায্যে আপনার আত্মস্থিতি রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে, তেমনি আমরাও আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছি, আমিত্বে নিরেট হয়ে যাচ্ছি। যেমন ওরা আকাশ থেকে বেরোচ্ছে, আকাশই ওদের উপজীব্য, অথচ তাতে মিশে যেতে চায় না, আমরাও তেমনি ভাবের আকাশে, হার্দ্দাকাশে 'নিরেট

হয়ে থাকতে চাই, তা থেকে জাত হয়েও তাতে মিশে যেতে চাচ্ছি:নে। এই 'আমি' পাকা হয়ে বসে থাকতে চাইছি। ঐ আকাশকে পরিহার করে স্বার্থে বসে থাকা হল জৈব ভাব। এটা জাত হচ্ছে হৃদ্দাকাশে। এখন সে ক্রমবিকাশে আমিত্ব পাকা করে নিচ্ছে, যেমন শিশু পাকা করে নেয় তার সমস্ত অনুভূতি। পরে ঐ আকাশকে আশ্রয় বলে চিনে নিয়ে ও তাঁর সহিত মিশে গিয়ে (Involutionএ) আবার আমিত্ব হারাবে।

আকাশ আকাশ বলে এই যে ভূমির বর্ণনা করছি, ইনি কি এই মাটির মত ভূমি? এই স্থূল আকাশের মত? না জ্ঞানময় একজনের বিস্তার, যঁকে ছাড়া অন্য কাকেও 'নিজ' বলা যায় না; 'আমি নিজে' বললে যাঁকে ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায় না, তাঁর কথা বলছি? ঐ আকাশ এক হলেও এঁতে বহু বহু শক্তি নিহিত আছে একাকারেই; বহুত্বের আগার যেমন একত্ব, একের ভিতর যেমন বহু নিহিত আছে—১+১+১···অনন্ত; তেমনি এত শক্তিত্ব দেখলেই এঁর নাম হয় বহুল, অথবা বহুলা শক্তি। ঐ আকাশ এক হয়ে মহাকাশ, আবার শক্তির দিক্ থেকে দেখলে বহুলা, বহু হয়ে ফুটতে পারেন। আমার নিজত্ব ওঁকে না পেলে ওঁতে একীভূত হবে না।

তোরা লোকব্যবহারের সময় বলিস্, এ ঘর, এ বাড়ী, সবই আপনার; আপনি এখানে থাকুন ইত্যাদি। এ সত্যি কথা কি? মনে মনে জানিস, এ সব ওর নয়, তোরই। ব্যবহারের বেলায় মাত্র শিষ্টতার জন্য ও সব কথা বলছি। সেই রকম সাংসারিক

ব্যবহারের সময় স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সকলেরই আমি, এ ঠিক। কিন্তু আবার স্ত্রী-পুত্র-সর্ব্বস্বতারূপ ব্যবহার থেকে যেমনি মুখ ফেরাই পরমাত্মার দিকে, দেখি—আমি একা। সেখানে আমার উপর কারো দাবী নেই—না স্বামীর, না স্ত্রীর, না পুত্রের, না অন্য কারোর। তখন তুই হাসিস্ ও ভাবিস, "বলতে হয়, তাই বলেছি, আমি তোমার।" তেমনি ভাববি, আমি সত্যি সত্যি স্ত্রী পুত্র কারো নই, আমি নিজের মাত্র একা। কিন্তু ব্যবহারের সময় ঢলাঢলি দেখে কে?

এমন যে জ্ঞানাকাশ, এঁর বহুলা শক্তি হল ও দিকে, একীভূত শক্তি এ দিকে। এ বছরের আলোচ্য আমাদের বহুলা। আকাশের মূর্ত্তি বা শক্তি হল বহুলাভিমুখী। এঁকে নিজস্ব বলে আদর করতে ইচ্ছা করে না? হে মহান্, হে এক অদ্বিতীয়! এই তোমাকে আমরা তোমার বহুলা-তত্ত্বের দ্বারা ধরতে চাচ্ছি, তোমাতে একত্ব প্রাপ্তির জন্য, একত্বটি ভাল করে চিনব বলে। একত্বের কোন মহিমা পাব না ততক্ষণ, যতক্ষণ না জানব, তাঁ থেকে অনন্ত অনন্ত বেরোতে পাবে। নয় ত একত্ব নিয়ে থাকতে পারিস কি? একলা বসে বসে ভাল লাগে না, একত্বের সুখ জানা নেই বলে। জানা থাকলে, বহুত্বে গিয়েও একত্বে ফিরে আসতিস।

দুরকম মানুষ আছে। একরকমের হল, হাতে দশ টাকা আছে; তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেললে। দশ টাকা খরচ হয়ে, দশ টাকা দেনা হয়ে গেল। আর একরকমের মানুষ আছে,—

খরচ করছে ; কিন্তু ফিরে ফিরে আসছে বাক্সের দিকে, (Positivity) দেখতে। যে টাকার মূল্য গণিত-বিজ্ঞানের দ্বারা বোঝেনি, সে খরচ করে নিলে, পরে পস্তালে। আমরাও একত্ব থেকেই বহু, এর অভিজ্ঞতা এলে, হাজার বহু হয়ে খরচ করেও দৃষ্টি থাকবে ওঁর প্রতি। আমরা প্রতি বিষয়ে নিজেকে সূর্যের মত বিলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যিনি 'নিজে' হয়ে, জ্ঞানমূর্তির টুকরো হয়ে বসে আছেন, এঁর কি কোন আদর করি? এঁকে ধরে রাখি? এঁকে বিলিয়ে দিয়েই যেন সুখ। আপনাতে আপনি বিন্দুমাত্র সুখ পায় না, তাই লাফালাফি করছে। নিজেকে শূন্য করে ফেলছে। এই শূন্যকে দেবীভাবপূর্ণ দেখলে ওতে পাবি আনন্দ। মাটির অন্য আদর নেই ; মাত্র ওর উপর দাঁড়াতে পারি, লাফালাফি করতে পারি। নিজত্বেরও তেমনি সেই মূল্য। কিন্তু তিনি যদি সব কিছুর আকার হন, আর তাঁ থেকে বেরোতে ইচ্ছা হবে কি? না বেরোন মানে হল, তাঁতে আপ্তকাম হয়ে থাকা, আপনাতেই সব কামনার পূর্তি পাওয়া। বেরোলে আত্মাতে ভোগ পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে নিতে হয়। এঁকে বহুলা-শক্তিপূর্ণ দেখলে একেতেই পূর্ণ হব। বহুলা-শক্তি যত দিক্ দিয়ে নিজেকে বাড়িয়ে দেয়, একত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এটা দেখলেই তার মূল্য হবে ; নয় ত নিজত্বের মূল্য নেই।

আমার যত কিছু ভঙ্গিমা, যত কিছু দেবতা, সকলেই যদি বলে, "আমি তোমা থেকে জাত, 'তোমাতে' স্থিত," তা হলে সমস্ত

হৃদয় আমার ঐখানে অবস্থিত হবে না ? ঐ নিজত্বে ? এমন ভোলা দেবতা আর আছে ? নিজে একদম ব্যোম-ভোলা ত ব্যোম-ভোলা পড়ে আছে। আর শক্তি সব জাগ্রত হয়ে মহা মহা লীলা করে চলেছে। আহা, শিব শম্ভু, তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব।

তা হলে আত্মতত্ত্বে বহুলা মা দর্শন, এই হল আমাদের বহুলা-সাধনা। ইনি উপনিষদে বৈশ্বানর পুরুষ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। তন্ত্র এঁকেই আদ্যাশক্তি বলেছে। বাক্, অগ্নি, মুখ, এ সব এক কথা। বাক্ই অগ্নি, অগ্নির নাম হুতাশন, হব্যবাহন, এ সব এক তত্ত্বকে লক্ষ্য করছে। ঋষি বলেছেন, এই মুখগহ্বরস্থ যে আকাশ, তার নাম বহুল। বৈশ্বানর অর্থাৎ বাক্যের ভিতর, মুখের ভিতর, অগ্নির ভিতর যে আকাশ, তা দর্শন করলে বহুল দর্শন হবে। এই তিনের ভিতরের আকাশের নাম বহুল,—এক বাক্য, এক স্থূল অগ্নি, আর এক—মুখের ভিতর যে আকাশ। এক ঋষি প্রাদেশভূমি মাত্র অবলম্বন করে বৈশ্বানর নাম রেখেছেন; অন্য ঋষি মুখবিবরস্থ আকাশকে; অপর ঋষি তাকে মধ্যদেশস্থ শরীরে বলেছেন। একজন তত্ত্বভূমিতে, একজন ভূতেতে বলেছেন। তত্ত্বে নিলে প্রাদেশভূমি নেবে। বাক্, আগুন আর মুখ যেখানে সমাবিষ্ট, এই তোর মুখে, এই গহ্বরে, এই আকাশে সেই আগুন জ্বালবার জন্য আমার প্রচেষ্টা। আমাদের বৈশ্বানর এইটুকু। এই মুখের গর্ত্তে আছেন আকাশ, তাতে আছেন অগ্নি। তিনি অগ্নিময় হয়ে বেরোবেন; তবে বুঝব এই

দেবীকে, এই বৈশ্বানরকে লাভ করব। এমন কথা আর বার করবো না, যেটা জ্বলতে জ্বলতে বেরোবে না। কামান থেকে বারুদ যেমন জ্বলতে জ্বলতে বেরোয়, তেমনি ইনি বেরোবেন, যদি এঁকে জ্বালতে পারিস। এ গেল বাইরে। আবার যেখানে চোখ কাণ ইত্যাদিতে তিনি ফুটেছেন, একে জাগিয়ে কাণের ভিতর যদি ফোটাতে পারি, যত শব্দ আছে, সব বেরোবে। ঐ নাকে ফোটালে সব গন্ধ বেরিয়ে আসবে। ত্বকে ফোটালে, বিশেষভাবে অধরোষ্ঠে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত রকম স্পর্শাঘাত ফুটে উঠবে। এই ফল হবে ভিতরে। আর বাইরে ফোটালে যা বলব, তাই হবে। বহুলা-শক্তি জাগবে মানে, আমার বাক্য হবে তেজোময়। যেমন বন্দুক ছুঁড়তে গেলেই triggerএ হাত দিয়ে টানতে হয়, তেমনি কথা কইতে গেলেই মাকে trigger করে বলতে হবে। লক্ষ্য ফিরাও অর্থাৎ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন কর আর দাগো মানে, সঙ্কল্প কর, এই হবে তোমাদের কাজ। কারণ, চিনে নিয়েছি, তিনিই বহুলা-শক্তি। তা হলে আমরা যে হৃদয়াকাশ হৃদয়াকাশ করে আসছিলাম, আজ তাতে ঢুকে পড়লাম। মুখের আকাশ, এটা কি আলাদা? না। আগেই বলেছি, বুক থেকে মাথা পর্য্যন্ত হৃদয় বিস্তৃত। মুখাকাশ হৃদয়াকাশেরই এক অব্যক্ত বিভাগ বা বীজ-বিভাগ। মাথার দিকে সমবিভাগ; যেখানে ব্যক্তাব্যক্ততা নেই, মাত্র অনির্ব্বচনীয়তা। আকাশের তিনটে বিভাগ—ভোগের, অব্যক্তের, সমের। প্রত্যেকে সেই আত্মহ আজ দেখবে অব্যক্তভূমিতে,

মুখগহ্বরস্থ আকাশে। এখানে দুটো একাকার হয়ে আছে; খালি বিচ্ছুরিত (radiate) করছে ফুটিয়ে; সুখ বল, দয়া বল, নির্দয়তা বল। এই তিনটে বিভাগ,—অব্যক্তভাবে সব নিহিত আছে, সেটা অব্যক্তভূমি, মুখমণ্ডলের মধ্যে। চোখে কাণে ত্বকে ইত্যাদিতে নিহিত আছে ব্যক্তভাবে। বুকে ভোগ, মুখে ভাঁড়ার, এইটে দেখতে পেলে বাইরে থেকে খোষামোদ করে কাউকে আনতে হবে? ছেলে, পরিবার, দেবতা, যাকে যখন দেখা দরকার, এইখান থেকে বের করবে।

জ্যান্ত মায়ের ঘরে আজ তোরা প্রবেশ করছিস। কেন এখানে মাকে পূর্ণ জীবন্ত দেখি? যেহেতু, directly দেখতে পাই, মা এখানে ক্রিয়াশীলা। এখানকার প্রকাশই আমরা বুকে ভোগ ক'র। কিন্তু মা কি প্রাণ নিয়ে ধরে আছেন আমাকে? অগ্নিগর্ভ এ প্রাণ বাক্যময়। অগ্নিময় বাক্-বৈশ্বানর আমাকে জাত করেছেন, পুত্রেষ্টি যজ্ঞে বৈশ্বানর যেমন রামচন্দ্রের জন্মের জন্য চরু দিয়েছিলেন। ঋষির মন্ত্র-আবাহনে যেমন চরুময় দেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর বাক্-প্রভাবে আমাদের গঠনোপযোগী উপাদানময় দেবতা আবির্ভূত হয়েছেন। সেই বাকে আছে কি? প্রাণ, হৃদয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে না হলে তেজ ফোটে না। বাক্ যখন বেরিয়ে আসেন, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসতে হয়। আমি যে তাঁর মনে বিধৃত হয়ে রয়েছি। হৃদয়ময় বাকের দ্বারা তিনি আমায় জাত করেছেন। হৃদয়ময় বাক্য বললে আমরাও তেজোময় বাক্য বার করতে পারি। বুকে হৃদয়ের

সাড়া আছে। মুখে আছে কি? যেখানে হৃদয়ের সাড়া, সেটা ব্যক্তভূমি। যখন মুখে হৃদয়ের সাড়া পাব, সে মুখও তখন হবে ব্যক্তভূমি।

এই যে এত করে 'হৃদয়, হৃদয়' করছি, এসব মড়া থেকে যায়, যদি জ্ঞানভূমিতে না ঢুকিস। জ্ঞানভূমিতে, চিন্ময়ে ঢুকলে সব জ্যান্ত হয়। যে শক্তি হৃদয়ের সব ভাব নিয়ে টলটল করছে, জীবন্ততার যত কিছু ক্রিয়াময়তা (activity), অনুভূতি (feeling), বোধক্রিয়া (intellectual action) সব, এর নাম চিন্ময়। আমার নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে হলে এই সব নাম নিতে হয়। আমার পরিচয় শুধু এই যে, আমি চিন্ময়ীতে জাত। হে দেবতা, এই দর্শনে আমায় স্থিতিশীল করে দাও; এই পরিচয় যেন আমার নিত্য পরিচয় হয়—অপুনর্ভবায়। যেখানে যাই, আমি যেন আর বাহ্য পরিচয় না দিই; 'আমি চিন্ময়ীতে জাত,' এই পরিচয়ই যেন আমার মনে আসে। আমি সাধারণ মানুষের কাছে যা বলি না কেন, মনে মনে সর্ব্বদাই বলব, "আমি চিন্ময়ীর সন্তান আর তাতেই অবস্থান করছি।"

এই তত্ত্ব গ্রহণ করার জন্য আবার একটা শেষ প্রতিশ্রুতি (last offer) দিচ্ছি তোদের। বড় উচ্ছৃঙ্খল তোরা বাহ্য ব্যবহারে; এখন থেকে সংযত হও। ধীর, শান্ত, পর-সুখান্বেষী একটা সৌন্দর্য্য নিয়ে আমার সামনে আয়। তোরা বড় উদ্ধত, পরস্পরের সম্মান রাখতে জানিসনে, পরস্পরকে গ্রাহ্য করিসনে;

এ সব দেখলে আমার কেমন লাগে। লোকে তোদের পরিচয় দেবে ত আমার শিষ্য বলে? কেউ এসে যদি বলে, আপনার অমুক শিষ্যকে দেখলাম; সেই সময় তোর উচ্ছৃঙ্খলতার স্মৃতি থাকলে বুঝব, এ লোকটা একটা ঠোক্কর দিলে। নিজেদের ভিতর একটা সৌম্য ভাব নিয়ে আয়। বিশেষতঃ যাকে গুরু বলে প্রতীক করেছিস, তার সামনে সেই ভাব নিয়ে ত আসতে হয়? আমি দেব বলেছি, দেবই। কিন্তু এইগুলো দেখলে প্রাণটা খুসী হয়। একজন বসে আছে; ঠকাস করে তার উপর দিয়ে চলে গেলি। জানিসনে, এতে আমার বুকে কত লাগে। তোদের যেরূপ হতে বললুম, সেইরূপ দেখলে আমার প্রাণ একটা সমতার ভিতর আসতে পারে; নয় ত অসুরের ভিতর আমাকে ঢুকতে হয়। বামনদাস পেছনে বসে, ওতে ওর জয়। তুই সামনে বসলি, তোর হল পরাজয়। পরস্পর পরস্পরের মর্য্যাদা-বোধ, এইটে সব চেয়ে দামী জগৎব্যাপারে। যার যে স্থান, তাইতে তাকে রেখে তার সঙ্গে ব্যবহার করো। সব সুন্দর হবে।

এত দিনে জেনেছিস, সব কিছু জ্ঞানময়, যে বিশ্ব সামনে, সব তোর জ্ঞানময়; আজ যা বললুম, এইখানে ঢুকলে সেটি সহজে পাবি। চোখ দিয়ে দর্শনময় আত্মা বেরুলুম, কাণ দিয়ে শব্দময় আত্মা বেরুলুম, এই অভিজ্ঞানে সেই শক্তির ঘরে ঢুকবি।

———

২১এ মে, ১৯৩৭, শুক্রবার।

ব্যক্তত্ব ও অব্যক্তত্ব। শক্তির তিন রকম প্রকাশ—নাম, রূপ ও ক্রিয়া। এর ভিতর এমন একটা জিনিষ আছে, যেখান থেকে এইগুলো প্রকাশ হয়, আবার যাতে নিমীলিত হয়ে যায়। এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন জ্যামিতির (geometryর) বিন্দু (point) একটি শব্দ, বিন্দুর (pointএর) আয়তন (magnitude) নেই, অথচ তার অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে নিতে হয়। তেমনি এই যে তত্ত্বটি, যাতে গিয়ে সব মিলিয়ে যায়, তার মধ্য থেকে কিছু খুজে বার করবার উপায় নেই ; কিন্তু তা থেকেই যে সব জাত হয়, এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। এইরূপ তত্ত্বের নাম অব্যক্ততত্ত্ব। এই অব্যক্ত-তত্ত্বে অধিকার এলে তখন ঐ শক্তির উপর আধিপত্য (command) এসে পড়ে আপনা হতে, এর প্রকাশগুলো নিজে হতে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। এই জন্যে অব্যক্ততত্ত্বই আদি শক্তিতত্ত্ব এবং অব্যক্ততত্ত্ব উপলব্ধিতে না এলে ভগবান্‌কে বুঝা যায় না। হৃদয় প্রভৃতিতে ভগবান্ ব্যক্ত ঈশ্বর, আর অব্যক্তে তিনি শক্তিমান্ ঈশ্বর। ব্যক্ত ঈশ্বর, ভাবময় ঈশ্বর, এক কথা। ভাব হল ছড়ান জিনিষ। বীজ, অব্যক্ত হল শক্তিত্বের দিকে জমাট জিনিষ। ভাবও শক্তি অনুসারে হয়। অব্যক্ত কেন্দ্রে যত আঘাত পড়ে, ভাব তত ব্যাপক ও কার্য্যকর হয়।

২২এ মে, ১৯৩৭, শনিবাব, সন্ধ্যা।

যে চিন্ময় আত্মা থেকে বোধশক্তি জাত, তাতেই আবার এ সংন্যস্ত হয়ে আছে ; একদিকে ক্রিয়াশীল, আর একদিকে একটা স্থিতিস্থাপক অবস্থায় স্থিব দেখাচ্ছে। ঐ হল সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই তিন রকম স্থিতি। সাত্ত্বিক থেকে তামসিক পর্য্যন্ত সব স্থিতিটা ধরতে পাবলে আমি ঐ স্রোতে পড়ে গেলুম ; জ্ঞানে, নয় ত অজ্ঞানে গেলুম, খালি তামসিক স্থিতিজ্ঞানে রইলুম। ভগবান্ অনিমেষ দৃষ্টিতে আমাব দিকে চেয়ে আছেন, এটা দেখতে পাচ্ছিস কি ? যদি পাস, তবে তুই হয়ে গেলি সত্ত্বময় পুরুষ। তখন ঐ সাত্ত্বিক অংশকে তামসিকের সঙ্গে যুক্ত করলে সেও হয়ে গেল সত্ত্বময়, আলোময়। সাত্ত্বিক অংশ থেকে বেবিয়ে আসা হল রাজসিক প্রকাশ ; আর তার পরে গতি যেখানে নিম্নমুখা হচ্ছে, সেটা তামসিক প্রকাশ। যখনি দেখলি, ভগবৎদৃষ্টি আমাতে সংন্যস্ত হয়েছে, তখনি হয়ে গেল সাত্ত্বিকী অবস্থা। ঐ অবস্থায় যা দেখবি, তামসিক অবস্থায় দেখাব চেয়ে তা অনেক তফাৎ হবে। ভগবৎদৃষ্টিতে আমি পরিপূর্ণ, এর মানে—আমি ভগবন্ময়। এত ক্ষণ জগৎ ছিল অন্ধকারে নিরাশ্রয়, এখন সব বদলে গেল। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, সুনির্দ্দিষ্ট ভগবান্‌কে দেখে এইখানটা ভাল করে লক্ষ্য কর। যা কিছু সব চিন্ময়ের বুকেই দেখছিস ত ? ধী, বুদ্ধিতেই সব বিশ্ব আছে ত ? এই চিন্ময়ী, যাঁতে স্থিতি দেখছিস, এঁতে ব্যবহার দিয়ে ফেল, এঁকে ধরে ফেল্। অসম্ভব সম্ভব

করতে পারেন ইনি। চলে যা ঐ দিকে। দাঁড়িয়ে থাকিসনে, **stagnated** হোসনে। এই রকম করে গতি বাড়াতে হয় বাবা! ভাল করে যদি ছুটে যেতে পারতিস, কি হত? 'অহং ব্রহ্মাস্মি'তে গিয়ে পড়তিস, এই পরম আত্মতত্ত্বে। দেখলি, গতি তা হলে বাড়ান যায়? এত যদি কাছে তুমি, আর কেন তামসিকতায় ঠেল? অনেক পাক খাইয়ে এনেছ তোমার সাত্ত্বিক অবস্থায়। আবার হুস হুস করে রাজসিকতা আসবে। এই ভৌতিক তামসিক সংস্কারগুলোই আবার নামিয়ে আনবে। দেখতে পেলি? কারণ নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে। আর কারো দোষ দিতে পারবিনে।

কেন নেমে এলুম জানিস? রাজসিক **repetition** এর মাত্রাগুলো যখন খুব ঘন হয়েছে, তখনি ত তামসিক ভাব হবে? এতে এত দিন মাত্রা দিয়েছি, সত্ত্বে আজ নতুন দুটো মাত্রা দিলুম বই ত নয়। সত্ত্বে মাত্রা দিলেই এগুতে থাকবি। দৃষ্টি পড়েছে কি শুধরে গেছে। এখন জ্ঞানতত্ত্বে একটু বিহাব করতে শিখেছিস? এটা মস্ত জিনিষ। জ্ঞানে বিহার করে করে ওঁর বিজ্ঞানে নজর পড়া আরও উচু জিনিষ। জ্ঞানেতে একটা জ্যোতি ফুটলে, তাতে লগ্ন হয়ে থাকার চেয়ে **stagnated** হয়ে এই বিজ্ঞানের গতিতে বিহার করার দাম বেশী। বুঝতে পারলি? মানে, জ্ঞানের অনুবর্ত্তন করতে পারলি? বলিস কি রে? আমরা ভগবতীর নিত্য সন্তান। যেমন গণেশাদি।

"ত্রীণি খলু এষাং ভূতানাং বীজানি ভবন্তি, অণ্ডজং জীবজং

উদ্ভিজ্জং।" পাশ্চাত্ত্য দর্শনে শক্তির দুটা দিক্ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তার তিনটে দিক্ আছে, তিন রকম প্রবাহ আছে। চক্রাকার গতি (Circular movement) আর সরল গতি (straight movement) ওরা জানে; ত্রিভুজাকৃতি গতি (triangular movement) ওরা জানে না। আমরা এই যে কথা কই, শব্দ উচ্চারণ করি, তাতে দুইটি ত্রিভুজ (double triangle) হয়ে যায় ষট্‌কোণ। সরল (straight) ও চক্রাকার গতি (circular) মিশে হয় সর্পিল (spiral) গতি। আধুনিক বিজ্ঞান (Modern science) উদ্ভিদ্-গতিকে জানে না, এ তত্ত্ব তাদের মধ্যে আলোচিত হয়নি। উদ্ভিদ্‌গতি যতক্ষণ না জানবি, ততক্ষণ রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে ছাল কেমন করে হয়, ধরতে পারবি না। জল থেকে বরফ, কোমল প্রসব করলে কাঠিন্য। যখন দেখাব, বলবি—কি সুন্দর! যেখানে গরম, সে প্রকাশ করবে ঠাণ্ডা; তরল প্রকাশ করবে কাঠিন্য; অন্ধকার প্রকাশ করবে আলো। অস্তি-জ্ঞান থেকে অস্তিত্বময় সব কিছু তৈরি হয়েছে। পদার্থ দেখে অস্তিত্ব স্বীকার করিনি, অস্তিত্ব থেকে পদার্থ স্বীকার করি। আমাদের মতে গুণ থেকে দ্রব্য প্রকাশিত হয়, qualities radiate matter, দ্রব্য থেকে গুণ নয় not that matter radiates qualities।

সচ্চিদানন্দের উপাসনা হল—নিজের অস্তিত্ব, সে সম্বন্ধে অনুভূতি বা জ্ঞান ও তাতে আনন্দ। আনন্দ বললে বোঝায়,

একটা কিছু আছে, যাতে সৎ ও চিৎ আছে। এই হল পদার্থ। এই পদার্থ শক্তিমান্ হবে, এই আনন্দময় যিনি, তিনি যদি প্রকাশিত (assert) করেন আপনাকে। কি প্রকাশ, assertion নেবেন আগে? 'আছি' এই জ্ঞান। তা হলে ঐ থাকার শক্তি হল 'আছি' এই জ্ঞান। থাকা যেন জিনিষ। সেই জিনিষের যখন জ্ঞান করলুম, তখন ঐ জ্ঞান করাটি হল শক্তির বিকাশ। এই হল তেজ, প্রকৃতির বিলাস। প্রকৃতি জাত হল, প্রকাশ হল। অস্তিত্বজ্ঞান তা হলে একটি তেজ। বোধ করলেন মানে, তেজোময় হলেন, তাঁর তপস্যা করা হল। 'আছি' এই জ্ঞানে পরিপূর্ণ হওয়াই প্রথম তপস্যা। সমস্ত বস্তুর বস্তুত্ব এই 'আছি'তে এসে মিশে যাবে, আবার এই 'আছি' থেকেই বস্তু সব বেরোবে। দেখতে হবে, এই 'আছি' কেমন করে জাত হল। আছির দুটো কাজ; এক—জগৎ প্রসব করছে, অপর, আনন্দতত্ত্বে মিশছে; যেন Insulator হয়ে রয়েছে। আনন্দের ভিতর সৎ বলে যে শক্তি আছে, সে 'আছি'কে আঘাত দিচ্ছে। আনন্দময় বললে 'আছি'ময় বটে, কিন্তু 'আছি'র প্রকাশ নেই। 'আছি'-প্রকাশকারিণী প্রকৃতি পরমাত্মারই অন্তর্গত, কেন না, প্রকৃতি বলছে আছি; অথচ 'আছি'টা পরমাত্মারই। সুতরাং পরমাত্মার আত্মত্বই তার আত্মত্ব। এই অস্মি কেমন করে প্রকাশ পায়, বোঝার এবং তখন বোঝার বাকের গতি।

আমার ভিতর যিনি জ্ঞানময়, তিনিই ভগবান্, এই বোধে মাথা ঘুরিয়ে নে, তার পর যা কিছু করবার কর্। কি কৌশল

তোমার! এই যে বাক্‌ভূমি, এর দ্বারাই দ্রব্যময় জগতের বিকাশ হয়। বিকাশ হলে তখন কথাটা প্রতিপন্ন হয় অসার বলে; যাকে সে জন্ম দেয়, সেইটাই হয়ে যায় সারবান্।

২৩এ মে, ১৯৩৭, রবিবার।

ব্রহ্মদেবতাকে আবাহন করছি আমার অন্তরে। তাঁকে দেবতারূপে আবাহন করছি অর্থাৎ তিনি ত আবাহনের বাইরের জিনিষ; তাঁর আবাহনেই সকলে আবাহিত হচ্ছে; তবু দেবতা হিসাবে আবাহন করছি অর্থাৎ তিনি যে শক্তিজাল বিস্তার করেছেন, সেই শক্তি দেখে তাঁকে আবাহন করছি। দেখেছি, যক্ষ তিনি, এবং সর্ব্বশক্তি তাঁতে নিহিত। 'ব্রহ্মদেবতা' এই কথা উচ্চারণমাত্র দেখতে পাই, তিনি নিজে আবির্ভূত হয়ে আমাকে আবাহন করান। আমার জ্ঞান হলেন "ভগবান্", তার পর সেই ভগবান্ শব্দ উচ্চারণ করলুম, কিন্তু সেটির স্মৃতিকে জাগিয়ে দিলে কে? তিনিই জাগিয়ে দিলেন, যিনি স্বয়ং; তিনি আপনাকে জাগিয়ে দিলেন, আপনি গতিশীল হলেন, তখন তাঁকে আবাহন করলুম। আমার দ্বারা যা সম্পন্ন হবে, সেগুলো তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন; কাল হিসেবে, দেশ হিসেবে সব নির্ণীত করে রেখেছেন, তবে আমি পরিচালিত হচ্ছি। পরমুহূর্ত্তে কি হবে, কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আমি সঙ্কল্প করলুম, তার দ্বারা কাজ

করলুম। কিন্তু সেই সঙ্কল্প কে করালে? তিনিই। সুতরাং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করতে বসে, তিনিই যে সর্ব্ববিধ কর্ত্তা, এই তত্ত্বটি মাথায় না নিয়ে কিছু করার জো নেই একেবারে। তিনিই ভোগে অধিষ্ঠিত, ভোগী পুরুষ; আবার প্রেরণায় অধিষ্ঠিত, প্রেরণা দিচ্ছেন। এমন যে তিনি, তাঁর শক্তি কি? যেখানে যা কিছু প্রকাশ হচ্ছে, সবই। জীবের হিসাবে লজ্জা, ভয় ইত্যাদি সাধারণ মানসিক বৃত্তিমাত্র। কিন্তু ভগবানের দিক্ থেকে এ সকল শক্তির লীলাবিলাস; এরা আমাকে সংযত করছে, নিখুঁত করে গড়ে তুলছে। এই যে ভগবতী, এই যে মা, আমি পূর্ণমাত্রায় জাত হয়ে রয়েছি এঁতে। অন্তর ও বাইরের মাঝে এই 'আমি'টি একটি বেড়া। 'আমি'-জ্ঞানের বাইরে যা ফোটে, তা বাহ্য, আর আমার ভিতরে বলে যা ফোটে, তাই অন্তর। আমি যখন জেগেছি, বুঝতে হবে, বাহির ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমি যে ভগবান্ থেকে বিশ্বে জেগেছি, তার মানে, এই বিশ্ব—যাহা ভিতরে ছিল, তারই বাহ্যে অভিব্যক্তি হল। এর জন্য তাঁকে হতে হল গতিশীল, শক্তিশীল, তাঁকে বেরোতে হল। এর জন্য তিনি যে কৌশল নিলেন, সেটি হল সৃষ্টিবিজ্ঞান; আপনাকে বহু হতে হল। 'আমি' বললে তাতে এই সব আছে। এই আমি যদি এখন বলি, আমাতে বহিঃ তৈরী করব, তার পর বরাবর আমি বেড়ে গেলাম, তাতে কি বার তৈরী হবে? না। আমি যদি বেড়ে বেড়ে যাই, তাতে একত্বের বিস্তৃতিই হল, বার তৈরি হল না। বার তৈরি করতে

হলে আমাকে কাট্‌তে হবে। আমার সঙ্গে সংযোগ রেখে আমার বার তৈরি হবে না।

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলে তাঁর ব্যাপ্তি হল, কিন্তু বহু হওয়া হল না। বহু হব, এই সঙ্কল্প নিলে আপনাকে কাটতে হবে, আপনাকে আপনা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। যে মহান্‌, অনন্ত, ভূমা, অখণ্ড আত্মাকে ডিঙ্গিয়ে কোথাও যাবার জো নেই, তাঁকে কি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলেন? একটি একটি শক্তির দ্বারা, শক্তিপ্রকাশের দ্বারা ভূমাকে—আপনাকে টুকরো টুকরো করলেন। এর নাম হল বহু আত্মপ্রকাশ। প্রত্যেক শক্তি-প্রকাশের দ্বারা এক একটি করে বিচ্ছিন্ন করলেন আত্মবোধকে। এক দিকে যেমন তিনি ভূমা, সর্ব্বধর্ম্মময়, পুরুভুজের দৃষ্টান্তে তেমনি আবার তাঁর প্রতি টুকরো এক একজন পূর্ণ দেবতা, পূর্ণ আত্মা। তিনি এক শক্তিতে আপনাকে করছেন ভূমা, আর এক শক্তিতে আপনাকে করছেন বহু। তিনি কি শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন? না, ঐ আত্মত্বেই দাঁড়িয়ে আছেন। তা হলে আত্মত্ব এমন জিনিষ, যা এক দিকে থাকে এক, এক দিকে থাকে বহু। 'নিজবোধ' এই শব্দ মনে পড়লেই এতে দুটো শক্তি দেখতে হবে; (১) অপরিচ্ছিন্ন, কাটা যায় না, পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। (২) বহু হতে পারেন; এক থেকেও বহু হতে পারেন।

ঋষি বলেছেন, এই যে মস্তিষ্ক, এই যে হৃদয়, এই পর্য্যন্ত একটা ফাঁক আছে, এখানে স্বয়ং আত্মা বিরাজ করছেন। ব্রহ্মরন্ধ্র বা আকাশের নামই হল ব্রহ্ম, চিদাকাশ, সাক্ষাৎ

পরমাত্মা ; ব্রহ্মের বাসস্থল অর্থাৎ স্বয়ংব্রহ্ম। তাঁর প্রথম প্রকাশ হল 'অস্মি' বা 'আছি'। কিছু স্বীকার করা মানেই 'আছে' এইটিতে শক্তি প্রয়োগ করা, নয় ত স্বীকৃতি হয় না। সুতরাং 'আছি', এই হল তাঁব প্রথম শক্তিবিকাশ। থাকা বলে যে জিনিষটি, এইটির বিস্তৃতি হল মহত্তত্ত্ব, অখণ্ড অস্মিতত্ত্ব। গাছ, টাকা, ছেলে ইত্যাদি সব 'থাকা' এই জ্ঞানে একীভূত হয়ে যায়। 'থাকা'র একরকম চেহারার নাম বৃক্ষ, আর একরকম চেহারার নাম মাটি। শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি সবই 'থাকা'র চেহারা মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান ও আর্ষ বিজ্ঞানে পার্থক্য এইখানেই। আধুনিক বিজ্ঞানে দ্রব্যের প্রাধান্য, থাকাটা তার ধর্ম্ম। আর্ষ বিজ্ঞানে থাকাব প্রাধান্য, বস্তুগুলো থাকারই বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। থাকা মানে, বোধশক্তি বা জ্ঞানশক্তির প্রথম জাগরণ। তাই থাকা হল **neutral** শক্তি। **neutral** মানে, সব আছে, কিন্তু এখনো ক্রিয়াশীল হয়নি ; বিপরীত মেরুদ্বয় (**opposite poles**) তৈরি করেননি।

যদি 'থাকা' থেকে জাত হয় জ্ঞানময় শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি, 'থাকা'র প্রকাশই যদি হয় জ্ঞানময় চন্দ্র, সূর্য্য, জগৎ, জীব ইত্যাদি সব, এমন 'থাকা' যদি আমার স্বরূপ হয়, তবে আমি হলুম সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। সেই জন্য পরমাত্মার প্রথম অভিব্যক্তির নাম হল সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, প্রজ্ঞানপুরুষ, প্রাজ্ঞ পুরুষ, সব থাকার জ্ঞানময় ও কামময় পুরুষ। মস্তিষ্ক (**Brain**) জিনিষকে পেলাম। এই প্রাজ্ঞ পুরুষমূর্ত্তিতে এখানে যিনি অবস্থান করছেন, তাঁর নাম

হল পরমেশ্বরী। এই 'থাকা'টি তে'জাময়; এর থেকেই সকল প্রকাশ জাত হয়, আবার এঁতেই সকল প্রকাশ বিলীন হয়। কোন্ শক্তির উপর ভিত্তি করে ইনি এই সকল প্রকাশ-মূর্ত্তি ধারণ করে আছেন? এই শক্তির নাম হল তপস্যা, একটা তপের, তেজের গতি; তপস্যাময় প্রকাশ। এঁকে ছুয়ে ফেললুম, দেখে ফেললুম শুধু নয়, এঁ থেকে একটা তেজ প্রকাশ হচ্ছে, তাও পেলুম। এই 'থাকা' থেকে একটা শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে; তাকে দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু হচ্ছে। অদ্ভুত এই দেবতা, তাঁ থেকে যা বিকাশ করবেন, সে সব ঠিক করে রেখেছেন। এই যে নির্দ্দিষ্ট গতিমুখ (direction) নিলেন, একটা বাঁধা দিকে শক্তির গতি নির্দ্দিষ্ট (focus) করলেন, তার নাম হল তপোলোক। সত্যলোক—'সৎ' বা 'অস্তি' নিয়ে যেখানে তিনি বসে আছেন, আর বিশিষ্ট গতি যেখানে নিলেন, সেই হল তপোলোক। তপোলোক থেকেই তিনি নিজেকে খণ্ডিত করলেন। আত্মার নির্গুণ অব্যক্তত্ব ও সগুণ ব্যক্তত্ব রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আত্মার নির্গুণতত্ত্ব এবং শক্তির অব্যক্তত্ব, এই দুই রূপ বা aspect প্রকাশ করতে হয়। ঐ তপস্যার দ্বারা তিনি প্রথমেই সেই দুই রূপ রচনা করলেন। তার পরে কোথায় কি জাতীয় শক্তি-সংযোগে আত্মত্বে সাপ, ব্যাঙ্, দেবতা ইত্যাদি কি গড়বেন, তা ঠিক করে করে চললেন। সব শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে, সত্যলোকে; পরে তপোলোকে, তার পরে জনলোকে; জন্ম গ্রহণ করার জন্য জনলোক। তপোলোকে নির্গুণ আত্মত্ব, আত্মা এখানে অক্ষর।

আর যে ক্ষেত্রে শক্তিকে বৈশিষ্ট্য দিয়ে, ক্রিয়া করবার জন্য বহিরুন্মুখী করে রেখেছেন, যেখানে শক্তিকে প্রকাশের উপযুক্ততা দিয়ে রেখেছেন, সেই লোক জনলোক। পর পর এই সব প্রকাশ বা **manifestation** দেখ। তপোলোক অক্ষর আত্মার স্থান। সেখান থেকে তিনি বহুত্ব নেবেন; সুতরাং সেখান থেকেই বিচিত্র বিচিত্র শক্তি নিতে হবে, শক্তি নিয়ে সেজে বেরোতে হবে। তপোলোক যেন বাক্স, জনলোক যেন সাজঘর বা Green-room। বাক্স খুলে মাথা থেকে ছাড়ছেন, জনলোকে সাজছেন। জন্মের পর বুকে ভোগ। এখানে গড়া বিশ্ব তৈরী আছে, টাকা-কড়ি, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি। প্রেরণা ঐখানে, খণ্ডিত হওয়া ঐখানে, ভোগযুক্ত এখানে হলেন। এতগুলো বুঝলে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝা হবে।

আমার সমস্ত উপাসনার কথা আজ ভুলে গেলাম। কালী, দুর্গা ইত্যাদি আনুমানিক কোন কথা রাখলাম না। দেখলাম, এই যে ভোক্তা এখানে ভোগে মগ্ন হয়ে রয়েছে, এখান থেকে একে পালাতে হবে। আরও দেখলুম, পালান তাঁরই হাতে নির্ভর করে, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যিনি আমাকে ভোগ করাচ্ছেন, যেমন ছেলেকে সাঁতার শেখায় কোমরে গামছা বেঁধে। যিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন, যিনি আমায় ভোগ দিচ্ছেন, আমার সেই সবিতাকে আমি ডাকব। তিনি কি দিয়ে আমায় এবং এ সব লোক ধরে রেখেছেন? ঐই সমস্তের উপাদান কি? গঠন কি? জ্ঞান, শুধু জ্ঞান। সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক,

এ সব ত বিভিন্ন জ্ঞানপ্রকাশ, ধীপ্রকাশ। তা হলে যিনি আমায় ধী দিচ্ছেন, তার মানে এ নয় কি যে, জন্ম থেকে সমস্ত ব্যাপার তিনিই করাচ্ছেন, এই জ্ঞানভূমিতে? তাই না? তপঃ সত্য ইত্যাদি লোক-সকল কি দূর দূর ভূমিতে দেখতে হবে? না, এই জ্ঞানভূমিতে? এক এক জ্ঞানকে ভিত্তি করে তদুত্তর জ্ঞান প্রকাশ হচ্ছে। পূর্ণমাত্রায় এক এক জ্ঞানভূমি, তার উপর সেই সেই প্রকাশের ভঙ্গিমা রয়েছে।

তা হলে পরমেশ্বরী, অক্ষর ও ভোক্তা, এঁরা সব জ্ঞানময় সত্য, তপঃ, জন ও হৃদয়ভূমিতেই জাত হয়েছেন? জ্ঞানভূমিতে গায়ত্রীর দ্বারা তাঁর সঙ্গে যথার্থ সংযোগ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু স্থিতিলাভ করতে পারছিনে। মলিনভাবে দেখছি, তাই স্থিতি হচ্ছে না। এটা পরিবর্ত্তন করতে হবে। রসভূমি থেকে তেজোভূমিতে যেতে হবে। কাঠকে সূর্য্যের তাপস্পর্শে শুষ্ক করতে হবে। তোমরা সব ভ্যাদভেদে হয়ে গেছ, পোকা ধরেছে। এখন রৌদ্র খাইয়ে খাইয়ে ঠিক করতে হবে। তার মানে, তেজোময় অক্ষর পুরুষে সংযুক্ত হতে হবে অর্থাৎ আত্মত্বের অক্ষর পুরুষে বার বার স্থিতি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

যেখান থেকে ত্রিগুণা শক্তি বেরোলেন, সে সাত্ত্বিকী ভূমি। যেখানে চেতনার শক্তিত্ব জাত হল, তার নাম সত্যভূমি, সত্ত্বগুণ। তার উপর ভর দিয়ে যিনি প্রসৃত হলেন, তাঁর নাম রজোগুণ— প্রবহমান অবস্থায় যিনি **impression** দিতে লাগলেন। স্রোতস্বিনী নদী তার প্রতি জলকণার প্রবহমানতা সত্ত্বেও দেখতে

কিন্তু একটি স্থির জলরাশির মত। সেই স্থিতির নাম তমোগুণ। এই তামসিকতা এনে নিজে ভোগ কববেন বলে তিনটি বিভাগ দেখতে পাই—(১) আত্মসংন্যস্ত বিভাগ, (২) রাজসিক বিভাগ, (৩) তামসিক বিভাগ।

জল ফাঁক ফাঁক হয়ে এলে পুঞ্জীভূত জলবাশি বা **sheet of water** দেখতে পেতে না। তেমনি আমরাও ভগবতীর দিকে গিয়ে তাঁতে তামসিক মূর্ত্তি তৈরী করতে পাবছিনে, ফাঁক ফাঁক হযে যাচ্ছি। পাহাড়ে হাঁটুজলে ঢেউ এল, আবাব বেরিয়ে গেল। তোমরা পাহাডে নদীব মতই হয়ে আছ, গঙ্গার জল হওনি। এখন গতিব পৌনঃপুনিকতায় বা **repetition**এ ঘনতা দিলেই ভগবতীতে থাকতে পারবে। ভগবতীতে তামসিকতা পেতে হলে বাজসিকতা বাড়াতে হবে। তেজ বাড়াতে হবে, তপোলোকেব সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। সুতরাং প্রধানতঃ দবকাব হয়েছে, আত্মাব অক্ষবত্বকে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ কবা। তার চেয়েও বেশী মূল্যবান্ কথা, জ্ঞান মানেই ভগবতী, এই কথা পুনঃ পুনঃ ধবা পডলে, আপনা হতেই তেজ আসতে থাকবে, তুমি অক্ষবায় চলে যাবে। অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা ভগবতীই এই জ্ঞানের নানা স্তরে, নানা ক্রম, আমার আমিত্ব ও বিশ্বের বিশ্বত্ব, এইটি তোমায় বাব বাব দেখতে হবে।

মাথার দিকে যেতে হবে না, ভগবতীর দিকে যা; তাতেই মাথায় চলে যাবি। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', যাঁতে আমি জন্মে রয়েছি, এই বলতে বলতে চলতে থাক; দেখবি, সহস্রারে চলে গেছিস।

মাথায় যাবার জন্য আর কোন পৃথক্ চেষ্টা করতে হবে না। "এস ত তোমায় একটু ভাল করে দেখি, চিনতে পারছিনে" বললে স্বভাবতই মাথায় যাবি। "একটু আদর করি" বললে স্বভাবতই বুকটা ফোটে।

আগে দেখ, জন্মে রয়েছিস্। তার পর দেখ কাতে জন্মে রয়েছিস। ভগবতীতে? মানে, সমস্ত অস্তিত্বের যিনি জ্ঞাতা, সেই বিশ্বেশ্বরীতে। 'থাকা'টা common factor। বিশ্বের থাকাটা যাঁ থেকে জাত হয়, তিনিই বিশ্বেশ্বরী। আগুনে, জলে, ঊর্দ্ধে, অধে, কোথাও এই 'থাকা'-মূর্ত্তি বিশ্বেশ্বরীর অভাব হয়েছে? আমি এইবার এই ভূমির বর্ণনা করতে আরম্ভ করছি। হার্দ্দ ভূমি থেকে কেমন করে জন ও তপোভূমিতে যেতে হয়, দেখিয়ে দেব। কিন্তু জ্ঞানকে ফুটিয়ে রাখ, এইটুকু আমায় সাহায্য কর।

যতক্ষণ আমি ভগবানের ঘরের বাইরে, ততক্ষণ আমার পুরুষকার, আমি কর্ত্তা; সুতরাং আমিই কর্ম্মফল-ভোক্তা. এই উপলব্ধি অনিবার্য্য এবং অনিবার্য্য হলেও ভগবানের দ্বারাই আমি আলাদা হয়ে আছি বলে তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ভগবৎ-নিয়ন্ত্রণের অধীন জীবকর্ত্তৃত্ব একান্ত স্বীকৃতব্য।

তার পরে যখন ভগবানের ঘরের লোক হব, সেখানে গিয়ে সমান্তরাল রেখা মিলিত হওয়ার মত আমি ও ভগবান্ এক আত্মতত্ত্বে মিলিত হব, তখন দেখব, নিয়ন্ত্রণ ও পুরুষকার দুই স্বতন্ত্র জিনিষ নয়; যা নিয়ন্ত্রণ, তাই পুরুষকার এবং যা পুরুষকার,

তাই নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সেখানে ভগবান্ ও আমি এক। সেখানে দেখব, একই ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে।

অব্যক্তত্ব ও ব্যক্তত্ব। জগৎ ব্যক্ত করবার জন্যই প্রথমে অব্যক্ত ভূমি রচনা করতে হয়। তার মানে, আত্মবোধকে **neutral** বা নিগু´ণ করতে হয়। আত্মবোধের সঙ্গে যদি ঐশী স্মৃতি থাকে, তা হলে সে আত্মা বাঘের চামড়ায় ঢুকেও আপনাকে ঈশ্বর বলেই বোধ করতে বাধ্য। কাজেই প্রকৃত বাঘরূপ জীবত্বের খেলা সম্যক্ হয় না। এই কারণে আত্মাকে **neutral** বা নিগু´ণ করা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম ক্রিয়া। আত্মা নিগুণ হলে তাকে যে ভূমিতেই প্রবিষ্ট করিয়ে দাও, তখন সে আপনাকে তদ্বৎ বোধ করতে বাধ্য হবে। শক্তির অব্যক্ততা ও আত্মার নিগু´ণতা হল সমস্ত ক্রিয়া-প্রকাশের মূল। তপোলোক **concentration ground,** যেখান থেকে প্রত্যেক ক্রিয়ার সূচনা হচ্ছে। তপোলোক অব্যক্ত আত্মত্বের কেন্দ্র। জনলোক অব্যক্ত শক্তিত্বের কেন্দ্র। সত্যভূমি থেকে তপোভূমি পর্য্যন্ত আত্মা নিজে রইলেন। জনভূমিতে তাঁর শক্তির পোষাক রইল। জন হল সাজঘর বা **greenroom**। সহস্রার হল **universal,** সব আছে। তোমার জীবত্বের অভিনয় জন্য যতটুকু দরকার, সেটা বুকে ফুটে আসছে সংস্কার থেকে, সহস্রার থেকে।

২৬এ মে, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা।

এক পরম তত্ত্বে আমরা বসবাস করছি; সে তত্ত্ব সম্বন্ধে এখনো তোদের কিছু বলিনি। আমরা ব্যক্ত শক্তির দাম দিই, অব্যক্ত শক্তির দাম দিতে জানিনে। কিন্তু আসলে অব্যক্ত শক্তিরই মূল্য বেশি। কারণ, বীজশক্তিই বৃক্ষ। আবার বৃক্ষ বার না করলে বীজেরও মূল্য থাকত না। সুতরাং ভগবৎতত্ত্ব চিনতে হলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, দুটি পাদই দেখতে হবে। ব্যক্ত পাদে আমরা দেখি ভোগী আত্মা, অব্যক্ত পাদে নির্গুণ আত্মা। কিন্তু যিনি এই দুই পাদকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই আসলে সাংঘাতিক প্রভাব-সম্পন্ন। যখন তোরা আত্মা অনাত্মা, এই সব কথায় ঢুকবি, তখন চেতনত্বে ঢুকবি; তখন কে আত্মা বলে বোধ করছে নিজেকে এবং কে তা থেকে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখছে, এটি দেখতে পাবি। এই চেতনত্বই আত্মবোধসম্পন্ন এবং বিশ্ব-বোধসম্পন্ন। ইনি ততক্ষণই সাধ্য ও দ্বিতীয়, যতক্ষণ আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত এঁতে পর্য্যবসিত হয়ে না যায়। হৃদয়ের অগ্র-ভাগ যখন জ্বলে ওঠে, তখন এই আত্মত্ব সেইখান দিয়ে ঊর্দ্ধগামী হয়ে পরমাত্মায় চলে যান। যাবার পূর্ব্বে হৃদয়ের অগ্রভাগ দ্যোতনশীল হয়ে ওঠে। ঐ **triangle start** করলে। হৃদয়টা ছিল রস, হয়ে গেল তেজ। এই ঘটস্থাপনা হচ্ছে। এই বুকই ঘট, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ পল্লব, সহস্রার সশীষ ডাব। তার উপর চাপা দিলাম গামছা একখানা, শিখা তার বন্ধ। সহস্রার-রন্ধ্র দিয়ে বৈরাজ পুরুষের সঙ্গে সংযোগ রইল। ওটা বৈদ্যুতিক

সংযোগ বা **lightning conductor,** ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে মূলাধারে সর সর করে নেমে আসবে। শুধু কেশে চলবে না, শিখা চাই। **sensitive** ছালকা, **meningis** ইত্যাদি। ঐ স্ত্রীশক্তি, ভোগশক্তি। যত সিদ্ধির দিকে, বাম দিকে ঐ স্ত্রীশক্তি। "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

ভিতরে থাকেন পুরুষতত্ত্ব, উপরে থাকেন শক্তিতত্ত্ব। শক্তি-তত্ত্ব না বুঝলে পুরুষতত্ত্বের কোন মূল্য হবে না; শক্তিতত্ত্বের দ্বারা নির্ণীত না হলে পুরুষতত্ত্ব নির্ণীত হবে না। তা হলে জ্ঞান-স্বরূপকে, আত্মাকে যখন দেখতে যাস্, কি দেখতে পাস্? তাঁর শক্তিত্ব। আত্মতত্ত্ব দেখতে গিয়ে, সর্ব্বশক্তির দ্বারা দিক্‌দিগন্তে তিনি নিজেকে ফুটিয়ে রেখেছেন, এ যদি না দেখতে পাস, শক্তিরূপ পুরের মধ্যস্থ আত্মতত্ত্বকে যদি দেখতে না পাস, তা হলে কোন দেখাই হবে না। এইটুকু বেশ করে নজরে রাখ। "তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিগ্‌দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিব্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণাঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে আছে। পঞ্চ দিক্ পঞ্চ প্রাণ। তুই চলেছিস রাস্তা দিয়ে; কে চলেছে দেখব? একজন ঊর্দ্ধ অধঃ, উত্তর দক্ষিণ প্রাণবিস্তার করে, তার সেই সমগ্র বিশ্ব নিয়ে চলেছে। একটা মানুষ বা পোকা যাচ্ছে, কিন্তু সে তার গোটা বিশ্ব বিকীর্ণ করতে করতে, দিক্-দিগন্তে ঊর্দ্ধে অধে প্রসারিত হতে হতে চলেছে। এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ যখন যায়, তখন ভূত-সকল সচকিত হয়ে ওঠে। একটা গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে চলেছে সরল গতিতে

বা straight lineএ সহস্রাব থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত। এত জ্ঞান শুনছিস, এ জ্ঞানের গতি চলেছে কোন্ দিকে? মহাব্যোমেব সেতু তৈরি করছিস এই গতির দ্বারা, ঊর্দ্ধাধঃ সেতু ব্যোম্।

অনন্ত ভূতবিশ্ব মূলাধার, অনন্ত জ্ঞানবিশ্ব সহস্রাব। Because it is infinite, অসীম বলে এ গতিব বিরাম নেই। এক দাঁড়ের ভিতব দিয়ে দুই শক্তি চলছে। Positive to Negative, Negative to Positive—দুটো poleএর ভিতর দিয়ে এই গতি। যে পবিমাণে এক দিকে চলেছে, সেই পরিমাণে আব এক দিকে চলেছে। এক হিসেবে দুজনেই যেন বিরুদ্ধ মুখে চলেছে—action and reaction, অথচ দুটোই পরস্পরেব দিকে চলেছে। বহির্ম্মুখী বা centrifugal ও কেন্দ্রাভি-মুখী বা centripetal পরস্পবেব দ্বাবা প্রতিঘাত না হলে চলে? তাই দেখতে যদিও বিরুদ্ধ যাচ্ছে, তবু একে টানতে হবেই। টেনে টেনে বেড়ে যাচ্ছে। এও আবার আপনাকে রক্ষার জন্য টান দিচ্ছে। টানটা যে চলেছে, এবও স্থিতি ওখান পর্য্যন্ত আছে, ওরও স্থিতি এখান পর্য্যন্ত আছে। একটা পথে দুটো গ'ত আছে; একটা উপব থেকে নীচে, একটা নীচ থেকে উপরে। নিজে যদি অসীম হোস্, তা হলে এই সমান্তরাল, সরল, অসীম গতি দুইটি রয়েছে দেখতে পাবি। সুতরাং আমি চলেছি ব্রহ্মের দিকে, ব্রহ্ম চলেছেন আমার দিকে, এ ঠিক আছে? মা চলেছেন আমার দিকে, আমি চলেছি মাএর দিকে। আমি যত জীবত্বের দিকে যাচ্ছি, তিনি তত প্রলম্বিত বা elongated

হচ্ছেন। কেমন করে এই দেহ হয়, তাই দেখাব। তাই এই পথ ধরাচ্ছি। সেটা ধরতে পারলেই সমস্ত শক্তি কেমন করে চলছে, দেখতে পাবি। কি করে জ্ঞান থেকে বস্তু বা **matter** তৈরি হয়, মূর্ত্তি তৈরি হয়, ভগবতীর পদক্ষেপ কেমন, তা ধরতে পারবি। ঐ **line** টানা হল, যার ফল হল একটা স্নায়ুকেন্দ্র তৈরি বা **nerve centre create** করা হল। আমি একবার মন দিলাম বাক্সে। বাক্সের যে মূর্ত্তি আছে, আমার ভিতর তার একটা স্নায়ু বা **nerve** তৈরি হয়ে গেল। এবার বাক্স বললেই চমকাব। বাক্স বললেই এবার সেই স্নায়ুকেন্দ্র বা **cell** কচ্ করে ধরেছে। হর হর! কি রকম জাল বিস্তার করে বসে আছেন দেখতে পাচ্ছিস? স্নায়ু, মস্তিষ্ক কি ভাবে জাত হচ্ছে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবি, একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা **electric current** চলবে, সেটা জ্বলতে থাকবে, প্রদ্যোতনশীল হবে। এমন **switch** টানব, আলোয় কুরকুট্টি হবে না? প্রতি কথা উচ্চারণে একটা বিদ্যুৎরেখা জ্বলে উঠবে দেখতে পাবি। জ্ঞান-চোখে সেইটে দেখতে পেলে তখন দেখাব, কথা জ্বলতে জ্বলতে বেরোচ্ছে। অগ্নি মানে আগুন নয় —বিদ্যুৎ। এ রকম বিদ্যুৎময় বা **electrified** মানুষ যদি হয়, তাকে ছুঁতে গিয়ে আছাড় খাবে না তখুনি? থাকবি এই অন্ধকারে? একটা টিপুনি দিলে জ্বলে উঠবি। গুরুর আশ্রয় নে, ভক্তি টক্তি কি করবে?

আজ স্নায়ুগুলির একটা ছবি বা **nerve**এর **chart** নে;

তার পর একটা চিন্তা কর, চার দিন চিন্তার পর আবার ছবি নে। দেখবি, আর একটা স্নায়ু জন্মে গেছে। তমসো মা জ্যোতির্গময়। আলো থেকে সব হচ্ছে যে। জ্ঞানাকাশে, চিদাকাশে, চিন্তার তেজ বা বিদ্যুতের ছটা ফুটেই আছে। যেমন এই ভূতাকাশ মেঘময় হলে, মেঘে ভরে থাকলে কোন কোন সন্ধ্যায় একটা বিদ্যুৎছটার মত ফুটে ফুটে ওঠে, এমন অবিরাম বিদ্যুৎধারা ছোটে। তেমনি আমাদের অধ্যাত্ম শরীরের ভিতর জ্ঞানময় আকাশে চিন্তার বিদ্যুৎধারা ছুটতেই আছে, সেই আলোর ছটা ফুটেই আছে। প্রতি চিন্তাটা বা বাক্যটা এক একটা বিদ্যুতের খেলা।

২৭এ মে, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

রসতত্ত্ব ও স্পর্শতত্ত্ব আগে ফোটে। তোর আত্মভূত অবস্থা থেকে জগৎভূত পদার্থ পর্য্যন্ত যিনি তোর সব হচ্ছেন, তিনিই ভগবতী। আত্মত্ব তাঁরই, আর কারো নয়। যা কিছু ভোগ্য বলে দৃশ্য হচ্ছে, আর যা ভোক্তা বলে, সে সব উনিই ত? তা হলে ভগবতীদর্শনে কেমন করে বধা পড়ল? ঈশ্বরত্ব ভাল করে দেখতে পাচ্ছিসনে—কোন্‌খান দিয়ে কেমন করে এই পরমেশ্বরী নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রকৃতি-পুরুষবাদে দেখি, প্রকৃতি অংশে দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, সব আছে; আত্মাংশে কিছুই নেই। এতে ব্রহ্মদর্শনে কোন ক্ষতি হল না। একটি শব্দ উচ্চারণ

করলাম; শব্দটি কোথা থেকে জাত হল, কিসে পড়ল, কিসে স্থির হল? জ্ঞানেতেই জাত, জ্ঞানেতেই স্থিত, জ্ঞানেতেই পড়ল। সে শব্দ থেকে একটা ভাব হল। সে ভাব কোথায় অবস্থিত? জ্ঞানেতেই। সেই ভাব থেকে একটি বুদ্ধি জাত হল; সেও জ্ঞানেতেই জাত ও স্থিত। জ্ঞানে জাত, স্থিত ও বিলয় হল মানে কি? এর মানে, যিনি চিন্ময়ী ভগবতী, চলতি কথায় যাকে জ্যান্ত বলি, তাঁতে জাত, স্থিত, লীন হল। তার মানে, এঁতে যত রকম ব্যবহার ফুটতে পারে, দর্শন শ্রবণ, হার্দ্দ, তৈজস, এই সব ব্যবহারময় এঁতেই হল। বলে দিয়েছি, প্রত্যেক অণুকে তৈরি করতে হলে তার পিছনে একটা হৃদয়রূপ ঘট রাখতে হবে; তা না হলে তার জন্ম হয় না—কে জানে জাব, আর কে জানে দেবতা। হৃদয়রূপ ঘটে আত্মা বাস করেন। এই পুরুষ' যদি বাক্‌কে পরিচালনা করেন, তবে হৃদয়ের ভিতর দিয়েই সে বেরোবে। কথাবার্ত্তা হৃদয়ের ভিতর দিয়েই বেরোয়—সকল কথাই। কোন একটা ভাবশূন্য কথা কইনে ত? যাকে লক্ষ্য করে কথা কইছি, সে কাছে থাকলে শুনতে পায়, না হলে পায় না। এমন যদি কেউ হয়, যে সর্ব্বব্যাপী, তা হলে সে কথাগুলো শুনতে পায় না, এমন হয় না। আমি না জেনে কথা কইলুম, এমন হয় কি? জানলুম না, বলে গেলুম, এমন হয় কি? সেইরূপ তিনি জানলেন না, আমি কথা কয়ে ফেললুম, এমন হয় না। আমি বললুম 'ফুল' এবং এ কথা জানলুম যে, 'ফুল' বললুম। তিনিও জানলেন কি? তাঁর সাড়া দেখতে

পেলি ? হ্যাঁ, তিনি ফুলের আয়তন নিলেন। তার জন্য তাঁকে কি করতে হল ? তাঁর ঈক্ষণ থেকে কি ফুটল ? প্রথমে ফুটল 'আছি', তার পরে ফুটল অহং। অহংএর ব্যাপ্তি কি ? পঞ্চ তন্মাত্রা। তার ব্যাপ্তি ? পঞ্চ ভূত। তা হলে যেমন বললুম 'ফুল', তিনি বললেন—'আছি'। তা হলে ফুলের তত্ত্ব গঠিত হল, ফুলতন্মাত্রা রচনা হল, সেটা ফুটে ফুলজ্ঞান হল। তা হলে যখন বলি 'ফুল', তার মানে, জ্ঞান বা মা, ফুলতত্ত্ব ফুটিয়ে, ফুল-আয়তন ধারণ করে আমার সামনে হাজির হলেন। এই হল মায়ের ফুল দেওয়া। এই পঞ্চ তন্মাত্রা পঞ্চ ভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলে, এই রকমে ভূত-সকল তৈরি হয় বলে, বাইরের ফুলের সঙ্গে আমার বুকের ফুলের যোগ হবে। এ ফুল কোথা থেকে এল, তা দেখিনি বলে এ বাইরে আঘাত দিলে না। বিশ্বেশ্বরীকে এখানে দেখতে পেলাম না বলে ওখানে আঘাত দিলে না। আমার ফল, ফুল, জল ইত্যাদি প্রতি বলার সঙ্গে সঙ্গে মা 'আছি' বলে সাড়া দিয়ে তন্মাত্রা ফুটিয়ে তুলছেন ও ভূত ফোটাচ্ছেন। তিনি কেন সাড়া দেন ? তিনিই ফুল ফল সব কি না; তাই তাঁকেই ডাকা হচ্ছে বলে তিনি সাড়া দেন। এইটে স্থূলভাবে বা physically ভূতক্ষেত্রে হয় জানিস ? ভূতক্ষেত্রে দেখাবার জন্যে ব্রহ্মকে anatomically দেখিয়ে দিচ্ছি। এইরূপেই শরীর তৈরি হয়েছে। এ শরীর ভগবতীর। চিন্ময়ে বিশ্বাস নেই বলে হুঁ হুঁ করে স্বীকার করতে এত দেরী হয়।

তিনি ঐ যে 'আছি' বলে সাড়া দিলেন, এ সাড়ার পিছনে

তাঁর আত্মত্ব আছে ? তিনি নিজে আছেন ? ফুল ফল, জল আগুন—সবের পিছনে নিজে আছেন ? তা হলে বহুলাকে দর্শন করলাম ; এই সমস্তে তিনি বহু হয়ে গেছেন। এই যেমন ফুল ফল ইত্যাদি বহু হয়েছেন মস্তিষ্কে। প্রতি অস্মিজ্ঞানের অব্যক্ত অণু, খালি microscopic cells ভিন্ন আর কিছু নয়। আর cellএর ভিতর ব্রহ্মরন্ধ্র, ডাক্তারি ভাষায় aqueduct। জ্ঞান ততক্ষণ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হন না, যতক্ষণ না তিনি দ্রব্যরূপে প্রকটিত হন। বাহ্য দ্রব্যত্ব পর্য্যন্ত যতক্ষণ না জ্ঞানে পাবি, ততক্ষণ সে জ্ঞান কার্য্যকারী নয়। এ দেবীকে যতক্ষণ না একজনের মত পাবি, ততক্ষণ এ দেবী কার্য্যকারিণী নন। শক্তি, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-ফল বা ভূত, এই হল দ্রব্য-প্রকাশের প্রণালী। এই তিন প্রণালী নিয়ে ভগবতী এই তিন ধারায় আপনাকে দ্রব্যরূপে পরিচিত করেন। তা হলে শক্তি, ক্রিয়া ও ফল, এই তিন হল দ্রব্যের তিন স্তর। শক্তির ফল দুরকম—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত ফল—ব্যক্ত ভূত ; অব্যক্ত ফল—বীজ, সংস্কার। ব্যক্ত কর্ম্মফল এই চেহারা, যা ধরে বসে আছিস। অব্যক্ত ভিতরে সাজান আছে।

কোথায় চলেছিস ? চিন্ময়ী ভগবতীতে ? আর কেউ ভগবতী আছে ? দেখা শুনা, লজ্জা ভয়, শরীর, কর্ম্ম—এই সব তাঁতে ছাড়া আর কাতেও নেই। জীবন বলে যে দেখছিস, এ এঁতেই ? জ্যান্ত ইনি ? তার পরে যে সাড়া দেওয়া দেখালাম, তা দেখলি ? কি পর্য্যন্ত স্বীকৃতি হলে এ সাড়া দেওয়া ধরা পড়ে ? চিন্ময়—এই কথাটি ধরলে। ওটি সরিয়ে দিলে সব আড়াল হয়ে যায়।

তা হলে গতাগতির পথে, বিশ্বের পরিভ্রমণের পথে এই দেখাটাই হল আলো, আর এই দেখাটি সরে গেলে সবটা হয়ে যায় ভূতের মত, ভূত। এখন ফুল ফল জল যদি বলতে হয়, তবে গুরুর বাক্য অনুসারে এই রকম করে বলবি ? সংকল্প কর। পদে পদে সঙ্কল্প করতে হয়; সঙ্কল্প বড় ভয়ানক জিনিষ, জগৎ ত সংকল্পময়। 'কামময়োঽয়ং পুরুষঃ।' হ্যাঁ মা, এখন আর যা-তা করে ফুল ফল জল বলব না, তোমাতে জাত, স্থিত ও লীন দেখে বলব। যেমন আমি বা 'অস্মি'বোধ এই ভাবের ধারায় ফুটে উঠেছে, তেমনি সকলেই এই ধারায় তোমাকে পেয়েছে। বলে দিলাম—শক্তি, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। নিজবোধসম্পন্ন চিন্ময় দেবতা প্রকাশ হচ্ছেন শক্তি, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে। ধরতে পাবলি ছবি ? চোখই নেই! দেবতার চোখে চোখ পড়ছে ?

একটা কথা কইলাম 'আলো'। একে ফুটিয়ে তুলতে হবে দ্রব্যত্ব পর্য্যন্ত। ভূতে—শক্তি, ক্রিয়া, কর্ম্মফল। অধ্যাত্মে—বাক্, প্রাণ, মন। বৈদ্যুতী শক্তির প্রজ্বলন না থাকলে যেমন বিদ্যুৎকে চেনা যায় না, ধরা যায় না, তেমনি যতক্ষণ ইনি দ্রব্য-রূপে জ্বলে না উঠবেন, ততক্ষণ এঁকে চেনা যাবে না। তবু গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে, মেনে চলতে হবে। বিদ্যুৎ জ্বললে কি আকাশ কেঁপে ওঠে ? না; খালি আপনার আলোয় আপনি ধরা পড়বে। এই জন্য আত্মত্বের এত মহিমা। যাঁর নাম হল স্বয়ং, তিনি নিজেকে জ্বেলে তুলছেন। ঐ আকাশবৎ চিন্ময়ী এঁকে আত্মপরিচয়ে পরিচিত করছেন। বলিস

কি রে! এই রকম ভাবে এই আকাশে রয়েছিস? তোর অস্তিত্ব এই আকাশে? বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সর সর করে চলে যা। গিয়ে আকাশে আকাশে বিশ্রাম পাবি; কেন না, তাতেই ক্রিয়াশীল হয়েছিস। ফুল বললে এতগুলো ঘটনা ধরা পড়ে? বলতে তর সয় না মোটে। খালি পাচ্ছি না—ওর যেটা কর্ম্মফল। ফুলের শক্তি ও ক্রিয়া পেলুম, চেহারাটা শুধু পেলুম। গন্ধ, শীতলতা ইত্যাদি পেলুম না। ফুল ফল পাচ্ছি, কিন্তু ভোগে আসছে না। কোন্ রাস্তায় আসছে দেখতে পাচ্ছিস? যদিও তড়িদ্‌বৎ দ্রুত আসছে, তবু কোন্ রাস্তায়, তা দেখে নিয়েছি। **Anatomically** বুঝিয়ে দেব। জ্যান্ত ফুল বার করবার জন্যই এই রাস্তায় দৌড়োদৌড়ি করছি। মূল কিন্তু সবটার ভগবতী-স্বীকৃতি। চিৎতত্ত্বকে ভগবতী বলে যদি বরণ করতে পারি, তবেই এই সব কথার সার্থকতা—না? বলে দিয়েছি, এই চেতনেই আছে—ফুল ফল ইত্যাদি সব। এই চেতনেই আছে মহামহাশক্তি—কালী, কৃষ্ণ, দেবতা ইত্যাদি। এঁতেই আছে সিদ্ধ পুরুষাদি; যেখানে যা কিছু হয়েছে যুগে যুগে, সব সঞ্চিত এখানে। সব ব্রহ্মরন্ধ্রময়, ঐ আকাশ সর্ব্বত্র। মৌচাক দেখেছিস? এই মৌচাক দেখলি? "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ পরায়ৈ সততং নমঃ।" তিনি দেবী, যিনি ফুলের আকারে এলেন। তিনি মহাদেবী, যিনি সমষ্টি অক্ষরা। পরা—আত্মরূপা, বহুলা, যিনি সমস্ত আয়তনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বহু আত্মারূপে থাকেন।

২৮এ মে, ১৯৩৭, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

১। বাক্। সহস্রার বা মস্তিষ্ক থেকে প্রেরণা পেয়ে, চলে গেল সোজা মূলাধারে। বুক থেকে মাথা পর্য্যন্ত আত্মার স্থান।

২। ঊর্দ্ধমুখী সোজা গতি আত্মিক গতি। আশে-পাশে এঁকে-বেঁকে যাওয়া ভূত স্পর্শ করে গতি।

৩। সচকিত—চেতায়িত। ভূতকে জ্ঞানরূপে ধারণা করলে সে জ্ঞান ভূতের উপরও প্রতিক্রিয়া করবে, লোহার উপর চুম্বকের ক্রিয়া যেমন চলে। ভূতজ্ঞান সরে যাবে, আর ভূতের অন্তরে একটা স্পন্দন খেলা করবে।

৪। যোগী, সুতরাং ভোগী কোন পুরুষ, ভিন্ন ঋতুতেও যদি কোন ফুলগাছের তলায় যান, তবে সে গাছে ফুল ফুটে উঠবে। শকুন্তলাকে বৃক্ষসকলে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়েছিল। এটা নিতান্ত কবিকল্পনা নয়; কবি কালিদাস এতে আর্ষ শক্তিই দেখেছিলেন। ঋষির প্রভাব এমন যে, তার সংশ্রবে এসে বৃক্ষাদিও প্রভাবসম্পন্ন হতে পারে।

৫। একই আত্মত্বের ভিতর দিয়ে একটা ঊর্দ্ধাভিমুখী, একটা নিম্নাভিমুখী, এই দুটো শক্তি চলছে। এইটে ধরতে পারলে ভগবান্ আমায় চাইছেন, আমি ভগবান্‌কে চাইছি, ইহা দেখা যায়।

৬। মূলাধারে ভগবান্ জীবশক্তি দিয়েছেন। সেইটাই আপাততঃ ব্যক্ত (positive) শক্তি। আমি সরল রেখায় একটা গতি নিলুম। সে বাহ্যতঃ একটা গতি বলে

প্রতীয়মান হলেও তার ভিতরে দুটো গতি আছে; একটা যাবার জন্য সচেষ্ট, একটা তাকে বাধা দিবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু যে যাবার জন্য ইচ্ছুক, সে সেই বাধাদানকারী গতিরই সুবিধা নিয়ে, তারই উপর ভর করে অগ্রসর হয়। যখন ইহা অতিমাত্রায় হয়, তখন ভুলে যায় ঐ অব্যক্ত (negative) শক্তির কথা, যদিও সেই অব্যক্ত শক্তি সতত সত্য তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে তাকে টানতে এবং অপ্রধানভাবে জীবের জীবত্বকে দৌড়াতে দিতে।

৭। আমাকে ছেড়ে ভগবান্ জগৎ গড়তে পারেন না, আর ভগবান্‌কে ছেড়ে আমিও এক পা অগ্রসর হতে পারি না, ইহা দেখতে না পাওয়াই জীবত্ব।

৮। পরস্পর পিছাইয়া যাইবার ফলে Law of Intersection ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তখন আর যেন ভগবান্ আমার উপর আধিপত্য করেন না, ঐ Law of Intersection-এর crossএ যে সংস্কার তৈরি হয়, তারাই আমার উপর আধিপত্য করে।

৯। আসলে কিন্তু ভগবান্ পিছাইয়া যান না; আমার তলায় তলায় থাকেন; কূর্ম্ম হয়ে পিঠ পেতে আমার দাঁড়াবার জায়গা করে রাখেন। আমি যা কিছু করি, যা খুসি করি, তবু আমি ভগবানের বুকে রয়েছি, এ কথাটা ভগবৎ-তৃষিতের পক্ষে কত বড় কথা। আমি তোমার বুকে? তবু আমার নিশ্বাস চলবে তোমায় ছেড়ে?

১০। ঐ Law of Intersectionএ অনন্ত brain-cells তৈরি হচ্ছে। ভগবান্ জাল রচনা করছেন চেতনার, আর এই বিজ্ঞানপ্রভাবে ভৌতিক দেহ রচনা হচ্ছে।

১১। প্রতি কথায় স্নায়ু (nerve) তৈরি হচ্ছে, এ যদি দেখতে পাই, তা হলে আগে কম্পন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি প্রত্যক্ষ করতে থাকব। সে জ্যোতি হৃদয়ের অগ্রভাগে জ্বলে উঠবে। হৃদয় থেকে সব নাড়ী সহস্রারে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে। হৃদয় থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত সবটাই হবে জ্যোতির্ম্ময়। আর তখন বুঝতে পারবে, এই হৃদয় দিয়ে আমরা যে সব ব্যবহার করি বা হৃদয়ে যে সব ব্যবহার পাই, এগুলো জ্যোতির্ম্ময় ঈক্ষণ মাত্র, তাঁর দৃষ্টি—heart is nothing but an eye, and it is situated in the brow। তখন হৃদয়রূপ চক্ষু যে কপালে আছে, তা দেখা যাবে—ত্রিনয়ন! বাহ্য হৃদয় জাগতিক ব্যবহার করে। অন্তর্হৃদয় তাই, যা ভগবান ছাড়া আর কাউকে চায় না।

২৯এ মে, ১৯৩৭, শনিবার, সন্ধ্যা।

আত্মা আত্মার সঙ্গে কথা কইবে। আমি মিলিয়ে গেলুম্, ব্রহ্ম রইলেন। এতটা আত্মতত্ত্বে যাওয়া চাই। "জ্ঞানময়ী মাকে দেখছি," এখন তোদের এ কথা বলা মনের কল্পনা, ঐ দেখা প্রকৃত দেখা নয়। জ্ঞানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে রাস্তাটাকে দুরস্ত

করে নে। যাবার আর রাস্তা নেই। ঠিক করেছিস্ ত—মন, প্রাণ, আত্মা। এইবার কথা ক। নমস্তে নমস্তে! না দেখতে দেখতে কথা কস্ কেন? 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এই মন্ত্রকে বেশী প্রয়োগ করবি। খবরদার! সরে যাও! এখন আমি মাকে দেখছি; সব সরে যাও—আর যে কেউ আসছ বুকের ভিতর। আহা, কি সুন্দর শব্দ ধীমহি!

যখন খেতে বসলি, তখন যেমন সব ধুয়ে মুছে গুছিয়ে রেখে, সেখানে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব রাখতে হয়, তেমনি এখন আমি ভগবানের ঘরে যাচ্ছি, সব সরে যাও—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এই মন্ত্রকে খালি সজীব কর, খালি সজীব কর। এ মহামন্ত্র! একে চৈতন্যময় করলে এ ভয়ঙ্কর হয়। অত ভাব জানি না, ভঙ্গিমা জানি না, বিশ্লেষণ জানি না, ব্যাখ্যান জানি না। ছেলে যেমন কিছু জানে না, মা বলা তার স্বতঃসিদ্ধ। সে মা বাবা ছাড়া কিছু বলে না। বাক্যের এই যে প্রথম আদরের স্মৃতি, এইটাই কাজ করে সারা জীবনে। মাকে বাবাকে চিন্তাও করলাম না, আপনি ডাক এল—"মা গো! বাবা গো।" তেমনি কাউকে জানিনে, শুধু বললাম—'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

৩০এ মে, ১৯৩৭, রবিবার।

ঋষি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে ভগবতীকে জীবের হৃদয়ে প্রাপ্তব্য বলেছেন। ঋষির উপদেশে দেখতে পাই,

আত্মতত্ত্বকে তিনি তিন রকম করে বর্ণনা করেছেন। প্রথম বলেছেন, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' এখানে আর কোন দ্বিতীয়ের সংস্থিতি নেই। এই ভগবত্তা, যাঁকে দেখতে পাচ্ছি নিজের ভিতর আত্মবোধ বলে, ইনিই ব্রহ্ম। আর এক জায়গায় বললেন, "দ্বা সুপর্ণা সজুযা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" জীব আর ঈশ্বর। একজনকে বললেন, সে কর্ম্মফল ভোগ করছে, আর একজন "অনশ্নন্," না খেয়ে শুধু দর্শনশীল হয়ে রয়েছেন। এখানে ভগবত্তাকে দুই মূর্ত্তিতে দেখালেন। আর এক জায়গায় দেখালেন 'ক্ষরন্তি'। আত্মার এই তিন মূর্ত্তি—একজন মৃত্যুশীল, একজন মৃত্যুহীন সাক্ষি-স্বরূপ, একজন ঈশ্বর, নিয়ন্তা।

দর্শনকারেরা এখানে নানা বাদ-বিসম্বাদ করেছেন। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা যে ভাবে দেখছি, তাতে এই তিনের সমন্বয় পেয়েছি। জীবের চেতনস্বরূপ আত্মত্ব আর কোথাও থাকতে পারে না। "নিজ" বলে এই জ্ঞানটি চেতনা ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। কিন্তু 'নিজত্বই' কি চেতনার সর্ব্বস্ব? তা নয়। দেখতে পাই, বিশুদ্ধ নিজত্ব "নিজে"কে ছাড়া আর কোন জ্ঞান-প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে না, তাই অবাধ আত্মদর্শন, আর কোথাও কিছু আছে বা নেই, এ সব কোন কথাই নেই চেতন্যায়, মাত্র 'নিজে' এই কথাটা ব্রহ্ম হয়ে, অব্যাহত হয়ে, ব্যাপ্ত হয়ে আছে স্বতঃসিদ্ধভাবে, বিনা প্রচেষ্টায় এই ভাবে রয়েছে সেই

আত্মত্ব। কিন্তু এইটি ভগবতীর প্রধান মূর্ত্তি হলেও ভোক্তৃত্বরূপ আর এক মূর্ত্তি ফোটে। যা কিছু ভোগ করি, এঁকেই করি। সুতরাং এই নিজত্ব সহজসিদ্ধ ধর্ম্ম হলেও ভোগ করার কিছু পেলে তিনি ভোগ করেন, ভোগ্যকে তাঁর সঙ্গে একসা করে নেন, যেমন আমি সুখী দুঃখী মানে, সুখ দুঃখকেই আমি নিজের সামিল করে নিলুম।

যারা নিগুর্ণবাদী, তারা বললে—এ হল 'অনুদর্শন' করা বা 'অনুদ্রষ্টা' হওয়া। ব্রহ্মবাদী বললেন 'অনুভোক্তা' হওয়া। চিন্ময়ী আপনাকে আপনি আপনার দ্বারা নিত্য বিদিত আছেন, এটি তাঁর প্রধান ধর্ম্ম। জড়ত্বের ধর্ম্ম আপনার দ্বারা আপনাকে না জানা। আমরা ভোগে যখন তাঁকে দেখলুম, তখন ঋষি বললেন—'এ হল অনুদর্শন; কেন না, ভোগের সঙ্গে তিনি আপনাকে ত দেখছেনই।' ব্রহ্মবাদী বললেন, 'ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে, ওটি তাঁর আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়া।' যেমন আমরা বলতে পারি, 'রৌদ্র এসে এই জিনিষে ঠেকেছে।' আর একজন একেই বলতে পারে, 'রৌদ্র ওর আকারে আকারিত হয়েছে।' থালার উপর রৌদ্র পড়লে তাকে মাত্র 'ঠেকেছে' বললে ঠিক হল না, ঠিক হয়, 'থালার আকারে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে' এই কথা বললে। একটা বাটি থাকলে রৌদ্র বাটির আকারে পরিদৃশ্যমান হত। এই রৌদ্র যদি জ্যান্ত হত, তা হলে সে বলত, "আমি থালা হয়ে গেছি বা বাটি হয়ে গেছি, এইরূপ উপলব্ধি এসেছে।" এর নামই হল ভোগ করা। তখন সে

নিজের স্বরূপ থেকে পৃথক্‌রূপে আপনাকে দেখছে। 'আমি সুখী' এ কথা বললে গুহারূপ 'আমি' থেকে বেরিয়ে নিজেকে সুখী বলে পরিচয় দিলাম। কিন্তু যে পড়েছে থালায় বা বাটিতে. সে নিজেকে 'থালা' বা 'বাটি' বলে পরিচয় দেবে। আত্মার এইরূপ ভোক্তৃত্ব আছে ; তার মানে, ভগবতী জীব হতে পারেন। আর একটি কথা। ঐ যে রৌদ্র এসে চিক্‌চিক্ করছে, এর মানে কি ? একজন আপনি আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। তেমনি আত্মতত্ত্বে দেখতে পাই, ঈশিত্ব বলে একটি জিনিষ বর্ষিত হচ্ছে ; একজন আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন ঐ আকারে। মস্তিষ্ক থেকে দর্শনাদি দিচ্ছেন, তারা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে ভোগ দিচ্ছে, আমি তন্ময় হয়ে যাচ্ছি। আমাকে তিনিই সব পাঠিয়ে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু এমন সব সংস্কার হয়ে গেছে, আমার এই থাকা যে তাঁরই থাকা, এ কথা ভুলে গেছি ; আমি কেবলমাত্র জীব, আমি যেন একটা আলাদা সর্ব্বদা আছি, আর তিনি তাতে যা হয় ঢেলে দিচ্ছেন, এইরূপ দেখছি। তা হলে চেতনতত্ত্বে, চিন্ময়ী ভগবতীতে তিনটি মহিমা আমরা দেখতে পেলুম।

এই যে মা আমার সন্তান-সন্ততি বিস্তার করে এমনি করে বসে আছেন, এ দেখে আমরা আকুল হয়ে গেছি। এ খালি আত্মম্ভরিতাময় শক্তিপ্রকাশ নয়, একখানা বুক দিয়ে সমস্ত গড়া। এ বুক ছাড়া, এ হৃদয় ছাড়া, নির্হৃদয় আত্মপ্রকাশ হয় না। ইনি যেখানেই আপনাকে পাঠান, হৃদয় তৈরি করেই পাঠান ; কেন না, হৃদয়ই ওঁর বাসস্থান।

ঋষি বলেছেন, এই বুকের ভিতরই সব কিছু আছে। আমার বুকের ভিতর তিনি বসবাস করছেন, ঐ হৃদয়রূপ ঘটের ভিতর। আমার বুকের ভিতর তা হলে আছে হৃৎপ্রকাশ; তার মানে, ভালবাসা, হিংসা প্রীতি ইত্যাদি যত রকম অনুভূতি, সমস্ত টলটল করছে যেখানে, সেই ভূমির নাম হৃদয়। একটু বাতাস উঠেছে, অমনি সুখ দুঃখ যা হোক কিছুর ঢেউ উঠেছে। এমন জায়গায় বসে আছ, একটু যদি বাইরের বাতাস লেগেছে, তুমি অমনি ঢেউ হয়ে উঠেছ। চিন্ময়ী ভগবতীর বাঁধন, একবার যাকে নিয়েছি, সে-ই জড়িয়ে গেছে আমার সঙ্গে।

বলে দিয়েছি, এই হৃদয় মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর যেখানে মাত্র নিজের দ্বারা নিজেকে জানা, সে হল মধ্যক্ষেত্র, সংযোগক্ষেত্র। যেমন মাথা ও শরীরকে ধরে আছে গলা। **spine** ও **brain**এর যে মধ্যস্থল, সেই হল নির্গুণ আত্মার বাসস্থল। উপরে হলেন দাতা, যিনি সব ঢেলে দিচ্ছেন। এই দাতৃত্ব ও নির্গুণত্ব যা দেখলাম, এ দুই ভাব ভগবান্ যুগপৎ ভোগ করেন।

এই যে হৃদয়, এ কোন না কোন কামনা ধরেই আছে। একটি বিরত হলে আর একটি তার স্থলে জুড়ে নিলে। চিন্তা দু রকম ভাবে অহর্নিশ আসছে। এক, মনে করি, ভেবে করলুম; অপর কতকগুলো না ভাবতেই এসে উপস্থিত হয়। বলেছি, বিশ্বের সব জিনিষের আধার মস্তিষ্ক। যদি বলি, 'টাকা চাই', অমনি চলে গেছি ঠিক ঐখানে, গিয়ে ওতে আঘাত করেছি। যেমন আঘাত করলুম, অমনি টাকা বলে যে জ্ঞান,

সে জেগে উঠ্‌ল। জেগে উঠে শুধু মাথায় ফুটেই রইল না, ভোগভূমি পর্য্যন্ত নেমে এল। অনেক জিনিষ আবার সূক্ষ্মভাবে ছাড়া নামে না। অনেক চিন্তা যা আসছে, তাতে অন্তবতঃ বিচঞ্চল হচ্ছে, এ ভোগটাও অন্তবতঃ হয়। কিন্তু টাকাটা বুকে নামাতে ভোগেই এল। ভগবতীর বুকে ত টাকা গাঁথা আছে। তাই আমি 'টাকা' বলতেই ভগবতী উত্তর দিলেন, টাকা 'আছি'। সব অস্তিত্ব নিয়ে একটা শক্তির আকারে এই মস্তিষ্কের একটা cell 'আছি'র আকারে আছে। টাকা, ছেলে, ফুল, ফল, সব 'আছি'র চেহারায় আছে। সব এখানে আছে, থাকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ নিতে পারে, সে শক্তি আছে। এর ভিতর যে বিজ্ঞান সর্ব্বদা ক্রিয়া করছে, ভগবতী অন্নপূর্ণা থালা ভরে নিয়ে বসে আছেন, আমার বলামাত্র দিচ্ছেন, তা আমরা জানিনে। এই যাতায়াতের পথ তৈরী হয় ঐখান থেকে বুক পর্য্যন্ত। তার নাম মনোবহা নাড়ী। তা থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রবাহিত হয় স্নায়ুজাল; স্নায়বিক বা nerval ব্রহ্মজাল বোনা হয়ে যাচ্ছে। তোমার নিজত্বেও ঠিক এই রকম হচ্ছে। স্ত্রী পুত্র, বন্ধু শত্রু প্রভৃতির একটি একটি স্নায়ু বা nerve এইরূপ মাকড়সার জালের মত মা পেতে রেখে দিয়েছেন। সেইগুলোই যেখানে গুচ্ছে গুচ্ছে নামছে, এই রকম দশ বিশটা একসঙ্গে দেখে ডাক্তারেরা তাকে স্থূল স্নায়ু বা physically nerve বলে। একজাতীয় মনঃপ্রবাহ যেখান দিয়ে বেরিয়েছে, রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে। কিন্তু যত

স্থূলভাবে বা **physically** শরীরময় ব্যাপৃত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী মনোবহা নাড়ী হৃদয়ে নেমেছে। আর সেইগুলোর গুচ্ছ গুচ্ছ গঠনে স্থূল স্নায়ু তৈরী হচ্ছে। ললাট হল মধ্যক্ষেত্র বা **medium**, দুই তত্ত্বই এখানে আছেন। হৃদয়েও তাই; এখানে এঁর নাম সমতত্ত্ব। কিন্তু আমরা বুকে দুই তত্ত্ব দেখতে পাই না; জড়াইয়া দেখি কি না, সেই জন্য আত্মত্বকে এখানে নির্গুণতায় দেখতে পাই না। মাথায় দাতৃত্ব ও আত্মত্ব; ওখানে একসঙ্গে 'খাই' ও 'খাই না'; ইহা জীবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, কিন্তু মস্তিষ্কে, স্বাধীন আত্মত্বে পাওয়া যায়। তার মানে, এখানে ঈশ্বরত্বও নিয়ন্ত্রিত করছেন।

নির্গুণ—আত্মত্বের একটি প্রকাশ বা **aspect**। তাই গীতাতে এঁকে একটি শক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। নিজবোধ পরাশক্তি। বহুল নিজবোধ—বহু বহু হয়ে, আপনাকে টুকরো টুকরো করে ধরে বসে আছেন। এই হল নির্গুণ অংশ। তিনি বলবেন, কস্মিন্ কালে আমি কিছু খাইনি, শুধু নিজেকে নিজে জানি। আর ঈশান, খেয়েছি এবং খাইনি, দু ভাবে যুগপৎ পরিচয় দেবেন। জীব বলবে,—খাওয়া, পরা, বসা, এই সব নিয়েই ত আছি। নিজেকে ত দেখতে পাচ্ছি না।

এমনি ভাবে ব্রহ্মজাল বিস্তার করে আমাকে এখানে ধরে রেখে দিয়েছেন। আমারই এই শরীরের ভিতর এই যে ভগবতীতে ও আমাতে, সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রভাবে দেওয়া নেওয়া চলছে, এই হৃদয়, আহরণ ও দান চেতনে চেতনে দেখছি, ক্রমে ক্রমে

এতে আত্মার সংস্পর্শ এসে যাচ্ছে। যেমন মাটিতে আছে একটা নেগেটিভ মেরু, একটা পজেটিভ মেরু থেকে তড়িৎ যেমন ওতে গিয়ে একীভূত হয়ে যায়, এই রকম দেওয়া ও নেওয়ায়ও আত্মায় আত্মায় একীভূতি এসে যায়। নেবার প্রার্থনাও দেওয়া। তিনি হাত বাড়াচ্ছেন নেবার জন্য, আমি হাত বাড়াচ্ছি দেবার জন্য। এতে হৃদয় তৈরি হয়ে যাচ্ছে, আত্মসংস্পর্শ এসে যাচ্ছে।

তোমরা আসল তত্ত্ব, পরম জ্ঞান এই পেলে যে, মাথা থেকে বুক পর্য্যন্ত সবটাই হৃদয়। আহা! হৃল্লেখা দেবতাকে আঁকছি। সাধারণতঃ এ কথাগুল আমাদের কাছে এত ছোট যে, কে আবার এত করে একে দেখতে যায়? মাথায় একটা ভাব এল, ভগবানেব সঙ্গে তার যোগ কে দেখতে যায়? এক একটা বিশেষ দিনে মা কালিয়া পোলাও ধরে দিলেই মাতৃত্ব মনে পড়ে। কিন্তু ভাল ছেলে যে, সে চচ্চড়িতেও মাতৃত্ব দেখে।

এই যে ব্রহ্মজাল আমাদের ভিতর অনবরত চলছে অর্থাৎ হৃদয়ে বোনাবুনি চলছে, ঋষি বললেন—যে একে দর্শন শ্রবণ মনন করে, তার হৃদয় জ্বলে ওঠে। আলোর ভিতর বিদ্যুৎ দেখা যায়, ভাবের ভিতর দেখা যায় না? যে দর্শন শ্রবণ মনন করে, তার হার্দ্দি তার জ্বলে ওঠে, প্রদ্যোতনময় হয়, নির্ব্বাপিত থাকে না, একেবারে ধরা পড়ে। আচ্ছা, যদি আমার বুক থেকে মাথা পর্য্যন্ত আলোকময় দেখা যায়, তা হলে আমরা যথার্থ যে ব্রহ্মলোকে, তা দেখতে পাই কি? তা হলে ঐ আলোই চোখ? ঐ হৃদয়ই চোখ? সমুদ্রে যেমন বাড়বানল, আমার

হৃদয়ে তেমনি বাড়বানল আছে, চোখ আছে, ঈক্ষণ আছে? তাই শাস্ত্র বলেছেন—"হৃদয়স্থিতলোচনাং।" বুকটাই চোখ, এ ত জগৎব্যাপারেই দেখতে পাই। হৃদয়ের তারতম্যে কুৎসিতও সুন্দর, সুন্দরও কুৎসিত হয়। হৃদয় যে চোখ, তা হৃদয় জ্বলে উঠলেই বুঝা যায়। জ্বলে ওঠা মানে, মস্তিষ্কে যাওয়া। হৃদয় তা হলে এল তেজ থেকে, তেজ থেকে হৃদয় তৈরী হল। হৃদয়াভিমানী দেবতা আর জলাভিমানী দেবতা, উভয়েই এক। হৃদয়টা রস, প্রকৃত পক্ষে সে, তেজ থেকেই জাত হয়েছে। এখানকার দেখাই প্রকৃত ঈক্ষণ, চেতনার যাতায়াতে চেতনার প্রদ্যোতনশীলতা। হৃদয়ের স্নায়ু জ্বলে উঠলে তৃতীয় চোখ জ্বলে উঠল। এখানকার ব্যবহার তবে কি হবে? আমি যদি হই চেতন, তবে ব্যবহার হবে চেতন চোখ দিয়েই ত? যেমন চোখ থেকে অশ্রু গড়ায়, এই দর্শন থেকে তেমনি হৃদয় গড়িয়ে আসছে। হৃদয় যদি জ্বলে ওঠে, তবে এই সব কাণ্ড হবে। হৃদয় একটি জাল, সরু সরু নাড়ী দিয়ে এ জাল তৈরি হয়েছে। এই হৃদয়-জালেরই একটি মুখ আছে, সে মুখটি মাত্র উপরে সোজা চলে যায়; সেটি হল সাক্ষাৎ ভগবতীকে চাওয়ার দ্বারা তৈরি সোজা নাড়ী। আর সব নাড়ী অন্যান্য নানারকম চাওয়ায় জাল বুনে উঠেছে। এই উর্দ্ধমুখী নাড়ীর নাম—'তোমাকে চাই, এই আত্মত্বের পরমাত্মত্বকে চাই।' এক জনই যে যুগপৎ ঈশান, নির্গুণ ও সগুণ, এই আগুন জ্বালা হলে, এইটি জ্বলে উঠলে, ঐ উর্দ্ধমুখী নাড়ী ত জ্বলবেই, সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠবে সমস্ত জাগে। এই আত্মত্বে

তখন কেবল ঈক্ষণই বিরাজ করবে। গূঢ় হৃদয় নিয়ে এই যে ব্রহ্মজাল ও ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনা করলুম, এটা অপূর্ব্ব তত্ত্ব নয় ? জমির উপরেই চাষা চাল ডাল বুনছে ; চার হাত নীচেই যে সোনার খনি রয়েছে, তা সে জানে না। খনিতত্ত্ববিৎ বা Mining Engineer সে জমি খুড়ে দেখতে পায়, একটু নামলেই সোনা।

এই কথা শোনার পর এখন কি মনে হচ্ছে ? এই যে মেদ-মজ্জাময় শরীর, এ কি শুধু ভূতের চাষ, না একটা দর্শন, একটা হৃদয় ফুটে আছে এর ভিতর ? এর ভূতাংশের তলায় জ্ঞানময় মূর্ত্তি, তার তলায় ঈক্ষণ—হৃদয়ময় দৃষ্টি, পায়ের নখ থেকে মাথার ডগা পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে ? গোঁজামিল দিসনি। মনে হচ্ছে ? তবু যেন আলো জ্বলছে জ্বলছে জ্বলচে না। হ্যাঁ বৎস ! তা জানি। এইখানটায় ঠোক্কর দিলেই জ্বলবে। আগে জালটা দেখালাম, ঘরটা দেখালাম, নির্ম্মাণ-কৌশল বা Construction দেখালাম। একই তত্ত্ব বিপরীত মেরুতে বা opposite poleএ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নিয়ে ফোটে—আলো অন্ধকার, কঠিন কোমল ইত্যাদি। যতটা আলো ফুটবে, ততটা অন্ধকার, যতটা কঠিনতা, ততটা কোমলতা। আমি ভগবানের দিকে এক মাইল এগোলে তিনিও এক মাইল এগোন। ফলে আমার দু মাইল কাছে যাওয়া হয়। ভগবান্ থেকে এক মাইল সরলে তিনিও এক মাইল সরেন। ফলে আমি দু মাইল দূরে যাই। এই উভয়-বিপরীত প্রকাশ আছে বলে ভগবতী শৃঙ্খলা তৈরি করেও অসম্ভব সম্ভব

করতে পারেন। দাহ ও শৈত্য, দুই বিপরীত মেরুতে বা **opposite pole**এ। এইটিই মা। আমার কর্ম্মফলে দাহ পাবার কথা; কিন্তু প্রার্থনা করলুম, "তোমায় রক্ষা করতে হবে।" মা বললেন, "আমায় আগুন দিতেই হবে।" আমি বললাম, "যা থেকে আগুন তৈরি, ওরই বিপরীত মেরু বা **opposite pole** বের করে দাও না।" সুতরাং ভগবান্ অসম্ভবকে সম্ভব করেন। এটা আলঙ্কারিকের কথা নয়; এইটিই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানে মা আগুনকে জল করতে পারেন, জলকে আগুন করতে পারেন।

শুনে কি করবি? এই রত্ন বুকের ভিতর লুকান রয়েছে। একে না পেয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবি? যত প্রকাশ ঊর্দ্ধে—ছালকার নিম্নে নয়। দক্ষিণে পুরুষ, বামে স্ত্রী। স্ত্রীতে অনুভূতির অংশ বেশী; পুরুষে সেটা ঢাকা থাকে। আত্মার ঈক্ষণই কর্ম্ম; এই কর্ম্ম দর্শন হলেই কর্ম্মজাল কেটে গেল। অসম্ভব-সম্ভব-কারিণী ভগবতীকে আঁকলাম। এখন আত্মা বা নিজবোধ বা চিৎ বলতে অসম্ভব-সম্ভবকারী জ্ঞান বলে গ্রহণ করবি? আত্মা, হৃদয়, জ্ঞানস্বরূপ, যা বলেই দেখিস, বহ্নি, হুতাশন, যাই বলিস, অগ্নির অগ্নিত্ব ফুটিয়ে দেওয়াই আসল লক্ষ্য।

তোরা বড় অনাচারী; তোদের কোন শক্তি নেই। একটা শুধু শক্তি আছে, 'তুমি অসম্ভব সম্ভব-কারিণী' খালি এই কথা বলা। আমরা ভক্তিহীন, কর্ম্মহীন। প্রেমময় প্রেমময় বলে উদ্ধার আছে কি? একে তুলতে হলে ঐখানটায়—'সব করতে

পার' ঐখানটায় নাড়া দিতে হবে। ঐখানটা জ্বেলে দাও মা, সব হয়ে যাবে।

বার বার হতাশে ভেঙ্গে পড়ছিস, দেখছিস ত? এঁকে যদি পাইয়ে দি, জীবত্বের ক্রিয়ার বা action এর প্রতিক্রিয়া বা **reaction** আপ্তকামত্ব দেখিয়ে দেব। এই হৃদয়তত্ত্বকে দৃষ্টি বা ঈক্ষণ বলে চিনতে পারলেই কর্ম্মফল ধ্বংস হয়ে যায়। আজ একটা বড় তত্ত্ব দেওয়া হল।

৩১এ মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

ডাল-ভাত খাবার প্রণালীও যা, ভগবতী সাধনার প্রণালীও তাই, এ কথা কোথাও শুনেছিস? জামা বললে জামা, ভগবতী বললে ভগবতী, এ কথা কোথাও শুনেছিস? ভগবতীতত্ত্ব প্রকাশ হবে, ভগবতীকে পাবি, এ কি খেলা কথা? যে ভূমিতে শোনা মানে কওয়া, কওয়া মানে শোনা, সে ভূমিতে দাঁড়িয়েছিস? আমি যে কথা বলছি, সে কথা আগে ভগবতী শুনছেন তোর বুকে, তার পর তুই শুনছিস? তাঁর প্রসাদ পাচ্ছিস্? তোদের ভিতর ভগবতীকে দেখে আমি কথা বলছি, তাঁর উপাসনা করছি, "আকাশোপম মহাদেবি, তোমার ঈক্ষণময়ী মূর্ত্তি আমায় দেখাও।" কত সৌভাগ্যে এ মধু পান করতে পেয়েছিস, তা জানিস? ঐ আকাশে যদি বিদ্যুৎ না খেলে, সব অন্ধকার হয়ে যাবে, চিন্ময় ভূত হয়ে যাবে।

'আমি'তে আর ভগবতীতে কি তফাৎ বুঝিয়ে দিয়েছি। ওঁর থেকে প্রতিফলিত বা reflected হয়ে তোতে সব আসছে, একটা সংস্কারের পাগড়ি মাথায় দিয়ে। Law of Intersectionএ তোর সব উল্টা হয়ে যাচ্ছে। মা দেখালেন জ্যান্ত, তুই দেখলি ভূত। এই কথা যখন বলি,—"এইখানেই ভগবতীর সংস্থিতি"—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" কাণার ভাষ্য হবে, "কামনা থাকলে কি হবে মশায়!" যখন বলি কাপড়, অন্য কামনা থাকে? যখন বলি ভাত, অন্য সংস্কার থাকে? ভগবতী একবার নামলে সব কামনা চলে যাবে। আগুন ধরে গেলে সব সংস্কার জ্বলে পুড়ে যাবে। আর ভগবতী বলাই নিষ্কামের অন্তর্গত। ও সব ব্যাখ্যান ভগবতী না দেখার ফল।

ক্ষণিক সাধনার রাস্তা কি রকম? দৃষ্টি পড়ে যায় না একটা ক্ষণের ভিতর? কে তোদের দায়ী করেছে তোদের সমগ্র জীবনের কর্ম্মের জন্য? আমি তোদের কিছু বলেছি? যা করেছিস করেছিস। কি দেখছি তোমার কাছে এসে, হে দেবি! যা কিছু ভূতগ্রন্থিতে ধবে রেখেছি, সব দেখছি মড়া!

"এই অব্যক্ত-তত্ত্বের মূর্ত্তি আমার দেখ বৎস! আবার এরাই বেঁচে উঠবে, যদি তুমি দেখ।" ধন, স্ত্রী, পুত্র, শরীর আমি সংগ্রহ করেছি। আচ্ছা করে গাঁট দিয়েছি আমার আমাব বলে। এখন দেখছি, আমি শুদ্ধ তোমারই! চিন্ময়ী দেবি, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আর গাঁট থাকে ওখানে?

কত শ্লথ হয়ে যায়, দু দশ বার করে দেখ না। আমিত্বের নঙ্গর বেঁধেছিস—এ কি থাকবে? টিঁকবে? ম্যাজিকের মত উড়ে যাবে। এই ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে বসবি? না হাত বাড়িয়ে ভগবতীকে পেতে চাচ্ছিস? সেই ভগবতী, যে ভাত-ডাল খাওয়াচ্ছে। যার সহস্র শীর্ষের একটি শীর্ষ দেখতে পাচ্ছি নিজবোধে। নমস্তে নমস্তে নমস্তে!

১লা জুন, ১৯৩৭, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

ব্রজভূমি—ভাবের ভূমি। বজ্রভূমি—আত্মভূমি। আমার জাগা ও আমার ঘুমান মানে, 'আমি'-বৃত্তি জাগ্রত হওয়া ও 'আমি'-বৃত্তি ঘুমিয়ে পড়া। অহং আশ্রয় করে অর্থাৎ অহং ফুটিয়ে তিনি জৈব খেলা খেলেন, আবার দৈব ভাব আশ্রয় করে দৈব খেলা খেলেন।

'অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।' যা থেকে প্রাণ জাত হয়, তাঁকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। আত্মবোধের ভিতর তিনটি স্তর আছে। এক হল ভোগের—"দৃশিঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" দ্বিতীয়, নিয়ন্ত্রিণী বা controlling শক্তি। তৃতীয়—"এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে···সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" এই অক্ষর অসঙ্গতত্ত্ব—এক দিকে এঁরই জীবত্ব, এক দিকে এঁরই ঈশ্বরত্ব স্বীকার হল। আত্মত্বে কেমন করে

ভোক্তৃত্ব ফোটে, আর কেমন করে ঈশিত্ব ফোটে, তা দেখতে হবে ; শুধু আত্মা বললে হবে না।

যখন যে শব্দটি প্রয়োগ করবি, তখন সেইটিই হবে তার আয়তন। আত্মা শব্দের আয়তন হল নিত্যসিদ্ধ নিজবোধ। শব্দতত্ত্বের এই মহিমা। যেটি হৃদয়ে গৃহীত হয়, সেইটিই তার তখন আয়তন হয়।

প্রত্যেক প্রকাশই তাঁর ইচ্ছার প্রতিমূর্ত্তি—Everything is but the echo of His will। তোরা সকলে 'আমি করলুম, আমি খেলুম', এই বলিস। এ বলিস না যে, 'আমি সেখান থেকে বেরোলুম এই খেয়ে, এই করে।'

আয়তন যখন আসে, তখন কাল প্রকাশ করতে করতে আসে ঈক্ষণ। তা হলে সত্যি সত্যি কি আসে ? দর্শন আসে। আলো, তাপ এবং গতি বা Light, Heat and Motion, এই হল বাইরের আলোকতত্ত্বের জিনিষ। প্রজ্ঞানতত্ত্বের জিনিষ হল—Heat, Light and Motion। Heat মানে তেজ, Light মানে ঈক্ষণ, Motion হল কাল। ঈক্ষণ, কাল, তেজ, এই হল উপরের তত্ত্বের। মহাকালের বুকে না হলে মা আমার পা দেন না। নীচের তত্ত্বের হল বাক্, প্রাণ, মন। সংস্কৃতে এর নাম ভর্গ—ভ, র, গ—ভাতি, রঞ্জয়তি, গচ্ছতি বা Heat, Light and Motion। এখন দেখছিস, কেমন করে ব্রহ্মজাল বিস্তার করে তোকে ধরে আছেন ? জাল বলে পেলি তেজ, সূত্র বলে পেলি কাল। তা হলে তোকে অনিমিক্ দৃষ্টিতে

দেখে ধরে রয়েছেন, এ কথা ঠিক? এরই নাম ব্রহ্মজাল? এখনও জোড়-হাত করতে শিখলিনি, তত্ত্বকথা কি শুনবি?

সেখান থেকে সব বেরোচ্ছে, না তুই সব করছিস? এইখানে প্রতিধ্বনিত বা **resound** করছে? সেখান থেকে এল—'আমি চললুম।' কথা যে কইলি, সে কথা কোথায় গেল? যেখান থেকে বেরোল, সেখানে গেল? তিনি সব শুনতে পাচ্ছেন? দর্শনের প্রতিদর্শন, শ্রবণের প্রতিশ্রবণ, ঘ্রাণের প্রতিঘ্রাণ, স্পর্শের প্রতিস্পর্শ—যেমন শব্দের প্রতিশব্দ? অন্য আর কিছু হয় না। ভগবান্ আগে সর্‌সর্‌ করলে তোর গা সর্‌সর্‌ করে। আর কাকেও দেখলে চলবে না, একেবারে ছাঁকা ভগবতী দেখতে হবে।

'কামময়ঃ অয়ং পুরুষঃ'। তিনি যেখানে কাঁদতে ইচ্ছা করছেন, সেখানে কাঁদছেন। যেখানে সাধু হতে ইচ্ছা করছেন, সাধু হচ্ছেন, যেখানে অসাধু হতে ইচ্ছা করছেন, অসাধু হচ্ছেন। "তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, কুমার কুমারী হয়ে আপনার বিপুল কামময় লীলা করছ।" যে নিজে ইচ্ছা করে পাপী পুণ্যবান্ সব হচ্ছে, তার স্বাধীন লীলা দেখাই সুখ; নিজেকে বা জীবত্বকে না দেখাই সুখ। ব্যক্তভূমি, অব্যক্তভূমি, সমভূমি, এই তিন ভূমি না পেলে ব্রহ্মপ্রকাশ হবে না। আমরা চোখ বুজে চেষ্টা করে ভগবতীকে দেখব না; খেলতে খেলতে ভগবতীকে দেখব। একটা কিছু নে; দেখ, এই তিন ভূমি তাতে আছে কি না। যার দ্বারা চেষ্টা ফুটছে, তাকে ধরবার জন্য আবার চেষ্টা? সর্ব্ব আকারে

এই মহীয়সী শক্তি বিদ্যুদ্‌বৎ চলছেন আর খেলছেন। কোথাও সেজেছেন সতীশ, কোথাও বিজয়কৃষ্ণ, কোথাও বামনদাস, কোথাও বৃক্ষ। কোন প্রচেষ্টা নয়, তোরা শুধু শ্রদ্ধাবান্, গুরুসেবাপরায়ণ হ। দাঁড়িয়ে রইলি ভগবানের সামনে, আর অসঙ্গত প্রলাপ করছিস—"ভগবান্ কই? ভগবান্ কোথায়?" "ভক্তি কর, এ কর, ও কর" সবাই বল্‌ছে। আর তিনি আপনি বলছেন কি? যেমন অরসতত্ত্ব রসতত্ত্বের আগার ইত্যাদি। বাক্ ধরলে সব তার অন্তর্নিহিত হয়ে যায়। বাক্যেই বীর্য্য নিহিত রয়েছে। এর পরিচয় দিতে হবে।

২রা জুন, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

ভগবানে আছি, ইহা দেখতে পেলে তাঁর চোখে চোখে সংযোগ হয়ে যেত, তাঁর ঈক্ষণ দেখতিস; আমার সঙ্গে কথা তোর বন্ধ হয়ে যেত। তাঁকেই দেখতিস, হাত জোড় করতিস। এখন ঘরশুদ্ধ লোক দেখছিস, তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছিস, আড়ালে আছি বলে আমাকে দেখতে পাসনি। হঠাৎ আমায় দেখতে পেলে সব ছেড়ে দিয়ে যেমন আমাতেই সংন্যস্ত হতিস। যে ঈক্ষণে তুই জন্মগ্রহণ করছিস ক্ষণে ক্ষণে, তাকে একবার দেখলে আর কি কিছু দেখতে পারতিস? জয় ভগবতি! এই মুহূর্ত্তে তিনি তোকে দেখছেন! তাঁর দর্শন কাকে দেখবে? "আমাকে।" এই দাবী সবাই করতে পারে। আমাকে না দেখে তিনি কিছু

করেন না। তাঁর না-দেখায় আমার কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছে ? যা কিছু হচ্ছে আমাতে, তাঁ থেকেই হচ্ছে। অনিমেষ, অক্রম ঈক্ষণ চলেছে। এ ঈক্ষণ কখন থামে না। আগে মহাকালের দর্শন, তার পরে ক্রমধারায় পর পর দর্শন। ক্রিয়া, কর্ম্ম, ক্রম, সব এক ধাতু থেকে, এক পদবাচ্য জিনিষ।

বৃক্ষরূপে জাত হওয়ার সমস্ত কর্ম্মটা, ক্রমটা, **continued running**টা জমাট হয়ে গেছে একটা ক্ষুদ্র বীজে। তেমনি তোরও ক্রম, কর্ম্ম সব জমাট হয়ে গেছে একটা সংস্কার-বীজে। ক্রমে চড়চড় করে একটা ঠোক্করে বেরিয়ে আসবি। বীজক্ষেত্র—অব্যক্তক্ষেত্র—সংস্কারক্ষেত্র। ১। কাল, ২। ক্রম, ৩। হৃদয়-ব্যবহার, ৪। মন, ৫। কর্ম্ম। ক্রমটা কর্ম্মে পরিণত হবে।

চেতন-প্রকাশ হতে হলে হৃদয় তৈরি করে আসতে হয়। যে দর্শন প্রাণকে জাত করে চলেছে, এমন দর্শন। এই দর্শনে পাকিয়ে আছে তোর সংস্কার। ঐ দর্শনের তাপেই জীব-হৃদয় প্রকাশিত হবে। সেখান থেকে রস আকর্ষণ করলে ডালপালা বেরোবে। যেমনি ঈক্ষণে বীজ উপ্ত হল, সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ের রস টানলে, রসময় হল। শিকড় দিয়ে, বাইরে দিয়েও যেমন বৃক্ষ রস টানে, তেমনি মায়ের দিক্ ও তোর দিক্, দু দিক্ দিয়েই রস টানা হল। আমার অস্তিত্ব আর কিছু নয়, খালি শক্তিময় বীজ নামছে, আর গজাচ্ছে। সাধনার গুহ্য স্তরে, শক্তির স্তরে এখন এসেছিস। উনিই 'আমি আমি' করে আসছেন, 'আমি আমি' একটা বৃত্তি মাত্র। এই সব না দেখলে কিছু হবে না। সংস্কারকে

যদি দেখতে পাই, তাতে চোখ পড়লেই সংস্কার স্তব্ধ হবে। তখন অসঙ্গ আত্মত্বে চোখ পড়বে। তখন দেখব, আমি অনন্ত অনন্ত খণ্ড খণ্ড আত্মত্বে রয়েছি। এত হয়েও আমি ঠিক আছি। তখন দেখবি, ভগবান্ ধর্ত্তা হয়ে সমস্ত বিশ্বকে ধরে আছেন।

এক জায়গায় বসে পুরকে নিজের সঙ্গে একশা করেছ, এক জায়গায় আত্মহারা হয়েছ; কত বড় তোমার সাহস, তাই আত্মহারা হতে পারছ। ছুটেছ আত্মহারা হয়ে, অনন্ত জীব পশু পক্ষী হয়ে। যতই আপনাকে হারাও, তবু ঠিক আছ। যেমন নিজকে পৃথক্ বলে দেখি, অমনি কোথা ভগবান্? একেবারে নিঃসহায়। তোর দিক্ থেকে দেখবি, তুই আছিস ভগবানের বুকে। তাঁর দিক্ থেকে তিনি ফুটছেন তুই হয়ে। যখন বীজতত্ত্ব জানবি, তখন জগতে এমন একটা কিছু দেখবি না, যাতে তোর প্রাণ না ফুটে রয়েছে, তার সঙ্গে তোর আলিঙ্গন না হচ্ছে, একটা মধুময় ব্যাপার না হচ্ছে। আত্মতত্ত্বই দর্শন করে, ঐ মধুময় তত্ত্বই দর্শন করে; এ কথা জানিস না; জানলেই সব মধুময় হবে। এই ভূমিতে এমন জায়গায় এসে পড়বি, যেখানে অক্ষর বা বাক্য উচ্চারণ মাত্রই ফল হবে। দু রকম জানা; এক, আত্মত্বকে জানা, নিত্যসিদ্ধ আপনাকে আপনি জানা, পরাকে জানা। আর এক, আত্মত্বের শক্তিকে জানা, অপরাকে জানা। ব্রহ্মের চিন্ময়ত্ব ওঁম্। তাঁর ক্রিয়াময়ত্ব ঔম্। ক্রমময় হয়েছেন মানে, শক্তিময় হয়েছেন। সিদ্ধিমার্গ—বামমার্গ; দক্ষিণ-মার্গ নয়। যং রং লং বং—বায়ু বহ্নি ইত্যাদি সব তত্ত্ব নিয়ে শক্তিতত্ত্বে

যেতে হবে। আকাশ থেকে উঠেছে মহাশক্তি; এই শক্তি নিয়েছে বীজের আকার। এই সব দেখলে ক্রমধারা দেখতে পাবি; ক্রমধারা দেখলে হৃদয়ধারা দেখতে পাবি।

৫ই জুন, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

ভিটামিন জিনিষটা সাধারণতঃ ফলের খোসার দিকেই বেশী থাকে এবং ভিটামিনের দ্বারা শারীর প্রাণশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলের শাঁস মন প্রাণ প্রভৃতি পুষ্ট করে। শীতলতা, তাপ ও স্নিগ্ধতা, এই তিনটির মধ্যে শীতল হল তম, তাপ হল রজ এবং স্নিগ্ধ হল সত্ত্ব-পোষক। আহার্য্য বিচার করতে গেলে ঘৃতের মত আহার্য্য আর নাই। ইহা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ। কিন্তু ডাক্তারেরা ঘৃতে **fat** বা চর্ব্বি ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। ঘৃতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। দুগ্ধ পুষ্টিকর, মাখন স্নিগ্ধ, শীতল বা তামসিকতার দিকে গেল। ঘৃতহীন অন্ন বিষ। ঘৃতে ক্ষুধা কমে, অথচ চর্ব্বি বাড়ে না, শরীরের সমতা রক্ষা করে। ঘি না খেলে স্নায়ুপ্রণালী বা **nerve channel** বন্ধ হয়ে যায়। ঘি খেলে চক্ষের দীপ্তি বাড়ে, ছানি পড়ে না। দেবসেবায় বা হোমে ঘৃতের ব্যবস্থা। ঘৃতের ধোঁয়ায় বৈদ্যুতিক রুক্ষতাকে সরল করে, তাই ঘৃতের ধোঁয়াতে বৃষ্টি হওয়াব সহায়তা করে। ক্ষুধা হল স্নায়ুর রুক্ষতা। ঘৃত সেবনে এটা কম হয়, কাজেই ক্ষুধা কমে। হিসাব-মত খেলে অম্ল সারে। ভগবতী সর্ব্বরোগের ঔষধি। শীতল, উষ্ণ অর্থাৎ তামসিক ও

রাজসিক, এই দুইয়ের মধ্যে একটি শক্তি তৈরি হয়। এই জন্য **nervous** লোকদিগের নরম অথবা গরম সহ্য হয় না।

মা হৃদয় দিয়েই সব ধরে রেখেছেন, তিনি হৃদয় ধরেই আসেন, এই জন্য এত বলা ও শোনা। আত্মত্ব হল সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন বা **Resignation** আত্মত্বে ছাড়া আর কোথাও হবার জো নেই। সব ঘুরে ঘুরে এসে শেষে দেখি, তুমিই আত্মা, আত্মাই তুমি।

ভৌতিক বিজ্ঞান আরম্ভ হল জড়কণা থেকে; আর আমাদের জড়জ্ঞান হল জড় বস্তুর জ্ঞান থেকে। চেতনতত্ত্বেও একটা বিভাগ দেখতে পাই; চিন্ময় যাঁকে বলি, তিনি আত্মময়। যাঁকে আর পরিচালিত করতে হয় না, অন্যকে পরিচালন করেন যিনি, তাঁকে বলছি ভগবতী, ঈশ্বরী, ঈশ্বর ইত্যাদি। যখন তাঁকে ভগবতী বলে আহ্বান করি, তখন তাঁর আয়তন হল অনাত্মজ্ঞান, জড়জ্ঞান। সুতরাং সাক্ষাৎ অপরিণামী, সপ্রকাশ, নিত্য আপনার দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত ও অন্যকে জাত, স্থিত ও লীন করার দ্বারা পরিচালিত করছেন তিনি। জল মাটির উল্টোপাল্টা হোক, আর জ্ঞানেরই উল্টোপাল্টা হোক, এ সমস্ত আলোড়ন তাঁর সংস্পর্শ ছাড়া যখন হয় না, তখন প্রত্যেক আলোড়নের ভিতর ঈশিত্ব, ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব বিস্তার করে তাকে তিনি ধরে আছেন। এই ঈশিত্ব ও ভোক্তৃত্ব জানা হয় না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁকে ভগবতী বলে পরিজ্ঞাত হই। যেমন তুমি এলে বলি না যে, রক্তমাংসের একটা ঢেলা আসছে; তেমনি মায়ের বেলায়ও একজন—চেতনতা,

ব্যক্তিত্ব ও জীবনস্বরূপ, এই অংশ নিয়ে পরিচিত হতে হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা ভগবানের বেলায়ও হাড়-মাস দেখি; আসলে যিনি সজীব, সচেতন, তাঁকে "ও মা, এস," এই বলে সম্ভাষণ করি না। আত্মার সংস্পর্শ না পেলে জড়জ্ঞান নড়ে চড়ে না। জড়া শক্তি তাকেই বলি, যা জাত হয়, স্থিত হয় ও লয় পায়। আমার 'আরম্ভ' দেখলুম গুণেতে। শক্তি ত্রিগুণা। গুণ থেকে জাত হয়েছে বিশ্ব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে স্থূল অণু থেকে বিশ্ব জাত হয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানতত্ত্ব এবং তাঁর তিন জাতীয় ক্রিয়া অবলম্বন করে বিশ্বের উৎপত্তি। শক্তিতত্ত্ব ত্রিগুণ-জ্ঞান। প্রত্যেক জিনিষের counterpart আছে জ্ঞানে। শক্তি দুই মেরুতে খেলা করে; এক জ্ঞানাত্মক, এক ভূতাত্মক। একটা জ্ঞানরাজ্যে জাত হওয়া, স্থিত হওয়া ও লয় হওয়া; একটা ভূতরাজ্যে জাত, স্থিত ও লয় হওয়া। এখানেও যে শক্তি-প্রকাশ বা গুণ-প্রকাশ, ওখানেও তাই। একই গুণ-নামীয় জিনিষ দু দিকে ক্রিয়া করছে দুই তত্ত্বের ভিতর। এর দ্বারাও বুঝে নিতে পার যে, এ দুটো একই জিনিষ। দুয়েতেই তিন গুণ বা শক্তি খেলা করছে, ঐ তিন রকমই প্রকাশ হচ্ছে। একই শক্তি এখানেও, ওখানেও খেলা করছে।

এই গুণ যে জ্ঞানক্রিয়া, তা বুঝিয়ে দিয়েছি। ঐ তিন গুণ গুণনেরই বা multiplicationএর মত ঠিক একগুণে বা মাত্রায় জাত, দ্বিতীয় গুণে বা মাত্রায় স্থিত, তৃতীয় গুণে

বা মাত্রায় বিলীন, অব্যক্ত হয়। এমন একটি জিনিষ, যা এক মাত্রায় জাত, দ্বিতীয় মাত্রায় স্থিত ও তৃতীয় মাত্রায় লীন হয়। জিনিষটি neutral, তাতে কিছু নেই; যখন সে খেলে ওঠে, তখন প্রখ্যা হয়, প্রবৃত্ত হয়, স্থিত হয়, লয় হয়। দ্বিতীয় মাত্রার ক্রিয়া এত জোর ক্রিয়া যে, তাকে দেখায় যেন স্থিতিশীল। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা জোরে ঘুরলে দেখায় যেন ঘুরছে না। আবার এই জগৎকে যে স্থিত দেখি, এটা আমাদের চোখ তৃতীয় মাত্রায় দেখছে, ভিতরে ঢুকে অব্যক্ত হওয়ার সময়। অব্যক্ত হল তৃতীয় মাত্রা। একেবারে শক্তির আকারে নিধন, লয়; এর চেয়ে আর কোন ঘন মূর্ত্তি সে নেবে না। আবার বিলোমে অন্তর্মুখী ক্রিয়াশীল। ঐ অব্যক্তে চেতোমুখ অবস্থাই তখন জাত। তার পর প্রবৃত্ত— খানিকটা এক অবস্থায় থেকে ক্রিয়াশীল। শেষে নিধন, লয়। জাত, স্থিত ও লয় হওয়া—এ আছেই; এ ভিন্ন কোন শক্তি হতে পারে না। আবার দুটা counterpart।

এই শক্তিতত্ত্বের নাম ভগবতী। এঁকে চিনতে হবে। এই ত্রিগুণ-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করছে সমস্ত জগতের ওলট্-পালট্। প্রত্যেক জিনিষের চেহারা, গন্ধ ইত্যাদি কিছু না দেখে "যদি শুধু সেই মহাশক্তিকে দেখি, যা থেকে এ সব জাত, স্থিত ও লয় হয়; কিছু করব না, শুধু এর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক গুণটি অধিকার করে যদি এর অদল-বদল করতে পারি, তা হলে সব হবে। মা রয়েছেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত, মহিমা দেখতে পারছি, কিন্তু কি যে ফল,

তা এখনও ধরতে পারছিনে। 'মা, তুমি ত্রিগুণময়ী, সবকে সব করতে পার, জলকে মাটি করতে পার, মাটিকে জল করতে পার', এই বলতে থাকলে এঁকে পরিচালনা করার অধিকার এসে যায়। ভগবতীকে পেয়েছি, এ কথা ততক্ষণ বলতে পারব না, যতক্ষণ না অন্ততঃ তাঁর একটু মহিমা আমাতে পাব। মন্ত্রের দ্বারা সেই শক্তিকে আবিভূ্ত, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যক্তে লয় করতে পারা যায়। এর নাম দেবীর আবাহন, পূজা ও বিসর্জ্জন করা।

'আমাকে—ত্রিগুণা ভগবতীমূর্ত্তিকে যদি চিনতে পারিস, তা হলে আমি তোর খেলার পুতুল হব।' এহি এহি, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, গচ্ছ গচ্ছ, —কত বড় বিজ্ঞানে পৌঁছে ঋষিরা এই রকম খেলা খেলতে পেরেছিলেন! ভগবান্ যেন গোলাম। বললেন 'আগচ্ছ' ত এলেন, বললেন 'গচ্ছ' ত গেলেন। সাধারণ ভগবদ্‌বোধ রয়েছে, তা ছাড়া আবার এমন একটা অধিকার দেন, যাতে তার বশ হয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ এই ভূমিতে উঠেছে, তবে সে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ভগবান্ যার স্বতঃসিদ্ধ নিজের আত্মার ভিরত, এ সব তারই হবে। আমি ভগবানের আশ্রয়েই রয়েছি, তাঁতেই লয় হচ্ছি, এ কথা যত বলবি, তার উত্তরে তিনি বলবেন, "বৎস! আমি তোমার বুকে, ডাকলেই আসছি, যেতে বললেই চলে যাচ্ছি।"

এইখানে এসে কত বড় সুদৃঢ় ও নিঃশঙ্ক চেতন-ভূমিতে পদার্পণ করলি? এই অমৃতের ঢেউ খেয়ে এখনি আবার ঐ আঁধারে নামা, এ আর পারা যায় না। একটু স্থিতি মাত্র নয়, একেবারে মহাপ্রস্থানে চল্। এ কি খেলা খেলবি, কার সঙ্গে রে?

কি অধিকারের কথা কাণে ঢুকল রে? একটা সহজ পথ আজ তোদের কাছে ব্যক্ত করতে পারলুম, তাই আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। এই সব বাক্যের একটি কুচি ফেলবি না, স্যাক্‌রার দোকানের ধূলা-সংগ্রহের মত এ সব কথা অতি আদরের সহিত বুকে গেঁথে রাখবি। এমন ভূমিতে তোদের নিয়ে ফেললুম বলে, যেখানে ভগবান্‌কে স্মরণ করেছিস কি পেয়েছিস।

৬ই জুন, ১৯৩৭, রবিবার।

যেমন বরফ গলে জল হয়ে গেলে তখন আর তার বরফত্ব থাকে না, তেমনি আমি গলে গেলে আত্মত্ব বেরিয়ে পড়ে; কারণ, আত্মত্বই আমার 'আমি'র আকার নিয়েছিল। নিজবোধ কেবলমাত্র আত্মত্বের সুস্পষ্ট বাহ্য লক্ষণ। আত্মা বলতে 'আমি' বা 'আমি' বলতে আত্মা, এ গোলমাল যেন তোদের না হয়। অনেক সময় তোরা আত্মাকে নিতে গিয়ে দ্বৈত ভাব নিয়ে ফেলিস। বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে হারান হারানই নয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে ভোগ হয়ে নিজেকে হারানই প্রকৃত হারান। এ হারান মানেই নিজে বিদ্রাবিত হয়ে যাওয়া। একীভূত হওয়াই হৃদয়ের প্রধান লক্ষণ। এইটা হয় হৃদয়ের শেষ ভাগে, সেখানে তুমি ও আমি একসা হয়ে যাই। এই হল ব্যক্ত হৃদয়। তখন হৃদয় হয়ে যায় জ্যোতির্ম্ময়। এই হৃদয়ের প্রধান লক্ষণ হল, সরল সহজ সত্যবোধ। যে পরিমাণে সংশয়, সেই পরিমাণে হৃদয়ের সঙ্কোচন

হয়। সত্য সরল ভোগই হল হৃদয়ের ধর্ম্ম ; ইহাই অবলম্বন করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তুমি আছ এবং আমি আছি, এই নিয়ে হার্দ্দ ব্যবহার চলতে লাগল। কিন্তু আর একজন আছেন, যিনি এই দুই জনকেই চেয়ে দেখছেন, দুই জনকেই টানছেন, এই নিয়ে ত্রিকোণ তৈরী হয়, এই **triangle** অর্থাৎ হৃদয় তৈরী হল।

এ পাশে আমার জগৎ এবং ও পাশে আমার ভগবান্, এই দুই টান নিয়ে ত্রিকোণ অর্থাৎ হৃদয় তৈরী করে তিনি বসে আছেন। অথবা আত্মা শক্তিকে চায় এবং শক্তি আত্মাকে চায় ; এই উভয় চাওয়ার মূলে তিনি উভয়কে ধরে বসে আছেন। হৃদয়ের অভ্যন্তরে ত্রিকোণের বা Triangleএর এক কোণে আমি, এক কোণে অসঙ্গ আত্মা এবং এক কোণে অক্ষর পুরুষ পরিচালকরূপে রয়েছেন। সরল সত্য জ্ঞানে যত তাঁর দিকে অগ্রসর হতে থাকব, ভগবান্‌ও আমার দিকে তত অগ্রসর হতে থাকবেন। সরল সত্যবোধে তাঁকে স্বীকার করা, এই হল আমাদের সাধনা। এ যাবৎ আমরা যে সব আলোচনা করে এসেছি, সে সমস্ত হল Theory বা আনুমানিক সাধনা। এখন একে সরল সত্যবোধে গ্রহণ করতে না পারলে সে জ্ঞান লাভের কোন মূল্য নেই। ধানগাছ হুড়ে যাওয়ার মত অনেক সময় আমাদের জ্ঞানও হুড়ে যায়, ফলবান্ হয় না ; সে কেবল* এই সরল সত্যবোধেব অভাববশতঃ।

আমি তোমায় অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মাকে দেখছি, তুমি

অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মা আমায় দেখছ, এই যে হৃদয়-ব্যবহার, এতে যদি আমি "জন্মাদ্যস্য যতঃ," তাঁর দিকে অর্থাৎ অক্ষর আত্মার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও (অসঙ্গ আত্মাও) নাস্তি-বোধে অব্যক্ত হয়ে তাঁতে চলে যাবে। কারণ, তোমার দিক্ হতে চোখ ফিরিয়ে নিলেই তুমি অব্যক্ত হয়ে গেলে।

কথা কওয়া মানে, একটি আয়তন রচনা করা ; তার মধ্যে আছে—মন, হৃদয় ও আত্মা। আমার কথা শুনে তোমার অভিমান হল, তুমি ক্রুদ্ধ হলে। এতে আমার কথার উপর তুমি অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করলে না, বক্তা আমার উপরই তুমি অভিমান করলে ও ক্রুদ্ধ হলে। সুতরাং কথার দ্বারা বক্তার আত্মা, হৃদয় ও মনেরই অভিব্যক্তি হয়, যার দ্বারা তোমার মনে অভিমান ও ক্রোধ উদ্রিক্ত হল। এইরূপে আত্মত্ব পর্য্যন্ত দিয়ে কথা কওয়া যদি আমার ধর্ম্ম হয়, তবে আমার বাক্য হবে অমোঘ ; যাকে কথা বলব, তার আত্মত্বে সে কথা আঘাত দেবেই। এখন পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে কথা বলবার সময় এই বিজ্ঞানে দৃষ্টি রেখে যদি কথা বলি, তবে তাহাই হল চৈতন্যময় মন্ত্রপ্রকাশ। আত্মত্ব স্থির, নড়ে না। 'বাক্যের সহিত আত্মাকে পাঠান মানে, আত্মা হইতে এক আত্মময় পুরুষ জাত হয়ে বেরিয়ে যাওয়া। একদিকে যেমন আমার জগতে আমি অভ্যস্ত, অন্য দিকে তেমনি আমি ভগবানে ন্যস্ত, এটা অতীব সুনিশ্চিত। আমার এক পিঠে জগৎ এবং অন্য

পিঠে ভগবান্, এইটিকে লক্ষ্য করে আমি বললাম "মা" অর্থাৎ আমার মন, প্রাণ ও আত্মত্ব মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়াল। মাও প্রাণময়, মনোময়, ইন্দ্রিয়ময় হয়ে তবে এই জগৎ রচনা করেছেন। এ সমস্তের প্রজ্ঞা জ্বলে না উঠলে সৃষ্টি হয় কি? আগে অন্তঃপ্রজ্ঞা, তার পর বহিঃপ্রজ্ঞা ফোটে। আমার অন্তরের মন প্রাণ আত্মা নিয়ে মা বলা মানে, আমার তল্পিতল্পা যা আছে, সব নিয়ে মায়ে পৌঁছান। এই যে জল বায়ু আকাশাদি-রূপ ভগবানের বাহ্য বিশ্ব, এ বিশ্ব আমার অন্তরেও আছে। আমার অন্তরে ঐ সমস্ত ফোটাবার জন্য বাহ্য বিশ্ব উদ্দীপনা বা **provocation** দেয় মাত্র, আসলে আমি দেখি আমার জ্ঞানের বিশ্ব। তিনি আমার কর্ম্মানুসারে ভোগ দেওয়া ছাড়াও আমায় তুলে নেবার জন্য এমন অবস্থার মধ্যে আমায় ফেলেন, যাতে আমাব সেইরূপ সংস্কার তৈরী হয়। অন্তর এবং বহিঃ, এই দুইই শক্তিতত্ত্ব এবং যেখান থেকে কিছু বেরোয় না, অথচ সবই যেখানে আছে, সেইটি হল আত্মত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব। অন্তর এবং বহিঃ, এই দুই ক্ষেত্র রচনা করেই শক্তিতত্ত্ব খেলা করে।

এই যে বাইরে 'আমি' ফুটেছি, এইরূপ একটি 'আমি' ভগবতীর বুকেও আছে। "বৎস! বাহিরে যেমন তুই রয়েছিস, এমনি তুই আমার বুকেও আছিস।" তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে কি অভিনব আবিষ্কার করে ফেললুম, ভগবতীর বুকে আমাকে খুঁড়ে বার করলুম এবং এ মূর্ত্তি জ্ঞানময় অর্থাৎ আমার জ্ঞানময় মূর্ত্তি ভগবতীর বুকেই সংস্থিত। এই অন্তর বাহ্য

রচনাও যা, বীজ ও বৃক্ষ রচনাও তাই। আগে বীজ, কি আগে বৃক্ষ, এই নিয়ে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ তর্ক আছে। বীজ ও বৃক্ষ একসঙ্গেই আছে, এই হল এর সমাধান। এ উভয়কে যুগপৎ স্বীকার করতে হবে। তেমনি আমার ভগবতীকে, আত্মা ও শক্তি উভয়কেই যুগপৎ বলে স্বীকার না করলে চলবে না। এই দুই তত্ত্ব দেখে যদি ব্যবহাবশীল না হই, তবে মহাশক্তিকে ধরা যাবে? তবে কি কথার দ্বারা বাহ্য জগৎকে পরিচালিত করা যাবে? কথা কওয়া ও মন্ত্র প্রয়োগ করা একই জিনিষ। প্রাণেব ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জগৎ সাড়া দিতে থাকবে। এই 'কথা'ই সাধন-রাজ্যের অতীব গূঢ় তত্ত্ব। আমার হাত বলতে আমার বাহ্য হাতের সঙ্গে মন এবং জ্ঞানের যে হাতমূর্ত্তি, সে মনে পড়ে যাবে। এমনি আমাব অন্ন, জল, মন, প্রাণ বলতে প্রত্যেকেরই দুই দুই মূর্ত্তি মনে পড়ে যাওয়া চাই। কোন্ দিক্ দিয়ে যাব, তার একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি। নামতে চলেছি ভীষণ স্রোতে, বেশ করে কোমরে গামছা বেঁধে নে অর্থাৎ ভাল করে গুরুকে আকড়ে ধবে থাক। মা আমার জানে যে, আমি যে খেলাই খেলি না কেন, কিছুতেই আমি মায়ের বুকছাড়া হব না।

বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে, এ কথা বললে মনে হয়, যেন বৃক্ষটা গুঁড়িয়ে, তালনাড়ু পাকিয়ে, ছোট হয়ে বীজের মধ্যে আছে। কিন্তু তা নয়। আমি যদি বীজের মধ্যে ঢুকতে পারতাম, তা হলে দেখতাম, বাহিরের বৃক্ষের মতই অনন্ত বৃক্ষ সেই বীজের মধ্যে

দাঁড়িয়ে আছে। আমি অণুত্ব নিয়ে বীজের মধ্যে প্রবেশ করলে এই দৃশ্যই দেখতাম। এটি ভারি দামী কথা। বাহিরের গাছে চোখ পড়লে কি দেখব ? দেখব, রাশি রাশি বীচি সার-গাঁথা হয়ে তাব ভিতর দাঁড়িয়ে আছে, আবার তার মাথায় কতকগুলো বীচি ছড়িয়ে আছে, তা হতে আবার বীচি, আবার বীচি, এইরূপ অনন্ত বীচির ধারা। একটি অণু বীজের মধ্যে অনন্ত বৃক্ষস্থ। অনন্ততত্ত্বে প্রবেশ করলে দেখব, একটি বীজের মধ্যে অনন্ত বৃক্ষ এবং অনন্ত বৃক্ষে অনন্ত বীজ। তেমনি আত্মা ও শক্তি বা ভগবান্ ও বিশ্ব, এ উভয় ধারারও অন্ত পাবার উপায় নাই। এই তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা দেখছি যে, আমাদেরও কিছুই হারাবে না; আত্মা ও শক্তি, অন্তব ও বহিঃ সমানই থাকবে।

আমার অন্তর এবং বাহির, এ উভয়ের মধ্যে আমি যেন একটা বেড়ার মত। নির্গুণ আত্মা সেতুস্বরূপ; ইনিই অন্তর ও বহিঃ ধারণ করে আছেন। এমন আত্মাকে এখন আর শক্তি-হীন বলব না। বিশ্বকেও আত্মহীন দেখব না। যেখানে দৃষ্টি পড়ে যাবে, সেখানেই দেখব, অন্তর ও বহিঃ এক হয়ে আছে। এখন বুঝেছি, অন্তর-জ্ঞান থাকা মানেই বহির্জ্ঞান থাকা। আমরা যেখানে as it is আছি, এইখানেই ভগবান্‌কে লাভ করব অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের অন্তর্বাহ্য হয়ে যাবেন। তোরা কেবল শ্রদ্ধাবান্ ও সংযত হয়ে শুনে যা; এতে শক্তি লাভ হবে। *

চুম্বক-শক্তিতে বা Magnetic forceএ জগৎ তৈরী হচ্ছে। ভূতজ্ঞান ছাড়িয়ে এ সবের আলোচনা করলে চুম্বকশক্তি

আসবেই। এ বিজ্ঞান সাক্ষাৎ তিনিই। তিনিই আপনাকে ভূতময়ী, জ্ঞানময়ী, সব করেছেন। কিন্তু মাটিতে ঠেকলেই এ শক্তি আর খেলা করে না ; ভূতে নামলে এ শক্তি আর চলে না, নিষ্ক্রিয় বা **neutral** হয়ে যায়। একটা তার নিয়ে **magnetic field**এ ঘোরালে যেমন তাতে **electricity** তৈরি হয়, তেমনি আমরা ভগবানের কথা কইছি মানে, মায়ের কোলে বসে মাকেই মন্থন করছি। বালক যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করে, আমরাও তেমনি মায়ের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা মায়ের স্নেহ বার করে নিচ্ছি। জয় মা ভগবতী ! কত **reality**র কাছে এসে পড়েছি দেখছ ? মায়ে বসে মাকে পাক দে, পাক দে। নতুবা ভূতে নেমে পড়বি। এই মন্থন ভয়ানক জিনিষ। সমুদ্র-মন্থনের মত এ মন্থনের সুমেরু পর্ব্বত হল আত্মত্ব। বাসুকি হল আত্মশক্তি। মন্থন হবে মায়ের বুকে, ভূতে নামলে হবে না, জ্ঞানময় ক্ষেত্রে এই মন্থন হবে। এ মন্থনের ফল অমোঘ। অমৃত উঠতে বাধ্য। তোরা ঘরে গিয়ে যা করিস কর, কিন্তু আমার কাছে এসে ঠিক হয়ে দাঁড়ালেই আমি নিশ্চিন্ত হই। এ অনন্তের ব্যাপারে যত ক্ষতিবৃদ্ধি হয় হোক, সে কথায় আমার ভরস্তর নেই। যারা এ অনন্তে নির্ভরশীল নয়, তাদের কাছেই যত বাঁধাবাঁধি। এ গুরুর সংস্পর্শ যারা লাভ করেছে, তাদের কাছে সমস্ত আইন টুটে গেছে।

———

১৩ই জুন, ১৯৩৭, ববিবার।

কাল রাত্রে ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরীর কথা বলছিলুম। ভগবতী, 'যিনি অনির্ব্বচনীয়া, একদিকে ঘটে ঘটে মূলরূপে অবস্থান করেন, তিনিই নিজে থেকে নিজের শক্তি বার করেন। এর মানে এ নয় যে, তাঁর একটি শক্তি আছে; সেটিকে তিনি বার করেন; এর মানে এই যে, যত কিছু শক্তিপ্রকাশ, সে সব তাঁরই প্রকাশ। এ না ভাবলে বড় ভুল হয়। যদি শক্তি তাঁ থেকে আলাদা হয়, তবে তাকে পরিচালন করবার জন্য অন্য শক্তি, সেই শক্তির পরিচালক আবার আর এক শক্তি, এইরূপে শক্তির অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। তা নয়; তিনিই শক্তি। যখন তিনি শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি শক্তিমান্। 'ন স্বরূপো ন বিরূপো বা'—আত্মতত্ত্বের সঙ্গে একান্ত একও নয়, একান্ত আলাদাও নয়। একেই আমরা সাক্ষাৎ চিন্ময়ী ভগবতী বলে গ্রহণ করলুম। ইনি তিন রকমে প্রকাশ পান—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অথবা অভিজাত হওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া আর তামসিক অবস্থায় স্থিত হওয়া। শক্তির আড়ালে পড়ে গেল বলে তামসিকতা; যেন বিলয় হয়ে গেছে, শক্তিত্ব এখানে আর নেই। আর বলেছি, এই যে মহাশক্তির প্রকাশ, এ প্রকাশ থেকে যা কিছু জাত হয়েছে, সে সবেতেই তিনি আছেন। ফুল, ফল, জল, মানুষ, সবের ভিতরে দৃষ্টি দিলেই আর কিছু দেখা যায় এই ত্রিগুণা ভগবতী ছাড়া? তা হলে ভিতরে যিনি প্রকাশ হন, তিনি ভগবতী, আর শক্তিত্ব চাপা

দিয়ে উপরে স্থিতিশীল তামসিক অবস্থা। তুমি আমি ভিতরে ভগবতী, বাইরে ছাল-বিশিষ্ট বিশিষ্ট কিছু নাম-রূপ-ব্যাকরণ। ভিতরের শাঁস আর বীচি স্বয়ং ভগবতী, বাইরের খোসাটি তুমি আমি।

ছোট কথায় অর্থাৎ নাস্তিকের ভাষায় কথা কইতে গেলে চিন্ময়ীকে এই ভাবে বুঝতে হয়। কিন্তু আস্তিকের ভাষায় বলতে হয়—"তুমি রয়েছ"। 'তুমি রয়েছ' এইরূপ জ্যান্ত-ভাবে বলতে হলে এঁর নাম দিতে হয় 'মা'। এঁর প্রতি কথায় দেখতে পাই, যেন ইনি কারো কামনা পূরণ করতে আবাহিত হচ্ছেন। বাসনার ডাকে আকাঙ্ক্ষার আগুন যার বুকে জ্বলে উঠেছে, অমনি এই ত্রিধাশক্তিময়ী ভগবতী সেখানে ফুটে উঠলেন, কামনাটি পূরণ হোক, এই ভাব নিয়ে। ফুল চাইলে ফুলের গুণ, রূপ ও সার্থকতা এবং কোন্ রাস্তায় ফুল আসবে, সে দিকে দৃষ্টি, এই দুই মিলে কামনা পূর্ণ হয়; কি পাব, কোন্ দিক্ থেকে পাব, এই দুই রকম। এই দুই একত্র হয়ে যেখানে থাকে, তার নাম কামনা। কাং—কাকে চাই, এই কথা যে বুকে জাগছে, ঐ হল কামনার 'কা'; আর 'ম'—কোন্ অব্যক্ত, অপ্রাপ্ত ভূমি থেকে তাকে সংগ্রহ করব, তাই লক্ষ্য করলে কা+ম, এই পাবে। কাকে কোন্ অব্যক্তভূমি থেকে পাব, এই হল কামনা। আমি যদি হই জ্যান্ত ভগবতীতে ন্যস্ত, আমার ছাল যদি হয় বাইরের এইটি, আর ভগবতী যদি শাঁস হন, তা হলে পাবার রাস্তাও ঠিক আছে; এই দিক্

থেকে পাব। আমার ভাষা তা হলে সেখানে কি হবে? ও ঘরে টাকা আছে মনে পড়লে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে যায় ঐ ঘরে। তেমনি ভগবতীর কাছে আমি যা চাই, তাই পাব, এ মনে হলে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ত্রিগুণময়ী ঐ ভগবতীতে। তখন আমার ভাষা কি হবে? আর যদি ভগবতীই কাম্য হন, তা হলে কি ভাষা হবে? "আগচ্ছ, তিষ্ঠ, গচ্ছ"—এস, বসো, আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, এখন তুমি স্বস্থানে যাও—এই হবে আস্তিকের ভাষা। এই ব্যবহার এবং জীবনকে, জ্ঞানকে মথিত করে এই ভাষা, ইহাই হবে ব্রাহ্মণের ব্যবহার। এই তিন গুণের পরিচালনার দ্বারাই যেখানে যা কিছু হচ্ছে, সব পরিচালিত। আমি এই ত্রিগুণে অবস্থিত; তাই যে কোন কামনা সিদ্ধ করতে হলে তার ভাষা হবে,—'আগচ্ছ, তিষ্ঠ, গচ্ছ'; এস, বসো, স্বস্থানে যাও। এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাস্তায় ঢুকলুম।

যে পুরুষ গুরুকৃপায় জ্ঞানতত্ত্বে ঢুকতে পেরেছে, বিশ্বটা চিন্ময় ছাড়া কিছু নয়, এটা বুঝেছে, তার পক্ষে এ কথাটা খুব সহজ। যারা ঢোকেনি, তারা ভূতজ্ঞানে থেকে ওখানে যেতে পারবে না। যে ঢুকেছে, সে জলের প্রয়োজন হলেই মাকে বলবে,—"এস, জল দাও, যাও।" অক্‌সিজেন হাইড্রোজেন মিলিয়ে জল পাব, এ কথা সে বলবে না। সে কত স্বাধীন, কত আপ্তকাম হয়ে যাবে জীবনে। গুরুর সঙ্গ পেয়ে এই রাস্তায় যদি প্রবেশ করতে না পারি, জীবনে বিড়ম্বনার আর

অবধি থাকবে না। ভগবতী ত একটা যুগকে মুহূর্ত্ত করতে পারেন, মুহূর্ত্তকে যুগ করতে পারেন। বাঁধা আইন আর নেই; তোমার ইচ্ছা, তোমার দৃষ্টি, এই হল আইন। বাকী আইন বাইরে আছে। এখানে তোমার সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হলেই 'আগচ্ছ, তিষ্ঠ' এই আইন। বাইরে তামসিক কড়া বিধান আছে। ওখানে প্রাণময়ীর কোন সাড়া নেই, হৃদয়ের সাড়াশব্দ ও রাজ্যে নেই, ওখানে চীৎকার করলেও কর্ম্ম-সকলের দড়ি বাঁধা আছে। এখানে তামসিকতা গেছে বলে আইনও গেছে, আইন হয়ে গেছে মাতৃস্নেহ। যদি এমন হন এই মা, তবে মুহূর্ত্ত যুগ হয়, যুগ মুহূর্ত্ত হয়।

আমরা যদি কেউ এখনই মরে যাই, তবে উপস্থিত কাজ গোছাবার মত এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চলতে চলতে এক সময় আমরা দাঁড়াব জানি। কিন্তু এখনই যে মরে যাবে, তার পক্ষে কি হবে? আর কিছু দিন এ জীবন ধরে রাখতে পারলে এই ভূমিতেই সার্থকতা আনতে পারবে; কিন্তু "নো চেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ", যদি তাঁকে না পাই ত আমার 'মহতী বিনষ্টি' হবে। আর যে থাকল, তার আপ্তকামতা হবে। কিন্তু জীবনে এর আশু প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা 'রক্ষ' প্রভৃতি যা বলছ, সে সব summarise করলে দেখতে পাই, এই জ্ঞান, এই যে গুরু আবির্ভূত হলেন, এইটুকুই পুঁজি। এখনো এক পা জলে, এক পা স্থলে; এক পা ভগবতীতে, এক পা পিছনে, ভূতের ভূমিতে টানছে। এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু

এলে এক পা জলে, এক পা স্থলে। একদিকে এক পা বাড়ালেই ভগবতীর সেই কোল পাই, যাতে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়; আর এক পা তুলতে পারছি না। এই যে আলো ও আঁধারের সন্ধিস্থল, এখান থেকে কে পরিত্রাণ করবে? এ পাশে হল বিধানের রাজ্য, ও পাশে হল স্নেহের, প্রীতির, ভালবাসার রাজ্য। তাতে পা ঠেকিয়েছি। গুরু দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যদি জোর দেন ত এখনই পা সরসর করে চলে যাবে। গুরু যদি জোর না দেন ত এ পা কি করে উঠবে? গীতায় বলা আছে বটে যে, ইহকালের পুঁজি নিয়ে সে যোগীর ঘরে জন্মাবে। কিন্তু আমরা যে জ্ঞানের আলোচনা করছি, সে জ্ঞান বিধানের রাজ্যের বাইরের জিনিষ। আমি আগামী জন্মে আর একজন বিজয়কৃষ্ণের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পাব, এটা বিধানের বিচার। এখানে তা নয়। একদিকে ত্রিগুণময়ী শক্তি; ক্রিয়া ও কর্ম্মফলের বাঁধনে ভূতে আটকাচ্ছে, আর এক পা আছে মাতৃস্নেহে। বলবান্ কে হবে? বিধান, না স্নেহ? স্নেহ বলবান্ হবে, যদি সত্য সত্য মানা হয়ে থাকে; মানা সত্য হয়ে না থাকে ত বলবান্ হবে না। তাই ভগবান্ বলেছেন, "আমার অধিদৈব, অধিভূত ও অধিযজ্ঞ, এই তিন রূপের পরিচয় যারা পেয়েছে, তাদের প্রয়াণের সময় তারা যুক্তচেতা হয়ে আমাকেই পাবে।" "আমি ত্রিগুণময়ী, এ যারা জেনেছে, তারা আটকে গেলে শুধু ঐ জানার জোরে আমি নিজে আকৃষ্ট হয়ে তাদের নিয়ে যাব।" এই আমাদের ভরসা। এই মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করলেও আমাদের যা

কিছু অপ্রাপ্য রইল, সে সব পাব। তিনি ঘরে বসে হাত বাড়িয়ে নৌকা ধরে টান দেবেন। তা হলে এখন আর নাস্তিকের মত কথাবার্ত্তা কইব না। এখন থেকে আর বলব না যে, "কর্ম্মফলে পড়েছি, তাই এই দুর্গতি।" আস্তিকের কথা কি হবে? "আগচ্ছ, তিষ্ঠ, গচ্ছ।" "দাঁড়াও মশায়" বলে জগৎকে থামিয়ে যদি মাকে "আগচ্ছ" বলতে পারিস, তবে জানবি, ত্রিগুণময়ীতে আস্থাবান্ হয়েছিস। কথা বুঝলি?

আমি মাকে বললাম—"আগচ্ছ, তিষ্ঠ।" উঠে হয় ত দেখলাম, যার জন্য মাকে ডাকলাম, তা পেলাম না। তাতে কি সব বৃথা হল? বিধানের রাজ্যে থাকলে তাই বলবি বটে। কিন্তু এ রাজ্যে থাকলে নিঃসংশয় হয়েও যদি ফল এল না দেখ, তাতে বুঝতে হবে, যে মাত্রায় নিঃসংশয় হওয়া উচিত ছিল, তা হইনি। তাতেও কি সেটা ব্যর্থ হবে? একটু কালাধীন হবে, একটু বিলম্ব হবে, একেবারে ব্যর্থ হবে না। মাকে ছুঁয়ে যখন বলেছ, তখন সমস্ত কাল অতিক্রম করে তোমার কাছে আসতে সে বাধ্য; এই তাঁর হার্দ্দ ব্যবহার। 'সূর্য্য অস্ত হবে না,' এ কথা তুমি বললে আজ হয় ত সূর্য্যাস্ত বন্ধ হবে না, কিন্তু একদিন হবে। ঋষি বললে আজই হবে। "আমি তোর স্নেহে এত ব্যাকুল হয়ে আছি, তোর ঐ বলাটা একটু সত্য হলেই ওটা হবে।" এ বলা তাঁর বুকে পাথরের মত হয়ে থাকবে, ভেঙ্গে পড়বে না, এই হল এ জায়গার অদ্ভুত শক্তি।

মাকে যে ভগবতী বলে না দেখেছে, তার সব কামনাই ক্ষুদ্র

এই আমের রূপ দেখে ছোট ছেলে সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু তুই শাঁস না খেয়ে সন্তুষ্ট হবি না। তোর আর চামড়ার লোভ থাকবে? খোসাটা ফেলিসনি বলবি আর?

এই ঘরটিতে কেমন করে উভয় বিপরীত এক জায়গায় সমন্বিত হয়ে আছে, তা পূর্ব্বে বলেছি। বিপরীতধর্ম্মী তত্ত্ব, রূপ ও অরূপ একত্রে কিরূপে সমন্বিত হয়ে থাকে, তা বুঝিয়েছি। জিহ্বায় অরস থেকে ঝাল টক্ বেরিয়ে পড়ে; তাতে জানি, রস অরস একসঙ্গেই রয়েছে। রূপ এবং অরূপ উভয়ের সমাবেশ হয়েছে রূপতত্ত্বে। এইরূপ শব্দ, অশব্দ, স্পর্শ ও অস্পর্শ, সকলেরই সমাবেশ এখানে।

এই কদিন যা আলোচনা করলুম, তাতে জানলুম, ত্রিগুণের মাত্রা, ভূত ও তত্ত্ব, সব একত্রে রয়েছে। জাত হওয়া, স্থিত হওয়া, বিলয় হওয়া, ত্রিগুণের দ্বারাই এই তিন ধর্ম্ম ভূতে ও জ্ঞানে খেলা করে। ভগবতি! তোমার ত এই ধর্ম্ম—জাত হবে, থাকবে, চলে যাবে। আগে থাকতেই জানি, তোমাকে আনতে হবে, রাখতে হবে, ফিরে পাঠাতে হবে; এই জেনেই সব করছি। এতে আমাদের আর কিছু অগ্রসর হবার পূর্ব্বে স্মরণে রাখব, মায়ের পূজার আর তিন মাস বাকী আছে। এই তিন মাসে 'আগচ্ছ, তিষ্ঠ, গচ্ছ' অভ্যাস করে মন্ত্রচৈতন্য করে নেব। এই ভূমিতে হবে আমাদের তিন মাসের তোড়জোড়। এবারকার পূজা হবে আমাদের এই রকম।

এই 'আগচ্ছ, তিষ্ঠ, গচ্ছ' এক শক্তির তিন মাত্রা—গুণ

গুণিত করা, multiply করা—addition নয়। ৪ × ১০ = ৪০, এটা সুবিধে, না ৪ + ৪ + ৪ + ৪ ইত্যাদি = ৪০ সুবিধে? এমন এক পুঁজি তোদের হাতে দেব, যাকে বলব, তিনগুণ কর। ১গুণ করবি, তার মানে জাত করবি; ২গুণ করবি মানে, স্থিত করবি; ৩গুণ স্বস্থানে ফিরে যাওয়া—এমন একটি পুঁজি দেব।

দেবীর স্বস্থান কোথায়? আত্মায়—আত্মতত্ত্বে। আত্মতত্ত্ব দেখতে একান্ত নির্গুণ, কিন্তু এঁ থেকে ত্রিগুণময়ী জাত হন, ফুটে বেরোন। জিহ্বাকে কে মুখে রাখত, এত রসের প্রবাহ যদি না সে ঢেলে দিত? এই আত্মতত্ত্ব কে বুকে রাখত, যদি এঁ থেকে ভগবতী না বেরোতেন? তাঁর যাওয়া আসার পথটা চিনিয়ে দেবার জন্য মা আমার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হচ্ছেন। আমরা খালি ফুল, ফল ইত্যাদি বাহ্য মূর্ত্তি দেখছি; তার ভিতরের মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি না। এত ভাগ্যবান্ আমরা? এই আত্মত্বে ভগবতী? তবু আমি ক্ষুদ্র জীব! এই কলঙ্ক বহন করবি? না, পরিচয় দিবি 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। 'অয়মাত্মা পরমাত্মা' বল্। এখনো শেয়াল কুকুর বেড়ালের লাথি খাবি? তুই ভগবতী, এখনো ছিন্ন বসন পরে বসে থাকবি? আর তোমার এ কি আত্মহারা ভালবাসা, তা বুঝতে পারি না! যার একবার ভগবতী বলে প্রকাশ হলে সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেন নিয়েছ এ বিচিত্রতা? "বৎস! তুই যে স্বাধীন হতে চেয়েছিলি। ছোট হব, এই ইচ্ছা, এই স্বাধীনতায় তোকে ছেড়েছি। সুতো ধরেই তোকে আবার টানছি। শুধু মহত্ত্ব দেখলে, ক্ষুদ্রত্ব না দেখলে, আলো দেখলে,

আঁধার না দেখলে সার্থকতা পেতিসনে। এই মানুষ, একটা মশা টিকটিকির দংশনে পাগল হয়ে যাস, আবার জগতের যা কিছু সব ছেড়ে দিলি—এ সব মা বলে। জেনেছিস মাকে? এস, আগচ্ছ মশা মাছি, অনন্ত ঐশ্বর্য্যরূপে আগচ্ছ। কি মজা! কর সুখ ভোগ। আবার দেখ, অনন্ত আত্মা তোরই ঢেউ, আত্মত্ব ছাড়া কিছু চাইনে, কিছু নাই,—সব শান্ত। এই উভয় পা—এই আমার মায়ের দুই পা।'

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৭, রবিবার।

ব্রহ্মতত্ত্বে কতটা অধিকার হলে এইরূপ 'এহি, তিষ্ঠ, গচ্ছ' বলা যায় বোঝ। কতটা স্থিরভূমি পেলে এরূপ হয়। এই মানুষ, কোথায় ভগবান, তা জানত না, কাতর কুণ্ঠিত; সে মানুষ পরিবর্ত্তিত হল, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে বসে আছে, মায়ের কাছে চাইছে, 'দাও জল,' অমনি জল এল; 'দাও অন্ন', অমনি অন্ন এল; কতটা অধিকার হলে মানুষ এই মহামহিম স্তরে পৌঁছতে পারে। এখন দেখছি, ভগবান সাধ্য নন, ভগবান সিদ্ধ; যেমন বাতাস আছেই, খালি টেনে নিলেই হল। কি ভয়ানক কথা! এই ভূমিতে আমরা উঠব, আর তার কোন পুঁজির দরকার নেই! "শরণাগত হও" ইত্যাদি যে সব উপদেশ তোমাদের শোনা আছে, এখন আর তার কোন মূল্য নেই, এখন শুধু আমার বলার উপর সব নির্ভর করছে! এ কি মহৎ

দান জীবেব উপর! কেন এত বড় দান হয়? জীব তাঁর সন্তান বলে। তিনি আপনাকে ব্যাপ্ত করেছেন কিনা টুক্‌রো টুক্‌রো করে : তাই এটা সম্ভব হয়। ঋষি ছাড়া এ আলো কেউ পেয়েছে, এঁকে এই ভাবে বর্ণনা করতে পেরেছে দেখা যায় না। পারলে পারতে পারত সবাই, কিন্তু পারেনি। ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী ভক্তের কাছে এ কথা বল, সে বিশ্বাসই করবে না। ব্রহ্মণ্যস্তর কত বড় স্তর, তাই দেখ্‌ছি। নিজের সন্তান কি না! যে তুইকে তুই বলে এত দিন জানতিস্, এখন দেখছিস, সে তুই তুই না। এ 'তুই'কে গড়ে তুলেছেন তিনি অণু করে; যুগযুগান্ত লেগেছে তাতে, কিন্তু আবার এক মুহূর্ত্তেই গড়ে তুলতে পারেন। আর এই যে বিস্তৃতি, এ হৃদয়েরই বিস্তৃতি, আর কিছুর নয়! হৃদয়ের ব্যাপ্তিই সন্তান।

আমরা জানি, এই 'আছি'কে হারালেই হয়ে গেল মৃত্যু। 'আমি' বলে যে পরিচিত, সে ভোক্তা জীব। আবার তিনি হলেন আদি ভোক্তা—'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমার ব্রহ্মত্বকে ভোগ করচি আমি; সুতরাং 'আমি' অংশ হল ভোক্তাংশ। আর দাতা অংশ—যে অংশ স্বতঃসিদ্ধভাবে বেরোচ্ছেন; 'আমি' এই আয়তনের দ্বারা যিনি গৃহীত হচ্ছেন। সুতরাং যা কিছু ফুটছে, 'আমি' ছাড়া কেউ কিছু গ্রহণ করতে পারে না। 'আমি' এই শব্দটি ধরলে দেখবি—চিদাকাশ প্রকাশ হয়। 'আছি' বললেই একটা আকাশবৎ ভূমি তৈরী হয়। 'আছি' না থাকলে কোন প্রকাশ হয় না। অনির্ব্বচনীয় যিনি, তাঁকে প্রকাশ করা যায়

না। 'আছি' বললেই দেখবি গগনোপম মূর্ত্তি। 'আমি' এই প্রকাশকে বা assertionকে ভাল করে দেখবি। সে অনুভূতিময়, বেদনপূর্ণ, এমন কিছু নেই, যা তার কাছে অননুবেদিত। সম্বেদিত হচ্ছে না, এমন ভাব এখানে পাবি না। স্বসম্বেদন, নিজেকে নিজে অনুভব করছি, 'আমি' হল এই বোধযুক্ত। এই বেদনই বায়ু, বাতাস বা প্রবাহ। ঐ গগনোপম জ্ঞান যেমনি ফুটল, আর একটু বাইরের দিকে যেমনি এল, অমনি স্বসংবেদনময় একটি বেদন, ব্যথা খেলা করতে লাগল—প্রাণ পরিস্ফুট হল। ঐ যে কম্পন, বেদন, ওতে প্রতিফলিত হল বায়ু—আগে যেমন প্রতিফলিত হয়েছিল আকাশ। আর একটু ভরপূর হলেই ঐ বেদন হয়ে যায় আলো; সেই আলো হল তেজ; বাইরের আলো আর ঐ আলো এক জিনিষ। তখন প্রাণটা বিপুল আনন্দে ভবে যায়, যোগসুধা বা রসের একটা স্থানকে হড়হড় করে বিদ্রাবণ করে দিতে থাকে। ইহাই অপ্‌তত্ত্ব। এই অপ্‌ আর বাইরের জল এক জিনিষ। আর এই যে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, এ সবটাই বহির্ম্মুখী। এরা পূরাদস্তুর প্রবাহিত হয়ে যেতে থাকলে এদের সীমা থাকে না, আয়তন রচনা করতে পারে না, গুটিয়ে নিয়ে এক করতে পারে না। সুতরাং যে তত্ত্বে আয়তন রচিত হল, তার নাম গন্ধতত্ত্ব, আধারশক্তি। গং = গচ্ছন্তং, ধ = ধত্তে = গন্ধতত্ত্ব। এই হল শেষ সীমা; 'অস্মি' থেকে গলে বেরিয়ে এসে এখানে স্থূল সীমা নেয়। বেরিয়ে আসছে আর ভিতর-মুখে যাচ্ছে, সেই জন্য নাকের সঙ্গে যোগ; বেরিয়ে যায় ও বিধৃত

হয়। প্রাণের বাহ্য আয়তন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, তাতেও দেখতে পাচ্ছি, নিশ্বাস প্রশ্বাসেও দেখছি। নিশ্বাসকেও টেনে নিতে হচ্ছে, নইলে সে বেরিয়েই যায়। জ্ঞানতত্ত্বেও দেখলাম, বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে, সুতরাং নাসিকাই তার স্থূল আধার হল। নিশ্বাসের সঙ্গে আর গন্ধতত্ত্বের সঙ্গে যোগটা একবার দেখ। একটা শক্তি বেরিয়ে আসছে আর ফিরে আসছে, এর সঙ্গে এমন একটী কৌশল দেখিয়ে দেব, যাতে বাতাসের সঙ্গে, নিশ্বাসের সঙ্গে গন্ধ পাবি!

এই যে পাঁচটা বিভাগ দেখলাম, আগে ফুটল আকাশ, তার পর বায়ু, তেজ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চানন আমি। এই পাঁচটা মুখের খোরাক যদি বন্ধ হয়েছে ত আমি আর নেই; পাঁচটা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ হলেও আমি আর নেই। আকাশ আদি পাঁচটা ভোগ্য, আর পঞ্চ করণ, এই নিয়েই আমি। তা বন্ধ হলে আমি ঘুমিয়ে পুড়লুম, মূর্চ্ছা গেলুম, মরে গেলুম ইত্যাদি। কিন্তু যাতে মরি, সে কি ফুরোয়? সে ফুরিয়ে গেল বলে বিবেচনা করি ততক্ষণ, যতক্ষণ এই পঞ্চানন 'আমি' জাত হয়ে আছি যাঁর বুকে, তাঁকে না জানি। কিন্তু তাঁকে যদি জানা থাকে, তবে যখনই আমিত্ব যাবে, তখনই ঐ ভূমিতে আমি আছি জানব; 'আমি'র আকারে জানব না, আত্মত্বের আকারে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আকারে জানব। 'আমি' একটা ক্রিয়া। আকাশ ইত্যাদি ফোটা—এও ক্রিয়া; বিদ্রাবণ, গন্ধ পর্য্যন্ত সবই একটা প্রকাশ, ক্রিয়া। যাঁর বুকে বসে এই ক্রিয়া করছি, তিনিই সাংঘাতিক জ্ঞান-

তত্ত্বে এই যে শক্তিত্ব-বিলাসের বাহ্য মূর্ত্তি দেখলাম, এই মূর্ত্তির অভিব্যক্তিতে কেমন করে তিনি আমাকে জাত করছেন, আবার কেমন করে আমি ওঁ'তে বিলীন হচ্ছি, তাই দেখ্‌তে হবে। ভগবতীর শ্বাস-প্রশ্বাসই হল আমাকে বিলীন করা ও আমাকে ফোটান। এর সঙ্গে জীব-প্রকৃতির যোগ দেখ—জীবের একটা প্রকৃতি আছে, স্নেহভাজনদের শির ঘ্রাণ করা, মাথা শোঁকা। মহাভারতে এর দৃষ্টান্ত আছে।

এই যে মানুষটি, যে আপনাকে পঞ্চানন হতে দেখছে, আর সে হওয়াটা ভগবতীর শ্বসনক্রিয়া মাত্র যে বুঝে নিয়েছে, সুখদুঃখবৎ, শীতাতপবৎ, জগতে যত কিছু থাক, সবই তুমি, এই ভূমিতে এসে সে দাঁড়ায়; স্বতঃসিদ্ধ নিজত্বের দ্বারা তার জ্ঞান পূর্ণ হয়ে যায়। কে জানে স্ত্রী, পুত্র, জল, মাটি, তুমি ছাড়া আর কেউ ফুটছ না; এই যে পঞ্চ মুখ, এই যে ভোগ করার পাঁচ মুখে মা আমার ফুটে গেছেন, বৈচিত্র্যের আর সীমা নেই; কিন্তু সব এসে মিলে গেছে এই নিজত্বে, এই যে দেখছে, সেই সব পেতে পারবে। জলরূপী মা, তোমায় টেনে নিলাম, তুমি এস। কিন্তু এ কেমন করে হবে, তা সে জানে না। এই জ্ঞানে অবস্থান করে থাকলে এর মীমাংসা সে করতে পারবে। একটা মানুষ এক গণ্ডূষ জল খেলে, আর সমুদ্র শুকিয়ে গেল, এই হল আসল বিজ্ঞান। না শুকানই অবিজ্ঞান। এখন বুঝেছ—না? এ ভূমি থেকে এমন কেউ বেরুবে না, যে আমা থেকে স্বতন্ত্র, আমি তাকে চিনব না; সে জলের চেহারা নিয়েই আসুক আর কে

কোন চেহারা নিয়েই আসুক, সে আমার এই মা। জ্যান্ত মা? স্তুতি না করলেও মা; যেমন জগতের শরীরী মা।

আমরা যাঁকে আত্মা, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত করছিলাম, সমগ্র বিশ্বজ্ঞানের একটা মর্ম্ম এই গুহাশয়েতে শায়িত রয়েছে, একটা সমগ্র বিশ্বসার্থকতার অস্তিত্ব তাঁতে নিহিত রয়েছে; রাজার ভিতর তার সমগ্র মহিমা যেমন খেলা করে, তেমনি পরমাত্মা, আত্মা বলতে সমগ্র সার্থকতা এঁতে নিহিত রয়েছে দেখতে পাবে। এই হল তোমাদের ভূমি, বাক্‌প্রয়োগের স্থান। এখানে সমস্ত সার্থকতার পূর্ণতা টলটল করছে। আপনি হয়ে গেল জলময়ী, অন্নময়ী; তবু এখানে ভাঁড়ার পূর্ণ রইল। এখন জল বলতে ঘটি হাতে করে গঙ্গায় ছুটবি, না এইখানে আসবি? আহা হা, ধন্য ঋষি! যিনি এমন করে বিশ্বটাকে মীমাংসা বা solve করে বুকের ভিতর পাইয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তটা এই ক্ষুদ্র পোকার বুকের ভিতর পূরে দিয়েছেন। কি ভীষণ রহস্য, কি ভীষণ বিজ্ঞান! কিন্তু ঐ কথা মনে রাখিস। যে নিজের জ্ঞানময়তা মনে না রাখবি, সে এখানে দখল পাবি না। 'ভগবতী' বলতেই খোসা ঠেলে জ্ঞান-শাঁসে গিয়ে পড়। এইটুকু হুঁস করে দিচ্ছি, এইটুকুতে চোখ রাখ, তা হলে আর কিছুতে বাধা ঠেকবে না। আর এটি করবার জন্যে কি অদ্ভুত জ্ঞানভূমি তিনি পর পর সাজিয়ে রেখেছেন, তা পূর্ব্বে বলেছি। যেমন 'আমি'কে ফোটাতে হবে, অমনি তাতে অসঙ্গত্ব ফুটিয়ে তুললেন। মাঝে ঐ অসঙ্গত্ব না

ফোটালে একদিকে দাতা, একদিকে ভোক্তা তৈরি হয় না। দাতা ও ভোক্তার মাঝে জ্ঞানের এমন একটি আবরণ থাকা চাই, যাতে করে যেখানে আমি ভোগ করছি, সেখানে দানের আস্বাদ একেবারে থাকবে না। আবার যেখানে দান করছি, সেখানে ভোগের আস্বাদ থাকবে না। মধ্যে Insulatorস্বরূপ অসঙ্গত্ব। তাঁর বহু হওয়া, বহু জীব হওয়া—এতে হতে হবে তাঁকে ভিখারী ভোক্তা; এক দিকে পেতে হবে, আর এ পাশে দান করতে হবে। আমি ছাড়া কেউ নেই, সেই আমাকে আমায় দানও করতে হবে, ভোগও করতে হবে। সুতরাং অসঙ্গত্ব বলে এমন একটা জ্ঞানভূমি রচনা করলেন, যার এক পাশে গ্রহীতা, এক পাশে দাতা। শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি এক পাশে গৃহীত হচ্ছে, আর এক পাশে দান চলছে। অসঙ্গত্বের মূল্য খালি সমগ্র কাজটাকে সুব্যবস্থিত করার একটা বিজ্ঞানসিদ্ধ ক্রিয়াময়তা। কিন্তু ভাষ্যকারেরা অসঙ্গত্বকে এমন করে এঁকেছে, যাতে মনে হয়, ঐটেই যেন আত্মতত্ত্বে প্রধান। আসলে আত্মতত্ত্বে অসঙ্গত্ব প্রধান নয়, একটি উপায়স্বরূপ মাত্র। যেখানে কার্য্য-কারণরূপ যত বিজ্ঞান, সেইখানেই তত insulation। কারণ কার্য্যে পরিণত হয়ে নিঃশেষিত হয় না, কারণের উপর একটা অভিব্যক্তি হয় মাত্র; তাতে কারণের কখনও অপলাপ হয় না। H_2O নিঃশেষিত বা exhausted হয়ে জল হয়ে যায় না—সে জলেই লুকান থাকে। সময়ে আবার এমন আকার নেয় যে, জল উড়ে যায়,

H_2O বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং ক্রিয়া করতে গিয়ে কারণ ফুরিয়ে যায়, এ কখন হয় না। আনন্ত্যের বা অসীমতার বিজ্ঞানবলেই অসঙ্গত্বরূপ শক্তি খেলা করতে সমর্থ হয়। সসীম হলে সে পারত না। সীমাহীনতা না থাকলে অসঙ্গত্ব হয় না। অসীম তত্ত্বের বাহ্য প্রকাশ—অসঙ্গত্ব নামে এক সত্তা। অসঙ্গত্ব দর্শনে আনন্ত্য রইল, সীমাগুল ফুরোল, আবার আয়তনময় হলে অসীম ফুরোল, সীমাময় একটা কিছু হল, তা নয়। আয়তন মানেই সসীম বাকের, তেজের দ্বারা একটা ব্রহ্মাণ্ডকে, বিশ্বকে সীমাদ্বারা গঠিত করছে। লাফ দিতে হলে যেমন মাটির উপর জোর দিতে হয়, তেমনি সসীম কিছু ফোটাতে হলে তেজের উপর একটা জোর দিতে হয়। আত্মায় সব আছে, তাতে কিছু হবে না। একবার অসঙ্গ, neutral হয়ে, তার উপর জোর দিয়ে সব কিছু বার করতে হবে। উদ্ভিদ্‌শক্তি পরে বোঝাব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দুটো মেরু বা pole রচনা করে দুটো গতি বুঝেছে। তৃতীয় গতি, যার উপর সব কিছু নির্ভর করে, তা তারা বোঝেনি।

আমাদের এখন নির্ভর বাক্; 'মা' নাম। আমরা হাজির হয়েছি কল্পতরুর তলায়। কিন্তু খাচ্ছি মাত্র ভাত ডাল। যা কিছু আমাদের কানেই ঢুকেছে, জ্ঞানে ঢোকেনি। ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব আদি যত নাম আজ উঁকি মারছে, সে সব নাম শোনা আছে। আমার পুঁজি বাক্। এই ভাঁড়ার-ঘরে বাক্‌রূপিণী মা আমার একমাত্র অবলম্বন। আমার বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা

ভাঁড়ার-ঘর থেকে মা আমার অভীষ্টরূপে বেরিয়ে আসবেন। দাতৃত্ব আছে বলেই তিনি অক্ষর সাজতে পারেন। তাঁর ভিতরে পূর্ণতা আছে বলে শান্তত্ব আছে। ত্যাগে কখন ভোগের শান্তত্ব আসে না। এই দেখে ঋষিরা জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় উপদেশ করেছেন। যতক্ষণ না বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজের ভিতর পাচ্ছ, ততক্ষণ দুরন্ত মায়ের দুরন্ত সন্তান শান্ত হবে না। মহামহিমময়ী মায়ের সমস্ত দান নিজের ভিতর উপলব্ধি না হলে কেউ শান্ত হয় না। আপ্তকাম, আত্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরই লক্ষণ। ঐ শান্ত শিষ্ট করতে যাওয়াতেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম আঘাত পেয়েছে। ঠাণ্ডা হও, চেও না, ও সব প্রাথমিক উপদেশ। বিপুল ব্রহ্মতত্ত্বে ও সব দূরীভূত হয়ে গেছে।

অসঙ্গ হয়ে গেলাম; আর আমার কিছু নেই। কিন্তু তোমার ভিতরে কে আছে? যতক্ষণ না মহামহিমময়ী ভগবতী এ পিঠে আশ্রয় হন, ততক্ষণ অসঙ্গ হওয়া হয় না। ভগবতীর আশ্রিত, এরই নাম হবে অসঙ্গ হওয়া। এই জ্ঞান দাঁড়িয়ে থাকলে আর মাটি, আকাশ, জল চাইবে? এই ভূমিকে আশ্রয় করে তোমাদের গুরু আছেন। তোমাদের আশা পূরণ হবেই। ক্ষুধাতুরা মা বললেন,—"তোর কথা অনেক দিন শুনিনি, শোনাবি চল সেইখানে।" কি কাণ্ড! অনেক সময় আমার বাহ্য ব্যবহার দেখে আমায় বুঝতে পারবি না।

তোদের সাধন ভজন নেই। এই সুধা পান করেই তোরা জীবিত হবি। এত বড় কথা কোন মনুষ্য সাহস করে বলতে

পারে? তোদের জ্ঞানগুলোকে ভাঙ্গব, তাতেই হয়ে' যাবে তোদের ভগবৎলাভ; যেমন বরফ টিপলে জল বেরিয়ে পড়ে, তেমনি। ঘরে ভগবান্ তোর, এ কথাটা ধর্ না। তোর দুর্ব্বলতা দায়ী নয়, তোর পাপ, তোর কর্ম্ম দায়ী নয়—এ ভাষা কে তোকে দেবে?

এখনো ভগবান্‌কে চোখে দেখছিসনে; না দেখিস, তাঁকে বুকে জান্। গুরু আসছেন, আসছেন—তিনি যাকে কৃপা করেছেন, তার কাছে। এই দিক্‌টা দেখ, তা হলে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবি। তোদের দৌর্ব্বল্যের দায় কেটে গেছে। অনারম্ভ হয়ে, নতুন আরম্ভ কিছু না করে গতব্যথ হ। ব্যথা গেছে মানে, ভগবান্ আসছেন বুঝে নিয়েছি। এখন "দ্রুত এস," এই বাক্য প্রয়োগ কর। রুদ্রভূমিতে তোদের দাঁড় করিয়েছি; সেখান থেকে তোরা বল্, "দ্রুত এস।" আজ ভগবান্ আপনার ছন্দের চাবিকাঠি তোদের হাতে দিয়েছেন।

দুটো চোখ, দুটো নাক, দুটো কাণ ইত্যাদি দুটো মেরু বা Pole গ্রহণের জন্য। একটা চোখ দাতার চোখ। স্বয়ংজ্ঞান হয়ে যাবি পঞ্চবক্ত্রং নিখিল-ভয়হরং। পাঁচটা মুখ কল্পনার কথা নয়। পাঁচটা মুখেরই ক্রিয়া আছে। এক একটা থেকে এক একটা তত্ত্ব বেরোয়। মুখ মানে, যেখান থেকে বেরোয়, আর যা দিয়ে শ্বাস। বেরোয় ঐখান দিয়ে, ঢোকেও ঐখানে। বায়ু, জল, অগ্নি, সব এক এক মুখ দিয়ে বেরোয়, দেখিয়ে দেব। জলের মুখে আগুন বেরোবে না, আগুনের মুখ্ বায়ু বেরোবে না।

চলেছি মহালাভের দিকে, জীবনেব এস্পাব ওস্পার যা হয় একটা হয়ে যাবে।

৫ই জুলাই, ১৯৩৭, সন্ধ্যা।

তিন রকম সাধক—পশু সাধক, বীর সাধক, দেবসাধক। পশু সাধক—আত্মজ্ঞানশূন্য। একজন আছেন ভগবান্, তাঁকে হাতজোড় কবছি। বীব সাধক—আত্মজ্ঞানযুক্ত। আত্মাকেই, নিজেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব কর্ত্তা দেখতে লাগল। আত্মাতেই আকাশ, বাতাস, জল ইত্যাদি পদার্থ বয়েছে, এই তাব দর্শন। দেবসাধক—যত কিছু অনাত্ম, সমস্ত তাব কাছে দেবতা বলে, দেবী বলে মনে হয়, আত্মমহিমা হযে যায, সেগুলো জ্যান্ত এক একজন, এরূপ অনুভূতি আসে। জল প্রভৃতি খাওয়া—জ্যান্ত জল খাওয়া, মানে আলিঙ্গন, মানে একীকবণ। বীবসাধক বললে, আকাশ হলে তুমি, অগ্নি হলে তুমি, বাযু হলে তুমি। দেবসাধক বললে,—"অগ্নি এস! তিষ্ঠ!" অনন্ত শক্তি নিহিত যাতে, সেই পরা। তাকে জাগিয়ে নেওয়া পশ্যন্তী; জ্যান্ত দেবতা হিসেবে। মধ্যমা—ভোগ হিসেবে। বৈখরী—স্থূল বাহ্য মূর্ত্তি।

৬ই জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবাব, সন্ধ্যা।

"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ", এই গায়ত্রী যখন ধ্যান করিস, তখন কেন্দ্র দেখিস, না ব্যাপ্তি দেখিস? এই কেন্দ্র থেকেই ত

সব। আমিই ত সব? আমারই বাহ্য প্রকাশ সব? তা হলে এই কেন্দ্রেতেই সব আছে, ভগবান্ থেকে বিশ্ব পর্য্যন্ত। সবই জ্ঞান ত? তোরা সাধারণ ভাবে যখন বিচরণ করিস, সে তোদের মহতী বিনষ্টি। সেই এমন কেন্দ্রবান্‌কে যখন না দেখিস, তখন মহতী বিনষ্টি। সব ছড়িয়ে গেল। যেমনি তাঁকে দেখছিস, অমনি জানছিস—এই সত্য; আবার যেমনি ছাড়ছিস, অমনি দেখছিস, সব ভেঙ্গে গেল। এই ভাঙ্গা ও গড়া কত সহজ। এমন মহান্‌কে হারান ও পাওয়া কত সস্তা! কি করে এত সস্তা হল? যত দিন না এই জ্ঞান কাণের ভিতর দিয়ে ঢুকেছিল, এই মহান্‌কে হারান ও পাওয়া তত দিন এত সস্তা ছিল?

এইটুকু অবধি দিয়েই আমি তোদের গরু চরাতে বের করে দিতে পারতাম। এত সস্তা করে যখন দিয়েছি এ তত্ত্ব, তখন এর সেবা করবিনে? জীবনের সমস্ত লক্ষ্য এতে ফেরাবিনি? জীবনে কোথাও কিছু পেতে হলে ঐখানে পেতে হবে, এ বিশ্বাস বাঁধবিনি? আর কি পেলে যথার্থ প্রাপ্তি বলে পরিচয় দিতে পারবি, তার লক্ষ্য থাকবে না? এই বাহ্য জীবনের একটুখানি আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, তাই লক্ষ্য হবে, না অমরত্বের জন্য, ওঁর জন্য আকাঙ্ক্ষা উঠবে? না, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীমাংসার জন্য লালায়িত হয়ে পড়বি? যতক্ষণ না তা উঠবে, আকাঙ্ক্ষা ঐ জাতীয় থাকবে, ততক্ষণ সদ্‌গুরুর শিষ্য বলে পরিচয় দিতে পারবিনি।

আমাদের উপলব্ধির কম-বেশী থাকলেও, ইনি এত সন্নিহিত,

এত আমাদের জন্য আকুল। যতক্ষণ না এ তত্ত্বে সিদ্ধ হতে পারব, ততক্ষণ এ তত্ত্বে সন্তান উৎপাদন করতে পারব না, এঁর কি প্রগাঢ় বাক্ প্রাণ মন, তা বুঝতে পারব না। আমায় তিনি ডেকে নিয়ে কথা কওয়ান? এ কথা বুঝলে তার লক্ষণ এই হবে যে, এঁর কথা, এঁর সম্বন্ধে স্মৃতি জাগবামাত্র আমি হৃদয়বান্ হয়ে এঁর কাছে এগিয়ে যাব। হৃদয় না নিয়ে এর কাছে যাবার মত কাঠিন্য আর থাকবে না। হৃদয়-মেলান উপলব্ধি ছাড়া যে উপলব্ধি, সে উপলব্ধিই নয়।

'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' তোরা গায়ত্রী করিস? আর কি করিস? গায়ত্রী ছাড়া আর করবার কি আছে? এমন কোন মন্ত্র আছে, যা উচ্চারণ করতে গেলে গায়ত্রী না এসে পড়ে? এই হল সাধনার সার সম্পত্তি। কোন মন্ত্র ফুটতে গেলেই গায়ত্রীর মধ্য দিয়ে ফুটতে হবে। বেদমাতা গায়ত্রী—সকল বেদনের জননী। হায় হায়! ঘরে দেবতা থাকতে কি বঞ্চিতই থাকতে হয়! এঁকে যতক্ষণ না দেখা যায়, না আমারই আনন্দ হচ্ছে, না তোদের আনন্দ হচ্ছে। 'আমি' থেকে আরম্ভ করে আমার যা কিছু আছে, সে সব নিঃশেষে ওঁতেই পাওয়া যায়। আমি যাকে নিয়ে আমিত্বের গৌরব করি, তা ওঁতেই পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে কাঁকড়ার খোলটার মত আমিটা মরছে? হিরণ্যকশিপু মরছে, প্রহ্লাদ জাত হচ্ছে। ভগবতি! ভগবতি! আহা!

জীবত্বের মায়া, ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম, এ সব ছাড়তে পারছিস না? এঁকে ইন্দ্রিয়াদিময় করে গড়ে ফেল, হাত-পা গড়ে ফেল। নমো

নমঃ! যা ছাড়তে পারিস, তা এঁতে মিলিয়ে দে ; যা ছাড়তে না পারিস, তা দিয়ে গড়ে ফেল হাত-পা—ছেলেরা যেমন কাদা দিয়ে গড়ে। 'ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি।' 'সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি।' ইনি রয়েছেন রে? গয়াসুর যেমন বললে, "মাথার উপর থেকে পা যদি তুলেছ, আবার জাগব।" তুমি সরলেই যাতায়াত ফের আরম্ভ হবে। গয়াসুর =গতাগতি।

ঋষিরা মাকে ডাল-ভাত করে নিয়েছিলেন কি না, তাই তাঁদের কথাবার্ত্তা বলতে বলতেই এই সব হত। বাইরে মজুক পুড়ুক, এইখানটা তাঁরা ঠিক রাখতেন। এইখানেই তাঁদের কৌশল—আনন্দ। আর কোথাও কোন কৌশল নেই। যাঁকে পাইয়ে দিয়েছি, ইনি ছাড়া আর কেউ নেই। মহাপ্রজ্ঞার এই উদ্বোধন। এঁকে পেলেই সব পেলে। অন্য রাস্তায় গেলে সে ভুল রাস্তা। এত সুখ পেয়েও এখানে ঋষিরা জোর দিতেন না ; তাঁরা জোর দিতেন,—তোমাকে ত পেয়েছি, কিন্তু আমি যেন এ থেকে আর চ্যুত না হই। এতে থাকতে পারলে সবই হয়। আকাশে জলো হাওয়া দেখে বুঝো যে, জল আসছে।

জ্ঞানময়ী ভগবতীকে ভোগ করছিস না? টাকা, পুত্র, স্ত্রী, সকলের আকারে এঁকেই ভোগ করছিস না? নিজেকে ভোগ করছিস তুই ভগবতী! আহা! ভরসা হয় বলতে? 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,' এ কথা বলতে ভরসা হয়?

যখন দেখবি, বৈষয়িক ব্যাপারে মনটা মলিন হয়ে গেছে,

তখনি এঁর দিকে চেয়ে বলবি,—"কি করছ ?" অমনি দেখবি, তাঁতে স্নান করে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে। কি অজ্ঞানতার ঝামেলা থেকে বেঁচে যাচ্ছিস, তাই দেখ। হিমকণা গায়ে লাগছে। প্রাপ্তির স্বীকৃতি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখবি। ঐ কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্র, দেখতে পেয়েছিস ত ? 'ইহ চেদবেদীৎ।' ঐ 'ইহ' ছাড়া আর কেন্দ্র নেই, বুঝতে পারিস ত ? তা থেকে কত সহজে চ্যুত হই, আর কত সহজে ফের পাই, তা দেখতে পাচ্ছিস ? শ্রুতিমাত্রে হয় না ? চিন্ময় সত্তা খুঁজে বার করতে হয়, অন্বেষণ করতে হয় ? যখন পাস, তখন কি খুঁজে বার করতে হয় ? প্রাপ্তি ও বিচ্যুতি অতি সহজে ঘটে। এখন আমার যদি ইচ্ছা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই পরমতত্ত্বকে বুকে গ্রহণ করতে, তা হলে সে কি শক্ত ? কতকগুলা অভ্যাস আছে, তাই হয় না। শক্তি মানে অভ্যাস—বার বার এই স্পন্দনের উদ্বোধন কর। একবার বললি 'মা'। দ্বিতীয় বার যখন বললি, মায়ের শক্তিমূর্ত্তি হল, সজীব হল। আবার বললি, আরও জাগ্রত হল। মূলধন তোমার—'কথা'।

জীবনটাকে কত সহজ করে দিলাম ? এর ঋণ শোধ করতে পারবি ? ঋষি না হলে ঋষিঋণ শোধ করা যায় না। কি আনন্দ পাচ্ছিস দেখ !

এটা খুব সহজ। নিশ্চিত থাক্। খালি এই পথ ধর, আমি যে পথ ধরিয়েছি।—হে ভগবান্, তুমি রয়েছ ; তোমায় দেখতে পাচ্ছি—এইখানটা একটু পাকা কর, একটু ভক্তি, নিষ্ঠা

নিয়ে। এঁকে ইন্দ্রিয়ময়ী করতে চাস, করতে পারবি। কিন্তু যেটা স্থির জীবন, অনন্ত জীবন, প্রবহমান নয়, তাতে একটু শ্রদ্ধাবান্ হ। সাপের হাঁড়ি পেলে ফোঁস করাতে দেরী হবে না; সে আমি এক মিনিটে করে দেব। সাপের হাঁড়ি এই জ্ঞান, এই পরমতত্ত্ব, এই ব্রহ্মতত্ত্ব। এই জ্ঞ ও অন-সংযুক্ত যিনি, সেই তত্ত্বটি। মা আমার, আত্মা আমার, সর্ব্বস্ব আমার!

প্রবহমান জীবন—যে ব্যক্তাব্যক্ত হয়। স্থির জীবন—যে ব্যক্তাব্যক্ত হয় না। ব্যক্তাব্যক্ত যে হয়, সে তারই, অথচ সে ব্যক্তাব্যক্ততায় তার কিছুই হানি হয় না। অনন্ততত্ত্বের নিয়ম এই যে, সে আপনি যেমন আছে, তেমনি থাকবে, অথচ তা থেকে ফুটে উঠ্‌বে সব। এই শক্তিতত্ত্ব; সেই অথচ সে নয়। যে মাকে পেয়েছে, এই রহস্যে ঢুকেছে, সে-ই একে পাবে। যুক্তিশাস্ত্র হচ্ছে—যা কালো, তা সাদা নয়। কিন্তু আমাদের রাস্তা,—কিছু না হয়েও সে-ই সব। পূর্ণতায় ভরে থাক্ না; তোর কোন অভাব নেই। কিছু না পেলেও অভাব নেই।

৭ই জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা।

বাক্‌ই হল তেজ। বাক্ থেকে, ঐ তেজ থেকেই সব কিছু সৃষ্ট হয়। একজন আছেন, তিনি জ্ঞান ভিন্ন কিছু নন। তাঁর আদি শক্তি-প্রকাশের নাম বাক্। সেই শক্তিই জগতের আকার গ্রহণ করেন, আবার পুনরায় বাক্ আকারে অব্যক্ত হন। শুধু

বাক্‌মাত্র অবস্থা অব্যক্ত অবস্থা, আর বাক্য হলেই হয়ে যায় ব্যক্ত অবস্থা। যখন বাক্ আকারে থাকেন, তখন এঁর নাম হয় সংস্কার। এই সংস্কারাকার শক্তির দ্বারাই জীব পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হয়। শক্তির একটা বিশিষ্ট আকার হল সংস্কার, যার ভিতরে পুনঃ পুনঃ সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের প্রবণতা থাকে। ভগবানের আদি শক্তিপ্রকাশ যে বাক্, সে ভগবানের নিজের সংস্কার। ভগবানের একটি নাম সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বক্ষণ তাঁতে সর্ব্বজ্ঞতা আছে, তাঁতেই সংস্কার আছে। তিনি স্বীয় শক্তির অধীন নন, এই জন্য তিনি অক্রমদ্রষ্টা; সর্ব্বক্ষণই সব প্রকাশমান রয়েছে। আর জীব স্বীয় সংস্কারের অধীন বলে, অনুপ্রবিষ্ট বলে, অক্রমদ্রষ্টা হতে পারে না—ক্রমদ্রষ্টা। তার এ অধীনতা ও স্বাধীনতা নির্ভর করে নিজের অসঙ্গ আত্মত্বের দর্শন ও অদর্শনের উপর। দর্শনে অধিরূঢ় হলেই আসে স্বাধীনতা, আর দর্শন না করলে থাকে অধীনতা। এই পরম-জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের নাম শিব। শিব শব্দের ভিতর তিনটি অক্ষর লক্ষ্য করবে; তালব্য শ, হ্রস্ব ই ও ব। অব্যক্ত শক্তি যখন পরমাত্মত্বে একীভূত হয়ে যান, অন যখন একীভূত হয়ে যান, ত্রিগুণ যখন একীভূত হয়ে যায়, সেই শায়িত, শান্ত, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বকে বাক্‌প্রকাশের দ্বারা আমরা 'শ' বলে গ্রহণ করি। আর যখন তিনি ত্রিগুণাত্মিকা লীলা করতে চান অর্থাৎ যখন 'ব' হতে চান, তখন 'ই' বা 'শক্তি'র আকারে প্রকাশ হন। তখন শ আলাদা হয়ে যায় না, শ-ই শক্তিরূপে, আপনাতেই আপনার

শক্তিরূপে জাত হয়ে আপনাতে যুক্ত হন। তখন বর্ণনা হয়ে যায় শিব। ব=ত্রিগুণা, রসতত্ত্বের, জলতত্ত্বের বীজ। খেলাটা সবই রস—'রসো বৈ সঃ।' ব হল তাঁর প্রকাশ। উদ্ভিদ্ হয়ে বেরোল, উদ্ভিদ্‌শক্তি হল। এই ই-কার দর্শন না করলেই জ্ঞানতত্ত্ব হয়ে যায় শব। আত্মা যে শক্তিস্বরূপে প্রকাশ হন, শক্তিপ্রকাশ যে আত্মারই প্রকাশ, এইটি না দেখলে ব্রহ্ম হয়ে যান মড়া, উপলব্ধি মৃতবৎ হয়ে যায়। শান্ত শিব মানে, যখন শক্তি আপনার ভিতরে শায়িত হয়ে থাকে, আর কোন ক্রিয়া-শীলতা তাঁতে থাকে না। শক্তি তাঁতে একীভূত হয়ে রইল। একীভূত, একেবারে এক হয়ে যায় সলিলে সলিলমিব, সলিলে লবণমিব নয়। জ্ঞ ও অন পৃথক্ পৃথক্ ছিলেন, এখন একীভূত হলেন। সুতরাং জ্ঞও নেই, অনও নেই। দর্শনের জিনিষ না থাকলে দ্রষ্টাও থাকে না। প্রকাশ হতে গেলেই দুটি দিক্ নিয়ে ফুটবে, এক জ্ঞাতা ও এক জ্ঞেয়। সপ্রকাশ—আপনার দ্বারা আপনাকে জানছি, এই বিশিষ্টভাবে দর্শন করলে আপনাতেই দুটো জিনিষ হল। আপনার দ্বারা আপনাকে জানছি, এখন বিশ্ব আরম্ভ হয় নি। তার পর যেমন বললেন জানছি, অমনি হল 'আমি আছি', তেজ প্রকাশ হল। 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।' ওর ভিতর সচ্চিদানন্দ আছেন। আগে ছিলেন শুধু আনন্দ, যেমন জানছি বললেন, অমনি সৎ চিৎ আনন্দ বোঝা গেল। জ্ঞান বললেই মহাশক্তিরূপে যিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, তাঁকে বুঝতে হবে। তবেই শিব শব্দ

সার্থক হবে। আগে শিবং। এ কে, এই জ্ঞানমূর্ত্তিকে ধরতে পারলেই সব ফুটে উঠবে। এঁকে শ্রদ্ধা না করলে, না ধরতে পারলে কিছু ফুটবে না। নিজে তুমি জ্ঞানেতেই জাত ? জ্ঞানই ভোগ করছ ? শিব শিব !

যিনি 'শববৎ' ব্রহ্মের আদি স্পন্দন-রূপে ফুটে উঠেন, শবতুল্য মহাদেবকে শিব করেন, এই দেবীকে আমরা বলি কালী ; ইনি শিবের বুকে আছেন। ইনি এই ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মপ্রকাশের জন্য, অবাধ গতির জন্য অবকাশ ফুটিয়ে তোলেন। পরমাত্মার, অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মতত্ত্বের বুকের ভিতর আত্মত্ব-নামীয় পরাশক্তি ফুটিয়ে তোলেন। এই গতিটির নাম হল সুষুম্না। ঐখান দিয়ে মা আমার বিচরণ করেন। এই সুষুম্না সর্ব্বতত্ত্বের ভিতর অধিষ্ঠিত। এটি ছিদ্রস্বরূপ,—এখানে আত্মত্ব নিত্য অসঙ্গ। এই যে ফাঁক, এই-ই সুষুম্না। জল আগুন আমার ভিতর আছে, অথচ তারা আমাতে ল্যাপ্চায় না এই সুষুম্নার জন্য। এমন আদরের জিনিষ আছে রে ? এমন মা আর পাবি ? এই মা— বুকে। সাবধান, এই জীবত্বকে নিয়ে ফেলিস না যেন। যত ঐ ফাঁক দেখতে পাবি, তত সুখ, তত সুখ বোধ করবি। আর vacuum' যেমন শক্তিকে আকৃষ্ট করে, এই সুষুম্না যত ফুটতে থাকবে, পরমাত্মতত্ত্ব তত আকৃষ্ট হতে থাকবে অর্থাৎ ঐ ফাঁকে যত যাবে, যত আত্মাকাশে প্রবেশ করবে, তত পরমাত্মাকে পাবে। বোধ-নাড়ীর নাম চিত্রা ও বজ্রিণী ; তার ভিতর দিয়ে যে অসঙ্গত্ব আছে, তার নাম সুষুম্না। বোধ-নাড়ী দুই রকম।

জগৎমুখে যখন কাজ করে, তখন চিত্রা, আর আত্মাভিমুখে বজ্রিণী। তার ভিতরে যে ছ্যাঁদা রয়েছে, অসঙ্গ—আহা—পরমা! এই ছিদ্র অবলম্বনে পরমাত্মার দিকে যখন লক্ষ্য, তার নাম ব্রহ্মনাড়ী। সুষুম্নার ভিতর তিনটি ভাগ আছে—চিত্রা, বজ্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী। মণিধরি বজ্রিণী! ঐ নিয়ন্ত্রিণী। যেমন করেই যাও, ঐখানে নিয়ন্ত্রিণী। এর নাম মণিধরি। সর্ব্ববিশ্ব এই বিন্দুতে গ্রথিত আছে, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত।

মায়ের উদয় শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবি; মা এলেন বলে জানবি। জ্ঞানোদয়কে ব্রহ্মোদয় বলে নিবি। তোর দেখার উপর সব নির্ভর করছে। মা আছেন; তুই কি চোখে তাঁকে দেখবি, তার উপর সব নির্ভর করছে। ব্রহ্মজ্ঞের চোখ হল—রয়েছেন, ভোগ করতে হবে। পশুদের দৃষ্টি হল—নেই; খুঁজে বার করতে হবে।

৮ই জুলাই, ১৯৩৭, সন্ধ্যা:

ভগবতী বললেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদ্ বশে এসে গেল মনে হবে। ভগবান বল্‌লে শুধু নিজবোধাত্মক ভাবটি নয়, সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তি—এই সমস্তের জন্ম স্থিতি মৃত্যু যাঁর ভিতর খেলার মত ফোটে ও নিভে, এত বড় শক্তিত্ব বুঝতে হবে। পরমাত্মা বলে ডেকে যখন তাঁর বুকে যাবি, আমার বোধ যদি সত্যি সেই বোধে গিয়ে হাজির হয়, কি না হতে পারে সেখানে—এই চেতন-ভূমিতে?

চেতন নিয়েই ত সব খেলা। এই ছোট ছোট চেতনার মূর্ত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকবি ? না, মহেরণায়, মহান্ ও বমণীয় যে মূর্ত্তি, প্রতি মুহূর্ত্তে অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে যে মূর্ত্তিতে, আমার কর্ম্ম প্রভৃতি কোন কিছু যেখানে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াতে পারে না, সেই মূর্ত্তিতে যাবাব চেষ্টা করবি ? এই রকম ভাবে দেখতে চাসনি বলে দেখতে পাস না। দিনের ভিতব চার পাঁচ বার যদি এ দেখা এসে যায়, তা হলে তার স্মৃতিতেই বীর্য্যবান্ হয়ে থাকবি—ব্যাঙ্কে আমার টাকা আছে, এর গৌরব যেমন মন থেকে যায় না, তেমনি। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেব যিনি আত্মা, তাঁদের বুকেও যিনি আত্মা, এই আত্মাকে নিতে চলেছি। মানুষের আত্মা, ঘোড়ার আত্মা, জলের আত্মা শুধু নয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যিনি আত্মা, তাঁদের বুকেও যিনি আত্মা, এই আত্মাকে নিতে চলেছি। অনন্ত মহাশক্তির যিনি আত্মা, তাঁকে যখন দেখবি, তখন তুই কি হয়ে যাবি ?

এই বাতাস পেলুম ; তেমনি ভগবান্ বললে ভগবান্‌কে পেলি ? ঝড় না পেতে পারিস, বাতাস ত পেলি। তেমনি সমস্ত মহিমাসমেত না পাস, ভগবান্ বলতে খানিকটা পেলি ত। এই মহাশক্তিধর, সমস্ত শক্তির ক্ষুদ্র আকার বা miniature form নিয়ে এই সাড়ে তিন হাত শরীরটি তোব ফুটিয়ে আছেন সেই বিজ্ঞানে, যে বিজ্ঞানে তিনি বিশ্ব গড়েছেন, ভুবনেশ্বর সেজেছেন ; সেই আনন্দ, সেই হৃদয় দিয়ে তোকে গড়েছেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

"জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্য মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥" প্রথমে দুটি পাখী আছে বললেন। একজন ফল খাচ্ছে, একজন খাচ্ছে না। ফল-খাওয়া পাখী যদি না অন্যকে, ঈশ্বরকে দেখে, তবে সে শোকগ্রস্ত হয়। যিনি চেয়ে বসে আছেন, অভোক্তা, সেই অসঙ্গ পুরুষই ঈশ্বর। ওঁকে দেখলে তৎক্ষণাৎ ফল খাওয়ার শোক থেকে সে বেঁচে যায়। আর কাকেও ঈশ্বর বলেন নি, এই অভোক্তাকেই ঈশ্বর বলেছেন। সুতরাং আমরা যে আত্মাকে নাইতে খেতে, উঠতে বসতে পাই, তাতে ভগবান্‌কেই, মহিমময়কেই পাই। আত্মতত্ত্ব যে বাকের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, এই জিনিষটি ভাল করে ধরে রাখলে তেজতত্ত্ব পাবে। এখন যেমন আত্মতত্ত্ব থেকে ভগবত্তত্ত্ব পাচ্ছ, তেমনি বাক্‌তত্ত্ব ভাল করে বুঝলে তা থেকে তেজতত্ত্ব পাবে। অসঙ্গ আত্মা ভগবান্ আমার সহস্রারকে আলো করে বসে আছেন—আমার কর্ম্মজাল ধরে আছেন ত? অনিমিক্ দৃষ্টিতে আমার কর্ম্মময় জীবন তিনি ধরে বসে আছেন। তুমি এখন ব্রহ্মতত্ত্ব শুনছ; এর মধ্যে যেমন তিনি গাড়ী বা ঘোড়া একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন, অমনি তোমার গাড়ী বা ঘোড়ার ভোগ এল। এমনি করে সমস্ত ভোগের প্রেরক তিনি। আমার গতাগতি, আমার সব এঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কখন ক্ষুধা, কখন পুত্রস্নেহ, কখন আর কিছু—এ সব অসঙ্গ অভোক্তা তিনি প্রেরণ করছেন, আমি ভোগ করছি। ভূতাত্মক বিশ্বের ঢেউ ধরবার এই যন্ত্রটা, একটা পাঞ্চভৌতিক

miniature ক্ষুদ্র জগৎ—এটা তিনিই ফোটাচ্ছেন, আর আমাকে ধরাচ্ছেন। এই হল ভগবতীর সঙ্গে আমার স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ। সকলকারই এই স্থিতি; তোদেব নজরে পড়ে গেছে, সকলের পড়েনি। এই নজবে পড়া এমন একটা স্তর, যেখান থেকে ঊর্দ্ধমুখী গতি আরম্ভ হয়। সুতরাং ভগবান্‌কে পাওয়াটা বাতাসেব মত, জলের মত এত সহজ হয়ে যাওয়া চাই। যতক্ষণ তা না হয়, বুঝবে—ও তত্ত্বে আমরা এখনও সুসিদ্ধ হইনি। তা হলে এই যে 'আমি' বলে একটি জীব বসে আছি, তার পিছনেই পবমাত্মা, শিব বসে আছেন। এ একেবাবে সত্যি কথা? ভগবতি! ভগবতি!

এই যে পরমাত্মা বলে শিব বসে আছেন, তাঁকে গুরু বর্ণনা কবলেন অসঙ্গ নামে। জন্ম দিতে হলেই অসঙ্গ হতে হয়, insulatorএব মত অসঙ্গ হতে হয়। অসঙ্গ শিব মানে, ভালবাসা, দহবম-মহবম নেই; আমি মবি বাঁচি, সে মরে বাঁচে না; আমি জেল খাটলে সে জেল খাটে না—নির্ম্মম ভগবান্! ঐ যে শায়িত শান্ত পুরুষ, ওঁর বুকের ভিতর মা জেগে উঠে তবে ত ওঁকে শিব করেছে, জগৎরচনায় নিযুক্ত কবেছে শক্তিময়ী। তেমনি এ দিকে আবার যে খণ্ডভাবে জাত, তাবও বুকেব ভিতর ঢুকে, তাকেও শক্তিময় করে ভোগ সম্পাদন করছে মা। কি মহিমা ঐ শোয়ার ভিতর ছিল, যাকে তুলে শিব করলে, জাত করলে, সুন্দর করলে। ওখানে যেমন 'শ' আর 'ব'-এর মধ্যে ঢুকে শিবত্ব দিয়েছে, এখানে তেমন 'জ'

আর 'ব'-এর ভিতর ঢুকে, জীবভাবে অনুপ্রবিস্ট করে, নাম-রূপ প্রকাশ করে সে-ই ভোগ করবে। এর ভিতর লজ্জা, ক্ষুধা, শ্রান্তি, তৃপ্তি, এই সব আকারে জীবের শক্তি হয়ে তাদের ধরে আছে। এই যে শান্ত, শায়িত, অসঙ্গ—তার ভিতরেও, শিবের ভিতরেও দেখালেন যে, তিনি অসঙ্গ হয়েও আমার জন্য কাঙ্গাল হয়ে আছেন। শিবের দুই aspect, এক অসঙ্গ; আর এক, একেবারে ওর বাঁচায় বাঁচি, মরায় মরি; তৃষ্ণামূর্ত্তি ততক্ষণ ধরে রইলেন, যতক্ষণ না আমি তৃপ্ত হলুম। এমন করে ভোগে ভোগে এক থালায় খাওয়া, এক জায়গায় শোয়া। ঐ অসঙ্গের ভিতর লুকান প্রাণ আছে, যা প্রকাশ হলে এই দেখব। শক্তি ত্রিমূর্ত্তিতে, তিন রকমে আপনাকে পরিচালনা করেন—অনন্ত মায়াময়, অথচ অসঙ্গ। অসঙ্গ তত্ত্বটির কোথায় সার্থকতা? যুগপৎ মায়াময় অথচ মায়ার অতীত, এক সঙ্গে আমায় অগাধ ভালবাসে, আবার অগাধ নির্ম্মমতা। এই যুগপৎ, অন্ধকার ও আলো একসঙ্গে দেখছি, এ কথা বিজ্ঞান স্বীকার করতে পারে না। অথচ আমরা যে ভগবতীকে দেখতে যাচ্ছি, তিনি একই সময়ে ভোক্তা ও অভোক্তা। এর কূলকিনারা না পেয়ে নানা লোকে নানা ব্যাখ্যা করে। কেহ বললে, ভগবান্ সর্ব্বদা সগুণ। একজন বললে, ও প্রকাশগুলা কিছু নয়, মায়া; তিনি ঝরঝরে অসঙ্গ, অক্রিয়। এ দুই চেষ্টাই তারা করতে বাধ্য হয়েছে, এ কথা বোঝেনি বলে যে, তিনি এক জায়গায় শক্তির উপর আধিপত্য

করছেন, এক জায়গায় শক্তির দাস হয়েছেন, আবার অন্যত্র অসঙ্গ হয়ে আছেন। ত্রিবিধ শক্তিরূপে জাত হয়ে ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও অসঙ্গত্ব, সমস্তই একসঙ্গে সমাধান করেন মা আমার, যিনি পরমাত্মাকে অক্ষুব্ধ রেখেও ক্ষুব্ধ করছেন। এই তিনটি তত্ত্বের রহস্য আজ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি। হলেও বিলোপ হয়েছে। অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, জীবজ, ইনি এই তিন রকম লীলা বিস্তার করেন। ওঁর ঐ তিন ভাঁজের খেলা ধরে ফেলতে হবে। জ্ঞানবান্ ছেলে মায়ের ভৎর্সনার ভিতরও মাতৃত্ব বার করে নেয়। তেমনি আমরাও মাকে বার করে নেব তাঁর ত্রিন-জাতায় শক্তি দেখে। তা হলেই আত্মাকে পরমেশ্বর বলে দেখতে পাব। আমি পরমাত্মন্ বলে আজলা পাতলাম, উঠল শুভ্র আকাশের মত কি একটা, একটু শান্তি পেলুম ; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে ত তাতে একেবারে পেলুম না ; আর না পাওয়া পর্য্যন্ত ত তৃপ্তি নেই। আজ একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি, যেখানে ভালবাসা ব্যর্থ হবার নয়। অমন ভালবাসাময় যে একজন আছে, এইটুকুই আমায় উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে, এইটে আমাকে আকুল করবে, ব্যাকুল করবে। যতক্ষণ না ভগবান্ বলতে মাকে পাই, ততক্ষণ আত্মদর্শন হয়েও হল না, এই কথাই গেয়ে যেতে হবে। নমঃ! ভালবাসা মানেই জড়াজড়ি, সঙ্গ, ইহাই আমরা জানি ; ভালবাসা মানে অসঙ্গ জানিস্ ?

জগৎকে দু দিক্ থেকে পড়া যায়—এক, বাইরে থেকে ভিতরে, আর এক, ভিতর থেকে বাইরে। যারা ভিতরটা জানে

না, তারা বাইরে থেকে দেখে দেখে যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা ভিতরে যায়। তাদের বিজ্ঞান স্থূল, যেটা হাতে-কলমে পায়, তাই যুক্তি প্রভৃতি দিয়ে খাপ খাইয়ে বসায়। এই মীমাংসায় চলছে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক। আব এক বকম আছে, যারা ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে সেই দিক্ থেকে সব কষে কষে নেয়। এইরূপে যত কষতে লাগল, ঈশ্বরের মহিমা ততই প্রকাশ হতে লাগল। আবার সেগুলো থেকে আবও মহিমা সকল প্রকাশ হতে থাকল। ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন বলে,—ওঃ, তোমার এত মহিমা!

ঋষি বলে এক শ্রেণীর লোক ভগবানেব কতকগুলো মহিমা এমন করে নির্ণয় করে বিশ্বকে বলে গেছেন। আমরা ভগবান্‌কেও মেনে নিলাম, তাঁদেব কথাও মেনে নিলাম; বেশ খাপ খেয়ে গেল। ঐ যে ভগবান্, আর তাঁর দূত ঐ যে ঋষিরা, তাঁদেব ফেলবার জো নেই। ভগবান্‌ও যেমন সত্য, ঋষিবাক্যও তেমনি সত্য। তাঁদের বাক্য আপ্তবাক্য হয়ে থাকল। আমরা ঐ পথেই চিন্তা করি, শেষের পথে, এই দিক্ থেকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যারা, তারা বললে, এই মাটি, কাঠ, electron protone ইত্যাদি। নাম দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। এই ভাবে কষে কষে চলল। যত নতুন আবিষ্কার হয়, একটু একটু বদলে যায়। Elementএর বা মূল উপাদানের আবার একটু বিভাগ করে নাড়াচাড়া দেয়।

আমাদের মত হল, চিন্ময় জ্ঞান থেকে সব বেরিয়েছে,

তাঁ থেকে সব প্রকাশ হয়েছে। কেমন করে? তিনি ঈক্ষণ করেন, আর সৃষ্টি হয়। কি করে? পশ্যন্ চক্ষুঃ, মন্বানো মনঃ ইত্যাদি। তাঁর ঐ সব ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গ তৈরি হল, তত্ত্ব তৈরি হল। এ পাশ থেকে যারা চিন্তা করছে, তাদের কাছে রসন থেকে রস, শ্রবণ থেকে শ্রুতি, এটা অসম্ভব বলে মনে হবে। আমরা বলব—এ ঠিকই; তিনি কলন করে কাল হলেন; এইরূপ পরিচালন, জন্ম, স্থিতি, লয় সব। আমরা এ ক্রিয়াগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছি না। প্রাধান্য দিচ্ছি তাঁকে, যাঁর মনন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা সব তৈরি হয়। উত্তর বলে প্রাণ যে দিকে গেছেন, সেই উত্তর দিক্, দক্ষিণ বলে যে দিকে গেছেন, সেই দক্ষিণ দিক্ ইত্যাদি। তা হলে ভগবান্ আগে যাচ্ছেন, তবে সেটা হচ্ছে। ভগবান্ বরণ করলেন গুরু বলে, তবে সকলে এখানে গুরু বলে হাজির হয়ে গেল। সুতরাং ভিতরের গুরু ও বাইরের উপলক্ষ্য গুরু একই। রসন থেকে রস জাত; তেমনি গুরু থেকে গুরু জাত, সেই জন্য গুরু। এই দেখে এখন্ ভূত থেকে জ্ঞানে চল; সাধনার এই প্রথম পাদ, এ কথা বললে ভুল হয় না। অর্থাৎ আমরা সব এই স্থূল থেকে ভগবান্কে জড়িয়ে জড়িয়ে তাঁর দিকে চলব। এই দিক্ থেকে যারা চলতে লাগল, তারা space ও time বা দিক্ ও কাল বলে ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই দুই জিনিষকে জ্ঞানতত্ত্বের দিক্ থেকে না দেখলে কখন নির্ণয় করতে পারবে না। সুতরাং জ্ঞানের এই দিক্ থেকে দেখে দেখে যখন

theoryতে পেলাম, তখন শুধু theoryতে পেলে তোমায় টিকতে দেবে না। প্রমাণ কোথায়? হাতে-কলমে প্রমাণ করতে না পারলে হবে না। তখন যারা অল্পজ্ঞ, তারা ঘাবড়ে যায়। সুতরাং এমন গুরুর দরকার হয়ে পড়ল, যিনি এই জোড়ের দাগটা বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারেন, link বা সংযোগটা সমান করে দিতে পারেন। এইরূপ গুরুর আবশ্যক হল বিশেষ ভাবে কলিতে। এই জোড়টি খাপ খাওয়াতে হলে জ্ঞানতত্ত্বের শক্তিনামীয় তত্ত্বের গতিবিধি, পরিচয়, রূপগত আকার-প্রকার প্রভৃতি ভাল করে না বুঝলে হয় না। অর্থাৎ পুরুষোত্তমের সেই পরাশক্তিমূর্তি, মহিমময়ী মূর্তি কষতে কষতে আসতে হবে। ভগবতীতে কতটা দখল এলে তাঁর হৃদয়গত রহস্য বার করে দেখা যেতে পারে? এ মহীয়সী শক্তিকে অবলম্বন করে যেতে পারলে খাপ খাওয়াতে পারব। এ পাশ থেকে তৃষ্ণাকে একটি শক্তি বলতে পারব, কিন্তু ও-পাশ থেকে কষে না এলে দেবী বলতে পারব না; শব্দ একটি 'শব্দ', কিন্তু ও যে এক শব্দময় পুরুষ, তা বলতে পারব না; নিদ্রা যে প্রলয়ঙ্করী দেবী, তা বলতে পারব না। ধন্য গুরু! মায়ের এই তেজোময় রূপ যিনি এঁকে গেছেন, সে সব সনাতন শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" সুতরাং এই যে জ্ঞান দিতে যাচ্ছি, সে জ্ঞান কত দুর্লভ, তা ভগবান্ বলেছেন। কেমন করে এই শক্তিতত্ত্ব জানা যায়, পরে বলব, আজ খালি principle বলছি। ঋষি এই শক্তিকে

তিন ভাগ করে দেখিয়েছেন—অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ, এই তিন নামকরণ করে। অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ পুরুষ, যারা ব্রহ্মতত্ত্বে জীবোচিত জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে অশক্ত, তারা এই কথাগুলোকে বই-পড়া কথা বলে নিয়েছে। ঐ দিক্ থেকে শ্রুতিকে তারা জাগ্রত করতে পারলে না। কিন্তু যারা উপাসক, বেদ অপৌরুষেয়, এই বলে তারা চক্ষুঃ স্থির রাখলে, অপৌরুষেয় বাণী, এই বলে পূজা করতে লাগল। পূর্ব্বমীমাংসা এই জন্য মন্ত্রকেই ভগবান্ বলেছে। যদি জানি, 'ত্রীণি' ইত্যাদি কথা ভগবান্ বলেছেন, তা হলেই আমার কাছে তার আদর হবে, তার গূঢ়ার্থ বেরোবে; শুধু মানুষ বলেছে জানলে কিছু হবে না। শুরু বলেছেন—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, তৎ তেজো-ঽসৃজৎ," ঐ কথা বলতে বলতে আবার বললেন, "ত্রীণি" ইত্যাদি। তা হলে এ দুটো কি একই কথা? এই তিনটে, আর ঐ তিনটে একই জিনিষ, এই নজরে আসবে? স্বভাবতই আসা উচিত। সুতরাং যোগ্য শিষ্যের কাণে সহজেই লেগে যাবে। প্রথমে বলেছেন অণ্ডজ—এখানে তেজ। তার পরে জীবজ, এখানে প্রাণ। তার পরে উদ্ভিজ্জ—এখানে মন। প্রায় ত মিলে এল।

অন ধাতুর মানে—তেজ। দ্বিতীয় প্রাণ—জীব। অন্ন আর উদ্ভিদ্—এ সবই ত জোড়া জোড়া মিলে যাচ্ছে। অণ্ডজ যে তেজ, এ কথা ঠিক; প্রাণ যে জীবজ, এ কথা ঠিক; সুতরাং মন যে উদ্ভিজ্জ, এও ঠিক। এ ত আমার ভিতরের অনুভূতি বেশ

দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঋষি "সর্ব্বভূতের" কথা বলেছেন; সুতরাং বাইরের ভূতসকলের জন্মের কারণ বা বীজস্বরূপও এই তিন, একে খাপ না খাইয়ে ত থাকতে পারছিনে। জ্ঞানপিপাসু যদি হই, যতক্ষণ না খাপ খাওয়াতে পারি, ততক্ষণ পরিতৃপ্তি হবে না। সুতরাং শক্তিতত্ত্বের একেবারে crucial pointএ এসে পড়লুম। জগতের ভালমন্দ দূরের কথা, জড়বিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় ব্রহ্মবিজ্ঞানে practically মিলিত হচ্ছে না। সুতরাং এইখানে আমায় তাঁকে পেতে হবে।

এ কথা যদি আমার মত মূর্খ লোকের কাছে পাস ত তোদের জীবনের কত বড় উদ্ধারণ বুঝে নিস। গুরুত্বের অপ্রত্যক্ষত্বে যারা যত চেয়ে থাকে, তারা তত অপ্রত্যক্ষ কৃপা লাভ করে। যারা খালি প্রত্যক্ষে চায়, তারা প্রত্যক্ষেই পায়।

১০ই জুলাই, ১৯৩৭, শনিবার, সন্ধ্যা।

তিনি জ্ঞানশক্তির দ্বারা যেখানে যা কিছু সব হয়েছেন। জ্ঞান-শক্তি মানে—জ্ঞান করা। সেই রকম জানা, সেই রকম নিজেকে তৈরি করে তোলা। এ ছাড়া আর কোন রহস্য নেই। মরা বাঁচা, ভাল মন্দ, জগৎ কি অন্য কিছু—এ ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদেরও যদি শক্তিপ্রয়োগ করতে হয় ত এই জ্ঞানশক্তিই প্রয়োগ করতে হবে। কেন না, জ্ঞান ছাড়া কিছু নেই। তোরা যেমন আমার কাছে বসে আমার অনুকরণ করিস, তেমনি তাঁর

অনুকরণ করবি। জ্ঞান করাই যদি শক্তি, তা হলে জগজ্জননী ত এঁকেই বলতে হয়। এ শক্তি তোতে নেই? দেখা শুনা, জানা বোঝা, খাওয়া, কাঁদা হাসা—এগুলো কি? জ্ঞান করা? তা হলে তিনি রয়েছেন? এ সব জ্ঞানশক্তি তোতে আছে? নয় ত তিনি রয়েছেন, এ কথা কোথা থেকে খুঁজে বার করলি? জানতে পারিস, দেখতে পারিস, আত্মবোধ বলে, 'আমি আছি' বলে লড়াই করতে পারিস, এ সব তিনি না?

ঋষি বললেন, এমন একটা কিছু নেই, যা এঁকে দিয়ে তৈরি নয়। ভালবাসা, ভয়, স্ত্রী, পুত্র, যা কিছু সব, এই জানা দিয়েই ফুটছে; এই শক্তিই সেই শক্তি। এ কি দুর্ব্বোধ, শক্ত কথা কিছু? ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি এই যে আমার ক্ষুদ্র চেতনবিলাস, ছোট সংসার-যাত্রার ভিতর যা কিছু আদানপ্রদান, ইনিই সাক্ষাৎ ভগবতী? হ্যাঁ বৎস, ইনিই সাক্ষাৎ ভগবতী। শুধু তাই নয়, তুইও এই। এই ছাড়া আর কেউ নস, এঁরই অংশ তুই। এঁর বুকে যে আত্মত্ব 'নিজে' বলে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিও ঐ জ্ঞানেরই আর এক মূর্ত্তি। তোর মনেও জ্ঞান আছে ত? জ্ঞানের এই 'নিজ' বলে যে মূর্ত্তি, দু জনেরই অন্তস্তলে এই মূর্ত্তি আছেন? 'নিজ নিজ—এখানেও, ওখানেও? তা হলে 'নিজ' বলে এই যে জ্ঞানমূর্ত্তি, এঁরই বুকে ভগবতীও ফুটেছেন, 'আমিও' ফুটেছে। ভগবতীতে শক্তির উপর আত্মত্ব আধিপত্য করছেন, এখানে আত্মত্ব শক্তির ভিতর লুকিয়ে আছেন। নিজে হাত, নিজে পা, এ কথা তুই বলতে পারিস? পারিস না। এজন্য তুই

আমিত্বের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হলি। উনি বলছেন,—নিজে ব্রহ্মা, নিজে দেবতা, নিজে গাছ, নিজে আকাশ ইত্যাদি। যে অনন্ত রূপ নিতে পারে, তার আসল রূপ কি, তা বলার জো আছে? আসল রূপ তা হলে কোথায় প্রভু? আসল রূপ না থাকলে সে বলতে পারে,—আমি বহু? এই অসঙ্গ আত্মত্বই আসল রূপ। ইনিই শিব-পুরুষ। আমি নিজেকে অসঙ্গ বলতে পারি না বলে জীবপুরুষ।

মা আমার নিজে বহুরূপী সেজে আমাদের ঠকিয়ে ফেলছিলেন। এবার দেখলুম, মায়ের একটি আসল রূপ আছে—বাঁচলুম। এখন যদি জলের ভিতর, আকাশের ভিতর, কিম্বা আমার ভিতর মায়ের সেই আসল রূপ দেখতে পাই, তা হলে ত বেঁচে গেলুম। এ জ্ঞান শুনতে শুনতে মোক্ষ হয়।

আত্মতত্ত্ব তা হলে আর দুর্বোধ রইল? মা! আহা! নমো নমঃ শিবায় নমঃ। এই যে জ্ঞানময়ী চিন্ময়ী শক্তি, এঁকে তিনটি বিভাগে, তিনটি বাঁধা পাকা রূপে ধরে নিয়েছি। এঁর অনন্ত রূপ থাকলেও এই তিনটি থাক তৈরি করেছি,—একরকমের নাম মনঃশক্তি, একরকম হৃদয়শক্তি, একরকম বাক্‌শক্তি। এ-সব বিভাগ কি নতুন হল, না ঐ জ্ঞান করারই শক্তি? মায়ের আমার তিনটি প্রধান রূপ। শিবকে বুকে নিয়ে তিনটি প্রধান রূপ তিনি ধরেছেন। আত্মতত্ত্বকে ফুটিয়ে শিবত্বে দাঁড় করালেন। স্বামিসঙ্গ না হলে পুত্রোৎপাদন হয় না; সুতরাং শিবকে স্বামী করে দাঁড় করালেন, সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যস্ত

হলেন। সন্তান উৎপাদন মানে? আপনি বহু হয়ে যাওয়া। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, পুত্র আত্মজ; পিতা, জায়াতে প্রবেশ করে নিজেই পুত্ররূপে প্রকাশ হন। কথাটা সত্য ত? ব্রহ্মবিজ্ঞানে এইরকম হচ্ছে বলে পিতৃত্ব কত বড় কথা। এখন বুঝছিস, শাস্ত্রে সন্তানের তর্পণ বিধান কেন করেছেন? এই আত্মাই পুত্ররূপে এখানে জাগ্রত রয়েছি, আবার ওখানে চলে গেছি পিতারূপে। এখানে ভাত খাই, তাই ওখানেও পিতৃরূপ আত্মাকে ভাত দেওয়া। পিতা মানে, অমুকচন্দ্র দেবশর্ম্মার কথা বলছিনে। আত্মাতেই পিতৃত্ব আর আত্মশক্তিতে মাতৃত্ব রয়েছে। ঐ পরম পুরুষকে পিতৃরূপে আমার বাবার ছাঁচে গড়ে উপাসনা করলুম।

মাকে আমার জননী, শিবানী, যাই বল, তিনি এই তিন মূর্ত্তিতে সাজেন ও লীলা করেন। মায়ের অনন্ত মূর্ত্তি হলেও প্রধানতঃ এই তিন মূর্ত্তি। তাঁর আদিমূর্ত্তি হল তেজ। কোন ক্রিয়া করতে গেলেই তেজের দরকার। ভালবাসাও তেজ, ঘুমানোও তেজ। শক্তির তিন রকম স্তর বলেছি—সাম্যাবস্থা বা rest, ক্রিয়াবস্থা, বা action ও ফলাবস্থা বা effect। সাম্যাবস্থাও একটা শক্তি; প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু তার ভিতরে শক্তি টলটল করছে। শব্দের দ্বারা যাকে নির্ণয় করা যাবে, তাই শক্তি। এই যে মা আমার অনির্ব্বচনীয় ছিলেন, তা থেকে তেজোময় হলেন, এ তিনি নিজে না জানালে জানবার উপায় নেই। ভগবতী যদি আমায় না জানেন ত আমিও আমায় জানতে পারি না। মা

যখন বললেন যে, আমি এই রকম, তখনই আমি তাকে সেইরূপ জানতে পারি। এ সবই প্রতিধ্বনি। আমার কোথাও কিছু পাবার জো নেই এই বিজ্ঞান ছাড়া, এইরূপই এই বাঙ্ময়ী, প্রাণময়ী, মনোময়ী মা আমার। Codeএ কাজ সারতে হবে, বেশী বলার সময় নেই। সে জন্য প্রাণময়ীকে বললুম হ্রীং, মনোময়ীকে বললুম শ্রীং, আর বাঙ্‌ময়ী নিয়ন্ত্রিণীকে বললুম ক্রীং।

এর ভিতর মা যখন অপৌরুষেয় বাণী দিয়ে শক্তির বর্ণনা করালেন, তখন বললেন—তেজ, জল, অন্ন। আরও স্পষ্ট করলেন বাক্ প্রাণ মন বলে; যাকে সাংখ্য গ্রহণ করলে সত্ত্ব রজঃ তমঃ বলে। যখন সত্ত্ব রজঃ তমঃকে বলা হয়েছে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ, আবার বাক্ প্রাণ মনকেও তাই বলেছেন, এইটুকু বোঝবার যাদের শক্তি নেই, তারা বড় বড় ভাষ্য রচনা করলে।

এই বাক্ প্রাণ মন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ সব পেয়ে গেলাম। একে আরও ভাল করে বোঝাবার জন্যে বললেন—অণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জং। এই তিনকে এক করে দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন; করেই বললেন, আমিই এই তিন দেবতা, আমিই হ্রীং শ্রীং ক্রীং।

কাল বলেছি, অণ্ডজ মানে তেজ, জীবজ মানে প্রাণ, উদ্ভিজ্জ মানে মন। রে আমার মন প্রাণ বাক্! তুমি মহাদেবী! আমি রূপবান্, ধনবান্ হব, এত কথা আগে চাই নে। আমরা বড় বিত্রস্ত; আগে তোমার হ্রীং—ঐ বুকখানা আমায় দাও; দিয়ে, তুমি যে কর্ত্তা, ইহা আমায় দেখাও;

তার পরে যা করতে হয় করো। নতুবা আমার এ বুক জ্বলে গেল। তুমি আগে আমায় তোমার বুক দিয়ে ধর, বল—"আমি তোর আছি।" শিবেরই বুকে শিবেরই শক্তির নামে হ্রীং। সূর্য্যের চারি ধারে অরাব মত, আত্মবোধের চারি ধারে যদি হ্রীং বিস্তৃত না থাকে, তা হলে শিবদর্শন হল না।

১১ই জুলাই, ১৯৩৭, রবিবার।

নমঃ। যাঁকে জ্ঞান নামে আমরা সাধারণতঃ অভিহিত করি, তিনি যে মহাশক্তি, সেটা আমরা আলোচনা করছি। বলেছি, তিনি বিশ্ব রচনা করতে গেলেই ত্রিধা-মূর্ত্তি ধরে রচনা করেন, বাক্, প্রাণ ও মন, এই তিন মূর্ত্তি নিয়ে। এখন আমরা যদি অগ্রসর হতে চাই, তা হলে আমাদেরও এই তিন শক্তিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। তিনি প্রথমে বাঙ্ময় হলেন। বাঙ্ময় হতে গিয়ে যে জাতীয় তেজ আবাহিত হল, সেই জাতীয় বাক্শক্তি রচনা হবে, অক্ষরাদি তার পরে হবে। অর্থাৎ বুকে যে জাতীয় তেজ উদ্দীপ্ত হয়েছে, সেই জাতীয় বাক্য বেরোবে। এই বাক্যের অনুকরণে তেজ মূর্ত্তি ধরবে বা তেজের অনুকরণে বাক্ ফুট্‌বে। তেজ যে ভাবে ভাবে বা দিকে দিকে যাচ্ছে, বাক্যও সেইরূপে যাবে। তাই এর নাম হল অণ্ড। 'অম্' মানে তেজ, 'ড' মানে অনুকারী শব্দ। এই অণ্ডশক্তি অদ্ভুত শক্তি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব অণ্ড, দুনিয়া সব অণ্ড। বলেছি, দু রকম শক্তি আছে। একরকম হল আণবিক গতি, যাকে আধুনিক

বিজ্ঞান **particle** গতি বলে। ধূলো ছেড়ে দিলে ফর-ফর করে বেরোয়, আলোর গতিও কুচি কুচি হয়ে আণবিক গতিতে বেরোয়। এই সাংঘাতিক শক্তি। এই আণবিক গতির দ্বারা তিনি বহু আত্মা রচনা করেন। আত্মতত্ত্ব লম্বা হয় না, খণ্ডিত হয়। কেন? আত্মা যেখানেই যাবেন, তা থেকে আর এক আত্মা জাত হবেন, নিজেকে তিনি লম্বা করেন না। আত্মজ্ঞান কি জাতীয় জিনিষ শোন, তা হলে বুঝতে পারবি। তার প্রতি খণ্ডে আপনার আত্মবোধের বিন্দুমাত্র হ্রাস হবে না বা থাকবে না। আত্মবোধ পূর্ণমাত্রায় আত্মবোধ। 'আমি এই,' এতে অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকবে না। যদি কোন জিনিষের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা তার প্রতি অণুতে পেতে হয়, তা হলে তা থেকে যদি কিছু আলাদা ভাবে বেরিয়ে আসে, তবে তার পূর্ণতার হানি হয়। তাই যত টুকরা কর, সে আপনার পূর্ণত্ব ভুলবে না। যদি ভোলে, তা হলে বুঝবে, সে পূর্ব্ব-জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে; বড় ছিলুম, ছোট হলুম, মহান্ ছিলুম, অণু হলুম, এ জ্ঞান থাকলে আত্মত্বে পূর্ণতার উপলব্ধি পাব না। আমি বা তুমি, আমরা কেহই বোধ করছি না যে, আমরা আত্মতত্ত্বে এইরকম ছিলুম, এখন আর সেরূপ নেই; আমরা সকলে পূর্ণ বোধেই আছি; পূর্ণ নিজত্বে নিজে। নিজ জ্ঞানটির অন্য কিছু সাপেক্ষতা আছে কি? আপনাতে আপনি বিভোর, পূর্ণমাত্রায় আপনাকে পেয়ে থাকা। নিজত্বের জন্য কাউকে কার মুখাপেক্ষী হতে হয় না। 'নিজ'রূপে ভগবতী যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে পূর্ণ

আত্মময় পুরুষ। আত্মবোধে কোন পরিণতি হচ্ছে না। লম্বা, সাদা, কালো, কোন জ্ঞান হয় না, শুধু নিজে। যার পরিণাম হবার জো নেই, ভাঙ্গবারও জো নেই, এ জাতীয় পরিণামের কথা বলছি না। দেখতে পেলুম, নিজ-বোধকে যদি কেউ টুকরা টুকরা করে দেয়, তবুও প্রতি টুকরাতে পূর্ণ নিজবোধই আছেন; নিজের আনন্ত্য-বোধ নিয়ে আছেন সর্ব্বত্র সর্ব্ব-ক্রিয়ায়। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, যার কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পাই না, অসম্ভব-সম্ভবকারী এই তত্ত্বকে, আপনার নিজত্বকে তিনি আপনি বহু করেন। আবার প্রতি ক্ষেত্রেই ঐ পূর্ণ নিজবোধ এমন ভাবে রয়েছেন, যেখানে বিন্দুমাত্র খণ্ডিত বা পরিবর্ত্তিত করবার উপায় নাই। এ তিনি কেমন করে করেন? এই যে টুকরা করার শক্তি, এর নাম অগুজ-শক্তি। কেন একে শক্তি বলে স্বীকার করব মশায়? যদি একে শক্তি বলে স্বীকার না করি, তা হলে বলতে হবে, অনন্ত অনন্ত কাল ধরে বহু বহু আত্মা আছেন; আর এইটি স্বীকার করলে বলব, এক পরমাত্মা বহু হয়েছেন। বহু বহু এই কুচো শিব, শিবলিঙ্গ বসান আছেন। একজনই পরমাত্মস্বরূপে বিরাজ করছেন এবং তিনি আপনাকে এইরূপ বহু করেছেন। সাংখ্য আত্মার এই বহুত্ব স্বীকার করেছে। যেখানে যত টুকরা টুকরা বিচিত্র বিচিত্র মূর্ত্তি দেখতে পাও, সকলকার ভিতরেই দেখবে, এই শিবতত্ত্ব বিরাজ করছেন। অসঙ্গভাবে আপনাতে আপনি বিভোর। সাংখ্যের এই চরম ভোগ।

আমরা 'নিজে'র পুরুষত্ব লাভ করে কাকে দেখতে চলেছি? গীতা তাঁকে বললেন পুরুষোত্তম। ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম, আমরা গীতার এই তিনটি বিভাগ পেলাম। দার্শনিক পণ্ডিতরা এর উপর বিশেষ জোর দেয় না, অথচ বলে, এর সঙ্গে শক্তিতত্ত্বের সংযোগ আছে। ভগবান্ বেদব্যাস আত্মার নিজত্বকে শক্তির ঐ তিন ভাগে সুন্দররূপে যুক্ত করেছেন।

আমরা উপনিষদ্ থেকে মায়ের তিন মূর্ত্তি দেখতে পেয়েছি—তেজ জল অন্ন, বাক্ প্রাণ মন। আচ্ছা, আমি একটা কথা কইলাম। এ কথা যদি আমার স্বয়ংবোধ থেকে, নিজত্ব থেকে বলি, তা হলে ঐ কথাকে আমার নিজত্বেরই আয়তন বলে বোধ হওয়া উচিত। যদি নিজবোধ থেকে বলি 'ফল', তা হলে সে ফলের শাঁস থেকে আঁটি পর্য্যন্ত নিজত্ব ছাড়া কিছু হবে না। যতক্ষণ ফল বলিনি, ততক্ষণ ফলের চেহারায় ছিলুম না। যেমন বললুম 'ফল', অমনি খণ্ডিত হলুম। যদি আত্মবোধ থেকে শব্দটি বার করতে পারি, তবে নিজের আয়তন ছাড়া ফল আর কেউ হবে না। 'ফল' নিজত্বের আয়তন, তাতে নিজবোধ পূর্ণ রয়েছে; আমি খণ্ডিত হয়ে গেলাম। বাক্যের দ্বারা এইরূপে আত্মপ্রয়োগ সেই করতে পারবে, যে এই পরমজ্ঞানস্বরূপ আত্মশক্তিকে, পরাশক্তিকে চিনতে পেরেছে।

আত্মা নিজে বাক্য প্রয়োগ করলে তৎক্ষণাৎ আপনা থেকে আলাদা না হয়েও একটি স্বতন্ত্র আয়তন নিজেই হন। বাক্যরূপ ঈক্ষণের মহিমাই পরাশক্তিরূপে নিজেকে টুকরো করতে পারেন।

যদি কেহ শুধু 'ফল' না বলে অনেক শব্দ একেবারে বলে ও তৎস্বরূপ হয়ে যায় তা হলে এই শক্তির কি মূর্ত্তি দেখবে? স্পষ্ট ধরা পড়ে যাবে, এমন একটা ক্ষেত্র আছে, যেখান থেকে অনন্ত অনন্ত আত্মত্ব বেরোতে পারে। তা হলে এর দ্বারা অক্ষরত্ব বেশ পরিস্ফুট করে লক্ষ্য করা যাবে। তা হলে আমার বাক্-শক্তি নিজের একটি আয়তন টুকরো করে বের করে দেয়। তার ভিতর আমিই থাকি। ফলেব যেমন আমি ছাড়া অন্য আয়তন নেই, আগা-গোড়া বিশিষ্ট আয়তনটি আমাকেই সম্যক্ বেষ্টন কবে থাকে। এ একটি ডিমের মত হল না? ডিমের ভিতর যেমন বাচ্চা থাকে, এর ভিতর তেমনি আত্মতত্ত্ব। অণ্ড দেখতে পেলি? হব, হর, হর!

এই 'নিজ'নামীয় শিবলিঙ্গ একরূপ ডিমের ভিতর বসবাস করছেন. উপবের আবরণটি নাম-রূপ, ভিতরে সাক্ষাৎ নিজবোধ। উপরে ফলের নাম ও রূপ, ভিতরে পূর্ণ নিজবোধ। ডিমের ভিতরের বাচ্ছা ও খোসা দুই পেলি। এতে আর একটা তরল পদার্থ আছে, সেটি তেজ, ওজঃশক্তি, albumen, তার ভিতরে পরমাত্মা বসবাস করছেন। এর ভিতরে ওজের সমুদ্র আছে; এটি তেজে ভরা। আপনাকে যে আকারে ধরেছেন, সেই আকাব পরিস্ফুট করার জন্য ওর ভিতর শক্তি রয়েছে।

হাঁসের বাচ্ছার উদ্দেশ্য—হাঁস হয়ে বেরোন। যার শক্তি, তাকে আমি টেনে এনেছি. বাক্ দিয়ে বেষ্টন করেছি। এখন ঐ বেষ্টন বাচ্ছাকে ভোগ করাতে হবে, অনুভব করাতে হবে।

সুতরাং হংসত্বের যা তেজ, তা ওকে খাওয়াতে হবে; খাইয়ে খাইয়ে যখন ও বেরোবার মত যোগ্য হবে, তখন বেরোবে। এই তেজের নামই মা। মা আমাকে খালি খাওয়াতে লাগল— মানুষ, মানুষ, মানুষ। এই হল নাম, এই নামের জন্ম হল। আমি মানুষরূপে নিজেকে জানলুম, আমার সেইরূপ সংজ্ঞা হল। আমার নামকরণ করেছে বেটী, আমায় ঘিরে ওজঃ দিয়ে, শক্তি দিয়ে—তুমি মানুষ, তুমি মানুষ; তাই আমি সাড়া দিচ্ছি মানুষ বলে। আবার যখন শোনাবে—তুমি শিব, শিব, শিব, তখন আমি শিব বলে সাড়া দেব।

এই ডিমের ভিতর তরল জিনিষটা দেখতে পেলি? হৃদয় তা হলে খালি ভালবাসা, মায়া মমতা, এইটুকুই নয়। হৃদয়ই সমস্ত শক্তি, মাতৃগর্ভ, মা আমার। আর এই শক্তির নাম বাক্। সে দিন আমি বলেছিলুম, তোদের এখনো ভাষা ফোটেনি, মা তোদের এখনো শিব শিব বলায়নি। যে সংজ্ঞা মা লাগাবে, তাই ফুটবে। আজ বলাচ্ছে মানুষ, মানুষ; কাল বলাবে পশু, পশু; পরশু বল'বে দেবতা, দেবতা। Albumen বা ওজঃশক্তির বাসস্থল হৃদয়। এ শক্তি হৃদয় থেকে তৈরী হয়। হৃদয়ের যে জাতীয় পরিচালনা হয়, ওজও তার অনুরূপ হয়ে থাকে। কবিরাজরা জানে, মনুষ্য-শরীরের সারাংশ বীর্য্য, বীর্য্যের সারাংশ ওজঃ। এই ওজঃশক্তির বসবাস হৃদয়ে। এখন হ্রীং যে মা, এ কথাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে? কেমন?

এখন মনে কর, পাখীকে বুলি শেখানর মত মা আমাকে

হংস হংস পড়িয়েছেন, আর আমি নিজেকে হংস ভেবে ছালকায় আবদ্ধ হয়ে গেছি। তার পর হংসত্বের দিকে যখন নজর পড়ল, তখন মায়ের আব এক শক্তি বেবোল—উদ্ভিজ্জ; হাঁস বেরিয়ে এল ডিমের খোসা ভেঙ্গে। সে স্বাধীন হাঁস হয়ে বেরোল; কে তাকে বুকে ধরেছিল, তা সে ভুলে গেল। জলের কথা, হৃদয়ের কথা সে ভুলে গেল। এর নাম উদ্ভিদ্‌শক্তি, স্বতন্ত্র হয়ে বেরিয়ে বিচরণ করার শক্তি। ধরতে পেরেছ?

মা আমাদের এই রকম করে গড়েছেন। এখন মাকে আবার আমাদের ঠিক এই বকম করেই গড়তে হবে। মাকে ঐ ডিমের মত করে, ভিতরে ভিতরে 'তুমি মা, তুমি মা,' এই কথা শোনাতে হবে। শোনান ঠিক হলে তিনি সামনে এসে দাঁড়াবেন। কেমন, এ সব ভাল কথা? মিষ্টি?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু রচনা, এর ভিতর আণবিক গতি, একটা চক্রাকাব গতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবে কণাবৎ সসীমতা, তাব একটা আবেষ্টন, একটা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি, তার নাম ত অণু? তা থেকে অণুপুঞ্জ, তা থেকে ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ, সবই তা হলে ডিম-পাকান; যেমন মাছের ছোট ছোট ডিম পাকিয়ে একটা বড় ডিম হয়েছে। এই নিয়ে ভগবান্ কণাদ বৈশেষিক দর্শন রচনা করেছেন। কেমন করে একটা জড় জগৎ ভাসমান হয়েছে ও রয়েছে, তাই তিনি এঁকেছেন দর্শন নাম দিয়ে। আবার ঐ জন্য সে ঋষির নাম কণাদ, কণাভক্ষক, কণা নিয়ে আলোচনা করতেন বলে কণাদ। এই রকমে সব ঋষির সঙ্গে আমাদের তত্ত্ব মিলে যাবে।

তোমার বুকে সব ঋষি আবির্ভূত হবেন। সব ঋষি এসে বলবেন,—"সাধু, সাধু, ঠিক বলেছ।" ওঃ! কি ভয়ানক তত্ত্ব দিচ্ছি তোদের! নাগাল পাওয়ার জো নেই। 'ঋষি' নাম শুনলে দেবতারা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হতেন।

অণ্ডজ উদ্ভিজ্জ নাম কেন হয়েছে বুঝলাম। মাঝে জীবজ জীবভাবের দ্বারা পুষ্ট। প্রথমে অণ্ডভাবের দ্বারা একটা আবরণ প্রস্তুত করে, তার ভিতর অনুপ্রবেশ, পরে তাতে জীবভাব ঢালতে লাগলেন। প্রথমে যে বাক্য নিয়েছেন, সে হয়েছে খোসা। তার পরে হংসত্বের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবে তাকে ঘিরে নিলেন। তার পরে হংসত্বে যা যা আছে, তা তাকে খাওয়াতে হল। তার পর মা যেমন গর্ভ থেকে সন্তান বার করেন, সেই রকম তাকে অণ্ড ফাটিয়ে বার করলেন। খাওয়ান শেষ হয়ে গেল। অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ। জীবভাব যা থেকে জাত হয়, সেই জীবজ।

এই কথার ভিতর আর একটি জিনিষ ভাল করে পেলুম, সে হল হৃদয়। যদিও 'হংস' এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে অণ্ড প্রস্তুত হল, কিন্তু হংস প্রস্তুত করতে যা যা প্রয়োজন, সে সকল যদি না বেরোয়, তবে খালি খোসা হল। সে খোসা পচে যাবে, যদি ওজঃ তাকে পুষ্টি না দেয়। তা হলে বুঝলুম, এই যে উপলব্ধ হৃদয়ভূমি, এইখানেই আমরা মানুষ হচ্ছি। মায়ের ইচ্ছা বল বা আমাদের কর্ম্মফলই বল, দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখন পর্য্যন্ত এমন অযোগ্য যে, একাননই হয়ে রইলাম.

পঞ্চানন হতে পারলাম না। মা আমাদের যে চেহারাই দিন, যতক্ষণ আমিত্বের পূর্ণ প্রকাশ না পাই, ততক্ষণ একানন পুরুষ। মুখে রসগোল্লা দিলে মিষ্টি ছাড়া নিমপাতার স্বাদ পাই না। পঞ্চানন হয়ে একসঙ্গে রূপ রস ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি না; এরকম করে মা আমাকে এখন গড়ে তোলেননি। ইস্! কিন্তু হতে ত হবে পূর্ণ? মা আমার পঞ্চানন-মূর্ত্তি হয়ে বিশ্ব ধারণ করে রয়েছেন, এ না দেখলে মাকে পূর্ণভাবে দেখা হবে না। যত দিন না এ পঞ্চানন-মূর্ত্তি দেখতে পাই, তত দিন জন্মের পর জন্ম নিতে হবে। একটা জ্ঞানকে সংস্কাররূপে পরিণত করা কত সময়-সাপেক্ষ। যে মাতাল, তার পক্ষে 'মদ খাওয়া বড় দোষ' এই জ্ঞানকে পাকা করতে কত সময় লাগে—হয় ত এক জন্মেও পারে না। সামান্য একটা জ্ঞান পাকাতে যদি এত দেরী হয়, তা হলে মাকে পঞ্চানন দেখা কত দুরূহ হবে। কিন্তু আশা হচ্ছে—গুরু আছেন। লক্ষ কথায় লক্ষ জন্ম পরিসমাপ্ত করব, এই জ্ঞান গুরু দিচ্ছেন। সুতরাং আমাদের কিছু ভয় নেই।

একটা জন্মের ভোগ একটা কথায় সেরে দিবি, কি সাংঘাতিক! এ জ্ঞান গ্রহণ করবি? জীবন হাতে করে এসেছিস? সমিৎপাণি হয়ে এসেছিস? তোদের চিত্তের ক্ষুধা দেখলে, তবে ত প্রসন্ন হয়ে দিতে ইচ্ছা করে? নয় ত এসেছিস, মেপে মেপে দিতে হয়। কি ভয়ঙ্করী শক্তি বাক্‌শক্তি, তাই জেনে জেনে বল,—"হে গুরু, আমি অক্ষম, একান্ত অক্ষম।"

আর কি বেশী বলবার দরকার আছে? স্পষ্ট হয়েছে? এখনো প্রয়োগ শেখাইনি, বিজ্ঞানটা শেখালুম। প্রথম ক্রিয়া— মায়ের আণবিক গতি, একটি আলাদা স্বাতন্ত্র্য রচনা করা। দ্বিতীয়, শক্তিপ্রয়োগ, আদান-প্রদান; এখানে পরিবর্দ্ধন বা **elongation**, একটার সঙ্গে আর একটার যোগ। আমি মা— ঢালছি: তুমি সন্তান—গ্রহণ করছ। এক শক্তি একটা থেকে আর একটাকে দিচ্ছে। ঋজু লাইন, **positive** থেকে **negative**, এ পাশ থেকে ও পাশ, উভয় মেরুময় শক্তিবিকাশ। বুকের ভিতরই আদান-প্রদান চলতে লাগল; দান-ক্রিয়ারূপ **positive** শক্তি, গ্রহণরূপ **negative** শক্তি, দুই শক্তি চলতে লাগল। এক বাক্‌শক্তিরই ভিতরকার দুই ক্ষমতা। আগে বাক্‌শক্তিতে ডিম গড়লে। আর **elongation** শক্তিতে, আলম্বনী শক্তিতে ডিমে আদান-প্রদান চলছে। তা হলে দেখলাম, পঞ্চাননত্ব বা কোন কিছু পেতে হলে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে, মায়ের পেটে সন্তান হয়ে ঢুকতে হবে। আমরা মাকে আজ ভোগ্যা করে সব ভোগ করছি। এখন আবার তাঁর পেটে সন্তান হয়ে ঢুকতে হবে, ঐ শিব হতে হবে। জীব থেকে ঢুকতে পারবে না, ঐ শিব হয়ে তবে ঢুকতে হবে। খালি এইটুকু যদি তোরা নিতে পারিস, এই শিবভূমি, আর জ্ঞানশক্তি-ভূমি, এইটুকুতে যদি অধিষ্ঠিত হতে পারিস, তবেই কৃতার্থ হয়ে যাবি। মহাশক্তির ভূমি, মাতা জ্ঞ, আর অন জ্ঞেয়, এই বিভাগটি শিক্ষা করে কত দূর পেয়েছিস ভেবে দেখ। কি

মহিমময়ী শিক্ষা লাভ করছিস্! এটা জীবনে একটু পাকিয়ে নিতে পারলে আমগাছে জাম ফলাতে পারবি। তৈরী হ, প্রয়োগ পরে শেখাব।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান আর কিছু নয়—নিজবোধ। জ্ঞানেরই এক পাদ নিজবোধ, এক পাদ শক্তিবোধ। গুরু-বোধ ফুটলে, জ্ঞানতত্ত্বে নজর দিলেই নিজেকে পাবি। শক্তির চেয়ে তিনি প্রধান, সর্ব্বব্যাপী। আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, এই ভাবে তখন পরিদৃশ্যমান হবি।

এখন জ্ঞানতত্ত্ব দেখতে পাচ্ছিস? জ্ঞান বললে কত বড় কথা হয়? আর এতটা বিশ্বাসবান্ হয়েছিস কি? মা জগৎ ভুলে তোরই মা হয়েছে; তোকে স্বতন্ত্র করে, তোকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। এর অপূর্ব্বত্ব হল, মা এক চোখ রেখেছে পরমাত্মার ঘরে, এক চোখ তোর ঘরে। মা যদি পরমাত্মা থেকে একেবারে কেটে বেরোত, তবে মায়ের শক্তি ফুরিয়ে যেত। তোর মত কিছুই করতে পারত না। সে জন্য সেখানে রেখেছে এক পা, তোতে রেখেছে এক পা। সব মিলে যাচ্ছে ঠিক?

১৩ই জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

জীবত্ব বা পশুত্ব বলি দেওয়া, সমিৎপাণি হয়ে আসা, জীবন নিয়ে আসা, এ সবের মানে কি? "তজ্জলান্ ইতি শান্ত

উপাসীত”—শান্ত মানে কি ? পশুত্ব মানে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও নাস্তিক্যবোধ। সব আসুরিক ধর্ম্মই পশুত্ব। ভগবৎশক্তি-প্রবাহের যে প্রথম উন্মেষ, তারই নাম হৃদয়। জীব, হৃদয়ে অভিভূত, ভগবান্ হৃদয়ে অধিরূঢ়। এই যে হৃদয়ের প্রকাশ হল, এর বহিরংশ ব্যক্ত হৃদয়, ভিতরে অব্যক্ত হৃদয়, সংস্কারগ্রন্থি, লিঙ্গশরীর, ভগবানের হৃদয়। লহর যে নাচে, সে মনে করে—নিজে নাচছে, কিন্তু সমুদ্রের নাচনেই তার নাচা। সে-ও নাচছে বটে, কিন্তু সমুদ্র নাচছে বলে সে নাচছে। যখন ঐ সমুদ্রের নৃত্যে তার দৃষ্টি যাবে, তখন সে ব্রহ্মদৃষ্টি হয়ে ব্রহ্মবাক্-দেবীকে দেখবে—যাঁর এক পা ওঁতে, এক পা জীবে।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা।

যাঁ থেকে সব জন্মায়, তিনি আপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে যদি দুই রকমে প্রকাশ করেন, তবে তাঁ থেকে যে কেউ জন্মাবে, প্রত্যেকেরই দুটো করে দিক্ থাকবে। এই সূত্রের অনুসরণে কষে বার করে নিয়ে এস—জীব, বীজ ; লীন, নীল ; সর, রস। মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে কয়টা চোখ রাখতে হবে ? দুটো। মা বলতে গেলেই চোখ রাখবে মাতৃ-অনুভূতিতে এবং তাঁর সাক্ষাৎ স্থূল প্রকাশ ভূতিতে। তোমার অনুভূতিতে মা যতটুকু ফুটে উঠেছেন এবং বাকী যা ব্রহ্মাণ্ডরূপে রয়েছেন, মন্ত্রোচ্চারণের সময় এই দুই মূর্ত্তিতে তোমার দুই চোখ রাখতে হবে।

মাকে কথা কওয়াতে শিখতে হবে। তাই বেদদীক্ষার আয়োজন হচ্ছে। ধর, আমি সবটা চক্ষু ছাড়া আর কিছু নই। তুমি আমার সামনে বসে আছ দেখছি। এ অবস্থায় তুমি আমার ভিতরে ঢুকে যদি আমার সঙ্গে মিশে একসা হয়ে যাও এবং তার পরে যদি আমাকে ভেদ বা cross করে বেরিয়ে যাও, তা হলে তোমার পিছনটাই আমি দেখব। এই হল ছেদবিজ্ঞান বা Law of Intersection। তোমাকে যে দেখছি, এ শুধু আমার চোখের দেখা নয়। আমার আত্মায় তোমার যে মূর্ত্তি পড়েছে, তাই আমি দেখছি। এই হল রূপ-গতি। এইরূপ শব্দগতি, স্পর্শগতি প্রভৃতি আছে। আমার বুকে সুড়সুড়ি দিয়ে যদি 'বামনদাস' বলে ডাকি, তবে তুমি বামনদাস অবশ্যই সে স্পর্শ অনুভব করবে। কেন না, ঐ একই মা এখানে এবং ওখানে স্নায়ু হয়ে আছেন। তোমাদিগকে সাধারণ ভাবে যদি বলি—গুরু বল, তা হলে হয় ত সে কথা তোমাদিগকে অনুপ্রাণিত করবে না। কিন্তু যদি আত্মতত্ত্ব থেকে বলি, তবেই তোমরা অনুপ্রাণিত হবে। তখন দেখব, এক দিকে বলছি, আর এক দিকে তদাকার হচ্ছি,—এই উভয়মুখী প্রকাশ বা double aspect—সংজ্ঞা ও সম্ভূতি। কথা বলা মানে, যে কথা বললুম, তাকে ঈক্ষণ করা। 'স ঐক্ষত', 'অবেদীৎ' এ সব এক কথা। ভগবতী খুঁজতে আর পাড়ায় বেরোবি? তিনি আমার আত্মাতেই আছেন। নমঃ! দেখে নমস্কার দিলি? আহা হা! "যে আমাকে যে ভাবে দেখবে, সে আমাকে সেই ভাবে লাভ করবে।"

'যো মাং জয়তি সংগ্রামে'—যেখানে যেখানে **Intersection, Friction** বা কাটাকাটি, ঠেকাঠেকি, যুগ্ম হওয়া আর যুগ্ম **intersect** করা বা ছেদন করা—এই দুইটি শিখিয়ে দিলেই আমার সব শেখান শেষ হল। "যো মে দর্পং ব্যপোহতি"—মা আমার দিগ্ দিগন্তে গতিশীলা, এই না তাঁর দর্প। বিচিত্রে বিচিত্রে আপনাতে টুকরো হ'চ্ছি ; এই নীল, পাশেই আমি সাদা ; এই সুখ, এই দুর্গতি—আর চেনবার উপায় নেই ; এই যে মা আমার দৃপ্তা—তুমি যত রকমে কেটে-কুটে যাও, আত্মরূপের এই খোঁটা আর ছেড়ে পালাবার জো নেই।

সংগ্রাম—সাধনাবস্থা, অভ্যাসযোগ। স্থির নিশ্চয়তা, ধ্রুব বটপত্র, অচ্যুত ভাব, এই হল সাধনার ভূমি। এ ভূমি প্রতিষ্ঠিত না হলে কিসের উপর দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবে ? 'প্রতিবলঃ'—তুমিও কেউ-কেটা নও, আমিও কেউ-কেটা নই। তুমি যত বড় হও, আমিও তেমনি। যেখানে তুমি যেমন করে প্রকাশ হও, আমাকে ছাড়া আর কাকেও তুমি ভোগ দেবে না। আমি ছাড়া তোমার চলে না, তোমার সব খেলা বন্ধ। আত্মস্থে গেলে এই সব দর্শন প্রকাশ পায়, আপনি ব্রহ্মৈশ্বর্য্যে ভরে যাই। আত্মস্থ মানে—এমন মূল চেতনা, যাঁ থেকে আমিত্ব জাত হয়েছে। আমাকে এই তিন **phase**এ বা ভাবে যে চিনবে, তখন আমি তার ভর্ত্তা। আবার আমি তার দাসের দাস। 'আমার যে করে আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তথাপি যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসের দাস।' সর্ব্বনাশ—আত্মদর্শন ;

সকল যেখানে নাশ বা বিলীন হয়ে যায়। অন্ধকারে যখন খাবার নিয়ে যাচ্ছি, মনে করেছিলুম, সে খাবার শুদ্ধ। তুমি আলো—তোমার কাছে যখন এলুম, তখন কত মলিনতা ধরা পড়ল। মাকে হাত-যোড় করলুম। মা বললেন,—"ভয় নাই বৎস! আমি সব নির্ম্মল করে দেব।" যা কিছু মলিন, মা গ্রহণ করলেই সব নির্ম্মল হয়ে যায়। মাকে খুজে-পেতে বার করতে হয় না, মা অন্বেষ্য নন, জলের মত সহজ—এইটে যেন তোদের হয়।

আর মায়ের সে আসা কেমন? যেমন ফুল বললি, খালি এইরূপ বললেই হয়ে যাবে। 'মা, তুমি ফুলের তলায় রয়েছ'—এই বললেই ফুলরূপ মলিনতা পবিত্র হয়ে যায়, মায়ের দ্বারা তাহা গৃহীত হয়, মাই ফুল হয়ে যান, এমনি ভাবে বলা। মলিনতা মানে মিশ্রতা, শুদ্ধ অব্যক্তকে না দেখা। মাকে দর্শনের গভীরতা, সে কত দূর? আত্মাই ফুল, এই হয়ে যাবে। এর মানে—আমিই ফুল, এই বোধে ফুলতত্ত্বে যাওয়া। মাকে খালি সচেতন কর, গুরুর উপদেশ স্মরণ কর। পর পর বলে যা, মায়ের বাঁকে বাঁকে গতি দেখ। মা বেরোলেন, ফুলদর্শন করলেন। ঈক্ষণ বেরিয়েছে, ঈক্ষণরূপ যে তেজ, সেই তেজই মা, তিনি বেরোলেন। অভ্যস্ত ব চেনা শক্তি বলে আদর থাকে না; শক্তি চলে গেলে তখন আদর হয়। মানুষ মরে গেল। কে গেল রে? যিনি মহাশক্তি, যিনি দ্রষ্ট্রী, শ্রোত্রী, তিনি চলে গেলেন, তাই মানুষ মরে গেল। ইনি গেলে কি হয়,

তা ভাবিসনি। ইনি কিসে না যান, তার চেষ্টা করিসনি। আজ সেই চেষ্টা করছি। আমার পায়ের নখ থেকে মাথার কেশ পর্য্যন্ত যে খাপ, তাতে মুক্ত তরবারির মত মা রয়েছেন। 'আমি সপ্রকাশ; আমি ছাড়া আর কেউ নেই; আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড', আত্মার বা আত্মপ্রকাশের পর পর এই তিন অবস্থা।

যতটুকুর ভিতর অধিরূঢ় হয়ে আত্মবোধ নিয়ে খেলা করা যায়, ততটুকুই অধ্যাত্মবোধ। নিজেকে এই শরীরের খোসায় ঘেরা ভগবান্ বলে জানছি; এই শরীরে ক্রিয়াময়, জ্ঞানাময়, ভোগময় ভগবান্ আছেন জানছি।

চেতনা মানে—চিন্ময় দেবতা, ভগবান্। ওঁর যে শক্তির দ্বারা উনি আপনি আপনার সদাজ্ঞাতা, সেই শক্তি এই রকমে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ আপনি আপনার আয়তন রচনা করে আপনাকে জানব, নির্ব্বিশেষভাবে জানা ও সবিশেষ ভাবে জানা; তখন ঐ চিন্ময় শক্তির নাম হয়ে যায় জ্ঞানশক্তি। একই শক্তির দুটো aspect বা প্রকাশ। অবাধ চেতনায় বাধা পড়াই সংগ্রাম; সীমা রচনা হওয়া, আয়তনকে পাওয়া, আয়তনে গিয়ে ঠেকা, আয়তনে মিথুনীভাব প্রাপ্ত হওয়া ও আয়তনকে cross বা ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া, ইহাই সংগ্রাম নামে কথিত।

সপ্রকাশত্ব মানে, সপ্রকাশ চিন্ময় যিনি, তিনি তাঁর স্বরূপ-ধর্ম্ম যে আত্মত্ব, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সেই ধর্ম্মের উপর যখন জ্ঞানশক্তি বা অনাত্মধর্ম্মকে প্রকাশ করতে যান, তখনই আমাদের

ভিতরকার জ্ঞানক্রিয়া দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এক দিক্ থেকে সেই আত্মত্ব জ্ঞানবিশ্বকে প্রকাশ করছেন, আর এক দিক্ দিয়ে সেই জ্ঞানশক্তিকে ভোগ করছেন অর্থাৎ তিনি যা করছেন, তা জানতে জানতে করছেন। এই জানা বা ভোগ করার নামই তাতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া বা জীব সাজা এবং ঐ প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি করা। এইরূপে আত্মতত্ত্ব এক হলেও স্রষ্টা ও জীব, এই উভয় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান। আত্মত্ব অসঙ্গ, এ কথা বললে আপনাকে আপনি জানা ছাড়া আর কোন জ্ঞানাভাস তাঁতে থাকবে না।

জীবত্বের স্বাভাবিক গতি বহির্ম্মুখে। কিন্তু আমাদের এখন অন্তর্ম্মুখে, ভগবানে বা আত্মরূপে পৌঁছতে হবে। 'ভগবান্' এই কথা বললেই দৃষ্টি পড়া চাই আত্মত্বে—এই আমিত্ব যাতে জাত হয়েছে, তাঁতে। এঁকে যেমন জানা, অমনি পশুত্ব ছেড়ে যাবে। তখন আত্মাই হয়ে যাবেন মহান্। এই আমিত্বটা ক্রমে **consumed** হতে বা মিলিয়ে যেতে থাকবে। আত্মত্বে যদি জীবত্বের কোন স্ফূট হয়, তবে সে মস্ত ভুল হল। সপ্রকাশ-ধর্ম্মময় ভগবতী, মহেশ্বর ঐ আত্মত্বের বুকে। সব হয়ে গেল জীবন্ত দেবতা।

আগে এ পাশে ফুটছিল ভূত, মড়া, এখন ফুটল জীবন্ত দেবতা। যদি সপ্রকাশত্ব হারিয়ে চলেছিস ত আবার মরে গেছিস। এ পাশ থেকে ও পাশে যাওয়া, **neutral point**এ বা অসঙ্গে পৌঁছান, আবার মহান্ হয়ে বেরোন; এই স্তর।

ঐ সপ্রকাশ নামে যে ছিদ্র, ঐখান দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভেদ করা যাবে। মনুষ্য দেবতাদের পশু হয়, যদি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উপাসনা না করে। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হলে দেবতারা তখন রাস্তা ছেড়ে দেন। আর এই আত্মত্ব তোর সদাপ্রত্যক্ষ, সর্ব্বোত্তম প্রত্যক্ষাবগম। যতক্ষণ পশুভাব, ততক্ষণ তুই খুঁজে দেখতে যাস তাঁকে। যখন বীরভাবে গিয়ে আত্মত্বে পৌঁছই, তখন দেখি, দেবভাবে তিনি আমাকে দেখছেন। বীরত্ব ঐখানে—টেনে হিঁচড়ে ঐখানে গিয়ে পড়া। বুদ্ধি এমন একটা গাঁট পাকালে, মেঘ তৈরি করলে; এই জন্য এখানে বীরত্ব দরকার। বীর হয়ে এই গাঁট ভেদ করলেই দেবত্বে পৌঁছবি। গুরুতে এখন পূরা শ্রদ্ধা হয়নি বলে বীর হতে পারছিস না। "ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।" এতে এতটুকু চালাকী থাকলে চলবে না।

নিজবোধে যদি ঠিক মা বলা হয়, তা হলে কি এই হাত-পা-জ্ঞান থাকবে? আত্মতত্ত্বই যে জানা, দেখা, শোনা প্রভৃতির একটা তত্ত্বস্বরূপ, এই আত্মজ্ঞানই দর্শন, শ্রবণ, বিজ্ঞানন আদি সর্ব্বজ্ঞানের একটা **neutral** বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' কাল দেখিয়েছি, তা থেকে কেমন করে সব ফুটছে; অথচ তিনি আলাদা আছেন। জীবত্বের হিসাবটা, এই অবস্থাটা তখন কার দখলে চলে যাবে? পরমাত্মার। কি সুন্দর, কি প্রাণদায়িনী এই জ্ঞানশক্তি, দেখতে পাচ্ছিস? 'ন তপসা ন চেষ্টয়া'—চেষ্টার দ্বারা নয়, দৌড়াদৌড়ির দ্বারা নয়। 'ন দানেন

ন ধ্যানেন, বিনা মহৎপদরজোঽভিষেকং'—'আমার আত্মা', 'আমার ভগবান্' বলা মানেই মহতের পায়ের কাছে গিয়ে পড়া। আমি আত্মা বললুম, অথচ আমাকে তিনি দেখছেন, এ কথা জানতে পারলুম না, আমাকে ওতঃপ্রোতভাবে তিনি ঘিরে আছেন, ইহা আমার অনুভবে এল না; তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর গন্ধে, তাঁর স্পর্শে, তাঁব ধর্ম্মে আমি সর্ব্বতোভাবে পরিপ্লুত, এ য'দি না দেখলুম ত আত্মা বলার সার্থকতা কি? তুই তাঁকে দেখছিস, এ ভাবে চেষ্টা কবিস না; তিনি তোকে দেখছেন, এই ভাব ফুটিয়ে তোল, তবে এর সুখ পাবি, তবে এব ব্যাপ্তি পাবি। তিনি দেখছেন আমাকে, আমি দেখ'ছি তাঁকে, এ কথার মানে কি? "অহমস্মি" এই জ্ঞানাংশকে ঐ সপ্রকাশস্বরূপ দর্শন করছেন, এই ত ব্যাপার? ঐখানটা ঠেকে গেলে সর্ব্বাঙ্গ ঠেকে যাবে। তুই যে 'জ্ঞানমহং' এইটে খালি ধর, পুনঃ পুনঃ তাঁর পায়ের উপর পড়। 'ভগবান্' বলে গেলি একেবারে তাঁর পায়ের কাছে? নমঃ! এখানে থাকবার জো আছে? ওঁকে কেউ ধরে রাখতে পারে? তুই যাবি, না উনি টানবেন? নমস্তে! সবটা উল্টে যাচ্ছে। এখানে চোখ দিয়ে দেখছিলি, সেখানে দেখে চোখ হচ্ছেন। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥' এই দর্শনে হৃদয় আছে? যদি কোথাও থাকে ত এখানেই আছে। এখান থেকে দেখছিস —তৃষ্ণা, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলো **physical energy**।

ওখান থেকে দেখ দিকিন, দেবী নয় ওরা ? 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

এই 'আমি'কে যাচাই করে দেখ—এ কতকগুলা জ্ঞানের সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এইগুলা আলোকময় হয়ে থাকলে তার নাম জাগ্রত অবস্থা, আর এগুলা অব্যক্ত হলে তার নাম মৃতাবস্থা। আমিত্ব তা হলে এই রকম ? এই আমিত্ব যাঁ থেকে জাত—দেখা, শুনা, ভাবা প্রভৃতি সমস্তই তাঁর, অথচ আমার বলে এ সব আমি ভোগ করছি। সবটা তাঁর, অথচ আমি দেখলুম, শুনলুম, ভোগ করলুম বলছি ; সুতরাং এ আমি কোথায় ? তাঁতে। তাঁর দেখা, অথচ আমি বললুম, আমি দেখছি। তাঁর সঙ্গে যদি এতটা একীভূত না হতুম, তা হলে তাঁর দেখাকে আমার দেখা, তাঁর শোনাকে আমার শোনা বলতে পারতুম না। তা হলে তাঁর মন, তাঁর হৃদয়, তাঁর তেজ 'আমার' বলে ভোগ চলেছে আমার ? মায়ের উপর সন্তানের এই অধিকার। আর 'আমি'টার কোন মূল্য দিবি ? যদি কোন মূল্য দিতে হয় ত ভগবান্‌কেই মূল্য দিবি। নিত্য-ভূমিতে যখন যা উঠবে, সবই নিত্য। এই অভ্যাসটা না হলে কিছু দাঁড়াতে পারবে না। এ ভূমিতে খালি মা আর আমি—ব্যস্, কেয়া বাৎ হ্যায়্। মানুষটাকে—মড়াটাকে টেনে টেনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ—স্বর্গ অবধি টানছ। হর হর শম্ভো!

১৫ই জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

জ্ঞানময়ী, সপ্রকাশ আনন্দময়ী, চিন্ময়ী, ইনিই তুই সেজেছেন? আর এই যে আমার এত বিশ্বজ্ঞান ফুটছে, ইনিই সেই সপ্রকাশ আনন্দময়ী। বললুম ভাত, ফুটলো ভাত। বললুম সপ্রকাশ ভগবতী, ফুটলেন তিনি। তা হলে ওখানে ব্যাপারটা এই? প্রাণময়ী—ঐ সপ্রকাশ আনন্দময়ী! তাই হয়েছিস রে? আপনি আপনাকে জানতে পারছিস, এইরূপ নিত্যশক্তি-সম্পন্ন যে আনন্দ, সেই আনন্দে আনন্দময়ী? আপনি রয়েছিস—সপ্রকাশ আনন্দ তা হলে উর্দ্ধ অধ ইত্যাদি সর্ব্বত্র চলছে, দেখলি? ইনি কত প্রকার ভঙ্গিমা নিচ্ছেন? যত রকমে বাক্যের ভঙ্গিমা করছেন। বললি 'গুরু', হলি সপ্রকাশ আনন্দময়। এই অণ্ড পাকাচ্ছে কে? বাক্, খালি কথা। এই দেখলি সপ্রকাশ আনন্দময়ী মূর্ত্তি, ফস্ করে বললি গুরু; গুরু এলেন? আর কিছু কৌশল দরকার হল? এ ত সাংঘাতিক শক্তি! বল্ ত ভগবতী! ভগবতী এলেন? বলা মানেই আসা। আবার সাপ বল দিকিন—সাপ ফুটে গেল। ঐ সপ্রকাশ আনন্দময়ীতে, ঐ শব্দের ভিতর সব রয়েছে। 'সাপ' এই কথাটির দ্বারা একটি চেহারা রচনা করলেন, গুরু, স্ত্রী পুত্র, এক একটি চেহারা রচনা করলেন। ঐ দিকে দেখে দেখে বল। জন্ম মৃত্যু রচনা করলেন? ঐ সপ্রকাশ আনন্দময়ী থেকে কথা বেরোচ্ছে? এই কথাগুলোর

নাম হল আকাশবাণী। এই যে গগনোপম, সুপ্রকাশ, আনন্দ-ময়ী শিবানী, সেখান থেকে এই কথাগুলো ফুটলো? এই কথা ঐ আকাশেই জাত হল? ঐ গগনেই জাত হল প্রতি কথাটা? যা বলছিস?

সে দিন শিব শব্দের মানে বলে দিয়েছিলুম। শিবের বুকের ভিতর শক্তি আছেন? শিব বললে যিনি শিব, তাঁকেই বোঝাবে, আবার কাকে বোঝাবে? তোর ভিতর তোর ছেলে মেয়ে, নাতি, গৌহাটীর বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা—সব শুয়ে আছে? সেখান থেকে 'দেবেন' বলে একটা বুড়োকে জন্ম দিয়ে শিব বসে আছেন? শিব-হৃদয়ে যে শক্তি আছেন বলে দিয়েছি, তিনি কি করেন? ঐ 'ই'-কার, ও যখন শবকে শিবত্ব দিয়ে, নিষ্কল শান্ত করে, মিথুনীকৃত হয়ে, একীভূত হয়ে শান্ত হয়—"এবমেব এষ আত্মা নান্তর্ন বাহ্যঃ কেবলং প্রজ্ঞানঘনঃ" ছাড়া আর কোন শব্দ তাঁতে প্রয়োগ করা যায় না, তেমনি এই ভগবতী। প্রত্যক্ষতা ছাড়া আত্মাশব্দের আর কোন মূল্য নেই; আত্মার চেয়ে প্রত্যক্ষ আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। 'আমি' বলে যে জ্ঞান ফুটেছে, এই জ্ঞানের মূলে যে 'আমি', সেই প্রত্যক্ষ—তারই নাম সেই জ্ঞানের আত্মা। ফুলের জ্ঞান মনে পড়লে ফুলকে একটা রেখা মাত্র মনে হয়। আবার নিজেই ফুলজ্ঞান, এ কথা মনে পড়লে ফুলজ্ঞানও ক্ষীণ হয়ে যায়। সেই জন্য ওঁর নাম প্রজ্ঞানঘন। মা আমার প্রজ্ঞানঘন। ওঁতেই রয়েছিস?

ঐ যে 'ই', ঐ বেটীই সাংঘাতিক। এ কাণ্ডটি ওই করে, যার নাম চিতিশক্তি। এই সব চেহারা নেওয়া, ফুল ফল ইত্যাদি শব্দ নিয়ে ডিম পাড়া, এ সবের ভিতর থেকে ঐ বেটীই দাঁড়িয়ে উঠেছে। যখন দাঁড়িয়ে ওঠে, তেতে ওঠে, তখন প্রথম যে চেহাবা ধরে, তার নাম 'অম্'। 'ই'-ব তেজত্ব বা অম্ত্ব দেখতে পেলি? তেজ শব্দের অর্থ হল—শিবের সঙ্গে শোয়া ভাবে ছিল; শিবই আপনি আপনাকে 'অম্' করে বার করলেন। আগে বার করলেন ঐ শোয়া-ভাব, শিবভাব, অসঙ্গ আত্মত্ব, তার পর 'অম্' হলেন—এর নাম হয়ে গেল শ্যামা। শি+অ+অম্। শিবের বুকে 'ই'কারেতে শ্যামা মা আমার গড়ে উঠল—দেখলি? কাকে বলছিস? তার খেলা দেখতে পাচ্ছিস? হাঁ, তারই খেলা। ডিমে খেলা করা—ডিম হয়ে ঢোকে ও ফোটে। এই material world বা ভৌতিক জগৎ ছেড়ে দে, ঐ জ্ঞানভূমিতে দাঁড়া। ঐখানেই শ্যামা মায়ের খেলা। এ আবার চলে যাবে ঐ শিবে, ঐ মিথুনে। ওর যাওয়াই 'আমি'র যাওয়া? গোটা আমির ভিতরে কাকে দেখতে পাচ্ছিস? শ্যামা মায়ের ঢোকা মানে, আমারই ঢোকা দেখতে পাচ্ছিস? এক পিঠে ধরেছে 'আমি' বলে বাচ্ছাটাকে, আর এক পিঠে ঐ বিশ্বজননী! আমার বুকের ভিতর 'আমি'শুদ্ধ জড়িয়ে না দেখলে দেখতে পাই না আমরা. সেই জন্য এ মূর্ত্তির দরকার। 'আমি' বলে একটা ডিম পেড়েছে—

বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বেশ দেখতে পাচ্ছিস? শিবের বুকে শ্যামা বেশ বুঝেছিস এবার?

তিন শক্তি নিয়ে—তিন মূর্ত্তি ধরে এ বেটী খেলা করছে, এ কথা কে বলেছে? এই বেটীই বলেছে। "এই আমারই তিন মূর্ত্তির টুকরো টুকরো নিয়ে এক এক করে প্রকাশ করব—তোমার ভিতর খানিকটা বাক্, খানিকটা মন, খানিকটা প্রাণ দিয়ে 'নামরূপে ব্যাকরবাণি।' এইবার দেবেন মুখুয্যে হল, আমি হাকিমি করি, টাকা হয়েছে ইত্যাদি। তুইও হলি, ঘোড়াটাও হল, ব্রহ্মাও হলেন। রকমারি তাপ চলতে লাগল—ঘোড়া, পাখী, দেবতা, মানুষ ইত্যাদি। এর নাচ দেখে শিব বললেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। শিবকে দিলে ঐ তাপ। আর আমাদের দিলে 'জীবোঽহং'। দিয়ে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা সাজাল, শিবকে শিব সাজাল, জীবকে জীব সাজাল ইত্যাদি। আত্মামাত্মা সব ভুলে যা—খালি জ্ঞান কথাটা ধর। তোরা এই যে কথা বলিস, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এই ত? তা হলে তোর অধরোষ্ঠ স্পর্শ করে বেরিয়ে যাচ্ছে? এটা ঠিক রে? এই অংশটা না থাকলে খালি জিহ্বাই কথা কইত। জিহ্বার বসবাসের জন্য গহ্বর রচনা করেছে। অধরোষ্ঠের নাম চুম্বিনীশক্তি; ও কাউকে ছাড়বে না চুমো না দিয়ে। কোন জিনিষ খেতে, গ্রহণ করতেও ছাড়বে না। মনে কর, অধরোষ্ঠ জ্ঞানের তৈরি। তা হলে প্রতি কথাটা যাচ্ছে, জ্ঞান হতে হতে চলেছে, এই জ্ঞানে স্পৃষ্ট হচ্ছে। হচ্ছিস স্পৃষ্ট? এইটি উপনিষদে বর্ণনা করা

হয়েছে—'মুখে হাত ঘষলেন'। এই মুখই "যোনি"। কথা যদি হয় জ্ঞানমূর্ত্তি, আর অধরোষ্ঠ যদি হয় জ্ঞানমূর্ত্তি, তবে ঐ জ্ঞানমূর্ত্তি কথা, অধরোষ্ঠরূপ জ্ঞানমূর্ত্তির স্পর্শ পাচ্ছে? কথা কইতে হবে আগে এই চুম্বিনীশক্তি নিয়ে। কথা বার করতে হলে আগে গ্রহণ করতে হবে চুম্বনশক্তি, তার পরে হল মিথুন-শক্তি। ঐ যে ধরে রাখল, তার পরে বার করা, ভেদ করার শক্তি বা intersect করার শক্তি। একটা হল গ্রহণ করা, একটা মিথুনীভূত অবস্থা, একটা বাচ্ছা বের করার শক্তি। শিবকে, বীজকে কেটে জীব করে দিল। এই কাণ্ড সর্ব্বদা চলেছে। এই শিবভূমির বুকে যে মহামহিমময়ী শক্তি, তাতে মিথুন-ভাব করে বিশ্বসন্তান প্রসব হচ্ছে। শিব, শ্যামা ও কথা, এই তিনটি জিনিষকে পড়তে থাক্। তোর বুকে কথা আছে, শ্যামা আছে, আর শিব আছে। প্রতি বারে শিব চুম্বিত হচ্ছে, মিথুনীকৃত হচ্ছে, আর প্রসূত হচ্ছে; এর মানে, কথা কওয়া—একজনকে জাত করা। শিবশম্ভুকে স্বয়ম্ভূ করা। এই কাশীভূমিতে যেখানে পা দিস—শিবলিঙ্গ! "শিব এব কেবলম্"! কেমন কাশী? এখানে মলে আর জন্ম হবে? হর হর! তোর কপালে যদি কালী বলে সিন্দূর দিই, ঠিক হবে? একটু আগে যেখানে ছিলি, সেখানে সব কথা ফক্কিকারি, অন্তঃসার-শূন্য। এখন যেখানে এলি, এখানে সব কথাই সত্য। অন্তঃ-সারশূন্য কথা যেখানে হয়, সে কলিকাল। অন্তঃসারপূর্ণ কথা সত্যকাল। এই ঘরটা এমন করে না খুলে মন্ত্র দিলে, সে

মন্ত্র ধরতে পারবি? "দেবি প্রসীদ—প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং।" আমার এই বিশ্বকে কালীময় করে "পাহি বিশ্বং।" এটা মাত্র স্তুতি নয় তা হলে? "দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য। প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং, ত্বং ঈশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥" তুমি শুধু মা নও—ঈশ্বরী। শুধু মা হলে পারতে না। এইবার মাকে একটু একটু চিনছিস—কেমন? কত সুখ বল ত ঐখানে দাঁড়িয়ে বলা; আর আগে যেমন বলতিস, দুটোর পার্থক্য অনুভব করতে পারছিস?

১৬ই জুলাই, ১৯৩৭, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

অম্=তেজ=সৃষ্টি ও লয়। এ ওম্ থেকে বেরিয়েছে। আর 'উ' রয়ে গেল শিবের বুকে—স্থিতি। ঋষিযুগের ঋষিরা হলে বলতেন—"এ নাদতত্ত্ব অপূর্ব্ব! দিন আমাদের!" কিরূপ বিজ্ঞানের উপর দৃষ্টি রেখে শব্দবিজ্ঞান রচনা করে গেছেন? ব্রহ্মতত্ত্বের উপর দৃষ্টি রেখে। শুধু শব্দের দ্বারা জ্ঞান হচ্ছে, সাধন ভজন করতে হল না। Double aspect বা উভয়মুখী প্রকাশ স্বচ্ছন্দে দেখিয়ে দিলাম 'ওম্' এই শব্দ বিশ্লেষণ করে। এ সব জ্ঞান না হলে ঋষি চেনা যায় না। কথা কওয়া মানে ভগবান্‌কে পাওয়া, এ জ্ঞান হাজার হাজার বৎসর ধরে মনুষ্য-সমাজে লুপ্ত হয়ে গেছে। এমন ঘরে গিয়ে পড়বি, যখন তোদের নির্ব্বাণ-সময় উপস্থিত হবে। হৃদয়ে না ঢুকুক, একেবারে

আত্মস্থ না হোক, এ জ্ঞান এখন মাথায় নিতে পারছিস। এ জ্ঞান কখনো ভুলতে পারবিনে। আর এই জ্ঞান যার শ্রবণে ঢুকেছে, ভগবান্‌কে সে প্রয়াণকালে অবশ্যই পাবে, বিশ্বাস করিস ; এ আমার প্রত্যক্ষীভূত। আর যারা তৈরি হয়ে উঠবি, নির্ব্বাণের পূর্ব্বেই তাদের নির্ব্বাণের উপলব্ধি আসবে। দেখবি, আমি ভগবানের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা কইতে পারিনে, এমনি একটা অবস্থা আসবে। ভগবানের দ্বারা চারটি অবস্থা জীবের মধ্যে খেলা করে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একটা সময় আসে, যখন ভগবানের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে সে সংসারে থাকতে পারে না ; তখনো উপদেশাদি দেয়, কিন্তু শেষে একেবারে নিষ্কর্ম্ম হয়ে যায়।

এই যে ইদানীন্তন ঐ Einsteinএর Law of Relativity খুব প্রবলবেগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ভিতর সে বলেছে, যেখানে কোন আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটবে, যেখানে energy বা শক্তির ক্রিয়াময় প্রকাশ থাকবে, সেখানেই একটা **restful energy in mass** বা বিপুল শক্তির স্থির সত্তা রয়েছে। এ কথা বলাও যা, আর আমার কর্ম্মের পিছনে ভগবান্ রয়েছেন বলাও তাই। এ কথা না নিলে Law of Relativityর theory দাঁড়ায় না। There must be a mass, at the background, at rest, to produce any atomic energy—প্রতি আণবিক স্পন্দনের তলাতেই স্থিরত্ব অর্থাৎ বিপুল শক্তির নিষ্ক্রিয় ভূমি রয়েছে।

শবত্বের সাক্ষী অসঙ্গত্ব। দুটো জ্ঞানের সাপ পরস্পর পরস্পরকে গিলে গেলে যা হয়, তাব নাম শবত্ব। **Darkness** বা অন্ধকার সব **negative** বা নাস্তি হয়ে গেছে—পরস্পর পরস্পরের ভিতর ঢুকে গেছে—ঢুকে গিয়ে **negativity** বা অব্যক্তরূপ জ্ঞান বা আলো বার করছে। জ্ঞানতত্ত্বে সাম্যাবস্থা। সেখানে তিনি প্রকৃতির অব্যক্ততার ভোক্তা,—যোগনিদ্রাময় বা যোগনিদ্রার সাক্ষিত্ব। অব্যক্তেব সাক্ষী হল অসঙ্গত্ব। নিজেকে নিজে জানা ছাড়া আব কিছু বইল না; স্বভাবসিদ্ধ-ভাবে জানা—'জানছি' এ **assertion** বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়, চেতনার সপ্রকাশ অবস্থা, তখন আমিত্ব অব্যক্ত হয়ে গেল। নিজত্বের বুক থেকে খালি 'আমি' জ্ঞান উঠতে পারে। জীবত্ব যে ভোগ করছে, তার নাম জীব; ঈশ্বরত্ব ভোগ কবছি, নাম ঈশ্বর। 'নেই' এইরূপে থাকা, এ-ও একটি শক্তির প্রকাশ। 'শক্তি নেই' মানে, জ্ঞানতত্ত্বে 'শক্তি নেই' আকারে জ্ঞান অবস্থান করছেন। অসঙ্গ, যিনি নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। তাব মানে, জ্ঞানস্বরূপিণী 'নেই'-রূপে অবস্থান করছেন। এর নাম হল অব্যক্তের সাক্ষী। তাই "যচ্চাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বমস্মিন্ সমাহিতম্"। এই বিজ্ঞানের জন্য এই বলার ভঙ্গি। অস্তিনামীয় এবং নাস্তিনামীয় দুই চেতন-বিলাসই এই বুকে—মায়ের বুকে অবস্থিত।

হয়ে যা না শব, মা বুকে নাচবে। মড়ার বুক না হলে, অসঙ্গ-ভূমি তৈরি না হলে পা দেয় না বেটী আমার—মায়ের

মহিমা বোঝা যায় না। নিজেকে ছাড়া কোথাও কিছু দেখছি না, এই জ্ঞানে দাঁড়া না, তা হলেই মড়া হয়ে গেলি। বলেছি ত, একমাত্র ভাল করে শব্দ উচ্চারণ করলেই পেয়ে গেলি। কতটুকু এল, কি এল, এল কি না, এ সব দেখিস না। ঠাকুর পর পর যে স্তর দেখিয়ে দিচ্ছেন, সেই বিজ্ঞানের স্তরটা দেখে যা। ইহাই তোদের Base বা ভূমি হবে। ঠাকুর তা হলে কথার ভিতর দিয়েই সব করবেন। এ কি অন্য কেউ বুঝবে? কিছুই নয়—কথা কইবার সময় শরীর, মুখ, প্রাণ, মন, এ সব মনে করবিনে; খালি জ্ঞানস্বরূপকে মনে করবি। ওঁতে ছাড়া আর কোথাও কেউ জন্মায়? কি জ্ঞানে বসিয়ে দিয়েছি দেখ না, এর মূল্য দে না; এখানে দাঁড়িয়ে দেখ—এর কত দাম! যদি কারো দাম থাকে ত কথারই আছে।

অ্যাং ব্যাং করে কোথায় যাচ্ছিস? কাকে দেখছিস? মা, শিব, আত্মা, ও সব জানিনে। একমাত্র জ্ঞান, চেতনা—ইনি কথায় কথায় রূপ ধরছেন? আমাকে ছেড়ে রূপ ধরছেন? হর! হর! ঐখানে দাঁড়িয়ে কথা কইতে পারবি নে? হওয়া মানেই কথা ফোটা? হচ্ছেন বলে বলছি, না বলছি বলে হচ্ছেন? মা আসছেন বলে বলছি, বলছি বলে মা আসছেন না। এইখানে চোখ রাখ। এ পুঁজি না হলে মন্ত্র বলতে পারবিনি, ঋষি হবিনি, মন্ত্রের দ্রষ্টা হবিনি। ভগবতি! নমো নমো নমঃ!

কে ঘাড় ধরে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে নিলে রে? "আমায় গড়

কর, আমায় গড় কর” বলে সে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে নিলে ; তুই তখন বললি—“নমঃ” !

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে জ্ঞানময়ী রয়েছেন ? দেখে বল্। অধ্যাত্মে, অধিভূতে রয়েছেন ? আমার বন্ধন-মোচন জ্ঞান থেকে হচ্ছে। বিশ্বকে, ভূতকে জ্ঞানময় বা ‘আমার’ জ্ঞানমূর্ত্তি বলে দেখলে মোক্ষের আরম্ভ হল। মা, ছেলে, স্ত্রী, বাবা, মা, টাকা, যা পেলি—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এতে জ্ঞান ছাড়া আর কিছু পেলিনে। তা হলে ত জ্ঞানকে ছাড়া আর কাউকে পাচ্ছিনে। এই চললি ! রূপে রসে, মায়ে বাপে, স্ত্রাতে পুত্রে—কোন্ জ্ঞানে দেখেছিস স্বয়ম্ভূ নেই ? বম্ বম্ মহাদেব ! কর শিবপূজা !

খুলছে ? বল্ ভরসা করে ! ভগবতীর বুকে বসে যা বলবি, তাই হবে। এ ছাড়া আর পুঁজি নেই। বই পড়াও নয়, ঠাকুর-ঘরে কলা খাওয়া আর ঘণ্টা নাড়াও নয়। এই পুঁজি। ভগবানেই থাকা, ভগবানেই বাঁচা, ভগবানেই চলাফেরা করা। এই তোমার পুঁজি। ধর্ম্ম বলে কোন হাতী ঘোড়া নেই। আমি বললুম—“বল !” তুই চাইলি ওদিকে। এ ভূমি তা নয়। সাক্ষাৎ গুরুভূমি, সাক্ষাৎ মায়ের ভূমি—এর কেরামতি এইখানে। এই নিজবোধ-ভূমি কল্পতরু নয় ? সাপ বললে সাপ পাবি, ভগবান্ বললে ভগবান্ পাবি। এই জন্য বলে—“শিব কল্পতরু, শিব জগদ্গুরু।”

প্রকাশক
পণ্ডিত শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী (ব্যারিষ্টার-এট্-ল)
৮।১, নিউ রোড, আলীপুর।
কলিকাতা।

মূল্য—৪

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় নিবেদন

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা তদীয় শিষ্যবৃন্দকে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম তিনি নিজেই 'ঋতম্ভরা' নামক পুস্তকাকারে লিখিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তক বিগত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী উপদেশাবলী কোনও পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। মধ্যে গত ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস হইতে ভাদ্র মাসের কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত কয়েকটি উপদেশ 'শ্রীশ্রীগুরু-বাণী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তার পর নানা কারণে আর কোনও উপদেশ মুদ্রিত হয় নাই।

আচার্য্যদেবের উপদেশ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া যাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺সরলা দেবী চৌধুরাণীর লিখিত উপদেশ অন্যতম। তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে যখন কলিকাতার বাহিরে থাকিতেন, সেই সময়কার উপদেশ ব্যতীত ইংরাজী ১৯৩৭ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে বহু উপদেশ তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তদীয় পুত্র শ্রীমান্ দীপক দত্ত চৌধুরী এই সকল উপদেশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় আচার্য্যদেবের উপদেশমালা আজ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

এই সঙ্কটকাল এরূপ ব্যয়সাধ্য পুস্তক-প্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে। তথাপি শ্রীমান্ দীপক যখন আমাদিগকে ইহার মুদ্রণ-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন দুর্লভ ও অমূল্য এই সব উপদেশ পাছে মুদ্রণাভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আমরা শ্রীমানের সে

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তিনি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, আশা করি, গুরু-ভাইগণ তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে সহায়তাদানে পরাঙ্‌মুখ হইবেন না।

এই উপদেশমালা বেদবিহিত আর্ষ জ্ঞান ও তাহার সাধন-প্রণালী-মূলক। বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে কাহারও কাহারও নিকট ইহা কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রথমে 'ঋতম্ভরা' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া লইলে, এ সকল উপদেশের মর্ম্মাবগতি সহজ হইবে।

উপদেশ শ্রবণকালে অতি দ্রুতভাবে পেন্‌সিল দ্বারা উপদেশ-সকল লিখিত হওয়ায় দীর্ঘকাল পরে সেই সব লেখার পাঠোদ্ধার কিরূপ দুরূহ ও কষ্টকর, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা বুঝিবেন। এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মুদ্রণোপযোগী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—গুরুভগ্নী শ্রীমতী স্নেহময়ী দেবী। তিনি তাঁহার রুগ্ন দেহ লইয়া যেরূপ একান্ত-মনে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহার এইরূপ সহায়তা না পাইলে বর্ত্তমান উপদেশমালা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপদেশমালা যাহাতে যথাযথ ও বিশুদ্ধ-ভাবে মুদ্রিত হয়, সে বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। সে জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

নিবেদক

শিষ্যগণ।

প্রকাশকের নিবেদন

গুরুর বাণী মায়ের লেখনীবদ্ধ ছিল। আমি তাহা গুরুভাইদের হাতে তুলিয়া দিলাম।

দীপক

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১১	বাতাপি ভাইকে	বাতাপি-ভাইকে
৩৯	১০	Electrisation	Electrocution
৩৯	২৩	প্ররাভূত	পরাভূত
৬৭	১১	প্রাণ নিয়ে	বুদ্ধি নিয়ে
৮৫	৯	ভূভুবঃ	ভূর্ভুবঃ
১৯৩	১২	বলতে পারলেই	না বলতে পারলে।
২৪৫	১০	নাস্তর্ণ	নাস্তর্ন

বেদবাণী

[আচার্য্য শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলী]

১৭ই জুলাই, ১৯০৭, শনিবার, সন্ধ্যা।

ওঁ বিষ্ণুঃ। তোমার বিষ্ণুত্ব দেখলাম, তোমার চোখের তলায় আছি, এই জ্ঞানে দৃষ্টি পড়ে গেল। চেন বা না চেন, চোখের তলাটিকে আগে দেখ, আমার তলায় যিনি আছেন বিপুলভাবে, তিনিই আসল জিনিষ। বিপুল স্থিতি বা **Massive rest**এর উপর শক্তির কাজ হচ্ছে। ভগবান্ খুঁজতে পাড়ায় বেরোতে না হয়, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়। হবে? চিন্ময়ী দেবীকে আমার খুঁজতে বেরোবি?

সব তত্ত্বে রস আছে, রসে আবার তেজ আছে। ঐ হৃদয়ের গোড়ায় তেজ। তেজ রস হলে প্রাণ হয়—প্রাণের এক মূর্ত্তি তেজ, আর এক মূর্ত্তি রস। রস হল খালি ভোগ, তেজ হল বহিঃসৃষ্টি। যে দিকেই হাত-পা বাড়াই, মন প্রাণ পরিচালিত করি, তাতে চিন্ময়ীকেই ধরতে পারব, দেখতে পাব, এইরূপ চেষ্টা চাই। এঁকে না দেখে তোদের জ্ঞান-সম্পদ্ হয়ে গেছে মৃত্যুময়। সৃষ্টি ও লয়, এই দুই শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা, ঢেউয়ের দ্বারা চিন্ময়ের অব্যক্ত স্থিতি, শিবত্ব চোখে পড়ে যাচ্ছে। "যোগো ভোগায়তে চৈব ভোগো যোগায়তে তথা। এবং তে ভজনং

দেবি সুরাসুর-বিমর্দ্দিনি ॥” যোগ হল মুক্তিপাদ, দক্ষিণপাদ, যাতে মায়ের সঙ্গে আমি মিলিত হয়ে যাই। ভোগ হল সিদ্ধি-পাদ, বাম-পাদ, যাতে আমি মায়েব ঐশ্বর্য্য পাই। ‘ভজ’ ধাতুব ‘ভ’য়ে উকার জুড়ে দে; ‘ভুজ’ ধাতু হয়ে ‘ভোগ’ এসে গেল। আবার ‘যজ’ ধাতুর ‘য’য়ে উকার যুক্ত হয়ে ‘যুজ’ ধাতুর ‘যোগ’ পাওয়া গেল। উকার যোগ করাই আসল কথা। সবার সঙ্গে যুক্ত হয়েও ‘উ’কাবে যদি যুক্ত না হই, তবে সে যোগেব কোন মূল্য নেই। সুতরাং সকল কাজের তলায় তলায় এই আত্মতত্ত্বকে নজরে রাখ। জলের তলা অবধি দেখে নে। তা হলে জগদ্দর্শনের চেহারা সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে।

চাঁদ দেখতে নিজে চাঁদে লেপচে আছিস মনে হচ্ছে? তা হলে চাঁদ আর তুই নিজে, দুটো জিনিষ হল। যখন মনে আসছে—লেপচে আছিস, তখন সে ক্ষরপুরুষ। আর তুই নিজে যখন চাঁদ হয়েও চাঁদ থেকে নিজেকে পৃথক্ বা অসঙ্গ দেখতে পেলি, তখন অক্ষর-পুরুষ। নমঃ শিবায়। চলে যা ক্ষরভূমি থেকে অক্ষরে। যখন চলে গেলি, তখন আর গায়ে কিছু জড়িয়ে রইল না ত? তত্ত্ব আসছে? শিবলিঙ্গ আছে, ভয় কি? এই শিব। আমি তোমায় পেয়ে গেছি, ধরে ফেলেছি, ‘আর ছাড়ব না। এই না গতি? এই দিক্ দিয়ে যাবি। একেবারে শিশুর মত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা। এই কথা মনে করলে গঙ্গাস্নানেব মত সব অবসন্নতাদি ধুয়ে যায় না? সমস্ত দিন বিষয়-চিন্তা করেছিস, টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙ্গা কাচের মত হয়ে গেছিস—

ছেলেতে এক টুকরো বিঁধেছে, বাড়ীতে এক টুকরো ইত্যাদি। চুর চুর হয়ে গেছিস, গুঁড়ো হয়ে গেছিস্। দেখছিস? এখন একবার একটা জায়গায় এসে জুড়ে গেলি। খালি চিদ্‌-বিলাস, দেখতে পাচ্ছিস্? কি ভয়ঙ্কর শক্তি! অত যে টুকরো করেছিলুম নিজেকে, মুহূর্ত্তে যুড়ে যাচ্ছি।

১৮ই জুলাই, ১৯৩৭, রবিবার।

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥' দেবতাদের কাছে খালি চাইব, তাঁদের আমি কিছু দেব না, এ হলে চলবে না। আমি দেবতাকে দিলে তাঁরাও আমাকে দেবেন। নিজের যা প্রিয়, যা না হলে আমার চলে না, সে সবই দেবতাকে দিতে হবে। নিজের ভাতের প্রয়োজন হলে দেবতাকেই আগে ভাত দেবে। মাত্র দেবতাকে দিলে দেবতা লোভী হয়ে যান; সুতরাং দেবতারা পরমাত্মারই মহিমাপ্রকাশ, এই জ্ঞানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে দেবে, তাতে পরমাত্মার সহিত দেবতারাও তৃপ্ত হয়ে যাবেন। এ বিজ্ঞান অতি অপূর্ব্ব। আমরা বসে আছি সমস্তের কাঙ্গাল হয়ে। জীবত্বের মানেই কাঙ্গাল হওয়া। তিনি জাগিয়ে দিয়েছেন এই সব তৃষা, কাজেই এরা সব আমায় অবলম্বন করে ফুটেছে। এখানে তাঁর মূর্ত্তিই তৃষা। সেই তৃষার আবার বৈশিষ্ট্য আছে। কেউ বড়মানুষ, কেউ দরিদ্র; এর মানে, কেউ টাকা চায়, কেউ মান সম্ভ্রম ইত্যাদি চায়। এই যে তৃষ্ণা, ঠিক

এর পিছনে বসে আছেন সেই তত্ত্বটি, যাঁর দ্বারা সেই তৃষ্ণা এবং তার প্রতিষেধক জিনিষটিও ফোটে। এই ভাবে যিনি বসে আছেন, তাঁর নাম তত্ত্ব। আমাতে রূপের তৃষ্ণা আছে, ভূতিক্ষেত্রে রূপের ঢেউও আছে; অথচ এর এক বিন্দু আমার নেবার জো নেই। এত রূপসমুদ্র রয়েছে, তবু এ থেকে কিছু নিতে হলেই, পিছনে যাঁর হাতে নিয়ন্ত্রণ বা control আছে, সেই রূপতত্ত্ব, তাঁকে প্রার্থনা বা appeal করতে হবে। রূপ, রস ইত্যাদির যা কিছু আনন্দ, তা এঁদের দ্বারা প্রতিফলিত হয়; আনন্দস্বরূপিণী মা আমার যতটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়েন, সেইটুকু আমি ভোগ করতে পাই। এর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন সর্ব্বরূপময়ী, সর্ব্বরসময়ী, সর্ব্বস্পর্শ-শব্দময়ী; সর্ব্বত্র দেখি যে, তত্ত্ব আকারে অর্থাৎ আধার আকারে ইনিই রয়েছেন। Electricity দেখতে পাইনে; কিন্তু সুইচ টিপলে সব ঘর আলোয় ভবে যাবে। আমি কল টিপতে শিখেছি। যদি জানি, আমার পিছনে এমন কেউ আছেন, যাঁকে টিপলে এক এক ঘাঁটিতে এক এক তত্ত্ব প্রকাশিত হবেন, তা হলে এই ঘর থেকেই রূপ, রস, বীর্য্য, যশ, ধন, ভুর-ভুর করে বার করতে পারব।

আমরা জানি না বলে প্রতি তৃষ্ণায় পদার্থের দিকে হাত বাড়াই। দশ ইন্দ্রিয় দশ ভুজ—ঐ দিক্ দিয়ে হাত চলে যায়। আর একটা অব্যক্ত, যেটা কেঁদে উঠেছে, সে চলে যায় অব্যক্ত ভূমিতে; আমি জানতে পারি না, তত্রাচ আমার এক অংশ চলে যায় ভগবতীতে, তখন তিনি অধিকার দেন। সহস্রদল কমলে

যিনি বাস করছেন, আমাকে ভোগ দেবার জন্য তিনি যেটুকু গ্রহণ করবেন, সেইটুকু শুধু আমাকে ভোগ দেবে। এইরূপে প্রতিনিয়ত ভগবতীর দিকে প্রেরিত হচ্ছি, বিষয়ের জন্য কাঁদছি আর বিষয় পাচ্ছি। কিন্তু আসলে কান্নাও তোমার, প্রাপ্তিও তোমার ; আমার কিছুই নয়। আমি তা হলে কি হলাম ? একটা রাস্তা বা channel মাত্র। আমি ভিতরে ফোঁপড়া, বাইরে ফোঁপড়া ; আমি nil, void, ফাঁক। ভোগও আমার নয় ; সবই তোমার। এ থেকে আমার বাঁচবার একটি মাত্র রাস্তা আছে। যতক্ষণ না আমি 'ঐ তুমি গো' বলে তোমার দিকে চাইতে পারি, ততক্ষণ আমার এ শূন্যতা কিছুতে ভর্ত্তি হবে না। আমার অনন্ত কামনা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমার ঐ তত্ত্বে উপনীত হব। তার জন্য এমন একাগ্রভূমিক প্রত্যয় চাই, যা পাহাড়-পর্ব্বতেব আঘাতেও ভাঙ্গবে না। আর এরূপ একাগ্রভূমিক প্রত্যয় বুকে বসিয়ে দিতে শুধু গুরুই পারেন, আর কেউ নয়।

পাখীর বাচ্চাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল বলে পাখীরা সমুদ্র শোষণ করতে বসল, যা নাকি তাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তাদের একাগ্রতায় এলেন গুরু, সমুদ্র শোষণ করে বাচ্চা বের করে দিলেন। সে গুরুর কাছে পাখীরা খালি বাচ্চা চেয়েছিল, সমুদ্র-শোষণ-বিদ্যা চায়নি। তোরাও গুরুর কাছে এসেছিস। এই শিবত্বে বজ্রের মত প্রতিষ্ঠা দিতে হবে, এই আকাঙ্ক্ষা তোদের হৃদয়ে দেখতে চাই। কিন্তু এখনও তোদের মুখে

বিষয়ের ঢেকুর উঠছে, এ আমি দেখতে চাই না। শুদ্ধ, পবিত্র, স্থির হয়ে গুরুর বাক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। এই তোদের উদ্ধার করে ছেড়ে দি, জাগিয়ে দি ; আবার কাদামাটি মেখে আসিস্। আবার আমাকে ধুয়ে দিতে হয়। এতে কত পরিশ্রম!

আমি কয়দিন ধরে কি শেখাচ্ছিলাম? বিপুল আধারস্বরূপ যে শিবত্ব, তাঁর উপর ভরন্তুর করে শক্তি খেলা করেন। পিছনে মহৎ সত্তার অবস্থিতি নেই, অথচ একটা পাতা নড়ছে, এ হতে পারে না। আর শেখাচ্ছি, সেখান থেকে তাঁর যে কোন ইচ্ছা তোর ভিতরে জেগে উঠবে, তাতে সকল সময়ে তাঁর ত্রিমূর্ত্তির হাজির থাকতে হবে। পরমাত্মস্বরূপ থেকে আরম্ভ করে ক্রিয়ামূর্ত্তি পর্য্যন্ত এবং তাঁর ভূতমূর্ত্তি পর্য্যন্ত ঐ ত্রিমূর্ত্তিকে হাজির থাকতে হবে। 'জগত্যাং জগৎ'—জগতে যে চাঞ্চল্য চলছে, তাও 'ঈশা বাস্যং'রূপে দেখতে হবে। যে মানুষ এই জ্ঞানে নিশ্বাস নিতে শিখেছে, জগতে নড়াচড়া করতে শিখেছে, সে এই জগৎজ্ঞানের ভিতর বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ভুলে ভগবতীর জ্ঞানেই ভরপুর হবে না? সুতরাং প্রতি ক্রিয়াই ঐ ঐশ্বর্য্যময়ীকে এনে দেবে, যাঁর কণামাত্র রূপে সে ভরে উঠবে।

আমি যদি শিবজ্ঞানময়, তা হলে আমার কি মূর্ত্তি উপলব্ধিতে আসবে? যা স্পর্শ করব, তার পরিপূর্ণতা, তার যত রকম বৈশিষ্ট্য আছে, যুগপৎ আমাতে আসবে। গন্ধ বললে শুধু চন্দনের গন্ধ নয়, যত রকম গন্ধ আছে, সব যুগপৎ আসবে।

সেই রকম পূর্ণ রস, পূর্ণ স্পর্শ, যা কিছু সব পাব। এ সবও তুচ্ছ হবে, এ সকলের পিছনে যে পরমাত্মা আছেন, যাঁতে এই সকল সুখের সমাবেশ, 'তৃপ্তোঽহস্মি' বলে যিনি ভরে আছেন—তাঁকে পেয়ে।

কণামাত্র শাক খেয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'তৃপ্তোঽহস্মি', তখন সশিষ্য দুর্ব্বাসাও বললেন—'তৃপ্তোঽহস্মি'। খেতে হল না। অধিকার যখন পূর্ণত্বে, তখন নানারকম করে খেতে হল না, তাঁর তৃপ্তিতেই জীব তার বৈশিষ্ট্যের ভোক্তা হল। তাই "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।" Taking the whole as a mass, সমগ্রের যুগপৎ ভোক্তা। এ কি রকম ভোগ? ভোক্তা কি এ ভোগে জড়িয়ে যাবে? কেন জড়াবে না? জীব অভাবের ঘরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তাতে বাঁধা পড়েছে, সেই ছাচে আপনাকে দেখে ফেলেছে, তাই ওর সসীমের তৃষ্ণা। অনন্তত্ব জীবের বাইরে আছে। আর আমার ভিতরেই অনন্তত্ব—শিবত্ব। তাই এ ভোগে আমি বাঁধা পড়ব না;—এ ভোগে নিজত্ব-বোধ নিয়ে ঢুকলেও বাঁধা পড়ব না।

এই পরম তত্ত্ব; বাক্যে যাঁর মহিমা ইয়ত্তায় আনা যায় না, গেয়ে ফুরোন যায় না, সেই তত্ত্ব আত্মরূপে তোকে ধরে তোর বুকে বসে আছেন। আরও অধিক, গুরুরূপে বলছেন,—"বৎস, তুইও আমি।" যদি এ অধিকার ছেড়ে চলে যাস, এই জ্ঞান শ্রবণের পরেও যদি পিতৃযানে গতি হয়, তবে কত ক্ষতি। এইখানে দৃষ্টি রাখা চাই। ভগবতীর সামনে চলেছি, এই জ্ঞানকে সর্ব্বদা

উদ্ব্যস্ত করবি। সর্ব্বদা না পারিস, অন্ততঃ গুরুর কাছে। সাপ যেমন লেজের উপর খাড়া হয়, তেমনি দাঁড়িয়ে উঠবি, নেতিয়ে পড়বিনে; গুরু রয়েছেন—ভাবনা কি?

তোদের বলে দিয়েছি, 'অমে'র ভিতর দিয়ে 'ওম্'কে পেতে হবে, এ ভিন্ন উপায় নেই। তোদের যত কিছু বল, **morality,** শুদ্ধতা ইত্যাদি, সবকে পরিণত করতে হবে তেজে। হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলনশীল, হৃদয়রূপ জলের উপরের অংশকে অগ্নিরূপী করতে হবে, রসশোষী করতে হবে, রসভুক্ হতে হবে। অগ্নি হব্যগ্রাহী। 'ভগবান্' শব্দ নেতিয়ে পড়বার শব্দ নয়, ভগবান্ বলে দীপ্ত হয়ে উঠ্‌বি।

ওঁকার = অ-উ-ম। অম = অ + ম। বাকী রইল উ। ওঁকারের ভিতর উ পেলে, অম পেলে। 'উ'র বুকে যদি 'অম' জ্বলে ওঠে, তবে সমস্ত ভূতকে গলিয়ে জ্ঞান করে, সমস্ত জ্ঞানকে টেনে আত্মত্বে একসা করে, সমস্ত আত্মত্বকে পরমাত্মা করে। পরমাত্মায় যাবার ক্ষমতা প্রাণের নেই; তেজই তাঁতে যেতে পারে, 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং।'

পর পর ছবি দেখিয়েছি, এতেও যদি তোরা নিশ্চেষ্ট হস, তবে সে ক্লৈব্য ছাড়া কিছু নয়। এমন অধিকারের ভূমি এই শিবতত্ত্ব মা তোদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। "বৎস, তোর কি বলবার বল; তোর বলার অপেক্ষায় মা বলবার অধিকার ফুটিয়েছি। যা বলবি, তা পাবি।"

আর কোন কথার কিছু দাম নেই। তুই ইচ্ছা করলে

বাড়ীখানা ভোজ্য করে খেতে পারিস, আগুনে শুতে পারিস, এই সম্বন্ধ তোর আমার সঙ্গে। যদিও আমি সর্ব্বদাই আছি, তবু তুই এমন জায়গায় চলে গিয়েছিলি যে, আমায় দেখতে পেতিস না। এখন এমন জায়গায় তোকে এনে ফেলেছি; তোকে বলার অধিকার দিয়েছি; এখন সেই বলার উপর নির্ভর করছে—তুই কোথায় যাবি, কোন্ মূর্ত্তিতে আমায় পাবি। এ অধিকার তুই গ্রহণ করবি না, এখনো সন্ত্রস্ত, সচকিত হয়ে দাঁড়াবি না? সেই ছোট ছোট আইন, ছোট ছোট হিসাব; সর্ব্বভুক্ তুই এখনো খালি দুধ-সাবু চাচ্ছিস?

ইল্বল ও বাতাপি দুই ভাই অসুর ছিল। তারা ব্রাহ্মণ পেলে, বাতাপি-ভাইকে কেটে, তার মাংস ব্রাহ্মণদের খাওয়াত। আহারান্তে ইল্বল 'ভো বাতাপি' বলে ডাকতেই ব্রাহ্মণদের পেট ফাটিয়ে বাতাপি বেরিয়ে আসত; ব্রাহ্মণরা মরে যেত। এই ব্যাপার শুনে অগস্ত্য একদিন সেখানে উপস্থিত হলেন। অসুর-ভ্রাতৃদ্বয় অগস্ত্যকে সৎকার করলে এবং বাতাপিকে কেটে তার মাংস খাওয়ালে। ভোজনান্তে অগস্ত্য বসে আছেন। ইল্বল 'বাতাপি' বলে পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগল। কিন্তু সে আর বেরোল না। এই হল তেজ।

এই বসে কথা কচ্ছিস, মায়ের বুকে? তোর এই কথা কোথায় খেলছে? কথা কওয়া, আর কথা শোনা এক, এ কথা বলেছি। কথা কওয়া শুনতে পেলে সেই কথাকেই ঊর্দ্ধে তুলে ধরা হয়। একেই, এই কথাকেই তুলে ধরা হচ্ছে? তা

হলে এইবার কথা ক ত? আর কাউকে দেখতে পাবি কথা কইলে? যদি বলি রূ-প—কে এল রূপ ধরে? এ ভূমি সত্য? সত্য বলে মনে হচ্ছে? মায়ের মত যদি কথা কইতে হয়, কথাকে যদি সার্থকতা দিতে হয়, কথার দ্বারা যদি অভীষ্ট লাভ করতে হয়, তবে এই আত্মত্বেরই বুকে, অন্য কোথাও নয়।

কাল ক্ষর ও অক্ষর আত্মা বিভাগ করে দেখছিলাম। গাছ দেখলুম। গাছের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সে আত্মত্বের ক্ষরমূর্ত্তি। যিনি গাছে জড়িয়েও জড়ান না, ক্ষরিত হয়েও হন না, তিনি অক্ষর। যদিও গাছের তলায়, মাটির তলায় নিজেকে দেখলুম, তথাপি এখানে দেখছি, জড়িয়েও জড়াইনি। কোন্ দেশের জীব আমি, আগুনে জড়িয়েও জড়াই না? প্রতি ক্ষর আত্মার তলায় অক্ষর আছেন, ইনি কূটস্থ; মাত্র এখানে নয়—যিনি জল, মৃত্যু, জীবন, সমস্তের তলায় আছেন, তিনি একজন, সর্ব্বজ্ঞ; কেন না, গাছের তলায় গাছ বলে, কীটের তলায় কীট বলে, মাটির তলায় মাটি বলে তিনি আপনাকে ভোগ করছেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ। আমার জীবত্ব চলে গেছে, আমি সর্ব্বজ্ঞত্বে এসেছি।

পারছিস যেতে? ক্ষর থেকে নিজের অক্ষর পুরুষত্বে? জোঁক এক তৃণ থেকে আর এক তৃণে চলল—কে নিয়ে যাচ্ছে তাকে? ঐ মা। আত্মত্ব ছাড়া মা আর কিছু নন। দেখার সময় অধিকার দিয়ে বলছে—আত্মত্ব ছাড়া আর কিছু না। এই মাকে চিনবি না—এই শিবকে? এই দুই মূর্ত্তি নিয়ে মা বিশ্ব

রচনা করেছেন। কোন্ মূর্ত্তিতে? বাক্মূর্ত্তিতে, গুরু-মূর্ত্তিতে। গুরু ও বাক্ এক কথা।

১৯এ জুলাই, ১৯৩৭, সোমবার, সন্ধ্যা।

মনের ভূতজ্ঞানক্রিয়া পরিচালনের আধার হল ললাট, আর ভূতভাব পরিচালনের আধার হল মূলাধার।

কে জানে অমৃত, আর কে জানে বিষ, সকলকেই ওখানে—শম্ভুক্ষেত্রে গিয়ে শান্ত হতে হবে; ওখানে গিয়ে সকলকেই শুয়ে পড়তে হবে—পাহাড় পর্ব্বত যেই হোক্। আমার চারি ধারের যে ব্যাপ্তি, সে আমার জ্ঞানেরই ব্যাপ্তি। আমার কিছু জানতে হয় ত তুমিই জানাবে, কিছু করতে হয় ত তুমিই করাবে, কিছু পেতে হয় ত তুমিই পাওয়াবে—হে শান্ত! আহা হা! আর উনিই আমার নিজত্ব ত। আমার যথার্থ পরিচয় উনিই—আনখেভ্যঃ, আরোমভ্যঃ। সমগ্র বিশ্বটা ধারণা করতে যাবি, না শুধু ঐ যতটুকু ফুটেছেন, তাঁতে সমর্পিত হতে চলবি? এ-ও ধারণা; কিন্তু ওরকম ধারণা নয়। "ভগবৎকামো নিষ্কামো বা।" সে তিনি কত দূর? যাঁকে দেখলে আমার আমিত্ব আর অন্য কোথাও জাগতে পারে না, এইরূপভাবে যাঁর প্রত্যক্ষ অববোধ হয়? জ্ঞানময়ীর জানা মানে, নিজেকে জানা। জানা মানে, দর্শন, শ্রবণ, স্পৃশন, সব যার ভিতর আছে। দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, জানার এক একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র। এই বৈশিষ্ট্য নিতে গিয়ে

সম্ভূতিক্ষেত্রে শব্দাকারে জ্ঞান ফুটে ওঠে। গ্রহণের জিনিষ শব্দ, আর শব্দ ধারণের যন্ত্র, এ বললেই শুনতে পাওয়ার মত একটা জিনিষ মাথায় এসে যায়। রূপ বললে দেখতে পাওয়ার মত একটা জিনিষ মাথায় এসে যায়। আমার জ্ঞান যে দর্শন স্পৃশনের আকার গ্রহণ করল, আমি তাই ভোগ করছি। দর্শন বলে ক্রিয়া যে বৃক্ষে নয়, আমার ভিতরেরই প্রকাশ, এ কথাটা কিন্তু মাথায় আসছে না। বিশ্বরূপ, বিশ্বশব্দ, বিশ্বরস ইত্যাদি সব যদি আমার জ্ঞানেরই মূর্ত্তি হয়, তবে এ প্রকাশগুলি কার হল? আত্মার ছাড়া আর ত কারও হতে পারে না। সুতরাং আত্মা সর্ব্বরসময়, সর্ব্বস্পর্শময়, সর্ব্বশব্দময়, সর্ব্বগন্ধময়. সর্ব্বরূপময়। আমরা ঐখানটায় ওঁকে পাই না, যেখানে আমরা বিভক্ত, সেইখানটায় পাই।

আত্মা বলতে তাঁর জ্ঞানময়ত্ব যদি না ফুটল, সজীব দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, ইত্যাদি না বোধ হল, তবে আত্মা শব্দ প্রয়োগের কোনও সার্থকতা নেই। আমার সর্ব্বস্বের দাতা, সর্ব্ব অভাব নিরাকরণের একমাত্র আধার। তাঁকে দেখলে শোক, জ্বালা, অভাব আর থাকবে? তোরা খালি গ্রহণ কর, অগ্রসর হ।

জ্ঞানকে যদি বলেছ কল্পনা, আমার Intellect বা বুদ্ধির খেলা, তবে সে একটা ভূতই হল। জ্ঞান যতক্ষণ জীবন্ত, একজন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, রসয়িতা, বোদ্ধা না হবেন, ততক্ষণ জ্ঞানকে পেলি না। তুই যে কাঠিন্য, তারল্য, স্পর্শ ইত্যাদি যে-কোন গুণকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনে করছিস, স্থূল মনে করছিস, এর প্রত্যেকটাই

জ্ঞান। জ্ঞান মানেই কঠিন, জ্ঞান মানেই শীতল, জ্ঞান মানেই আগুন। যতক্ষণ তা না হবে, ততক্ষণ জ্ঞানকে পেলি না, জ্ঞানের ভূত পেলি। তবে কোন্‌টা ভূত? যে জ্ঞান এইরূপ স্থূলত্ব বা materiality প্রাপ্ত হয়েছে, তোর ভোগের জন্য স্বতঃসিদ্ধভাবে যা তৈরি হয়ে রয়েছে, তার নাম দিচ্ছিস তোরা ভূত; মানে, যা হয়ে গেছে। ভগবতীর জ্ঞান এইরূপ হয়ে গেছে। এই বিচিত্র রূপের ছটা—কালো, সাদা, নীল, কার গায়ের রূপ রে? জ্ঞানময়ীর? কোথায় ভগবান্ খুঁজতে বেরোবি? এই বিজ্ঞান; সেই জন্য ঋষি বলেছেন,—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং।" শুধু আভাসে মেনে নেওয়া নয়। তোর জ্ঞানকে এমন ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বলে যা কিছু ভোগ করিস, সে সব মায়েরই মূর্ত্তি বলে দেখতে পাবি। ভাত-ডাল খেতে, রূপ দেখতে, আর মাটি ছুঁতে এইরকম প্রত্যক্ষীভূত ভগবতীকে দেখা গেল না? আর এসবের তলায় আত্মবোধ রয়েছেন? যত প্রকারের ভোগ, সে সব নিজে তদাকার না হলে হয়? নিজে তদাকার না হলে কোন কিছু হওয়াও হয় না। খালি আরও consolidated, আরও জমাট, আরও গাঢ়ভাবে নিতে পারলাম না। কিন্তু ছোঁয়ান হল। "অহমেব তৎ", এ ভিন্ন আর কিছু চলবে না। "নমস্তে" বলে ঝাঁপ দেওয়া, আর "অয়মেব ব্রহ্ম" বলাই শেষ। জ্ঞানের স্তরগুলি বুঝলি? ভূত বলে দেখায় যেরূপ বাইরের দিকে প্রত্যক্ষতা হবে, সে সব তোমার জ্ঞানের বাইরে; তদ্রূপ ভিতরে আত্মত্ব,

একীভূতত্ত্বা। আমার জ্ঞান একেবারে আত্মত্বে ঠেকে শুয়ে যাবে ; আর একদিকে আত্মত্বেরই কাঠিন্য, তারল্য, অন্য কারও নয়, এ সব প্রত্যক্ষতা আসবে। আর কি বাকী রইল ? This is intellect also ; এই মনোগ্রন্থি খুললে এ সব দেখতে গিয়ে যে রস ফুটবে, তাহাই প্রাণগ্রন্থি, আর প্রাণগ্রন্থির ভোগ আত্মত্বে মিলিয়ে গিয়ে বাঁধা সংস্কার যেখানে হল, সেই রুদ্রগ্রন্থি। মাটি কঠিন, এ কথা কে বলে দিলে ? জ্ঞান। কার জ্ঞান ? ভগবতীর জ্ঞান। এইরূপ মায়ের রস, মায়ের রূপ, মায়ের শব্দ, মায়ের স্পর্শ প্রভৃতি। এই দর্শনই ভগবতী-দর্শন। তোমাকে ধারণা করে রাখতে পারছি না দেবি, একবার মানুষী তনু ধারণ কর ত। দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, এঁরা কোন্ সমুদ্র থেকে উঠবেন ? এই যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিস—আত্মা থেকে ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, ইনিই দুর্গা, কালী, বিষ্ণু হয়ে দাঁড়াবেন। তুই চোখ কাণ, মন প্রাণ দিয়ে আর কাউকে প্রত্যক্ষ করছিস ? সুবোধ হল, না দুর্ব্বোধ হল ? দুটা রাজ্য অহর্নিশ আলাদা করে ফেলে রেখেছিস। এ দুই রাজ্য তোর সেই জ্ঞানই। এখন শুধু ঈক্ষণটা বদলে গেল। যেমন মা, তেমনি আছেন ; ভূত বল ত ভূত আছে, ভগবতী বল ত ভগবতী আছেন। এঃতে তোর ভিতরে কি হল ? যে ছিল ভূত, সে-ই হল ভূত-ভাবনী। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,"—গায়ে মাটি পেলি, জল পেলি, আকাশ পেলি ? জ্ঞানশরীর হলি ? শরীরে যে সব উপাদানের অভাব হয়েছে, যার দরুণ রোগ প্রভৃতি হচ্ছে, এই দর্শনে সে সব উপাদান

পূর্ণ হয়ে যাবে। জয় ভগবতী! পেলি এবার? ভগবতী কল্পতরু বটে, সব দিতে পারেন। কিন্তু আমরা সব কথাটার মানেই জানি না। হীরা মাণিক যে চেনে না, তাকে এক থালা হীরা মাণিক দিলে বলবে, "এ নিয়ে আমি কি করব; এ-সব একটু চিক্-চিক্ করবে মাত্র। তার চেয়ে এক থালা পয়সা দিলে কাজে আসত।" সে জানে না, একটা হীরা দিয়ে কত পয়সা হতে পারে। সবই জ্ঞান, এই কথা অবলম্বন করে, সম্ভূতি অসম্ভূতি না দেখে, বৌদ্ধরা হল নাস্তিক, শঙ্কর হলেন মায়াবাদী এবং কপিলের শিষ্যেরা—যে কপিল আত্মানাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর শিষ্যেরা সম্প্রদায় গড়ে, দ্বৈতবাদী হয়ে গেল। নিজবোধ পরমাত্মত্বেরই একটা বিকাশ বা aspect। আত্মত্ব ততক্ষণ শব, যতক্ষণ না তাতে সমগ্র জ্ঞানতত্ত্ব ঢুকে যায়। পরমাত্মত্ব ও ভূতত্বের ভিতর আত্মত্ব হল সেতু।

২০এ জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

বস্তুত্ব গুণের একটা প্রকাশ—ত্রিগুণের Permutation, combination। বস্তুর গা ঘেঁষে কথা কইতে গেলে এই কথাই বলতে হয়; নয় ত সবই ত্রিগুণময়ীরই বিকাশ বা রূপান্তর। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" 'রয়েছে' ইহা বড় সাংঘাতিক কথা।

সমগ্র বিশ্ব উপলব্ধ। এমন একটা কণা, এমন একটা অণু

কিছু আছে, যা তোর উপলব্ধ নয় ? যা দিয়ে তুই গঠিত, যা তোর উপাদান, সে উপাদান জ্যান্ত, তারই নাম তত্ত্ব। দুনিয়ার উপাদান জীবিত-তত্ত্ব—আত্মময়, আত্মোপলব্ধিপূর্ণ। ইনিই একসঙ্গে যুগপৎ অক্রম উপলব্ধি করতে পারেন। অক্রম উপলব্ধি খালি রুদ্রে হয়; প্রাণে হয় না, মনে হয় না। অক্রম দ্রষ্টা হওয়া মানে, ভূত ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের মত পাওয়া। আমি আত্মা, এমন একটা বিশ্ব নেই, যা আমার উপলব্ধ নয়। তোরা মনে করিস, তোদের সংস্কার আলাদা হয়ে পড়ে আছে; তা নয়। যেমন বর্ত্তমান নিয়ে আত্মত্ব রয়েছেন, তেমনি সংস্কাররূপে অতীতেও আত্মত্বে রয়েছি। এখন আর বলতে পারবি না 'আমি জীব।' 'তৎ ত্বমসি।' তুমিও তাই। কি খোলা রে, কি মুক্ত কবাট! দেখতে পাচ্ছিস ? ভূ থেকে সত্য পর্য্যন্ত সাত দরজায় চাবি-দেওয়া যে শক্তি, কখন্ কি ঘাড়ে এসে পড়বে, জানিস না,—সে সাতটা দরজাই আজ খোলা—"আমি তুমিই গো, আমি তুমিই গো!"

যদি আমার চারি ধার, দিগ্‌দিগন্ত, উপলব্ধির দ্বারা রচিত হয়, বিজ্ঞাত হয়—কোথাও এমন কিছু নেই, যা আমার জানা নয়, পরিচিত নয়, তা হলে সে পুরুষ কি বলে নিজের পরিচয় দেবে ? সর্ব্বজ্ঞ বলে। আর অজ্ঞান থাকবে ? দিগ্‌দিগন্ত সমস্ত আত্মায় উপলব্ধ, এই হবে যার জ্ঞানের ভূমি, সে কি অন্য কিছু গ্রহণের জন্য লালায়িত হবে ? এই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষে যদি মন্ত্রচৈতন্য করতে হয়, তা হলে আপনি কি হবি ? এঁর যদি

পূজা করতে বসিস ত কি ভাবে পূজা করবি ? আপনিও তাই হবি না ? "ওগো, তুমি সর্ব্বজ্ঞ," এই ভাবে সর্ব্বজ্ঞের উপলব্ধি এলে সর্ব্বজ্ঞ হবিনে ? কাকে বলছিস ভগবতী ? অতীব স্থূল জ্ঞান থেকে অতীব সূক্ষ্ম জ্ঞান পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপিণী যিনি, তিনিই ত ভগবতী। "এষ অন্তর্যামী এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং।" ভূত হয়ে বসেছিস মানে, তাঁর গায়ের মাংসকণা হয়ে বসেছিস। ভগবান্ কোথায়, আমি ভূত হয়ে বসেছি, এ কথা এখন আর বলবার থাকবে ? তোর গায়ের একটা রক্তকণিকা যদি কথা বলতে পারত, তবে সে বলত, 'আমার আমিত্ব তোমারই আমিত্ব।' আমার রক্তকণিকা এ কথা বলতে পারে না ?

বেরিয়ে গেলি ভগবান্ খুঁজতে, এ গ্রন্থি খুঁজতে, ও গ্রন্থি খুঁজতে ; খুঁজে পেলি না, তখন বললি, 'কৃপা করুন।' এ সব ভাষার কোন আবশ্যকতা আছে ? এ শুনে শুনে অরুচি ধরে গেছে। অরুচি-রোগগ্রস্ত পুত্রকে মা যেমন এটা খাবি, ওটা খাবি বলে তার রুচি জাগাবার চেষ্টা করেন, তেমনি ভগবানে রুচি জাগাবার জন্য তোদের কাছে ভগবানের নানারকম বর্ণনা করতে হয়। নয় ত "আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত" একটা কথা বললেই হয়ে যেত। বাপ-মায়ের পা, হাত বা বুক, যা ধরেই বল,—'তোমায় চাই,' তার একই মূল্য। তোরা জ্যান্ত ভগবান্ দেখতে পারিসনে বলে তোদের কাছে এত করে আত্মতত্ত্ব বলতে হয়। কেন না, আর কোন ভাবে এতটা জ্যান্তভা পাওয়া যায় না। সেই

জন্য সোনার কাঠি, এ কথাটার এত দাম হয়ে গেল। গাছ, জল প্রভৃতি তাই আত্মতত্ত্ব দিয়ে দেখতে বলা হল। কেন না, জীবন্ততার উপলব্ধি আত্মতত্ত্ব ভিন্ন হয় না। যদি জ্যান্ত বলে দেখা যায় ত আত্মবোধই দেখা যায়। যার হাতের জ্ঞান আছে, সেই নিজেকে বাহুময় বলবে। তেমনি যার আত্মজ্ঞান নেই, সে কি নিজকে আত্মময় বলতে পারে? আমি চুপ করে বসে আছি মানে, জ্ঞানময়ীর জীবভাব আমায় পেয়ে বসেছে। আমি অসঙ্গ বলে নিজেকে বোধ করছি মানে, মায়ের অসঙ্গ-বোধ আমায় পেয়েছে। আমি আত্মা বলে বোধ করছি মানে, তাঁর আত্মবোধ আমায় পেয়েছে। তা হলে খড়ম গড়তে, তোকে গড়তে কি কাদার ঢেলা পেলুম? না, এ সব জ্ঞানময়েরই মূর্ত্তি? প্রজ্ঞানঘন মূর্ত্তি? তোকে তিনি দেখছেন, দেখতে পাচ্ছিস? তোর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সব তিনি দেখছেন, দেখতে পাচ্ছিস? জানা হয়ে গেলে পাওয়া হয়ে গেল। তুই জানতে পারছিস না যে, বিশ্বময় তিনি ফুটে আছেন। সম্ভূতিতে তিনি আছেন। অসম্ভূতিতে, অনুভূতিতে তাঁকে দেখলে, তিনি দেখছেন, এইটি দেখতে পেলুম। তার মানে, আমারও দেখা হয়ে গেল। ভগবান্ দেখছেন, ভগবান্ দেখছেন! কি সাংঘাতিক কথা! মন্ত্র-চেতনা হল? এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে 'সব দেখছেন' বললে তবে সব দেখা হল। নতুবা "অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিতশাখাগ্র-ফলাস্বাদনমোদবৎ॥"

২১এ জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা।

জানছি, এও যা, জ্ঞান করাও তা। দিক্‌জ্ঞান মানে, 'দিক্' বলে জ্ঞানের উপলব্ধি হচ্ছে। একই স্থান থেকে যুগপৎ স্বস্থ ও দুঃস্থের প্রকাশ। শঙ্কর এর যে কত কদর্থ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। জ্ঞানতত্ত্বের এই যে প্রকাশ-যৌগপদ্য, তা তিনি ধরতে পারেননি; জ্ঞাননামীয় যে পরম বিজ্ঞান, সে বিজ্ঞানের আস্তাকুড়ও তিনি ঘাঁটতে পারেননি। এই যে যৌগপদ্য, এইখানে নির্ভর করে মায়ের আমার যত কিছু মহিমা। এইটি জানা না থাকলে ভগবান্ বলতে জগৎ সরাতে হয়, জগৎ বলতে ভগবান্ উড়ে যান। কিন্তু আসলে জগৎকে সরাবার বা উড়াবার কিছু প্রয়োজন নেই; যেখানে দর্শন, সেইখানে দৃশ্য, সেইখানে দ্রষ্টা। জয় ভগবতি! এইরকম নিরেট ভগবান্ চাই। এ শুধু বলার অপেক্ষা। তোর শরীর যেমন স্বতঃসিদ্ধভাবে পাওয়াই আছে—'শরীর কেমন আছে' জিজ্ঞাসা করলে একটা অংশকে Particularize বা নির্দ্দিষ্ট করা হয় মাত্র, ভগবান্ তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। এ ভাবে কে দেখতে পারবে? যার এই যুগপদ্‌ভাব আছে। আজ একটা বড় কথা বলে দিলাম। ঐখানটার উপর এই বিজ্ঞান কত দূর নির্ভর করে, সেই হিসাবে বললাম।

সপ্রকাশ যিনি, তিনি সপ্রকাশই থাকেন। তার উপর যখন তিনি প্রাণময়ত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সপ্রকাশত্ব ঘুচে যায় না। অথচ পূর্ণ differentiate বা স্বাতন্ত্র্য রচিত হয়ে গেল; আর

এর নামই অসঙ্গত্ব। তা হলে যা গড়েছেন, তা থেকে তিনি আলাদা আছেন, আবার একসঙ্গেও আছেন।

সপ্রকাশ ত রয়েছেন, আর এ পাশে দিঙ্‌ময় বা প্রাণময় রয়েছেন। এ উভয়ের পরস্পর কোন সম্পর্ক নেই, অথচ আছে; কেন না, এরূপ না হলে জগৎ ফোটে না। তিনি ফোটেন, অথচ ফোটেন না, দুই রূপই একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিস? তিনি কোন্ শক্তিতে এরূপ হন? আত্মতত্ত্বের শক্তিতে। এই শক্তি হল আত্মতত্ত্বের উভয়মুখী শক্তি, যার অনুকরণে তাঁর জ্ঞানক্রিয়াও দুই বিপরীত pole বা মেরু নিয়ে রচিত হয়। অম্—জন্ম ও মৃত্যু। মৃত্যুজ্ঞান না থাকলে জন্ম হয় না, জন্মজ্ঞান না থাকলে মৃত্যু হয় না। 'উ'-কার জুড়লে এঁর নাম হয়ে যায় ওম্=ব্রহ্ম। এখানে ভগবতী আছেন? এ সব জড়িয়ে আছেন? মা! তোকে কোন্ দিক্ দিয়ে দেখি? একদিকে একেবারে ঐক্য, আর একদিকে একেবারে স্পর্শ নেই। দুটো একসঙ্গে কবে দেখতে পাব?

জ্ঞান থেকে আকাশ জাত হয়। আকাশ ফুটেছে মানে, ব্যাপ্তি ফুটেছে। অথচ জ্ঞানের ব্যাপ্তি নেই। তুমি যে আকাশ দেখলে, তাতে বেপে চলে গেলে কি? না, এইখানে বসেই একটা অণুজ্ঞানের ভিতর সব পেলে? অথচ আকাশ রয়েছে একটা বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে। তা হলে ইনি সকল ব্যাপ্তির আধার, অথচ ব্যাপ্তিশূন্য। থাকা ও ব্যাপ্ত হওয়া, জ্ঞানের এই-রকম সাধারণ ক্রিয়া যদি একসঙ্গে দেখতে পাও, তা হলে যিনি

সপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর সেই স্বরূপকে কিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়? তিনি ব্যাপ্তি আদি কিছু নন, অথচ যুগপৎ সবই। এই যুগপৎ জায়গাটা নিতে হবে গুরুর কাছ থেকে। এ Logic বা যুক্তি নয়, argument বা তর্ক নয়, ইহাই fact বা সত্য। তেজ + উ = ব্রহ্ম। ব্রহ্ম—তেজ (অম্) = উ = শান্ত শিব, অব্যক্ত অবস্থা অক্ষর; একেবারে অনির্ব্বচনীয় নয়।

জগতে তোমরা জ্ঞানের ভূত ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও না। জ্ঞানের এক আয়তন ভূতনামীয় বা আকাশনামীয়। 'আয়তনজ্ঞান' বলে যিনি আছেন, তাঁর এক আয়তন ভূত, এক আয়তন ভগবান্। অথচ একদিকে মাত্র জ্ঞান, অন্য দিকে জ্ঞানের অনন্ত বিশ্ব। জ্ঞানের প্রকাশ পর পর কত স্তরে হয়, যাতে এমন কারণ তৈরি হয়? জ্ঞান কেমন করে Hydrogen, Oxygen প্রস্তুত করে এবং দুইকে একসঙ্গে করে জল করে? তুলা থেকে ১০০ নম্বর ও ২৮ নম্বরের সুতা মিলিয়ে কাপড় হয়। কাপড় মানেই, জ্ঞান হতে জাত আয়তন। একে ভাঙ্গলে জ্ঞান ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের শক্তিবাদের শিক্ষায় জ্ঞান কি করে স্তরের পর স্তর হয়েছেন, জ্ঞান কি করে উপাদান হয়েছেন, এ সব তত্ত্ব পাওয়া যাবে। জ্ঞান ছাড়া কিছুর কিছু নেই; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সব জিনিষের উপাদান জ্ঞান। সম্ভূতি-অংশ ভগবান্। যে অংশ অনুভূতি, ভগবান্ সেখানে ভোগের জন্য অনুপ্রবিষ্ট। ভোগের দিকে উদ্‌যুক্ততা সেই পরাশক্তি প্রকাশ করেছেন। এক দিকে ভোগের জন্য মশার

কামড়, ভোগ উপলব্ধি, আর এক দিকে মশাকে তাড়ান। এক দিকে ভোগ করবার উপযুক্ত জীব, অন্য দিকে ভোগের জন্য জিনিষ বা ভোগ্য হলেন। এখন ঐ মহাদেবীকে ভাঙ্গতে হবে, অংশীভূত করতে হবে—টাকা ভাঙ্গিয়ে যেমন সিকি, দুয়ানি, পয়সা হয়। তিনি হয়েছেন মানে,—জ্ঞান হয়েছেন, মানে—পরমাত্মা হয়েছেন। তিনি যে দিকে দিচ্ছেন, সে দিকে দাতা; যে দিকে ভোগ নিচ্ছেন, সে দিকে গ্রহীতা—আত্মবিস্মৃত আত্মা। তোদের স্মৃতি ফিরে আসছে। পূর্ণমাত্রায় এখনও আসেনি, তাই খোঁজাখুঁজি চলছে। যা উপলব্ধি করছিস, তাই বড় হয়ে আছে। যে ঈশ্বরত্ব দেখছে, সে জানে, অন্তর বা বাইরে যা ফুটুক, যে শব্দই ফুটুক, সব জ্ঞানমূর্ত্তি। জগৎ স্থূল, কঠিন—এখানে স্থূলত্ব ও কাঠিন্যের ভোগ হল। এ ভোগের দাতা কে? যেখানে যা রূপতন্মাত্রা ভোগ করলি, দাতাকে দেখলি না। আত্মা না থাকলে কারও প্রকাশ হয়? রূপত্ব যে ভোগ হল, এখানে আত্মা আছেন? একই ক্ষণে কে কে আছেন? দাতা, গ্রহীতা ও গ্রাহ্য, যুগপৎ; রূপ, রূপের ভোক্তা, রূপের দাতা একসঙ্গে সংন্যস্ত—যুগপৎ, মায়ের বুকে শিশুর মত। কোন শব্দ উচ্চারণ বা স্মরণ করলে তাতে আছেন—রূপ, প্রাণ, বিজ্ঞান, দাতা ও সবিতা। এ কথা কি দেখে বললি? "পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ," এই বেদবাক্য দেখে। তিনি দেখে রূপ হলেন; দেখলাম, এর নাম রূপতত্ত্ব। এখানে 'দেখা'র অর্থ কি? চক্ষুষ্মান্ জীব, প্রতীতিময় জীব। এইরূপে শব্দতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব,

সব তৈরি হল। তত্ত্ব মানে, যার ভিতরে সেই-জাতীয় প্রকাশের সব যোগ্যতা আছে, অথচ কোন বিশিষ্ট প্রকাশ নেই। গন্ধতত্ত্ব— যার মধ্যে অনন্ত গন্ধ আছে, অথচ বিশিষ্ট প্রকাশ নেই। তিনি রসতত্ত্ব হলেন—সর্ব্বরসের "জ্ঞ" হলেন, এমন মূর্ত্তি নিলেন, যাতে সব রস আছে। এতে তৃপ্ত না হয়ে বললেন—বৈশিষ্ট্য ভোগ করব; হলেন জীব। বাক্সে টাকা আছে—দেখবি? ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি রূপতত্ত্ব ভাঙ্গলেন—বহুরূপ হবার জন্য; জীব হলেন—ভোগের জন্য। ঘরে রূপনামীয় তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু আছে? সাদা লাল, হরিত পীত, সব গিয়ে এক রূপতত্ত্ব হল এবং তার জ্ঞাতা আছেন। রূপতত্ত্বের যিনি জ্ঞাতা, তিনি হলেন দাতা। মা আমার রূপতত্ত্বের তলে বসে তত্ত্ব প্রসব করছেন—'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং।' সবিতা-দর্শন, প্রসব-কর্ত্রীকে দেখা, দাতাকে দেখা। তোদের এমন কোন্ জিনিষটা ভোগ হচ্ছে, যার সঙ্গে সঙ্গে এই দাতা মাকে দেখছিস না? যেমন সকল রসের জিহ্বা একায়ন, সকল শব্দের শ্রোত্র একায়ন, তেমনি সকল তত্ত্বের মা একায়ন। ভগবতী-জ্ঞান নিয়ে এ সব কথা শুনলে গুরুতে, জ্ঞানমূর্ত্তিতে চোখ রাখতে হবে, নতুবা বায়ুগ্রস্ত হবি। শুধু Intellect বা বুদ্ধি দিয়ে ইহা গ্রহণীয় নয়। জ্ঞানমূর্ত্তি ছাড়া আর কেউ নেই দেখবি। রসতত্ত্ব চিবিয়ে ভেঙ্গে ছেড়ে দিয়েছি। স্পর্শে বজ্রও আছে, আবার ফুলের কোমলতাও আছে। তত্ত্বকে তত্ত্বময়ীজ্ঞানে দেখবি, নতুবা ভুল হবে। অচেতন-পদার্থ-জ্ঞানে দর্শন করা অভ্যাস হলে সেই-জাতীয় জিনিষই

পাবি। কাপড় তৈরি হল, তার জ্ঞান হল; কিন্তু তত্ত্ব দেখলে না, তুলো দেখলে না; একে স্বল্পজ্ঞান বলে। অজ্ঞান বলে কিছু নেই, খালি ভগবতীই আছেন। অজ্ঞান যদি থাকে ত সে ভগবতীরই এক মূর্ত্তি—তারই নাম অজ্ঞান। ভূত কথার মানেই জ্ঞানমূর্ত্তি, জ্ঞান মানেই আত্মজ্ঞানময় ভগবান্—"যেনেদং ধার্য্যতে জগৎ।" "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা।" 'মা, আমি তোমাকেই শুদ্ধ দেখছি', এ কথা যদি স্বীকৃত হত, তবে জ্ঞানের এত বিভাগ দরকার ছিল না। শুক্রাচার্য্যের এক চোখ কাণা না করলে সর্ব্বস্ব দান করতে পারা যায় না। তোর মাথায় সংস্কার আছে। ফুল বললে তুই ফুল বোধ করতে, বুঝতে পারলি; তখন জানলি, তোর মধ্যে সংস্কারভাবে ফুল ছিল; এখন অপ্রকাশ থেকে প্রকাশ হল, ক্রিয়া হল। এ প্রকাশ কে করলে? প্রকাশ করবার মত কেউ নিশ্চয়ই আছে, সে প্রেরণা দিল, নয় ত ফুলের স্মৃতি হত না। দুর্গা কাকে বলে? সব সংস্কার ধরে যিনি সর্ব্বজ্ঞা দেবী—যিনি সব ধরে বসে আছেন, যেটি তোর দরকার, সেটি প্রেরণ করছেন; অনন্ত বিশ্বে যেখানে যা আছে, তার ধর্ত্তা—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের জ্ঞাতা। তিনি যদি মাত্র তোর এই কয়টা সংস্কারই জানতেন, তা হলে তোকে কেবল এরই মধ্যে ঘুরতে হত। Higher evolution হত না, মাত্র ঘোড়া বা মানুষ থাকতিস, তোর উদ্ধার হত না। তিনি তোর সব সংস্কার বিধৃতি আকারে ধরে বসে আছেন। তোকে হোঁচট খাওয়াবার জন্য ইটের সামনে নিয়ে গেলেন। সর্ব্বজ্ঞ বলে বাহির থেকে ইট

টানছেন এবং ভিতর থেকে অজ্ঞ তোকে ঠেলছেন। তত্ত্বের গোড়ায় থাকা আর তোকে ধরে থাকা, এ দুই-ই এক। এমন আমার মা! ভালবাসার লোকের স্মৃতিতেও কত সুখ! অজ্ঞানে মা বলা স্মৃতি। এক্ষণে জেনে বলা—তাঁর ভাব এলে তবে বলব, ঠিক হয়েছে।

২৫এ জুলাই, ১৯৩৭, ববিবাব।

প্রতি জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বটি কি ভাবে লুকান রয়েছে, কি সুন্দর ভাবে তা কাল মা বলছিলেন। একটি কথা কইলাম, তার দ্বারা একটি ক্রিয়া হল, একটি জানা হল। এই ক্রিয়াটিব নাম সৃষ্টি, জানাটির নাম ভোগ। আর তাতে আমি প্রবিষ্ট হলাম, এও জানা হল। জানার ভিতর তিনটি রকম আছে,—সৃষ্টি, ভোগ ও তন্ময় হয়ে যাওয়া। যখন কথা কইলুম, তখন কথা কওয়ারূপ একটি কার্য্য তৈরি করলাম, একটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হল, ব্রহ্মেব একটি অণ্ড, একটি তেজোময় পুর তৈরি হল। চিন্ময় দেবতা, যাঁ থেকে ছাড়া কথা বেরোয় না, তাঁ থেকে একটি ধ্বনি নির্গত হল, আয়তন ঘিরে নিল। কেন? ডিমের মত ঘিরে নিল কেন? লম্বা-চওড়া হয়ে বেরোল না কেন? একটি গোলক রচনা হল কেন? অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভোগ করবেন বলে তার চার দিক্ ঘিরে নিলেন। যা থেকে বের হচ্ছে, তাইতে আবার ফিরে আসতে হবে, ইহাই শক্তির গতি, শক্তি-বিজ্ঞান। প্রত্যেক আঘাতটি, অগ্রসর হওয়াটি পিছন দিক্ থেকে আকৃষ্ট

হয়; তাই গতি মাত্রেই গোল হতে বাধ্য। এই জড়বিজ্ঞানশক্তি যাঁর দৃক্‌শক্তি বা ঈক্ষণ, তাঁর চারি দিকেই ঈক্ষণ ত? আমাদের মত একদিকে ঈক্ষণ নয়। আলো যেমন চারি ধার দিয়ে বিকীর্ণ হতে থাকে, তেমনি এই তত্ত্বের দিক্‌নির্ণয় হতে গেলেই চারি দিক্ থেকে হতে হবে। যদি চারি দিক্ থেকে বিকীর্ণ হয়, তবে একটা আলোর চারি দিক্‌ব্যাপী ঘেরাটোপ তৈরি করবে, Spaceটা matterএর জন্য curved হয়েছে, তা নয়। এ সর্ব্বেক্ষণময়—চাবি দিক্ দিয়ে দর্শন, তাই এর নাম—অণ্ড, গোলক। এই জন্য আমাদের পক্ষে ভগবতী থেকে যা কিছু জাত হয়েছে, তার প্রথম শক্তি অণ্ডজ, অণ্ডপ্রসবিনী শক্তি। তেমনি প্রতি বাক্যটি সর্ব্বদিক্‌নিরীক্ষক তত্ত্ব থেকে প্রকাশ হচ্ছে বলে ওর আয়তনও গোল। জলে টুস্কী মারলে জল যেমন চারি দিকে চলে যায়, তেমনি বাক্য কম্পিত হলেই অণ্ড তৈরি হয়ে যায়। ইহাই ব্রহ্মতত্ত্বের বাক্‌প্রকাশ। একটি জীবকে তাতে ঘিরে নিয়েছে, যে তা থেকে প্রসূত হবে। ছিল মহান্, ছিল অব্যাহত; এখন একটা গণ্ডী হয়ে গেল, তার দ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল; কিন্তু একেবারে নয়; এইমাত্র ঢুকেছে কিনা।

তোরা ভগবান্ বলে তখনই তাঁর কাছে যেতে পারছিস না; বলতে বলতে যাস। তার কারণ, গোল ঢেউ হয়নি, একপেশে ঢেউ হচ্ছে। তেমনি ভগবানেরও পূর্ব্বস্মৃতি রয়ে গেছে, কিন্তু তিনি তাকে বেষ্টনের ভিতর পুরে নিয়েছেন।

বাক্য বলে বলে বেষ্টন বাড়াচ্ছেন, ঘিরে নিচ্ছেন। তার পর কিছু দিনের জন্য সে তার ব্রহ্মস্বরূপ থেকে খণ্ডিত হয়ে গেল। স্মৃতিভ্রংশ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে কাজ চলে। পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হলে প্রথমে ভদ্রতার সহিতই ঝগড়া চলে। ক্রমে ভদ্রতার স্মৃতি চলে গেল, অভদ্রের ঝগড়া চলতে লাগল। তেমনি ব্রহ্মের স্মৃতি থেকে বিচ্যুত হল, উদ্ভিজ্জ শক্তিতে বেরিয়ে গেল।

ফুল বললাম, একটি অণ্ড প্রস্তুত হল; আমি ফুলে প্রবিষ্ট হলুম। ফুল হৃদয় হল, তাতে আমার তন্ময়তা এল। তখন আমি মানুষ, এ কথা ভুলে গেলুম; কেন না, ঐ ফুলে তন্ময় হয়ে রয়েছি। একজন কেউ এসে ডাকলে, "ভাত খেতে এস," তখন জাগলুম। তার মানে, আমি যে মানুষ, ভাত খেতে হবে, ফুল হয়ে এ কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তাঁর ব্রহ্মাণ্ড রচনাতেও যে বিজ্ঞান, জীবের একটা কথা কওয়ায়ও সেই বিজ্ঞান, সেই শক্তি, মায়ের আমার অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জশক্তি খেলা করে। মা আমাব এইবকম ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তিতে খেলা করেন। তিন রকম সৃষ্টি আছে। Microcosm থেকে Macrocosm পর্য্যন্ত সব অণ্ডাকারেঁ গ্রথিত। একটা কণা, আর একটা বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। আর তাব ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকা, সেই ভাবময় হয়ে থাকা, জীবজ হয়ে থাকা। তার পর পূর্ণভাবে তাই হয়ে যেরোন— উদ্ভিজ্জশক্তি। মায়ে যুক্ত হয়ে যে এই বিজ্ঞান দেখবে, সে-ই ঠিক দেখবে; নয় ত সে জড়বিজ্ঞানে চলে যাবে। মা কে?

চিন্ময়ী। দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি সর্ব্ব-বেদন, সর্ব্ব হার্দ্দ ব্যবহারময় তিনি। তাঁর একটি কথা তাঁর হৃদয়রূপ আয়তনে আমায় পুরে নিলে। এ দেখতে পেলি? এ কথাটি আমি কইলুম? না, মা কইলেন? আর কেউ কথা কয়? আর কেউ দেখে? শোনে কে? হৃদয়ময় হয়ে থাকে কে? ইনিই থাকেন? যে মা কথা হয়ে বেরোল, সে কথা যত ক্ষুদ্র, যত ভাবশূন্য হউক, তত্রাচ তাতে ভাব আছে, অর্থ আছে, মাতৃত্বের আয়তন ও স্মৃতি আছে। ঐ কথা সহস্রার থেকে জাগল না? সেখান থেকে কে নামল? মা। সে কি তোদের মধ্যে শুধু অনুপ্রবিষ্ট হল? ঐ মা আমাকেও ঐ উপদেশের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে নিলে। অর্থাৎ আমাকে যে আমিত্ব দিয়েছেন, সেই আমাকে কথায় কথায় আমার মা আলিঙ্গন করে নিলে। এই বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান না দেখলে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বাদ পাবি না।

তোকে যে কথা কইতে কইতে চিন্ময়ী ঘিরে নিচ্ছেন, নিজে চিন্ময় না হলে এ কথা তুই বুঝবি না। তা হলে দেখে নিলুম, মা আমাদের প্রতি কথায় আলিঙ্গন করছেন। আমরা বাক্যের বাচ্যে চেতনাময় হচ্ছি—চেতনাকে ঘিরছে চারি দিক্ দিয়ে গোলাকারে। কত বার হারাবি, যদি এই জ্ঞান বুকে থাকে, কত বার হারাতে পারিস বল? বাঘের কথা, সাপের কথা বুকে প্রবিষ্ট থাকলে থেকে থেকে যেমন বেরিয়ে পড়ে, তেমনি এই চিন্ময়ী মায়ের কথা বুকে প্রবিষ্ট থাকলে তুই ভাববি—এই জগৎ, এই জীবন, এ ত সার্থকতায় ভরা। এ ত চিন্ময়ী মায়ে

সমাবিষ্ট হয়ে থাকা, মায়ের একটা লহরীস্বরূপ। এই তোর সত্য স্বরূপ। খালি অণ্ডজ জীবজ ইত্যাদি বলাতে, আর এই চিন্ময়ীতত্ত্ব দেখাতে কত তফাৎ দেখ্ ত। আহা হা!

হ্যাঁ মশায়, তা হলে এত ঢেউ তুলে মা রয়েছেন, মায়ের বুকে অনন্ত ঢেউ অহর্নিশ চলছে—খালি ফোটাচ্ছেন আর নেবাচ্ছেন। এ ত বিপুল কর্ম্মময়ী, বেদনময়ী, হৃদয়ময়ী মাকে দেখালেন। যে মা শান্ত স্থির, সে মা কৈ? তা হলে এই সন্তান-প্রসবিনীর তলায় আরও একটি স্তর আছে? সেটি শিবস্তর, শুভ্র স্তর, শান্তিস্তর। তাঁর বুকে না বসে এমন খেলা হয়? না। এই যে খণ্ডিত হওয়া, আবার তাঁর বুকে যাওয়া, এ ত তাঁকে নিয়েই হওয়া। শিবস্তর ব্রহ্মস্তর। আচ্ছা, গাছের নাম দিয়েছি উদ্ভিদ্, জীবের নাম দিয়েছি জীব। তবে মায়ের মহাভাবে উদ্ভিদ্ আছে; ওখানে চেতনতা যতটা হারান আছে, আমাদেব ততটা হারান নেই। আমাদের চেতনা আছে, হৃদয় আছে। উদ্ভিদের তা নেই। সেই জন্য আমরা উদ্ভিদ্ হলেও উদ্ভিজ্জ ভাবকে ছাড়িয়ে জীবজ্ঞানে চলেছি। কিন্তু প্রকৃত জীবজ্ঞান সে দিনই হবে, যে দিন আর শরীরজ্ঞান থাকবে না।

এখনও তোদের উদ্ভিজ্জ ভাব আছে। কম হউক, বেশী হউক, গজ্ঞান এখনও চলছে। তবুও এখন তোরা বেরিয়ে এসেছিস, মানুষ হয়েছিস, দেবতাদের চেয়েও সেরা জীব হয়েছিস। দেবতাদিগকে নিজের ভোগের বিস্তৃতিতে নিমগ্ন থাকতে হয়। আমাদের তিনি ভিখারী করেছেন বলে, আমাদিগকে সর্ব্বদা

প্রায় সাধু করে রেখেছেন। একটু জল, বাতাস, তাপ পাই ত বাঁচি, এই ভাবে আমাদের সব সঞ্চয় করতে হয়। অথচ আমি স্বাধীনভাবে কোন্ দিকে যাব না যাব, একটা হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান খেলাবার অবসর আমাদের আছে। দেবতাদের তা নেই। তাঁরা দয়া করলেন ত গলে গেলেন, কুপিত হলেন ত একেবারে ক্রোধের একশেষ। মানুষের তা নয়; তারা ভেবে চিন্তে অগ্রসর হয় এবং চেষ্টা করলে দেবত্ব পর্য্যন্ত যেতে পারে। আমাদের তাই পূর্ণ জীবত্বে অধিকার পেতে হবে। পেতে হবে কেন? যখন গুরু দেখিয়ে দিলেন, প্রতি বাক্যে আমরা মায়ের মাতৃত্বের বা চেতনত্বের বেষ্টনে চলে যাচ্ছি, কথা কইলুম মানে, তদাকার মায়ের ঈক্ষণের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, তখন এঁকে না পেয়ে আর উপায় নেই। এর নাম কি? সৃষ্টি। তা হলে তোর মনে শোক, জ্বালা, রোগ, সুখ, যা কিছু উঠল, সে সব মাই সৃষ্টি করে করে চল্‌লেন। কি কাণ্ড বল্ ত! মা! যখন চিনতে পেরেছি সবই তোমার, তখন যতই বল,—'তোর ভাগ্য, তোরই ইচ্ছা, তোর কর্ম্ম', মূলতঃ দেখছি, সে সব তোমারই সৃষ্টি। আর আমি তার ভোক্তা। প্রতি শব্দ-আকারে যে জগৎ ফোটাচ্ছ, সে তোমারই সৃষ্টি, আর আমাকে তা ভোগ করাচ্ছ। মা! আর অন্য মূর্ত্তি ধরতে হবে না, তুমি শুধু মা হয়ে দাঁড়াও। এখন ফুল এলে যেন দেখি, ফুলের কাপড় পরে তুমিই এসেছ; ফল এলে যেন দেখি, ফলের কাপড় পরে তুমিই এসেছ। আর ঐ কল্পনামাত্র থেকে বিপুল বিশ্ব পর্য্যন্ত একই মা, আর মায়েই সকলের

অনুপ্রবিষ্ট হওয়া। তোরা মাকে পেতে চাস, গুরু জুটে গেল, এখন সাধক হ। মা যেমন তোকে একটা অণ্ডাকারে বেষ্টনী দেন, তুইও তেমনি মাকে লক্ষ্য করে বেষ্টনী দে। বল—'মা ঊর্দ্ধে, মা অধে, মা সম্মুখে, মা পশ্চাতে, মা দক্ষিণে, মা বামে, সর্ব্বত্রই চিন্ময়ী মা!' ঐ লক্ষ্য কর, গোল হয়ে শব্দ বেরোচ্ছে। এই যে মা বলে মাকড়সার মত সুতো পাকাচ্ছিস, এই যে মাতৃত্বকে বেষ্টন করছিস, দেখ, এতে অন্য দিকে নজর যাচ্ছে কি না, কোথাও ফাঁক আছে কি না। ঐ দিকে নজর রেখে মা বলবি। কত ক্ষণ মা মা বলতে হবে? যত ক্ষণ না মা উদ্ভিদ্ হন, ফেটে বেরিয়ে পড়েন, তত ক্ষণ তাপ দিতে হবে। তাপ দিয়ে দিয়ে জীব বানাবি। ও ত ছিল অসঙ্গ, আপনাকে দেখে আপনি সন্তুস্ট, আপনার আলোয় আপনি বিভোর; ওর বুকে মাতৃ-জীবত্ব জাগিয়ে দাও, ওকে মাতৃ-বোধবান্ করে দাও। মা—মা—মা—মা। কত ক্ষণ ডাকতে হবে? যদি অভিজ্ঞ হস, একবার ডাকলে হয়ে যাবে। গুরু বলে দিয়েছেন, ঐ অসঙ্গ আত্মত্বের ভিতরই শক্তিত্ব। তা হলে আমি যে 'মা' বলছি, এ ত তুমিই লুকিয়ে থেকে বলছ; তুমি উত্তর-সাধক হয়েছ। আমার মুখ দিয়ে মা বলিয়ে, প্রকাশ হবার জন্য তুমি আপনিই উদ্যুক্ত হয়েছ।

শুম্ভ নিশুম্ভ বধের আগে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মায়ের স্তব করছিলেন। মা তখন পার্ব্বতীবেশে সেখানে স্নান করতে এলেন এবং দেবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাকে স্তব করছ গা?' দেবতাদের আর উত্তর দিতে হল না।

ঐ পার্ব্বতীর শরীরকোষ থেকে আপনি শিবা-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়ে বললেন, 'আমারই স্তব করছে, আমারই স্তব করছে।' তেমনি ও বেটী তোদের এখন 'মা' এই শব্দ বলতে অধিকার দিচ্ছে। যদি চিৎক্ষেত্রে এই কাজটা করতে পারিস, তবে দেখবি, আমাকে উপলক্ষ্য কবে তার ডাক সে-ই ডাকছে। এই যে 'মা' বললি, এ কে বলালে ? এত ক্ষণ ত বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারতিস। এখানে তোদের কে এনেছে ? কে 'মা' বলাচ্ছে ? আবার ছেড়ে দিলে এখনি রূপের পিছনে, বিষয়ের পিছনে গুণ্ডা হয়ে ছুটবি। তোর মুখ দিয়ে 'মা' শব্দ বের করে মা এখন উদ্ভিদ্ হয়ে বেরোতে চাচ্ছেন। এইটে দেখলে দেখতে পাবি যে, ব্রহ্মতত্ত্বই চেতনতত্ত্ব। চেতনতত্ত্বে চিন্ময়ী মা অহর্নিশ কি কাজ করছেন ? বাতাস অহর্নিশ চলছে, তোরা তা ঠাওর পাচ্ছিস না। কিন্তু **meteorologist** বা বায়ুতত্ত্ববিদেরা তা ঠাওর পায়। তেমনি তোরা মায়ে **meteorologist** হ। মায়ে যদি দৃষ্টি ঠেকিয়ে রাখতে পারিস, তবে অসুর আপনি মরে যাবে।

তা হলে মা এত সন্নিহিত ? এই ফুল ফলেরই কাছে ? এরা মা নয় ? অন্তর ও বাহ্য, উভয় দিক্ বেপে যতক্ষণ সত্তা না দেখতে পাবি, ততক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্ব দেখতে পাবিনে। এই রূপত্ব রসত্বে কাকে পাচ্ছিস ? মা সন্নিহিত হল ? নয় ত এক পাশ ফাঁক পড়ে যায়, ব্যবধান পড়ে যায়, মাকে পূর্ণভাবে দেখতে পাবিনি। ফুল দেখে ফুল বল, আর মনে মনে বল, ফুল বলতে

কাকে পেলি ? বাহ্য—বাহিরকে পেলাম, ফুল পেলাম, মায়ের ফুলমূর্ত্তি পেলাম। এইরূপ সব। শব্দ আর বাহ্য রূপে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। 'ফুল' শব্দ আর এই 'ফুল' একেবারে এক জিনিষ। বলে দিয়েছি, দর্শন হতে মায়ের দৃশ্য ফুল হয়, আমাদের চোখ থেকে ফুলের রূপ হয়। চোখ থেকে রূপ হয়, চোখে ঠেকে 'রেটিনা'য় ঠেকছে, সেখান থেকে গিয়ে **intersect** করছে। এখানে রেটিনায় রূপতত্ত্ব আছে। এ পাশে জ্ঞানময় জিনিষ, রূপনামীয় জ্ঞানের একটি আয়তন, বিশুদ্ধ কাল, নীল রং একটা জ্ঞান জেগে আছে। রূপ মানে, রূপাভিমানী দেবতা। তোরা রূপের জন্য লালায়িত নস্ ? মা জাল পেতে বসে আছেন। রূপাভিমানী দেবতা বা রূপতত্ত্ব, শব্দাভিমানী দেবতা বা শব্দতত্ত্ব, এরা সব বসে আছে, নয় ত তোরা রূপ রস শব্দ পেতিস না।

শব্দ উচ্চারণ করা মানেই কোন কিছুর জন্ম দেওয়া। রূপ বললেই সহস্রদলবাসিনী, অনন্ত রূপের যিনি আগার, তাঁকে বুঝতে হয়। রূ—প, এই কথাটি বললে, এর ভিতর যাবতীয় রূপই আছে। রূ—প, এই কথা একটি **common factor**। কিন্তু রূপের তৃষা না হলে আমরা রূপ দেখতে পাই না। রূপভোগের জন্য আমার জন্ম। আমরা রূপতৃষাতুর ও বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন, এইখানে চোখ তৈরি হয়েছে। এর পিছনে আছে ভগবানের সর্ব্বরূপময়ী অনন্ত শক্তি। তারই বুকের উপর ফুটেছে রূপের তৃষা ; অনন্ত রূপের সমুদ্রের উপর রূপের তৃষা। যেমন সমুদ্রের উপর কুয়াসা, তেমনি রূপ-সমুদ্রের উপর রূপতৃষা, শব্দ-সমুদ্রের উপর শব্দ-তৃষা। সম্পদ্‌চেতনাময়ী মায়ে আমার

সম্পদ্‌তৃষা। এক দিকে মা আপনার মহিমাতে সব কিছু হয়েছেন, আবার তারই উপর ধূমাবতী হয়ে ছুটেছেন। কেন রে? না হলে সৃষ্টি হয় না, লীলা হয় না। পূর্ণত্ব প্রকাশ করতে হলে মহাশূন্য প্রকাশ করতে হবে। মহাশূন্যতার ভূমি তৈরি না করলে মহাপূর্ণতার রসাস্বাদ হয় না। এ সব চিন্ময়ী মায়ের আমার লীলা।

তা হলে এই পঞ্চানন-মূর্তি, পাঁচমুখো জ্ঞান, এ বড় সাংঘাতিক জায়গা। জল আর মাটি যেমন এক জায়গায় সঙ্গত হয়, তেমনি এখানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ রসাদি সব ভরা। এক দিকে মহাহাহাকারী ভিখারী, অসীম তৃষা; অন্য দিকে মহারূপের আগার। যেমন, সূর্য্যে যে সাতটা রং সমাবিষ্ট আছে, prism না হলে তা বেরোত না, তেমনি বাইরে একটা প্রকাণ্ড তৃষ্ণা না থাকলে অনন্ত রূপ ধরা পড়ত না। কাল, নীল, সাদা তরঙ্গ ধরা পড়ে কোথায় যাচ্ছে? ভোগ দিলে; দিয়ে কি জ্ঞানে পর্য্যবসিত হল? রূপজ্ঞানে অব্যক্ত হয়ে গেল। যেমন, খেয়ে এলি। 'কি রে, খাওয়া হয়েছে? কি খেলি?' 'আজ্ঞে, লুচি সন্দেশ, ডাল, তরকারি ইত্যাদি কত কি।' খাওয়ার ভিতর তা হলে লুচি আদি সবগুলো সমাবিষ্ট আছে; তেমনি 'রূপ' এই জ্ঞানের ভিতর সমাবিষ্ট আছে সব রকম রূপ; যেমন জিহ্বার ভিতর সব রস সমাবিষ্ট আছে।

তা হলে দেখছি, এক জায়গায় মা নিজেকে সংহত করেছেন, আর এক জায়গায় নিজেকে তৃষারূপে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যত কিছু গন্ধ, সব এই নাসিকায় সমাবিষ্ট এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য, এই

সব গন্ধের জন্য জগৎময় অন্বেষণ করতে হবে না ; এই সর্ব্ব-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ীকে বললেই পাবি। মা যেমন দেখে চোখ, আস্বাদন করে রসনা হয়েছেন, তুই যদি তাই করতে পারিস, তবে তোরও জিহ্বা থেকে অনন্ত রস, চোখ থেকে অনন্ত রূপ ইত্যাদি বেরোবে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই শব্দটি যদি বলা হয়, তবে আর জ্ঞান করতে বিলম্ব হবে ? কেন হবে না ? মাটি দেখছি কঠিন। প্রথম দেখলি মাটি, তার পরে জ্ঞান, তার পরে মা। তা হলে কে টক্, মিষ্টি, কে কঠিন, কোমল ? মাই ত। কে জল ? জ্ঞানই ত। ঘর দেখলি সাদা ; জ্ঞান—মাই ত সাদা। বুঝতে পারলি কথা ? মাকে দেখাব, তার ধারা দেখলি ? কে কঠিন ? জ্ঞান ? জ্ঞান শক্ত ? মা বজ্রের মত শক্ত ? আর মা বলতে দেরী করবি ?

সর্ব্বমূর্ত্তি মা, আবার অমূর্ত্তও মা। ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস পেলি ? চক্ষু খুলছে ? বালকের মত লোভ হওয়া চাই ; কোন গুরুগাম্ভীর্য্য চাই না। বালকের মত 'মা' বলবি। গন্ধতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব দেখলেই মা বলতে ছাড়বি না। আত্মা, পরমাত্মা, কূটস্থ ; স্থল, জল, আকাশ, মা ছাড়া কোন শব্দই নেই। জ্ঞানতত্ত্বে মূল হল মা। রস পাচ্ছিস্ ? উপলব্ধি পাচ্ছিস ? মাকে ছুঁতে পারছিস ? ছুঁচ্ছিস মানে ? সত্য করে বল। আহা ! দেবি !

অথচ এই সমস্ত, এত বড় বিশ্বজাল ; চোখে, মুখেঁ, হাতে, কাণে উপলব্ধ এই মা। এই মা আবার আর এক জায়গায় রয়েছেন, যেখানে এ সবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যেমন

জড়িয়ে ধরলুম, দেখি, তুমি এ সব নও। 'বিদিতাদথ অবিদিতাদধি।' মা, তোমাকে পাবার জন্য এই কূল-কিনারা, তোমাকে পাবার জন্য এই অভিনব কৌশল। এমনি পরমতত্ত্ব তুমি। এখানে আমাদের অসুর ধ্বংস করার অপূর্ব্ব কৌশল। **Law of intersection** যে দিন শেখাব, বুঝবি। ওঁ। এ সব কথা অনেক বার বলেছি। আজ নতুন করে বললুম। এখন অনেকে ধরতে পারছিস। মাকে ছুঁতে পারছিস। ধন্য মা, তোমাকে একটু ছোঁয়াতে পারছি। বুক খুলছে? হৃদয়ের গ্রন্থি কাটছে?

৩০এ জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার।

হৃদয়ের সহস্র সহস্র নাড়ী যদি তাঁকেই বরণ করে, তবেই সে সব নাড়ী একমুখী হল, তবেই তাঁকে সর্ব্বভাবে গ্রহণ করা হল। মনে হবে, এ বড় শক্ত জিনিষ। মন নানাকে চায়; কিন্তু বলা হয়েছে, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—একজনই আছেন। কাজেই মনে হয়, এ বড় শক্ত সাধনা। আমরা চাই—স্ত্রী, পুত্র, অর্থ; গন্ধ, রস, স্পর্শ; এর ভিতর কোন্‌টাকে দাবাব? ঋষি বললেন, যদিও উনি এক, তথাপি তোমরা যা কিছু চাচ্ছ, তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যার পশ্চাতে তিনি নেই। তিনি নিজে নেই, স্ত্রী আছে, তিনি নিজে নেই, পুত্র আছে, এ হয় না। তা হলে আমার ভোগের বিশ্বটাকে চারি দিক্ থেকে ঘিরে, নিজের গায়ে মেখে তিনি দাঁড়ালেন। আমি রূপ, রস, গন্ধ, আনন্দ,

বিজ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য, যা কিছু খুঁজতে যাব, ঐ মায়ের কাছ থেকেই সে সব পাব। গুরু চোখ দিলেন ;—উনিই সব। সর্ব্ব-প্রলোভনময়ী আমার মা, এই কথাটা যদি পূর্ণমাত্রায় বলে উঠতে পারি, তা হলে আমাদের দুঃখ দূর হয়। তুমি এত রাঙ্গা, এত সাদা, এত হলদে ! জীবের আজ যে ছুটাছুটি, তা ততক্ষণ, যতক্ষণ ভোগ্য-সকল কষ্টে অর্জ্জন করতে হয়। দুদিন ভোগ হলে আর তাদের আদর থাকে না। পিছনে ঐ মাই একমাত্র আছেন।

হীরার একটা কুচির দাম লক্ষ টাকা, তা কষ্টে অর্জ্জন করতে হয় বলে। আমাদের কষ্টে অর্জ্জন করা সবই এই তত্ত্বে পাচ্ছি, এ কথা জানলে তখন সবের আদর কমে গিয়ে ঐ একের আদর হবে। এঁতে যতক্ষণ না সর্ব্বশক্তি ও ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ দেখব, সুতরাং সর্ব্বপ্রলোভনময়ী বলে এঁকে যতক্ষণ না দেখব, ততক্ষণ হবে না। ইনিই আকর্ষণ করছেন, এঁর টানেই চলেছি, এ যখন চোখে পড়ে যাবে, তখনই অহেতুক ভালবাসা এসে যাবে। কেন এঁকে চাই, এর উত্তর দিতে পারব না। সাধনা মানে, চক্ষুরুন্মীলন। ইনি আছেন, অথচ আমি এঁকে জানি না ; সেই জানাই সাধনা। সাধনার এই বিজ্ঞানটুকু উপলব্ধির জন্য আমাদের যে গতি আছে, সেই গতিকে অবলম্বন করে নানা সাধু-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ; বিজ্ঞানটা তার তলায় অতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে। জৈব ভাব, যুক্তি, অনুমান ও ব্যবহার, নানারকমে তার সঙ্গে এই সমস্তের মিশ্রণ করে ঐ বিজ্ঞানটা চাপা পড়ে গেছে। সেই জন্য ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ করতে হলে বাহ্য ব্যবহার যা করছ ঠিক, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মত বলবে—

ও ব্রহ্মের একপাদ। এইরূপে বিজ্ঞানকে ঠিক রাখবে, নতুবা ঐ সাম্প্রদায়িক ভাবে জড়িয়ে যাবে। এই যে ব্রহ্মবাদ, এ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপক বলে, এই ব্যাপক ধর্ম্মের ভিতরে গতি লাভ করতে গিয়ে এই বিজ্ঞান। আমরা এই ঘরে দশ জন বসে আছি; একজন চোর, একজন নরহত্যাকারী, একজন মদ্যপ, একজন সাধু ইত্যাদি। মদ্যপ বললে, মদের ভিতরই ভগবান্ আছেন। সে জোর করে আরও মদে ডুবল। চোর ভাবলে, "এই তুমি? বাঁচলুম!" যখন 'তুমি' চুরি করাচ্ছ, তখন পরম উৎসাহে চুরি করতে মেতে গেল। মুখে বললে 'ভগবান্', কার্য্যতঃ কিন্তু নিজের প্রকৃতিতেই মত্ত হল। তিনি জ্ঞানভূমিতে আছেন; সেই হিসাবে চৌর্য্যেও আছেন বলে চৌর্য্যেই কি তাঁকে দেখতে হবে? না। কেন হবে না? আমি যে খালি চৌর্য্যে, খালি মদে তাঁর উপাসনা করছি, এই হল মোহ। তাঁর বিস্তৃতি, ব্যাপ্তির যে আনন্দ, তাই দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপ্তিই অবলম্বন কর। নেড়ানেড়ির দল শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্র অবলম্বন করলে, কিন্তু সুরু করলে অতি ঘৃণিত রকম সাধনা। কিন্তু মূল বিজ্ঞানে দাঁড়িয়ে থাকলে দোষ দিতে পারবে না। মদ ছাড়া, চৌর্য্য ছাড়া আর কিছুতে ভগবান্কে দেখছে না, এই হল দোষ। "যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি…॥ এতৎ বৈ তৎ।" মিথুন,—আত্মার সঙ্গে এদের সংযোগ-যুগ্মতা—হৃদয়গ্রন্থি! আহাহা!

একটা কথা মনে আছে কি? এই পঞ্চ তত্ত্বের নাম পঞ্চ ম-কার। এই সমস্তটাই হল মিথুনতত্ত্ব অর্থাৎ চেতনতত্ত্বের

সঙ্গে পঞ্চ তত্ত্বের এই সংযোগ। এই পঞ্চ মকার না পেলে 'ম'কে 'আ'-কার দিতে পারবিনে, মাকে পাবিনে। **What and why you are doing** অর্থাৎ কি এবং কেন করছ, এ না জানলে ঐ মদ্য-মাংসেই রইলে।

'ম'-কারে আকার দিতে হবে মানে, রূপ দিতে হবে। 'মদ্য'কে মা—'মৎস'কে মা, 'মুদ্রা'কে মা, 'মিথুন'কে মা করতে হবে, তন্ত্রের ভাষায় এই বলতে হবে। আর বলব, বিনা মদ্যে বিনা মাংসে উপাসনা করতে যেও না। পরমেশ্বরীতত্ত্ব এত অনন্ত তেজোময়ী, বিপুলা যে, ভগবতীকে মা করে সাজিয়ে, হার্দ্দ রসে ডুবিয়ে না নিলে সূর্য্যের দিকে চাওয়ার মত **electrisation** হয়ে যাবে। পঞ্চ 'ম'কে আকার দিতে হবে। আমি বলে দিলুম, রূপ রস ইত্যাদি পঞ্চ তত্ত্বের নাম পঞ্চ মকার। কেন, তা পরে বলব। আগে আকার দেবার কথাটা বলছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এই মাতৃতত্ত্ব অতীব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে, অসুর ও দেবতা, এই দুই-ই ব্রহ্মার পুত্র। এদের দুজনের চিরদিন সংগ্রাম। এর ভিতর অসুরদের পরাভবের জন্য দেবতারা সমবেত হয়ে চক্ষুকে বললেন, "তুমি উদ্গীথ গান কর, তা হলে অসুররা আর আমাদের পরাভূত করতে পারবে না।" চক্ষু উদ্গীথ গাইতে লাগল। অসুররা বুঝতে পেরে চক্ষুকে আক্রমণ করে পরাভূত করলে। চক্ষু পাপবিদ্ধ হল। সে জন্য চক্ষু সুরূপ ও কুরূপ, উভয়ই দর্শন করে। এইরূপে অসুররা নাসিকা, প্রাণ, শ্রোত্র, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাদের পরাভূত করে পাপবিদ্ধ করলে। তখন

দেবতারা অয়াস্য প্রাণ বা মুখ্য প্রাণের শরণ নিলেন। তখন, তিনি উদ্‌গীথ গাইতে আরম্ভ করলে অসুররা তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়ে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এই উপাখ্যানে ঋষি বললেন, পঞ্চ মকারের ব্যবহার দিতে হবে, কিন্তু তা মুখ্য প্রাণের শরণাগত হয়ে। ওঁকে দিয়ে উদ্‌গীথ গাওয়ালে অসুররা আর পারবে না। বাজে গন্ধ, বাজে শব্দ, বাজে দর্শন ইত্যাদি ঐ ঐ তত্ত্বের অসুর। অর্থাৎ নিজের হৃদয়ের উপযোগী, প্রাণ যা চায়, তা ছাড়া আর যা নিতে বাধ্য হও, তার মানে, অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। ওরা অসুরের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে। ওঁকে পঞ্চতত্ত্বময়ী, পঞ্চমকারময়ী করলে অয়াস্য প্রাণকে আকার দিতে পারবে। পঞ্চ তত্ত্ব নিয়ে অক্ষর আত্মা অবস্থান করছেন কণ্ঠ থেকে মাথা পর্য্যন্ত, তার নীচে ভোগস্থান। শব্দ স্পর্শ রূপ রস খাইয়ে, পরিশোধিত করে, ভূষিত করে কাকে জাগাতে চাচ্ছি? এইখানে, ললাটে আছেন অসঙ্গ আত্মা। পঞ্চ মকার সংগৃহীত করে তাঁকে আকার দিলে, ঐ শিবের বুকে মা ভেসে উঠবেন, যদি পঞ্চ তত্ত্ব, পঞ্চ মকারকে ওখানে নিয়ে গিয়ে সংগৃহীত করতে পারি। তারকামণ্ডলে বেষ্টিত হয়ে যেমন চন্দ্র অবস্থান করেন, তেমনি ললাটে অক্ষরাত্মা রয়েছেন, তাঁর চারি দিকে পঞ্চ তত্ত্ব ঘিরে রয়েছে। এই তত্ত্ববৃন্দকে সংগ্রহ করে তাঁতে স্পর্শ করাতে হবে। মায়ে স্পর্শ-তত্ত্ব লাগা, এ কথা বলা অপেক্ষা 'মাকে জড়িয়ে ধর্' বললে সহজ হবে। না জানলে এ তত্ত্ব সহজ হবে না। মন্ত্রের ম-কে অক্ষরাত্মায় যতক্ষণ না ঠেকাতে পারব, ততক্ষণ কিছু

পারব না। কত বড় বিজ্ঞান কত জঘন্য বা worse type হয়েছে, তাই বলছি।

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭, ববিবাব।

গুরুর বাড়ী প্রসাদ পাওয়া দরকার। যে সব উপদেশ তোদের দিয়েছি, তাতে তোদের পূর্ব্বের ধর্ম্মসংস্কার ভেঙ্গে আমার মনের মত ধর্ম্মসংস্কার তৈবি করেছি। তোদেব নিজকৃত কর্ম্ম-সংস্কার এখনও আছে। এ আরও চেপে বসলে সেটা ধ্বংস হবে। এখন মানুষ সাধাবণতঃ যে ধর্ম্ম পালন কবে থাকে, তাতে আত্মপ্রবঞ্চনা কত! মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ক্রিয়াময় এবং spirit and matter বা অধ্যাত্ম ও অধিভূতের সংযোগস্থল। মন এক দিকে জড়শক্তিকে, অপর দিকে আত্মশক্তিকে পরিচালনা করে। মন থেকে অন্ন তৈরি হয়। element বা আদি অণু মন। তিনি মনন করে মন হলেন—এ সাক্ষাৎ আত্মশক্তির ধর্ম্ম। সুতরাং জড়ত্ব ও আত্মশক্তি, উভয় স্থলেই মন আছে। একজনের মনন দ্বারা মন পরিধৃত, এ অংশে মন, জ্ঞানদ্বারা বিধৃত। যেমন মাখন দিয়ে দুধ পরিধৃত। দুধের দুগ্ধত্বের সারাংশ নবনী। প্রাণ কাদামাটিময় শরীর ধরে আছে। খেলাম ভাত, পুষ্ট হল প্রাণ, বিধৃতি-শক্তি। বিশ্বের যে স্থূল অংশ, তার প্রাণ হচ্ছে মন। অণু যেই মহান্ হয়ে গেল, তার নাম হল হৃদয়। মন হল কেটে ফেলার শক্তি। আণবিক শক্তি—clusters বা পুঞ্জ তৈরি করে। শরীর অণুময় শক্তি ধরে-

আছে। মন বিশ্বময় ব্যাপ্তি নিতে পারে। বিদ্যুৎ পাখা চালায়, সব কাজ করে; তার পিছনে একটা বজ্রশক্তি আছে। মহাবজ্রশক্তি পিছনে, সে মহাধ্বংস আনতে পারে। এই যে মন, যার দ্বারা দেখা শুনা, হাসি, চলা-ফেরা, সব কাজ করছি, আবার যে মহানের শক্তি নিয়ে এই মন শরীর চালাচ্ছে, তার পিছনে সেই বিশ্বব্যাপী মহাশক্তি রয়েছেন। মনের গতি কি সাংঘাতিক। এই মন যাঁর জ্ঞান থেকে তৈরি হল, যাঁর ভোগ-লীলার জন্য এই অণু স্বষ্ট হল, অল্পে অল্পে, অণুতে অণুতে, কণায় কণায় আমি ভোগ করব, এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি মন হলেন। এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া, এর মূল বিজ্ঞান হল অক্ষর। এ কথা নতুন। চেতন থেকে যা ফুট্‌ল, তা অক্ষরের আকার নিল। বাহ্য 'অ আ' লিখতে গেলে যে আকারের লেখা হয়, তা নয়। 'অ' বল্‌লে চেতনা যে আকার নেয়, সেই আকার। এরা হল অণু। এর বাহ্য পিঠ অণু, অক্ষর, এবং ভিতর-পিঠ ক্ষণ; এই উভয়ের উপর আত্মার আধিপত্য। অর্থাৎ space বা ব্যাপ্তি মন থেকে এবং time বা কাল প্রাণ থেকে জাত হয়।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় আছে—'নমঃ পৃথিব্যৈ, নম ওষধীভ্যঃ, নমো বাচে।' পৃথিবী—স্থূল বিশ্ব এবং ওষধি, তার অন্তরস্থ রস বা প্রাণ। অর্থাৎ মনের প্রকাশ স্থূল বিশ্ব, তার অন্তরস্থ প্রাণ এবং সকল প্রকাশের মূল বাক্‌শক্তি, এই তিনকে লক্ষ্য করে নমস্কার করা হয়েছে। তা হলে বিশ্বময়ী বাঙ্‌ময়ী হলেন। বাঙ্‌ময়ী মানে, মনোময়ী। বাক্যের প্রকাশই আকাশ। আমাদের ভিতরের চিত্তাকাশ ও বাহিরের ভূতাকাশ এক জিনিষ। কিন্তু সংস্কারের

জন্য এ আমরা ব্যবহারে আনতে পারি না; শরীরজ্ঞানে বাধা পড়ে। শরীরের তলে আকাশ, আকাশের তলে আমি। শরীর এ উভয়ের ঢের বাইরে। এখানে অর্থাৎ এই দেহজ্ঞান-সম্পন্ন জীবক্ষেত্রে, তিন রকম ভয়ানক শক্তি কাজ করছে। অণু মন প্রতি ক্ষণে বিপুল ব্যাপ্তি, আধারশক্তি তৈরি করতে পারে। আকাশের প্রধান শক্তি হল আধারশক্তি, বিধৃতিশক্তি। কণাশক্তিপুঞ্জকে এক সঙ্গে ধরে থাকে আধারশক্তি। তার তলায় কালশক্তি বা ক্ষণশক্তি। কণার যেমন **cluster** বা গুচ্ছ বাঁধলেন আধারশক্তি, তেমনি ক্ষণের **cluster** বা গুচ্ছ বাঁধলেন মহাকাল। অর্থাৎ এই দুটিতে নাম ও রূপ পাওয়া গেল। এঁকে আমরা হৃদয় বলে ব্যবহার করি। ঐ হৃদয়ে মা আমার নাচতে নাচতে আসছেন। চিন্ময় তত্ত্বে নজর রাখলে এ কথা তোরা বুঝতে পারবি। তিনি অণু হয়ে এসে অনুত্তর মূর্ত্তি গ্রহণ করছেন। যখন ভাব হয়েছে, কুঁড়ির ভিতর ফুল তখনই তৈরি হয়েছে। তিনি ক্ষুদ্র হয়ে এলেও মহাশক্তি; এখনি বিশ্ব প্লাবিত করে দিতে পারেন। তিনি বীজশক্তি। বাইরে আমি এই বটে, কিন্তু ভিতরে সাক্ষাৎ মা একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি ফুটিয়ে বসে আছেন। বৈদ্যুতিক তারের **insulation** খুলে গেলে যেমন ভীষণ কাণ্ড হতে পারে, এই মহাশক্তির একটু এধার-ওধার হলে সেইরূপ হয়। এই **insulation** খুলে দিচ্ছি আমি, একটু স্পর্শে এ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইনসুলেশন খুলে দেওয়া যেমন শক্ত নয়, একটু রবার কেটে দিলেই হল, সেইরূপ। গুরুর একটু ইচ্ছায় এ হয়ে যাবে। এ সব

আমার নিজের তত্ত্ব ; এ কোথাও পাবিনি। এমন মানুষই বহুকাল আসবে না, যে এমন করে এসব দিতে পারবে। এর ভিতর থেকে কষে মেজে নিলে বিপুল জিনিষ বেরিয়ে পড়ে। এই মাকে যে চিনেছে, এই মা রয়েছেন বলে যে ধারণা করতে পেরেছে, সে এমনি ভাবে প্রতি কণার ভিতর মাকে দেখবার জন্য চক্ষু বাড়িয়ে দেবে। কেন না, এ কথা ত তার শোনা ছিল না। যেমন বৈদ্যুতিক তারের insulation খুলে দিলে, সেই তারে হাত দিলে বা অন্য কিছু তাতে লাগলে ভীষণ অগ্নিময় কাণ্ড হতে পারে, এও সেইরূপ। গুরুর কাজ এই insulation খুলে দেওয়া ; অজ্ঞানের, অ-দৃষ্টির insulation খুলে দেওয়া। খালি গুরুর অভাব। মহাপাপ মহাপুণ্যের কোন মূল্য নেই ; ও সব লাল কালো রংয়ের insulation। গুরুর কাজ খালি এই দৃষ্টি খুলে দেওয়া। এই যে বললাম, এতে তোদের কিছু লাভ হল ? রবার অর্থাৎ ইনস্যুলেশনের রবারের 'ন্যায় আমাদের সংস্কার-সকল খয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রিয়া হচ্ছে। যেমন আগুনে হাত ঢোকালে "ফলেন পরিচীয়তে।" এখানে স্পর্শ না পেলে আর তৃপ্তি পাবি ? অথচ এখানে স্পর্শ দেওয়া অদ্ভুত ব্যাপার নয়, ভাষার দ্বারাই হয়, বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই ; যেমন insulation কেটে দেওয়া। বাঙ্ময়ীকে ভাষার দ্বারা স্পর্শ করলে এ হবে, এ কি আজগুবী কথা ? নমঃ।

আপনি আপনাকে জানিস ত ? তুই আছিস, তা জানিস ত ? 'আমি' দর্শনশক্তিময় রয়েছি ? কোথায় রয়েছিস ? এই

ভূমিতে, না এর ভিতরে অর্থাৎ দেহে, না দেহবোধের ভিতরে? এই যে সমগ্র তত্ত্ব বললাম, এর দ্রষ্টা হচ্ছিস? ঐখানে তোর স্থান। ওর ভিতরে তোর স্থান, এই দেখলে এদেরও মূলস্বরূপ তুই আছিস্ দেখবি। কি দেখবি? এই মাকে জাগিয়ে নাচ দেখবি? যেমন শিব মায়ের নাচ দেখেন? ঐ মাকে ঈক্ষণ দিয়ে জাগিয়ে তোলা, এই তোর কাজ। সহজ জ্ঞানে গ্রহণ করে যা, ধ্যানের দিকে যাস্‌নি। আমি ধ্যান করিয়ে এমন প্রগাঢ় করে দিচ্ছি। ডাল-ভাত খাওয়া ইত্যাদি প্রতি কাজেই সমাধি পর্য্যন্ত আছে। আমি যে উপদেশ দিচ্ছি, তা ডাল-ভাত খাওয়ার মতন সহজে এসে যাচ্ছে। তোরা এমন ভাবে এখানে এসে পড়বি যে, জানতেই পারবিনি, আমি কি করে তোদের নিয়ে এলুম। আমি তোদের যে জাতীয় উপদেশ দিচ্ছি, জগৎ থেকে এ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনাই এইরূপ। ধ্যান-ধারণাদি সাংখ্য-মার্গের জন্য। ঋষির সাধনা এইরূপ ডাল-ভাতের মত সহজ। প্রহ্লাদ এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ সাধক ছিলেন।

দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, “তুমি ত নিরপেক্ষ পুরুষ, তুমি কি করবে?” কৃষ্ণ বললেন,—“আমি নিদ্রা হতে উঠে যার মুখ প্রথমে দেখব, তার পক্ষে থাকব।” পরে নিদ্রাভঙ্গে অর্জ্জুনকে পায়ের দিকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। দুর্য্যোধন মাথার দিকে আগে থেকে এসে বসেছিলেন, তিনি বললেন, “আমি আগে থেকে এসে বসে আছি।” তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “এক দিকে আমি নিরস্ত্র একা

থাকব এবং অন্য দিকে আমার তুল্য যোদ্ধা সাত শত নারায়ণী সেনা থাকবে। এখন যার যা ইচ্ছা, বেছে নাও।" নারায়ণী সেনা = **atomic force** বা আণবিক শক্তি; 'আমি' খালি থাকব = আত্মত্ব। দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা বেছে নিলে, এবং অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। জগতের এই ব্যাপার। তপস্যা-শক্তি = নারায়ণী সেনা। এ শিবত্ব অর্থাৎ আত্মত্ব ধরে থাকে। এর ভিতরে সব কালী দুর্গা লুকান আছে, যেখানে যত কালী দুর্গা বেরিয়ে যাক্ না কেন! এই বল নিয়ে, এই চোখ নিয়ে চলবি।

২রা আগষ্ট, ১৯৩৭, সোমবার, সন্ধ্যা।

কাল বোঝাচ্ছিলুম, মন কেমন করে বাঙ্ময় ও চিদ্চিৎ উভয়াত্মক হয়। মনের এই উভয়াত্মকতা দেখবার প্রয়োজন এই যে, ব্রহ্ম কেমন করে যুগপৎ উভয়লিঙ্গরূপে প্রকাশমান হন, তারই আভাস এতে পাওয়া যায়। এ সব জানলে আরও বোঝবার ইচ্ছা অপেক্ষা নত হয়ে যাওয়াই বেশী উচিত। এতে দেখা যায়, কেমন করে সমস্তটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মন যেমন স্বতই জড়ত্ব গ্রহণ করে, তেমনি আবার স্বতই আত্মবোধ বা বিশ্ব-প্রকাশাত্মক যে জ্ঞানমূর্ত্তি অর্থাৎ বহু আত্মমূর্ত্তি, তা সে গ্রহণ করে। মন নেয় আয়তন, তিনি থাকেন আয়তনে আয়তনে অধিষ্ঠিত। এখানে কয়েক জন মানুষ বসে আছে; এ দেখে কি মনে হয় যে, এতটা মাংস এখানে, এতটা মাংস ওখানে বসে

আছে? না, জীবন্ত এক এক ব্যক্তি বসে আছে দেখা যায়? তেমনি বাহ্য বিশ্বের বেলায়ও জানবে, এই বিরাট্ বিশ্বরূপ ধরে জীবন্ত একজন দাঁড়িয়ে আছেন। আবার এমন সব লোক আছে, যেখানে অন্য এক রকম জড়শরীরী বাস করে। মনঃ-শরীরী জীবও আছে। এখানে যেমন আত্মা জড়শরীরী, পরস্পবেব স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইরূপ মনঃশরীবী হলেও পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য সব রয়েছে।

কণাবিজ্ঞান অদ্ভুত বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান তোদের শেখাব। এটি ধরতে পারলেই তোরা বহু আত্মা হতে পারবি। এখন তোরা আত্মা বলিস, কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞান হাবাতে পারিস না। ব্যাপ্তি মানেই আমিত্ব। ভগবান্ বলতে না শিখলে এসব হবে না। ভগবৎস্বীকৃতি দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে, নতুবা আন্দাজে আন্দাজে যাচ্ছি মনে হবে। দেবীব মাতঙ্গী নাম দেওয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁব মধ্যভাগ অদৃশ্য; এত সূক্ষ্ম যে, নজবে ঠেকছে না। তিনি জ্যোতিতে ভরা। শুধু মধ্যভাগ যে আছে, তাঁব বিশ্বযোনিত্ব জ্ঞান থেকে এইটুকু ধরে নেওয়া যায়। শবীবের উভয় অংশেব যে সম্বন্ধ আছে, তা ধরে নেওয়া যায়। বর্ণনার কি পারিপাট্য দেখ। আত্মতত্ত্ব থেকে জাত শুধু এইটুকু জ্ঞান; নতুবা ওর সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে, ধরবার উপায় নেই। যার মধ্যভাগ এইরূপ অব্যক্ত, ক্ষীণ, ঊর্দ্ধভাগ সপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়, অধোভাগ ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল অর্থাৎ বট গাছের যেমন ঝুরি নামে, সেই রকম ঝুরি নেমেছে, এই হল বিশ্বের বর্ণনা। এই হল মায়ের, পরমেশ্বরীর মূর্ত্তি। এইরূপ

যে মা, তিনি ধীর মন্থর গতিতে আবির্ভূত হচ্ছেন, মূলাধার ভেদ করে সহস্রারে চলেছেন। এই আলোটা থেকে যেমন চারি দিকে রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে, অথচ আলোটা স্থির রয়েছে, তেমনি মায়েরও ধীর-মন্থর মাতঙ্গবৎ গতি, যদিও দিগ্‌দিগন্তে তাঁর কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে। এই শক্তিত্ব গ্রহণ করতে হলে শক্তিত্বের মূলে এই যে স্থির মন্থর গতি, তাকে নিতে হবে। শক্তির প্লাবন, হুড়োহুড়ি, সে ত আছেই, কিন্তু ভিতরে যে মন্থরগতি, তাই দেখতে হবে। ক্রীং কর্তৃত্ব-প্রধান, হ্রীং হৃদয় বা প্রাণ-প্রধান, শ্রীং প্রকাশ-প্রধান। তপস্যার তাপে প্রথম তিনি ক্রিয়াময় হন, তার পরে বিস্তৃতি লাভ করেন, তাপটা যখন সব জলকণায় ঢোকে, তখন বাষ্প হয়ে বেরোন। মাঝের বিস্তৃত অবস্থা—হ্রীং তৈরি হল; এর নাম উদ্বেলন। তাতে চাই দুটো জিনিষ—একটা ঠেলা, আর এক দিকে আকর্ষণ (Push and Pull)। তোদের push আছে, pull নেই। তোদের নারায়ণ এখনো শ্রীহীন। 'শ্রীং' এই তত্ত্বটি যে দিন আত্মতত্ত্বে বসাতে পারবি—যে এখন মাত্র বুকের ভিতর ফুটেছে, সে দিন সে বাইরে ফুটবে; শ্রী, রূপতত্ত্ব—তাতে সমগ্র প্রকাশের শ্রী, পাঁচ মুখে বিশ্বের সমগ্র বিশ্বত্ব নিহিত। সমগ্র জিনিষ রয়েছে তাঁতেই, আর কোথাও নেই, এই হল গোড়ার স্বীকার। ভূমি না পাকলে, জ্ঞান স্বীকার না করলে কিছু হবে না। এই হল সাধনার প্রাণ। সেই জন্য বলে, গুরু না হলে, জ্ঞান না হলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। তার মানে, আত্মজ্ঞানের ভিতর বিশ্বজ্ঞান আছে, এই কথায় পরিচিত হওয়া। পরম দেবতাকে চাপ দিলেই হৃদয়ের প্রতি ছিদ্র দিয়ে

নানা ভাবে দিগ্‌দিগন্তে তিনি বেরিয়ে যাবেন। চাপ দেওয়া মানে, ব্যাপ্তিহীন করা। যা কিছু বেরোচ্ছে, সে সব তুমি বেরোচ্ছ বলে দেখ্‌ব ; যা বেরোচ্ছে, তাকে দেখব না।

———

১১ই আগষ্ট, ১৯৩৭, বুধবাব, সন্ধ্যা।

জ্ঞানতত্ত্বে বিহাব না করলে প্রকৃত বাঁচা হবে না। বাঁচা দুরকম,—এক, জীবভাবে বাঁচা ; আর এক, অমৃতত্বে বাঁচা। জ্ঞানতত্ত্ব মানে, বাঙ্ময় তত্ত্ব। এইটিতে সূচনা করে, বাক্যগুলা যে এক একটা আয়তন, তা দেখলুম। কোনটা feeling বা ভাব, কোনটা আর কিছু, অর্থাৎ বাক্যের জগতে আমি বিরাজ করছি, এ দেখে নিলুম। এই তত্ত্বই হলেন ভগবান্। এই বাঙ্‌মূর্ত্তি নিয়ে আমি সুখী দুঃখী, মহান্ দরিদ্র, শক্তিহীন শক্তিমান্, সবই হই দেখছি। কিন্তু এর হিসেব দেখছিনে। তাঁর স্থূল অভি-ব্যক্তিই শুধু দেখছি, কিন্তু তত্ত্ব অবহেলা করছি। মাটি কাঠ ইত্যাদি যা ফুটলো, তাই নিয়ে ধরাধরি কবছি। মূল তত্ত্ব যেন একটা পাতলা বিষয় ; তার অধীনে ব্যবহার নয়, ব্যবহাবের অধীনেই তাকে ফেলে দিয়েছি ; স্থূল ভূতের চেয়ে যেন তাব দাম কম। এই রকমে দেখলুম, আমার জ্ঞানাম্বুতে শ্যাওলা, পাঁক ধরেছে। গুরু বললেন, এই পাঁক উদ্ধার করতে হবে। এই জ্ঞানাম্বুকে ছেড়ে আজ পর্য্যন্ত জগতে কোনও সিদ্ধি কেউ পায়নি। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যা কিছু, সত্য সত্যই এ থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং

আত্মকল্যাণ চাইলে ওই জ্ঞানাম্বুর ধারেই বসে থাকব, তাঁকে ভগবান্ বলে স্বীকার করব, আর এতেই ওখানকার যা কিছু সব ধরা পড়বে।

প্রথম প্রথম মনে হবে, একদিকে জ্ঞান, একদিকে ভূতমূর্ত্তি, আমি তার মাঝখানে। আমি যেন আধা-জ্ঞান, আধা-ভূত। তার পর গুরু দেখিয়ে দিলেন, ঐ যে জ্ঞানাম্বু, ও আর তুই সমান জিনিষ; ঐ তত্ত্বই তুই, ঐ তত্ত্বই ভগবান্। তুই প্রাণপণে ধরতে লাগলি, কিন্তু কর্ম্ম প্রতিকূল বলে পারলি না। তখন 'আত্মা আত্মা' যত বলতে যাই, তত ভাল লাগে না; অভিমানাত্মক আমিই ভাল লাগে। ওকে খুঁজি এই 'আমি'র একটু সুখ-সুবিধার জন্য, 'আমি'র মুখ চেয়ে ওঁকে ওষুধঘোঁটা করে নিই। ভাগ্যবান্ তারাই হয়, যারা গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যারা এ 'আমি'র কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখে না, এই জ্ঞানস্বরূপই ভগবান্, এই দেখে বলতে থাকে,—"আমি তোমাকে আর ছাড়ব না, তোমাকে শ্রীগুরুদেব চিনিয়ে দিয়েছেন, তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।" এই রকম তপস্যামম হয়। জ্ঞানতত্ত্ব শ্রবণের যে বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে, এ বিশ্বাস লক্ষের মধ্যে একজনের থাকে। যারা বিশ্বাস করে, তাদেরও আবার লক্ষের মধ্যে একজন ঠিক ভাবে চলে। ধর্ম্মের শাখাপ্রশাখা এক একটা ভাব নিয়ে চলল। পূর্ব্বকালে সনাতন মূলতত্ত্ব মেনে চলার একটা ভাব ছিল; বুঝুক আর না বুঝুক, তার উপর নতুন কিছু আবর্জ্জনা চড়াত না। আজকাল ধর্ম্মের সে সনাতনতা ছেড়ে,

ধর্ম্ম ভাঙ্গতে গিয়ে নতুন শাখাপ্রশাখা গড়ছে, ধর্ম্মকে নিয়ে স্বেচ্ছাচারী ভাবে চলছে। এরকম অবস্থায় ভগবান্‌কে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জায়গা পাওয়া শক্ত; পেলেও ভাল করে দাঁড়াতে দেবে না। সকল জিনিষেরই দুটা দিক্ আছে ত? "ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরং"—কেন ত্যাগ, তা বুঝলে না, ত্যাগধর্ম্মী হয়ে গেল। কর্ম্মীরা ভাবলে, কাজ না করলে হবে না। কাজের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রচার করলে। অবশ্য দশটা ভাল কাজ যে না করলে, তাও নয়। অন্তরাত্মার সার্ব্বজনীন ভাব থাকলেও আমিত্বের পরিপোষণ এলে সব মাটি হয়ে গেল, আমিত্ব আরও শক্ত হল। এই রকমে সব পথই বিপর্য্যস্ত হয়ে রয়েছে। যদিও আমরা কোন বাঁধা পথ নিইনি। বিজ্ঞান যতটা আলো দেবে, ততটাই নেব। এ হল কলির শিক্ষা। সত্যের শিক্ষা, তোমায় ঘাড় ধরে কর্ম্মে আবদ্ধ করতে হবে, তার পরে বিজ্ঞানে যেতে হবে। এখন সে জবরদস্তি চলে না, তাই আমরা কলির পথ অবলম্বন করছি। তাই বিজ্ঞানকে ধরেছি। স্বভাবতই তাতে এমন একটা আকাঙ্ক্ষা আসবে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে সে দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যে কর্ম্মে ভগবান্ তোদের নিয়োজিত করেছেন, তা ছাড়তে বলি না। তোরা খালি বিজ্ঞান দেখে চল; তার আবহাওয়াতে যেটা সহজ মনে হয় হোক, কিন্তু এ পথের প্রধান জিনিষ হবে এই যে, যে বিজ্ঞানটি বললুম, এর দিকে চোখ দিতে হবে। জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান—খালি গুরুসেবাই করাচ্ছি; এর দিকে বিশেষ চোখ

রাখতে হবে। ঐ যে বলছিলুম, শ্রদ্ধাবান্ হলে দেখবে, 'আমি'টা ফোঁপড়া হয়ে যাচ্ছে এবং উনিই এখানে ফুটে উঠছেন। মনে হয়, তা হলে আমি কি আমারই সাধনা করছি? ভুল কথা। কাকে সাধনা করছি, এবং কে সাধনা করছে, এ দুয়ের তফাৎ দেখতে পাবি। আমি ক্ষর আত্মা; আর যাঁর সাধনা করছি, তিনি অক্ষর আত্মা। এই দুই বিশেষণের তারতম্যে আমরা বিভক্ত হয়ে রয়েছি। এই দুই বিশেষণের তারতম্য তাঁতে ও আমাতে তারতম্য।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৭, রবিবার।

নিজের সাধনপথে উপাস্য-নির্ণয় হল সর্ব্বপ্রধান জিনিষ। এই জন্য উপাস্য সম্বন্ধে যত definite বা সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান হয়, সাধনা তত সুসিদ্ধ হয়। হাজার হাজারের ভিতর হয় ত একজনের উপাস্য-নির্ণয় হয়েছে। কাকে উপাসনা করছি, জিজ্ঞাসা করলে হয় ত তোমরা ভাল করে বলতে পারবে না। একটি জিনিষের ভাব নিয়ে উপাসনা করছে, হাজার হাজারের মধ্যে এই-ই দেখতে পাবে। জগতের সব কিছু অনিশ্চিত। মাত্র একটি জিনিষ আছে, যার চেয়ে সুনিশ্চিত, সুনির্দ্দিষ্ট আর কিছু নেই। 'আমি আছি' এই জ্ঞান সব চেয়ে নির্দ্দিষ্ট এবং 'আমি আছি' এই জ্ঞানই নিজত্বে বিলীন হয়। কিন্তু এই আত্ম-তত্ত্বের সাধনা করতে গিয়ে কোন্ আত্মা উপাসক, কোন্ আত্মা

উপাস্য, তা সর্ব্বদা ঠিক রাখতে পারা যায় না। এর নির্ণয়ের প্রথম কথা হল—ক্ষর আত্মা উপাসক, অক্ষর আত্মা উপাস্য। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥" শ্রুতিকথিত এই দুই আত্মাকে দেখলেই বুঝতে পারবে, কোন্‌টি ক্ষর, কোন্‌টি অক্ষর। আগে ক্ষর আত্মাকে দেখ—আমি, তুমিই ক্ষর আত্মা। কেন না, উপস্থিত যতটুকু দেখছি, তার চেয়ে বেশী আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এই মুহূর্ত্তে যেন আমি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন প্রাণী। পরমুহূর্ত্তে এই 'আমি' থাকবে, কি থাকবে না, তার নির্ণয় নেই। এই মুহূর্ত্তের নিজবোধতত্ত্বটি সমস্ত কালতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বা isolated হয়ে বসে আছে। এরই নাম অনুপ্রবেশ করা। যেমন, পোকা যখন বাইরে আছে, তখন সে উড়ে বেড়াচ্ছে; কিন্তু কৌটোর ভিতরে ঢুকলে তখন সে কৌটো ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। সেইরূপ, আমিও যখন যে জ্ঞানায়তনে প্রবিষ্ট হই, তখন তাই ছাড়া আর বেশী কিছু দেখতে পাই না; এরই নাম ক্ষর আত্মা, ক্ষরিত আত্মা। পোকা যখন কৌটোর ভিতর ঢুকে পড়েছে, তখন সেই কৌটো ছাড়া আর যে কিছু আছে, তার সংযোগ দেখছে না। পর-মুহূর্ত্তের সংযোগ কিছু দেখছে না। এক প্রান্তে যা গ্রথিত আছে, যা অদৃষ্টে লিখিত আছে, যা পরে পরে আসছে, তা যেন ভূতের মত টিপ-টিপ করে আসছে। যেন অচেনা, অজানার মত এসে পড়ছে। এই হল ক্ষর আত্মত্বের লক্ষণ। অক্ষরত্ব ঠিক এর বিপরীত। উপস্থিত

মুহূর্ত্তের অর্থাৎ বর্ত্তমানের এবং সমগ্র ভূত ও ভবিষ্যতের যিনি অক্রম দ্রষ্টা, সমস্তই যাঁর কাছে ব্যক্ত, তিনিই অক্ষর। ক্ষর আত্মা অক্ষর হয় না। তবু আমরা যখন অক্ষরত্ব দেখব, তখন দেখব, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত অক্রমভাবে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে, তখন তার নাম হল অক্ষরের দ্রষ্টা। এক ক্ষণের উপলব্ধি ক্ষর, সমস্ত কালের উপলব্ধি অক্ষর আত্মা। অক্ষর, কূটস্থ একই —'কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।'

এখন 'আত্মা' এই শব্দটিকে আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিই। 'আমি আত্মা' এই বলে সুনির্দ্দিষ্টভাবে নিজত্ব অবলম্বন করেছি। এর উপর সর্ব্বদা ক্রিয়া চলছে। যখন বলি, আত্মত্বের উপর রয়েছি, সেটা প্রতি মুহূর্ত্তের এক খণ্ডের খণ্ডবোধ দেখে নয়। এক একবার আত্মত্বকে বুদ্ধির প্রান্তে এনে তাঁকে আভাসে দেখছি। এইটুকু দেখেই বলি, বিশ্ব ইত্যাদি কিছু নেই। আসলে দেখা শুনা ইত্যাদি সবই রয়েছে, আমি তাকে চাপা দিয়ে দিয়ে রেখেছি। বড় বড ক্ষর-ভাবগুলো সরিয়ে, ক্ষুদ্র করে, ক্ষুদ্র ভাবে, কম ভাবে, যেন নেই, এইরূপ মনে হচ্ছে। আর একজন যিনি নিজরূপী রয়েছেন, তাঁকে উপাস্য বলে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, আমার উপাস্য যে নিজত্ব, তিনি অক্রম দ্রষ্টা ও সর্ব্বজ্ঞ। তা হলে ক্ষর নিজত্বের ভিতর এ সব নেই দেখলে দুয়ের আকাশ-পাতাল পার্থক্য পাবি। এই লক্ষণ দেখে নিবি। নয় ত ব্রহ্মরাক্ষস হবি।

আর একটি লক্ষণ হৃদয়ধর্ম্ম। নিজত্ব জিনিষটি কখন হৃদয়

গঠন না করে থাকতে পারেন না। চিৎ বা জ্ঞান, হৃদয়ের অর্থাৎ ভাবের জ্যোতিশ্চক্র চারি দিকে রচনা না করে আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন না। আমরা 'আমার' বলে যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, তার জন্য পাগল হয়ে যাই। যে নিজত্বের একটু সংস্পর্শ এত বড় মমত্ব রচনা করে, আমার বলে সম্বন্ধ স্থাপন যাঁর চিদাভাস মাত্র, সেই নিজত্ব স্বয়ং, তাঁতে সর্ব্বপ্রীতি, সর্ব্বপ্রাপ্তি কি নিবিড়, তার ইয়ত্তা করা যায় না। 'নিজে' মানে, আমি ছাড়া আর কেউ নয়; কিন্তু নিজত্বের পূর্ণ force বা শক্তি ও নয়। নি, নিরন্তর, অবিচ্ছিন্নভাবে, উপাদান ও কারণ, সর্ব্বরূপে আমার সব কিছু যাঁ থেকে জাত হচ্ছে, তিনিই নিজ। আমিত্বের অভিমান প্রত্যাবর্ত্তনশীল—জন্ম ও মৃত্যুশীল। কিন্তু এ নিজত্ব এত বড় অচল অটল যে, পাহাড়ে আছাড় দিলেও এঁর মৃত্যু নেই। আমি যেখানে যাই, যে দিকে দৃষ্টি করি, এঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। অথচ এঁতে মাত্র আমিত্বই নয়, আর যে সমস্ত বস্তু এঁ থেকে প্রকাশ পায়, তা আমরা দেখতে পাই না। এঁতে সব কিছু সাজান রয়েছে, তাও আমরা দেখতে পাই না।

'আমি'র নিজত্ব একটা অভাবের ধামা মাত্র। এ নিজবোধে কিছু নেই, অথচ এটি আত্মপ্রত্যয়ের সার। 'নিজে'—এই ছাড়া আর কোন সার্থকতা এ পর্য্যন্ত সেখানে পেলি না। নিজাত্মক জ্ঞানটি আত্মবোধের প্রথম পরিচয়, ক্ষর অভিমানের কলঙ্কে কলঙ্কিত আত্মার প্রথম পরিচয়। এই নিজত্ব ভিন্ন কেউ

কোথাও নেই। যেখানে যা কিছু মহিমা ফুটেছে, এঁতে ছাড়া আর কোথাও ফোটেনি; যেমন মাটিতে ভিন্ন অন্য কোথাও বীজ ফোটে না। তবে কি আত্মা থেকে এই মহিমা জাত, এই ভাবে নিতে হবে? না। জলে যেমন তরঙ্গ ওঠে, সেই ভাবে? না, ঠিক সে ভাবেও নয়। ঋষি এর তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন। প্রথম বললেন, এই সব মহিমা ফোটালেই ফোটে—'অহিকুণ্ডলবৎ।' সাপের কুণ্ডলি তোলা—সাপ যেমন নিজেই কুণ্ডলি তোলে। পাছে সংশয় হয় যে, এর দ্বারা তিনি নিজে বিকারগ্রস্ত হচ্ছেন, তাই ঋষি বললেন—'মণিবৎ বা।' মণি থেকে যেমন স্বতই জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ তাঁ থেকে স্বতই সব উদ্ভূত হয়। সাপের ন্যায় ইচ্ছা করে কুণ্ডলী তোলা নয়, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মণি থেকে জ্যোতির মত তিনি আপনার মহিমা প্রকাশ করেন। তার পর বললেন, সাপ ও মণি, দুটোকে একসঙ্গে গ্রহণ কর। তিনি অবস্থান করছেন, কিছু করছেন না, মণিবৎ স্বতই জ্যোতি ফুটছে। যেমন তুমি বসে আছ, মাথার ভিতর হড়-হড় করে সাপ ব্যাঙ, ঘটি বাটি অনবরত জ্যোতিবৎ বিকীর্ণ হচ্ছে। এই যে সাপ ব্যাঙ ফুটছে, তার মধ্যে দুটো, চারটে খেয়ে ফেলছ। ছেলে এল, স্ত্রী এল, তুমি অহিকুণ্ডলবৎ তাই হলে। আর অন্য যেগুলো বেরোচ্ছে, তাতে মগ্ন হচ্ছ না, সে সব মণিবৎ। তেমনি ঐ অক্ষর পুরুষ। ওঁ থেকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। ইনি নিত্য ঈশ্বর। এঁর হ্রাসবৃদ্ধি নেই। মহাপ্রলয়েও অব্যক্ত ভাবে ঐ জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে ভোগ

হচ্ছে। তখন 'কিছু নেই, কিছু নেই', এইরূপ ভোগ হচ্ছে। যখন 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' সঙ্কল্প হল, তখন অহিকুণ্ডলবৎ হলেন, ব্যক্ত হতে লাগলেন ; আব যখন অব্যক্ত হলেন, ঈশ্বরত্ব রইল মণিবৎ। মনে কর, তোর ভাল ঘুম হল। বিশ্বসংহরণ করলি, তোর ব্রহ্মাকে অব্যক্ত করলি, জগৎ অব্যক্ত হল। আবার তোর জাগাব সঙ্গে সঙ্গে তারা হুড়-হুড় করে জেগে উঠল। এই হুড়-হুড় করে জেগে উঠাব পরিবর্ত্তে 'এইবার আমার জগৎ আরম্ভ হোক্' এই বলে যদি জগৎপ্রকাশ আরম্ভ করতে পারতিস, তা হলে হতিস যোগস্থ পুরুষ। আপনার বিশ্বের উপর আপনাব স্বাধীনতা পেতিস। ভগবান্ সেইরূপ স্বাধীন। তোদের এরূপ হয় না। না হলেও 'কাল ভোরে হাওড়া যেতে হবে, ৪টায় উঠতে হবে,' এই সঙ্কল্প নিয়ে শুলে ঠিক ঐ সময়ে জাগবি। ৪টার সময় ঘুম ভাঙ্গলে হাওড়ায় যাবার জন্য সঙ্কল্প ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে জেগে উঠবে। ঘুম ভাঙ্গলে অন্য ছবি আগে দেখবি না ; হাওড়ায় যাবার ছবিই দেখবি। তা হলে ব্যাপার কি হচ্ছে ? ঐ সঙ্কল্প বুকে নিয়ে সতর্কে ঘুমিয়েছিলি। যদি ঐ সঙ্কল্প একটি পুরুষ হত, তা হলে ওকে কত আদরে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল মা। একটা কথা মাত্র নয়—যদি একজন মানুষ হত, তা হলে যখন ৪টা বাজল, আর তুই জেগে উঠলি, তখন ওকেও সঙ্গে সঙ্গে 'জাগো' বলে ওঠাতি। তা হলে বুঝলি না কি, কত সন্তর্পণে ওকে বুকে রেখে ঘুমোচ্ছিলি ? প্রতি সঙ্কল্প এইরূপই জিনিষ।

তোর অক্ষর আত্মা তোকে কখন সুখী, কখন দুঃখী, কখন ক্রিয়াশীল, কখন চিন্তাশীল করেন। তোর বহুত্বের প্রত্যেক টুকরোকে বুকে ধরে, লম্বা জীবন-প্রবাহে তাদের ধরে আছেন দেখ। ঠিক ভোরে ওঠানোর মত, কার পরে কি হবে, সব নজরে ধরে রেখে বসে আছেন। তাই প্রত্যেক জীবের জন্য একজন ভগবান্ বসে আছেন। এক পিঠে তোর উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট, সহস্রচক্ষু হলেও চোখের আর পলক নেই। এঁরই নাম নিজত্ব। একটা কিছু প্রাপ্তি এঁতে ছাড়া আর কিছুতে হবে ? ইনিই দ্রষ্টা—না, দ্রষ্টা বলতে আর কাউকে বোঝায় ? ইনি ভিন্ন আর কেউ শ্রোতা ? চেতনতাব কোন প্রকাশ আর কোথাও নেই। অন্ততঃ তোব মত জ্যান্ত ত। তা হলে এই জ্যান্ত হৃদযময়-দৃষ্টি নিবিষ্ট একজনের বুকে ছাড়া, হৃদয়ময়তায় ছাড়া তুই কিছুই করতে পারছিসনে। তুই এই হৃদয়ময় যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র। সে তার বুকে বসে তোকে সব কাজ করতে দিচ্ছে। মায়ের বুকে বসে শিশু যেমন খেলা করে, তাঁর প্রশস্ত বুকে বসিয়ে তেমনি তোকে তিনি খেলাচ্ছেন, কওয়াচ্ছেন, বলাচ্ছেন, করাচ্ছেন ;—এমনি একটা বুক তুই পেয়েছিস। ওঁব বুকে ছাড়া আর কোথাও কিছু পেয়েছিস ? ওঁর বুকে ছাড়া আর কোথাও বিশ্ব পাচ্ছিস ? এক পা বাড়ালি ওঁরই বুকে ? আর এক পা ওঁরই বুকে ? একটু সুখ পাস্ ওঁরই বুকে ? দুঃখ পাস্ ওঁরই বুকে ? দিল্লী যাই, লাহোর যাই, ওঁর বুকে ছাড়া, হৃদয়ময় ঈশ্বরত্বে ছাড়া যাবার জো নেই। ক্ষণে ক্ষণে এক এক 'আমি'

হচ্ছি, ফুরোচ্ছি। সেই হওয়া-ফুরোনর ধারাময় বহু ক্ষর 'আমি'র সমষ্টিকে এক করে যিনি দেখছেন, ফোটাচ্ছেন, নিজেতে ধরে আছেন, তিনি আত্মা, অক্ষর, কূটস্থ—রাশি-'আমি'স্থ। নমস্তে নমস্তে।

তা হলে আমাদের উপাস্যকে দুটি ভাব দিয়ে অবলম্বন করলুম—সর্ব্বদা হৃদয়ের দ্বারা মণ্ডিত। তারই নাম হৃদয়, যাতে সব আছে—'যচ্চাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বমস্মিন্ সমাহিতম্।' একদিকে ইনি হৃদয়ময়, একদিকে অক্ষরত্ব অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব। তা হলে এই দুটি জিনিষ যে আত্মত্বের বিকাশ, তাঁরই বুকে আমরা বাস করি। এই আত্মত্বের উপাসক হল সেই ক্ষর আত্মা, যে শূন্যতার দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত করে রেখেছে; উনি পূর্ণতার দ্বারা বেষ্টিত। ক্ষর, স্বার্থের দ্বারা বেষ্টিত, উনি হৃদয়ের দ্বারা বেষ্টিত। এর হৃদয় নেই, স্বার্থ আছে, খাওয়া আছে, হৃ চলছে, দান মোটে ফোটেনি। এখন উপাস্য ও উপাসক আত্মার পার্থক্য বেশ বোঝা গেছে? এঁর সান্নিধ্য তখনই লাভ হচ্ছে বলব, যখন প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এঁর থেকেই টানছি ও ফেলছি দেখতে পাব। এমনি ভাবে যে সজাগ থাকে, তাঁকেই বলব যে, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেছে। আর সাধারণতঃ আমরা কি দেখি? হঠাৎ একটা কিছু অপ্রত্যাশিত লাভ হয়ে গেলে বলি, —'ভগবান্ রয়েছেন মশাই!' আর সাধকের ভগবান্ কিরূপ? 'সজ্ঞানে আত্মতত্ত্বে জীবিত রয়েছি।' এই রস যে টানতে পারে, সেই সাধক। সুতরাং এখন তোদের উপাস্য গ্রহণ করতে

আর কোন কষ্ট নেই। সেই গ্রহণটা কত দূর? কথা বলা মাত্রই দূর। যে মুহূর্তে অন্য কোন ভাব নিয়েছি, তার মানেই দূরে গেছি।

একটা দানের উৎস তখনই খোলে, যখন মায়ের দান দেখে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়,—"আহা, এত দিচ্ছ!" তখনই তুই কতক দানময় হলি। ভগবানে কতটা দানময় হতে হবে, আর ভগবান্ কি পরিমাণে আহৃত হলে তা দিতে পারবি, বুঝে নে। তিন প্রধান দেবতাকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। সেই তিন দেবতাও এঁর প্রধান জ্যোতি, এ কথা আমরা আগে বুঝে নিয়েছি। সুতরাং ভাবমূর্ত্তি বা যে কোন মূর্ত্তিতেই যাই না কেন, পরমাত্মরূপ এই তত্ত্বটি আমার বুকে ধরা। আহা, নমঃ! আমার সকল সার্থকতার আগারস্বরূপ। এটি হারিয়ে কৈলাসে গিয়ে লক্ষ জপ করলেও পরমতত্ত্ব লাভ হবে না; কোন সিদ্ধিলাভ হতে পারে। বেশ বুঝেছিস? মন থেকে অহর্নিশি জ্যোতি বেরোচ্ছে দেখছিস? এর নাম 'মণিদ্যুতি'। এর মধ্যে কতকগুলো নিয়ে মসগুল হচ্ছিস; এর নাম 'অহিকুণ্ডল'। আমি 'সতীশ সেন'—এতে গাঁথা হয়ে গেছিস, যেটায় পাকা হয়ে বসে গেছিস।

সবটাই তাঁর লীলা, বিজ্ঞান ও ভঙ্গিমা। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বোঝা গেল? দেখাগুলো আমার এই জ্ঞানভূমিতেই হচ্ছে। সুতরাং এতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা এসে পড়ছে। আজ যা বললুম, এগুলো বড় দামী কথা। সূক্ষ্ম ভুল প্রায়ই হয়ে যায়।

সাধন করবার সময় দেখবি, সূক্ষ্ম ভুল হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানীর চোখ না হলে ধরা পড়ে না।

হৃদয়ময়, সার্থকতাময় নিজত্বে নিজের নিজত্ব একেবারে ঠেকাঠেকি হয়ে আছে। যে বুকে কালী, দুর্গা সব লুকান আছে, তাই নিয়ে খেলা কর্। শিবত্ব, নারায়ণত্ব, এ সব বুক-ভরা আছে, তুই গিয়ে তুলে নিলেই হল। হুকুম নিয়ে নিতে হয় না, শিষ্যের মত তুলে নিতে হয়। নমঃ!

১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৭, সোমবার, সন্ধ্যা।

একটা Power House বা বিদ্যুদ্‌গৃহে প্রবেশ করলে কত সন্তর্পণে, কত বিস্ময়ভরে তার ভিতর চলাচল করি; তেমনি ভগবৎপুরীতে প্রবেশ করে কত সম্ভ্রমভরে, কত সবিস্ময়ে সব দেখতে শুনতে হবে! 'প্রাতঃকাল থেকে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত যা কিছু করি, সব তোমার পূজা হউক', ইত্যাদি বললেই কি সব হয়ে গেল; এত বড় চাঞ্চল্য কি তাঁতে অর্পণ করা হয়ে গেল? তাঁর বিপুল মহিমার কথা তখন মনে পড়বে না? 'এই চাঞ্চল্য তোমারই, এ তোমারই, তাই তোমাকে দিলুম' এমন ভাবে যদি না দেওয়া যায়, তা হলে 'অর্পণ করলুম' বললেই কি অর্পণ হয়ে গেল? এই হল সংযমযোগ। আগে তাঁর মহিমায় মহিমময় হয়ে, শুচি হয়ে, তখন তাঁকে বলতে পারব,—'তোমায় অর্পণ করলুম।' না হলে যজ্ঞ-বাড়ীর ভাত, হড় হড় করে ঢেলে গেলুম।

এই সব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমরা কত নিম্ন স্তরে পড়ে আছি। মাননীয় গণনীয় মানুষ বলে যাঁর মর্য্যাদা আছে, আমি না জেনে তাঁর নিকট দিয়ে ছুটে যাচ্ছি, তখন কেউ যদি তাঁর কথা বলে দেয় ত আমি থমকে দাঁড়াই; তেমনি ভগবানের কথা মনে হলে ঐ রকম মহিমময় ভাব যদি না আসে, তবে কি কিছু হল? জীব হয়ে জন্মেছি বলে অতটা পারি না; কিন্তু ভগবান্‌কে দেখতে যখন সচেষ্টই হয়েছি, তখন অতটা অবহেলা না করে, আর একটু **seriously** বা গভীর ভাবে নেব না কি? 'সর্ব্বতোভাবে সকলের ভিতর তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায় না,' এর মানে এ নয় যে, 'তবে আস্তাকুঁড়েই পড়ে থাকি, সেখানেও যখন তুমি আছ।'

সূর্য্য রয়েছেন, তাঁ থেকে কিরণ বর্ষিত হচ্ছে; ইনি এত মহান্ যে, কোথাও একটু কম, কোথাও একটু বেশী কিরণ দিচ্ছেন, এ দেখার প্রয়োজন হয় না। তেমনি এই শান্ত পরম দেবতাতেই আমি জন্মে রয়েছি, এ দেখলে কি অন্য কোনও বিষয়ে দৃষ্টি ফেরাবার অবসর থাকে? 'আমি' বলে পরিচয় যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ তাঁ থেকে আমি আলাদা। তা হলেও আমায় মিশে যেতে হবে ত? নীরব সে ভাষা, শান্ত সে দৃষ্টি, আমাকে ক্রমাগত বলছেন,—"চলে আয়, চলে আয়! মিলে যা, মিলে যা!" তাঁর ঈক্ষণই সর্ব্ব অর্থ; কাজেই সবই যে তাঁতে! আহা! ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তং অবক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

তাঁর চাউনির একটা অর্থের নাম রূপ, একটার নাম রস, একটার নাম গন্ধ ইত্যাদি; যেমন আমার চাউনি থেকে আমার মনের অর্থ বুঝতে পারিস। টাকা নিরাপদে রক্ষার জন্য আমরা ব্যাঙ্কে রাখতে পারি, আর নিজেকে ভগবানের ব্যাঙ্কে রাখতে পারি না? রসগোল্লার নাম করলে জিভ রসায়মান হল, ঐ রসবোধ আছে বলে। তেমনি যদি জানি, এই যে বোধস্বরূপ, ইনিই স্বয়ং ভগবান্! "হে অনাদি জনক আমার! তোমার বুকে ছাড়া কোথাও কোন প্রকাশ নাই। তোমার বুকে ছাড়া আমি আর কিছু উপলব্ধি করছি না। তুমি নিজেই এই সব, এই বিভাস; অনন্ত বিভাস বিকীর্ণ হচ্ছে, বেরোবার স্থান নেই, তোমাতেই আছে!"

যিনি স্থির, তিনি চঞ্চল নন; যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সবিকার নন, ভাষ্যকারেরা এই যুক্তির ধাঁধায় ফেলে দিলে। তারা দেখাক ত—জগতে এমন কোন কিছু আছে, যার মূলে একটা স্থির মেরু ও একটা ক্রিয়াময় মেরু নাই! সমস্ত প্রকাশেই একটা ক্রিয়াময়তা রয়েছে, আর তার তলায় স্থিরত্ব রয়েছে। খালি ভগবানের বেলায়ই এর উল্টো হয়ে যাবে? তবে সেই বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে শেখ, যে বিজ্ঞানে এই দুইয়ের সামঞ্জস্য* রয়েছে। এই দুই মেরুকে যে পরিচালনা করে, সে কে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঐ দুই মেরু আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সেই দুটো বিপরীত

মেরুকে যে পরিচালনা করে, তাকে আবিষ্কার করতে পারে নি। দুটোই যখন প্রকাশ, পরস্পরের আপেক্ষিকতা নিয়ে বাড়তে থাকে ও কমতে থাকে, তা হলে অনুমান করতে হবে, একটা কিছু আছে, যা এই দুইকে বাড়ায় ও কমায়। গুণ্ডার মত নয়, বীরের মত, শান্ত বলশালীর মত গুরুর কাছে এই শক্তিতত্ত্ব গ্রহণ কর। এই মাতৃরূপিণীর মাতৃত্ব যতক্ষণ না দেখবি, ততক্ষণ কিছু জানতে পারবি না। 'তুমিই মেপে মেপে দিচ্ছ', এই বললে মা আর মেপে দেবে না, তখন অপরিমেয় ভাবে দান করবে। অজ্ঞান শিশুকে যেমন সাগু-বার্লি দিতে হয়, আমরা সেই অজ্ঞান শিশু। কিন্তু একদিন এ বলে উঠবে, 'আমি সনাতন, কালও আমার নিম্নে!' জন্ম আর মৃত্যুর চক্রের মধ্যে যে জীবনটুকু, যার নাম ভবতাপ, এখন থেকে শুধু তারই মধ্যে নিজেকে আর আবদ্ধ রাখিস না। ছেলেকে ঘড়ি দেখাতে গিয়ে তার পেণ্ডুলামে হাত না দেয়, সে বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকিস, তেমনি জগতের কাজ করতে গিয়ে এই বিজ্ঞানটি সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ঠিক রাখবি। গোটা মানব-যন্ত্রে ওঁর সান্নিধ্য ঠিক রাখতে হবে। হৃদয়ের অন্তর, হৃদয়ের কেন্দ্র ভিন্ন এই পরম দেবতাকে দেখা যায় না। মনের তলায় অব্যক্ত হৃদয় রয়েছে। আমরা যেখানে হৃদয় নিয়ে ব্যবহার করি, সে ব্যক্ত হৃদয়। বহির্ম্মুখে থাকা মানেই হৃদয়ের গতি বাহিরের দিকে আছে। বুকের একটা ভালবাসার উদ্বেলনকে, মমত্বকে নিয়ে খেলা করি, আর সেই হৃদয়ের তাড়নায় বহির্ম্মুখী হয়ে রূপ রসে আমার গতি হয়। 'মন ব্রহ্ম' মানে,

মনের তলায় হৃদয় আছেন, আর হৃদয়ের তলায় পরমাত্মা আছেন। আত্মার আদি-জ্যোতি হল হৃদয়, তার পর লহর বেরোল মন। তাই ওঁর নাম আনন্দময়। বেগর আনন্দ অর্থাৎ বেগর হৃদয় কোন খেলা রচিত হয় না। শক্তিবিজ্ঞান লক্ষ্য করিস। এই জ্ঞানভূমি, চেতনভূমি, এখান থেকে অন্য জায়গায় আর কেন যাস? এই জায়গার উপর বিশ্বাসবান্ হ; তা হলেই শক্তিতত্ত্ব ধরতে পারবি।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

আগে ক্ষর আত্মা ও অক্ষর আত্মাকে দেখে দেখে অক্ষর আত্মাকে বুঝতে শেখ্, তার পর পরমাত্মাকে, পরম পুরুষকে উপাসনা করবি। পরমাত্মা থেকে আত্মা ও অনাত্মা, দুই বেরোচ্ছে। যখন তিনি মাত্র জ্ঞানস্বরূপ, তখন আত্মা অনাত্মা, এই ভাষা লোপ পেয়ে যায়। তাঁর প্রকাশ এই দুই রকম—আত্মা ও অনাত্মা। আত্মত্ব পরা শক্তি, অনাত্মত্ব অপরা শক্তি। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই বলাই যথেষ্ট। তার পর জ্ঞানের নানা স্তর-বিভাগ বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। তোরা একেবারে মর্ম্মে বসে যা। এইটুকু আমার কাছ থেকে আদায় করে নে। যিনি চিন্ময় জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই প্রত্যক্ষাবগম আত্মস্বরূপে, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাণ-মনোময় অনাত্মতত্ত্বরূপে বিদ্যমান রয়েছেন। আমি বদ্ধপরিকর হয়েছি যে, তত দিন

কলম চালাব না, যত দিন না এই শক্তিতত্ত্ব তোদের ভিতর দিতে পারব।

স্থূল বিশ্ব বা রূপ বা সকল প্রকাশই হল মন থেকে জাত; তার রস হল প্রাণ। অর্থাৎ মন প্রকাশ হয় বিশ্বরূপে, কিন্তু অন্তরের রসে রসিত হয়ে, এবং সকল রসময় প্রকাশেরই মূল হল বাক্‌শক্তি বা তেজ। তেজ বা আত্মা থেকে প্রাণ বা রস, তা থেকে মন বা বাক্য, অক্ষর-সমষ্টি; বাক্য থেকে বিশ্বপ্রকাশ। ঋগ্বেদের সন্ধ্যা-মন্ত্র স্মরণ কর—"নমঃ পৃথিব্যৈ, নম ওষধীভ্যঃ, নমো বাচে।" সাধনার দুই রকম গতি—অন্বেষণ আর স্বীকৃতি। নিষ্ঠাও দুই রকম নির্দ্দিষ্ট আছে—এক ত্যাগের পথে, আর জ্ঞান-সংযুক্ত কর্ম্মের পথে। সাধন করতে গেলেও ঐ দুই জিনিষের অনুসরণে দুটো দিক্ দেখতে পাওয়া যায়। অন্বেষণ ত্যাগের পথ; তার মানেই, যেখান থেকে আমি অন্বেষণ করছি, সে স্থানটা ভগবৎশূন্য; তাই তাঁকে আমায় খুজতে হচ্ছে। আর স্বীকৃতি,—যেখানে যা দেখছি, সে ভগবান্‌কেই দেখছি। সুতরাং এ জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মের পথ। তা হলে সকল ভূমিতে যেটাই আমার নজরে এসে যাবে, ভগবদ্‌বোধে সেইটেই আমার গ্রহণীয় হবে। যখন বললুম, "আনখেভ্য আরোমভ্যঃ," তখন মনে পড়ল নখ এবং সেইখানেই ভগবান্‌কে বসালুম; সেইখানে তাঁকে ধরলুম। কিন্তু আমার সংস্কার নখস্থ ভগবানে আমাকে দাঁড়াতে দিল না, সংস্কারের টানে আমি সেই অন্বেষণের পথে চললুম। কিন্তু তথাপি আমি বলতে লাগলুম, 'এইখানেই অক্ষর

সনাতন, 'এইখানেই—এইখানেই তুমি আছ।' এর ফলে অন্যান্য-স্থানীয় চেতনা এইখানে জমাট হল, সমগ্র চেতনা নিয়ে আমি এইখানে হাজির হলুম। তা হলে এইখানে, দেশকালশূন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার নখের ডগে। এইখানে অক্রম দর্শন তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হল। কাকে শুদ্ধ ঢুকিয়েছ এইখানে? সুতরাং স্বীকৃতির পথই গ্রহণীয়। স্বীকৃতিতে আপনা হতে জীবত্ব মুছে যাচ্ছে। আমি পরম চিৎদেবতায় যখন গিয়ে পড়লাম, তখন সেখানে **common factor** নিজ-দেবতা আছেন দেখতে পেলাম; ভগবান্ তাঁর পেটে ঢুকে গেছেন, নিজে সব হয়ে গেছেন। কি সুন্দর! সুতরাং এ সাধনা কঠিন জিনিষ নয়। আমার মন কঠিন, বুদ্ধি কঠিন; তাই মন ও প্রাণ নিয়ে সাধনাও কঠিন। কিন্তু এ পথে কোন দিকে চোখ ফিরিয়ে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। যদি আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় ত বলতে হবে, 'আমি' ডোবেনি।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব আমার বাসস্থান; সেখান থেকেই আমি জেগে উঠি, সেখানেই আমি ঘুমোই। এইখানে তোমায় দেখছি, তাই জন্ম ও মৃত্যু আর রচিত হবে না। তোমায় দেখলে আর জন্ম-মৃত্যু হতে পারে না। খোসামুদে কথা একটাও বলব না। যে অর্থ আমার বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষীভূত, সেই অর্থই খালি বলব। আমার প্রত্যক্ষীভূত নয়, পাঁচ জনে বলে গেছে, এমন কথা বলব না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত রুদ্রগ্রন্থি ভেদ না হয়, ততক্ষণ সংস্কারগ্রন্থি

ধরে বসে আছেন দেবী আমার। যতক্ষণ তাঁকে ওখানে লাভ করা না হয়, ততক্ষণ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, বৈকুণ্ঠ ঘুরে কোথাও ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই হিরণ্যকশিপু বলেছিল, "চতুর্দ্দশ ভুবন খুঁজে এলুম তোমায় মারব বলে, কিন্তু তোমায় খুঁজে পেলুম না। তুমি কোথায় ছিলে?" ভগবান্ বললেন, "আমি ত কোথাও থাকিনি, তোমারই বুকে ছিলাম।"

আমার চেতনা যখন আমার জ্ঞানময় বিশ্ব ছাড়া আর কিছু দেখছে না, আমার সংস্কার যখন আমার সুখদুঃখ, অতীত ভবিষ্যৎ, সব সমেত আমারই জ্ঞানময় অবস্থান বলে সমস্ত দেখে, তখনই আমার জ্ঞানময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা হয়। দেবতাই ব্রহ্মের জ্যোতি। ব্রহ্মভূমিতে গিয়ে কোন অভীষ্ট মূর্ত্তি যদি দেখতে চাও, তখন আকাশে বিদ্যুতের মত সে মূর্ত্তি প্রকাশ পাবে। আমাদের কি সাথী নেই? আছেন, গুরুই সাথী। নমো নারায়ণায়, আত্মভূতায় নারায়ণায় নমঃ। তুমি জলে আছ, স্থলে আছ, আকাশে আছ, তাতে আমার কি? যদি তুমি আমার হাড়ে মাসে, আমার অণুতে পরমাণুতে না থাক। আর আমাতে না থাকলে তোমার সবেতে থাকা হয় কি? আগে তপস্যা সাধনা প্রভৃতি কঠিন পথে ছাড়া ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না জানতুম। গুরু অববোধ এনে দিলে দেখলুম, তাঁর স্নেহময় হৃদয় সর্ব্বদাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। রৌদ্রে দাঁড়ালেও যদি মনে করিস, গায়ে রৌদ্র লাগল না, তা যেমন অজ্ঞানের কথা, তেমনি ভগবান্ বলে ডাকলেও ভগবান্ এলেন না মনে করা অজ্ঞানের

কথা। জীবনের চাকা কম্‌নে ঘুরিয়ে দিলে দেখলিনি ? ভগবতী ঠেল দিচ্ছেন দেখতে পেলি না ? ভগবতীকে না দেখলে মৃত্যুঞ্জয় এলেও দেখবি, মৃত্যু এল, যম এল।

ব্রাহ্মণ বৃথা বাক্য উচ্চারণ করে না। তার বাক্য অমোঘ। কেন ? তিনি নিজে বাঙ্ময় হয়ে ব্রাহ্মণের মুখে প্রকাশ হচ্ছেন বলে। মনের মূর্ত্তি কি ? **Cluster of words** বা শব্দের রাশি। অনবরত পাগলের মত কথা ফুটছে, হড়-হড় করে অনবরত কথা ফুটে চলেছে। এতে একদিকে তৈরি হচ্ছে সংজ্ঞা, এক দিকে রূপ, তাব নাম আকাশ, চিত্তাকাশ। আকাশের **element** বা মূল উপাদান হল শব্দ। প্রাণের কথায়—কথাটা মন, **feeling** বা ভাব প্রাণ। চিন্ময়ের জ্যোতি হল বাক্‌, তেজ। এত বড় বিশাল দিক্‌, এত বড় কাল-প্রবাহ, সব প্রবিষ্ট হয়ে গেল একটা বিন্দুতে—"অত্র মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"

সে যেন আমার কেউ নয়, আমাকে খেটে-খুটে দিন-মজুরী করতে হবে, সাধনের অবসর কোথায় ? একটা বাঘের বাচ্ছা, সিংহীর বাচ্ছা, পাখীর বাচ্ছা ; এরা দেখছি, মায়ের সঙ্গে এক একবার চরে বেড়াচ্ছে, এক একবার মায়ের দিকে চাইছে। আর তোদেরই এইরূপ ভীতিগ্রস্ত হয়ে বেড়াতে হবে ? তোরাও মায়ে লেগে থাক, লেগে থাক। তাঁর বিভুত্ব এখনো দেখিসনি বলে এই রকম সঙ্কীর্ণতা এসে যায়। ইনি বিভু ? ইনি "অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌, নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্‌ পূর্ব্বমর্ষৎ, তদ্ধাবতো অন্যান্‌ অত্যেতি তিষ্ঠৎ।"

২১এ আগষ্ট, ১৯৩৭, শনিবার, সকাল।

মনোগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি, সংস্কারগ্রন্থি, এসব ভেদ করার মানে কি? মুক্তি ও নির্ব্বাণে পার্থক্য কি? নির্ব্বাণ অপুনরাবর্ত্তন। মুক্তি—ইচ্ছা করলে স্বাধীন পুনরাবর্ত্তন। শিবেরও ঈক্ষণ, শক্তিরও ঈক্ষণ, উভয়ের ঈক্ষণে তফাৎ কি?

ভেদ মানে, একটাকে অতিক্রম করে আর একটায় যাওয়া। 'আমি সুখী, আমি দুঃখী,' এই বোধ ছেড়ে যখন 'আমিই সুখ, আমিই দুঃখ' এই বোধে এলুম, তখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হল। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করে গেলুম সংস্কারেতে, অর্থাৎ আত্মময় সংস্কারেতে। 'আমার তৃষ্ণা'-বোধে তৃষ্ণার জ্বলন আছে, কিন্তু 'আমিই তৃষ্ণা'-বোধে জ্বলন নেই। আগুন আগুনকে যেমন পোড়ায় না, তেমনি। যখন আর জ্বালাতে পোড়াতে পারবে না, তখন সংস্কারগ্রন্থি ভেদ হল অর্থাৎ তাতে পাকা ভাবে অবস্থান হল। আমি সুন্দর বলে নিজের সৌন্দর্য্যে কখন পাগল হই না, অন্যের সৌন্দর্য্যে পাগল হতে পারি। শিবেক্ষণ মানে শক্তি। শিব যখন ঈক্ষণ করেন, তখন শক্তি জাগে। শক্তি জাগা মানেই বহু হওয়া। যে টুকরো হয়েছে, সে আবার বহু হচ্ছে; কদমফুলের মত। পুরুরূপ—বহুরূপ। পুরুষের দুই মানে। ১। বাক্‌প্রাণমনোময় পুরে পুরে যিনি অবস্থান করেন। ২। পুরু হবার, বহু হবার শক্তি যাঁতে শায়িত আছে। অধ্যাত্মেই তিন রকমে আত্মার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে; ১। পরমাত্মা, ২। প্রত্যগাত্মা, ৩। জীবাত্মা। পরমাত্মা

বিশ্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমগ্র একসঙ্গে নিয়ে ভোক্তা— 'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।' বহু প্রত্যগাত্মারূপে নিজেকে বিভাগ আর কূটস্থরূপে অবস্থান। প্রত্যগাত্মা, বহু ভোগী আত্মারূপে নিজেকে বিভাগ এবং তারই কূটস্থরূপে অবস্থান। জীবাত্মা শুধু ক্ষরিত ও মৃত হয়; ভোগ করে আর ভোলে।

২২এ আগষ্ট, ১৯৩৭, রবিবার।

এই চিন্ময়ী মহাশক্তি, যিনি সকল নাম-রূপ আকারে প্রকাশ পেয়েছেন, তার জননীত্ব অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-স্বরূপতা, এবং এঁর লীলা-ভঙ্গিমা বা লীলাতে যত কিছু মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে, তা দেখলে বড় আশ্চর্য্য হতে হয়। এঁকে আমরা দেখতে পাই একান্ত জড়ামূর্ত্তিতে। আমার ভিতরে যে জ্ঞান, বস্তুতঃ তা ইনিই। হিঙ্গুলেশ্বরীর গল্প স্মরণ কর। সাধুর আশ্রমে কাঠ কাটা, বাটনা বাটা, সবই তিনি করে দিচ্ছেন। দেখে অপর সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে আপনি বনে যান কেন?" তিনি বললেন,—"এ মহাশক্তি মায়ের আমার দুটি রূপ। এক দিকে ইনি জল তোলেন, কাঠ কাটেন (চতুর্দ্দশ করণের শক্তি), অপর একদিকে ইনি নিতান্ত অসঙ্গ, অনির্বচনীয়। তাঁর প্রথম রূপ ঘরে ঘরে দেখা যায়। অন্য রূপের জন্য জঙ্গলে যেতে হয়।" তাঁর এই দুই রূপ দেখার জন্য যে বার্য্য অর্থাৎ ইচ্ছারূপ প্রেরণা ও চেষ্টা-শক্তি চাই, সেটি মায়ের মহাদান।

শুধু গৌরবান্বিত ভাবে তাঁর কথা শোনার যে বীর্য্য, তাহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু চিত্ত এতবড় চঞ্চল ও বাচাল যে, এই মহতী সার্থকতাকেও যেন সে ডাল-ভাতের মত গ্রহণ করে।

মুক্তির যে কত বড় সারবত্তা, কত বড় সার্থকতা, জ্ঞান-প্রকাশের বা ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভাবের যে কত বড় সার্থকতা, তার ইয়ত্তা করতে কোটির মধ্যে হয় ত একজনকে পাওয়া যায়, যে সেই সার্থকতা লাভের নিকটস্থ হয়েছে। সুতরাং এ যে কত দুর্ল্লভ, তা বলা যায় না। সুতরাং তাঁকে যারা লাভ করবে, তাদের অতি সৌভাগ্যবান্ মনে করা উচিত। কি অপূর্ব্ব সুযোগ তোদের হয়েছে! জ্ঞানময়ীকে এই ভাবে না দেখতে শিখলে তাঁকে সাক্ষাৎ করা অসম্ভব, এবং চিনলেও তাঁতে থাকা অসম্ভব। এক দিকে ফুল ফল, আকাশ পাতাল ইত্যাদি দৃশ্য-সকল অনবরত গৃহীত হচ্ছে। এও ত সেই জ্ঞান-মূর্ত্তিই। তাঁর ব্যাপ্তি অসীম! দিক্ দেশের বিস্তারে কল্পনাকে যত দূর নিয়ে যেতে পার, সে-ও ত মায়ের আমার জ্ঞানমূর্ত্তি। এমন কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না, যা মায়ের জ্ঞানমূর্ত্তি নয়। এই যে বাহ্য মূর্ত্তি জগৎ, যার বিশালতা ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যেতে হয়, এ সেই মায়ের আমার জ্ঞানমূর্ত্তি। এই যে জড়াভিমানী দেবতা, এর তলাতে তাঁর আত্মরূপিণী মহীয়সী মূর্ত্তি আছে, তা না হলে তাঁকে দেখা বা পাওয়া যেত না। আমি হাতী, ঘোড়া, ফুল, ফল চিন্তা করতে গিয়ে তার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যাই দেখছি। তা হলে আমার জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় একটা জড়রূপ

গ্রহণ করতে পারে, এবং তার তলায় ভোক্তৃত্ব এবং সেই আকার গ্রহণ করতে পারারূপ কর্ত্তৃত্ব থাকে। আমি ফুলের সারূপ্য নিলাম, পূর্ণমাত্রায় ফুল ভোগ করলাম, আমি ফুলই, এও দেখতে পেলাম। এতে ফুলরূপে পরিচালকত্ব, ফুলজীবত্ব এবং ফুল-ভোগত্ব, শক্তির এই তিনটি রূপ আছে দেখতে পেলাম। তা হলে সঙ্কল্প অনুসারে সব হয়। আমি 'এক ঘণ্টা নিজেকে ফুল করে রেখে দেব' এই সঙ্কল্প করে এক ঘণ্টা ফুল হয়ে রইলুম। তখন এক ঘণ্টার মধ্যে আর ফুলত্ব ভাঙ্গবার জন্য কোন শক্তি আসবে না। কেন না, 'প্রাক্‌সংকল্প'-প্রভাবের দ্বাবা ফুলত্ব ধরে আছে। এক ঘণ্টা পবে সেই ফুলত্ব ভেঙ্গে যাবে। এইটাই ফুলবোধের ঈশিত্ব হল না? ফুলত্বে নিজেকে পরিচালনা করা, ফুল হওয়া এবং 'ফুল হয়েছি' এই জ্ঞানময় হওয়া, ইনিই কি তা হলে ভগবান্ নন? এই সংকল্পের এমন প্রভাব আছে, যার বলে ফুল হব এবং এক ঘণ্টা ফুল হয়ে থাকব; সুতরাং এক ঘণ্টার মধ্যে আর ফুল থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু প্রাক্‌-সঙ্কল্পে ঈশিত্ব আছে। এই যেমন ফুল হওযার ঈশিত্ব-শক্তি, ফুল হওয়া এবং ফুলত্ব ভোগ করা—এই সবই সংকল্পের মধ্যে আছে। জ্ঞানশক্তিই দেবী। এই দেবী যতই ফুলত্বে ঢুকুন, ফুলত্ব যতই ভোগ করুন, তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত যান, তাতে ফুলত্বরূপ তাঁর একটি অংশই ফুলে ঢুকবে, বাকী অংশ ঈশিত্বে থাকবে। যে পাদে ফুল হলাম, সে অংশে ছাড়া ঈশিত্বরূপ ত্রিপাদে তার কোন চিহ্ন দেখা যাবে না। তা হলে নির্ম্মাণচিত্ত পুরুষ, সংকল্পসিদ্ধ

পুরুষ হলে দশ হাজার মানুষরূপে নিজেকে বিভক্ত করতে পারবে।

দেখ, যখন মনে মনে কিছু দেখ্‌ছ, তাতে একটা ভোগ হচ্ছে। ফুল দেখে মনে মনে মুগ্ধ হলে; দার্শনিক ভাবে দেখলে দেখবে, তুমি যেমন মানুষ, ঠিক তেমনি থেকে তোমার ফুল দেখা হয়নি, আর ফুলেব সৌন্দর্য্য ভোগ করাও হয়নি। তোমাকে কতক পরিমাণে ফুল হতে হয়েছিল। তোমার নিজত্ব ফুলের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তবে ফুল ভোগ করেছে। ফুলের গন্ধ, পাঁপড়ি, রং, যা যা পেলে, নিজত্বকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়েই সে সব ভোগ করেছ। ভোগ মানেই আপনি কতকটা তদ্বৎ হয়ে যাওয়া, ভোগ্যের সহিত একীভূত হয়ে যাওয়া। যেমন সুখ এলে বলে থাক, আমি আজ বড় সুখী। সুখ বা দুঃখ বলে যে যে চিত্তমূর্ত্তি, তাতে আপনাকে একীভূত করে তবে বলছ, আমি সুখী দুঃখী। যোগ যাগ আর কিছুই নয়, দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু হচ্ছে, তারই মূলে ভগবান্‌কে দর্শন করা। জল, আকাশ, গাছ, পাথর, যা কিছু আমরা দেখি, তাতে নিত্যই একীভূত হচ্ছি; এ সব ঠিকই আছে। মাত্র তার মূলে আর একটি তত্ত্ব দেখলেই সব বদলে গেল। ঘড়ির সবই আছে, pendulum না নাড়ালে কিছু হয় না। Electricityর তার-টার সব আছে, switch না নামালে জ্বলে না। তেমনি আমাদের সব আছে, ভগবান্‌রূপী switch না টিপলে চিন্ময় খেলা হয় না। ইনি দেবী, ইনি মহাশক্তির কারণ। জ্ঞান এইরূপ চিৎপ্রধান হয়ে যাবে। এখন আছে

জড়প্রধান ; বিশ্ব মাতৃময় হলে হয়ে যাবে চিৎপ্রধান, এইটুকু খালি রূপান্তর। আমি ফুল বলতে ফুল হচ্ছি, রস বলতে রস হচ্ছি। ঋষি বললেন, দেখা যাক কত দূর যায়। ওঃ, এত দূর এই শক্তির, এই জ্ঞানরূপিণীর গতি! আমি নিজে আর একটা ফুল তৈরি করতে পারি। আমি ফুল তৈরি করলেও তাতে ঐ ঈশ্বরীর সঙ্কল্প-শক্তি ক্রিয়া করবে। আমারও পিছনে ত একজন সঙ্কল্প করে আমায় ধরে আছেন, যাঁর ইচ্ছার বাইরে এক মিনিট আমার থাকবার জো নেই। তা হলে একই যোগেশ্বরীকে দেখতে পেলুম, যিনি যোগপ্রভাবে আত্মা ও বিশ্ব হয়ে রয়েছেন। যার এই মাত্রাজ্ঞান আছে, কি করে যোগ করতে হয়, কি করে বিয়োগ করতে হয়, তা সেই জানবে। এই মা রয়েছেন আমার মূলে। প্রতি প্রকাশের মূলে এইরূপ যোগেশ্বরী মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কথাটা ঠিক? তবে কেন তিনি সঙ্কল্প করলেন আমার বেলা কালো মানুষ হতে, আর তোমার বেলায় সুন্দর মানুষ হতে? এ আমার তোমার বেলার কথা নয়। তিনি আপনি মেতে আছেন আপনার খেলায়। আমার তোমার আপেক্ষিক বা relative জ্ঞান তাঁর নেই। এর মধ্যে আমরা বার করলুম কর্ম্মফল-বিজ্ঞান। আমাদের মূলে প্রকৃতি-পুরুষ-ভূমি আছে। তার পর দেখি, আমরা যে যার কর্ম্ম সৃজন করতে পারি। ইচ্ছা করে আমরাই জল মাটি হয়েছি। দেখছি, একটা বাঁধা নিয়ম আছে। একটা সূর্য্য আছে, সে যুগ যুগান্ত ধরে একই। সুতরাং মাত্র আমার ইচ্ছা নয়, একজন

আছেন, যিনি এই সব সাজেন, আর একজন এ সব ভোগ করেন। সাজার সার্থকতা ভাল করে দিবার জন্য কর্ম্ম সৃষ্টি করেছেন। যিনি মূল সঙ্কল্প করেছেন, তিনি নির্ম্মাণচিত্ত দিয়ে বললেন—'তোমায় স্বাধীনতা দিলুম। যত হতে চাও, হও; স্ব স্ব কাণ্ডে· আপনাকে শাখা-প্রশাখা করে লীলা কর।' যেমন সৌভরি করেছিলেন। যতক্ষণ তিনি করতে দিয়েছেন, ততক্ষণ সে লীলা থাকল। ঐ এক ঘণ্টার পর আর অত সৌভবি নেই। যত দিন তাঁর সঙ্কল্প, তত দিন যা ইচ্ছা কর। সঙ্কল্প ফুরোলেই তিনি টপ্ করে টেনে নেবেন। এমনি যোগেশ্বরী, ধাত্রী, বিধাত্রী আমাদের প্রতি ভূমিতে ধরে রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছিস? ভাল করে দেখতে পেলে কি বলবি? তোমায় ভুলে আব খেলা চাই না। তোমার বুকে বসে যদি খেলা কিছু চলে, তবে চালাতে রাজী আছি। তিনি বললেন, আমার বুকে বসে, আপ্তকাম পুরুষ হয়ে, আমাব সঙ্গে একীভূত হয়ে ব্রহ্মলীলা করতে পার।

অনবরত তাঁর বুকে রয়েছিস, এ কথায় আর কোন সংশয় আছে? তত্রাচ· তুই বলছিস্ না যে, আমি জ্ঞানী হই, সিদ্ধ হই, তোমারই বুকে হব। স্ত্রী পুত্র নিয়ে খেলা করি ত তোমারই বুকে বসে করব। এখনো ঐকান্তিক ভাবে বলছিস্ না, এখান থেকে এক পা বেরিয়ে গিয়ে রাজত্ব পেলেও তা চাই না। প্রজ্ঞাময়ত্বের আকর্ষণ কি তোদের প্রলুব্ধ করে না? প্রজ্ঞাময় হয়ে ভিখারী সাজতেও রাজী, প্রজ্ঞাশূন্য রাজা হতেও রাজী নই।

এখনও যখন সে ইচ্ছা জাগছে না, তখন কত হাল্‌কাভাবে দেবীর কাছে অগ্রসর হচ্ছি, ঐকান্তিক ভাবে নয়, তাই দেখ্।

জ্ঞানময়ীর জড়নামীয় সীমাতে এই খেলা দেখলাম। এখান থেকে একান্ত দূব, একেবারে বিরুদ্ধ, দুষ্পার যে অন্য সীমা, সেখানে জড় সাজা নেই, একেবারে জড়ত্বের গন্ধ নেই, মাত্র চেতনা সাজা, মাত্র নিজবোধ, একেবাবে চেতনারই আতিশয্য। এক ভূমি এমন যে, সেখানে ফুল ফল ছাড়া, মানুষ মানুষ ছাড়া আর কিছু ধারণা করতে পারে না। সেখানে সবাই জানে, আমি পূর্ণভাবে এক জন মানুষ। আবার এক ভূমি, যেখানে পূর্ণভাবে চিৎস্বরূপ, সপ্রকাশ চেতনা ফুটে আছেন। সেখানে এ চিৎস্বরূপতা কি করে হয়েছে ? এখানে দেখলাম, ঈশ্বর হয়ে ফুল প্রকাশ করে, তিনি ফুল সেজে বসেছেন। ওখানে তিনি মাত্র শান্ত, অনির্ব্বচনীয়, তত্ত্বরূপে আছেন। সেখানে কি করে তিনি শান্তত্ব প্রকাশ করেছেন ? সেখানেও ঈশিত্ব প্রকাশ করে বললেন, 'এই আমি আত্মস্থ হলাম। শিবত্ব ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করব না', এইরূপে চিত্তিশক্তিকে আপনাতে বিলীন করলেন। একই উপায়ে সত্ত্ব রজঃ তমঃ আপনাতে বিলীন করে নিলেন। সত্ত্বকে রজঃ-ক্রিয়ায় ঠেকালেন; মানে, শিব হলেন। এ হল তমঃক্রিয়া, তিনি তামসিকতায় পূর্ণ হলেন। এই জন্য উপনিষদে বলা আছে,—"তম এব ইদম্ অগ্র আসীৎ।" বাইরে থেকে দেখলে তামসী শক্তি, ভিতরে দেখলাম, এক সপ্রকাশ শিব রয়েছেন। কোন উপনিষদ্ "তেজঃ

পরস্যাং দেবতায়াম্” বলেছেন। আবার অন্য কোন উপনিষদ্ “তেজস্তমসি তমঃ পরস্যাং দেবতায়াং” বলেছেন। সত্ত্বকে রাজসিকতায় ঠেকিয়ে দেওয়া মানে, সত্ত্বেতে দাঁড়িয়ে রজঃশক্তি প্রয়োগ করলেন; সত্ত্বেতে দাঁড়িয়ে বললেন, “এইখানে, পরস্যাং দেবতায়াং, অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানে প্রবেশ করি। জ্ঞান ছাড়া আর কিছু দেখছি না, দেখছি না, দেখছি না। অন্য বস্তু নিরোধ করছি, ধ্বংস করছি।” তিনি যখন বলেন, আর বিশ্ব দেখছি না, তখন বিশ্বকে লয় করে দেন। স্বরূপ ভিন্ন আর কিছু দেখছি না, এইখানে অবস্থান করেন। অবস্থিতি এল, সব তম হয়ে গেল।

তা হলে দেখছি, এই মহাচিতিশক্তির খেলা ভিন্ন আমাতে আর কিছু ফুটছে না। এঁর দুই প্রান্ত কি অদ্ভুত! এক সীমায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নীচাদপি নীচ; অন্য সীমায় মহতের চেয়ে মহৎ; এই দুই সীমায় ইনি খেলা করছেন। আবার এই দুই সীমার মাঝেও দেবী খেলা করছেন; এর এক পাশে পূর্ণ সপ্রকাশ শিবত্ব—নমো নমো হর হর শিব শম্ভু! মানে, আমার বিশ্বকে প্রলীন করে শিবত্বে এলাম, শিব-সংস্থিতি নিলাম, এখানে রইলাম এক ঘণ্টাকাল; এ সময়ে আমার সঙ্গে কারও দেখা হবে না। এই খেলা চলছেই। যে আপনাকে এইরূপ লীলাময় দেখছে, সে আপনার লীলা মায়ের লীলা বলে দেখতে পাচ্ছে, সে মায়ের তালে তালে চলছে। এখানে ঘৃণা, ভয় বা কোন ভিন্নতা নেই। এটার নাম ঘৃণা, এটার নাম ভালবাসা, এ ভূমিতে

এরূপ কিছু গণ্য হয় না ; এখানে খালি ঢেউ গুণতে হবে, নাম-রূপের কোন দাম নেই। এই জড়ের ঢেউ তুললাম, আবার চলে গেলাম মায়ের চিন্ময়ত্বে। এই গতি বুঝতে পারছিস ? কি করছ এখন ? দিব্যি জগৎ ফুটিয়ে বসে আছি। কি রকম ভাবে ফুটিয়েছ ? সঙ্কল্প করেছি। কত ক্ষণের জন্য ? দশটা অবধি। তার পরে আবার শিবত্বে স্থিত হব। এখন তোরা জোয়ারের তৃণের মত ধড়-ফড় করছিস। তখন স্বাধীন ভাবে লীলা করবি।

এই ত দেখলি, মা-ই এই সব করছেন। তুইও ত জ্ঞানময়ী মা ? এখন এই জ্ঞান, এই জগৎ—এ ভাবে আর দেখবার প্রয়োজন আছে ? এই দুই তত্ত্ব নিয়ে যিনি অবস্থান করছেন, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তোর ভিতর অনবরত হচ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে, তুই ঘুমোলি, শিবক্ষেত্রে গেলি, কিন্তু পে'লি বিমূঢ়তা। এই হল তমে প্রবেশ। সত্ত্বে প্রবেশ হল—সবটা প্রজ্ঞানময়, যোগ-প্রদীপময়। এ না দেখলেই অন্ধকারে সব করছ ; কে জানে কালো, কে জানে সুন্দর, ভূতের মত সব ঘাড়ে এসে পড়ছে। সার্থকতা'ও ব্যর্থতা কত ক্ষুদ্র pointএ দেখতে পাচ্ছিস্ ? এই ভূমিতে, এই অনুভূতিতে এত দিন ছিলি ? এত দিন বলে কোন জিনিষ নেই। তবে জীবের কাছে আছে বটে। যার অক্রম দৃষ্টি, তার কাছে সবটাই এক ক্ষণ—এক ক্ষণে তার জীব সাজা ও ঈশ্বর সাজা সম্পাদিত হয়ে যায়।

এখন দেখছিস, জ্ঞানময়ী সঙ্কল্পময়ী তোকে ধরে বসে আছেন? আর আপনাকে দেখছিস? তোর বিশ্বকে গুটিয়ে নিয়ে মায়ে যেতে পারলি? এটা পূর্ণমাত্রায় কর, এই রাস্তাটুকু চিনে রাখ। যারা বেঁচে থাকতে থাকতে পূর্ণমাত্রায় দখল করতে পারলি না, তার জন্য তোরা দায়ী নস, ভগবান্ দায়ী, গুরু দায়ী। তোরা রাস্তাটুকু চিনে রাখ। নমস্তে নমস্তে!

"সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ। প্রয়াণ-কালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥" আমার ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি যারা দেখে নিয়েছে, মরবার সময়ে যুক্তচিত্ত তারা আমায় অবশ্যই পাবে। তোরা করবার কর্ত্তাকে চিনে তাঁর কাছে হাত জোড় কর। তোর জীবনের মুক্তির জন্য কিছু ভাবনা নেই; গুরুর বাক্যে একজন দায়িত্ববান্‌কে দেখতে পেলি, এই যথেষ্ট হল। আর উত্তম সৌভাগ্যবান্ হস ত দেহ থাকতে থাকতেই এঁকে পাবি। একবার শুনে নেওয়াও যা, একবার গয়ায় বেড়িয়ে আসাও তাই। ভগবানের রাজ্যে কিছু ভাবনা নেই। তবে যে ভগবান্‌কে বার করে দিয়ে নিজে কর্ত্তা সাজে, তার ভাবনা আছে। এ তত্ত্ব সহজ, না শক্ত? খুব সোজা নয়? আহা, তুমি থাম না; আমি সব করে কম্মে নিচ্ছি; তাই না এত কষ্ট যাড়ে এসে পড়েছে। কস্টের অনুপাতে হীরের দাম লক্ষ টাকা। জ্ঞানানুপাতে ওর কোন মূল্য আছে কি? একটু চক্‌-চক্ করে মাত্র। এ সব সহজ জ্ঞান। এ সবে দোরস্ত না হলে তত্ত্বে ঢুকবি কেমন করে? সমস্ত দিনের ছবিটা একবার

ভেবে দেখ না। কর্ত্তা সেজে কতটা ক্লেশ স্বীকার করেছিস, কতটা জীবন ক্ষয় করেছিস। এই জ্ঞানময়ীর এমন প্রভাব, ইনি এমন শক্তিময়ী যে, কেউ তা বলে শেষ করতে পারে না। এই যে উপদেশ শুনছিস, এতে কি হচ্ছে? খালি জ্ঞানভূমির খানিকটা অদল-বদল, সাজান খেঁতান হচ্ছে। বাকী সব নির্ভর করছে এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপর। "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।"

মরে কোথায় যাবি? জ্ঞান ছাড়া আর কোথাও যাবি কি? দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শুয়ে যদি কেউ ভাবে, আগুনে শুয়ে আছি, এ যেমন জ্ঞানের ব্যতিক্রম, ও-ও অর্থাৎ মৃত্যুতেও তাই। জ্ঞানের ব্যতিক্রমের দ্বারাই শক্তি জাত হয়। যে পরিমাণে বা আকারে জ্ঞানকে ব্যবহার করবি, সেই পরিমাণে ঐ জ্ঞানের counterpart শক্তি তোতে তৈরি হয়ে যাবে। এই হল সাংঘাতিক জিনিষ। এই অনুপাতে সমস্ত সৃষ্টি হবে। যে অনুপাতে সংজ্ঞা নিয়ে বসে থাকিস, সেই অনুপাতে অণু-সকল গায়ে জড়িয়ে যায়। অন্য অণুগুলো জড়ায় না। একটি রোগ তৈরি হবে, তার বীজাণু পর্য্যন্ত তোর দ্বারা এইরূপে বিধৃত হয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার এই জ্ঞানসম্পন্নতা। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অনিত্য ভৌতিক ও মর্ত্তলোকের মানুষ, গাছপালা, সমস্তই এই সংজ্ঞাত্মক জ্ঞানের বিভিন্নতা অনুসারে সৃষ্ট হয়ে যায়। যে ভাবে যে ভোক্তা হয়ে আছে, তার গায়ে সেইরূপ অণু ঘিরে আছে। শুধু ততক্ষণ সে সব অণু ক্রিয়া করে না, যতক্ষণ ইনি

না বলেন—motion হোক। সুতরাং এ কথা ভাবিস না, এই যে অনুভব করলাম, এই যে ভাবলাম, মাত্র এতেই হবে কি? একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে কত প্রচেষ্টা করতে হয়, আর এখানে একটা মন্ত্রের প্রভাবে সব হবে? হবে। সল্‌তে যেখানে বেরিয়ে আছে, সেখানে আগুনে ঠেকালেই শিখা জ্বলে উঠবে, কিন্তু পাথরে জ্বলবে না। যারা সল্‌তে দেখেছে, তারা আপনি জ্বলে উঠবে; তোর সাধনার জন্য, ভোগের জন্য, শরীরের জন্য সব কিছু এসে যাবে। যেমন-তেমন করে আসবে না; মাল-গাড়ীতে, গোরুর গাড়ীতে আসবে না; আসবে প্লাবনে, আগুনের ঝাঁকে ঝাঁকে, তাঁর ভালবাসার প্লাবনে। মা বলেছিস ত এমনি করেই সব আসবে। তা হলে মা বললেই রাজা হয়ে যাব? হয়ে যাবি যদি ঠিক করে বলতে পারিস।

ঐ সল্‌তেটি, ঐ নিজবোধটি ব্রহ্মে ঠেকা। আমি কি চাই না চাই, আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। নমস্তে! আবার যখন তত্ত্ব-সকল দেখতে পাবি, তখন আর নূতন করে কিছু পূর্ণ হবে না, সব পূর্ণ হয়েই আছে দেখবি। আমরা এখনও কালের অধীনে আছি; তাই হাজার তাড়া থাকলেও halt করতে বা থামতে হয়, মেল-ট্রেণেরও থামতে হয়। কিন্তু ঋষিদের আর বলতে তর সয় না। কার সামনে বসেছিস? মা? কে তিনি? পর? না আত্মরূপা। তিনিই বিশ্বরূপা হয়েছেন? এই শরীর, শরীরী এবং আত্মত্ব, তুই মহিমা দেখছিস? নমস্তে!

২৪এ আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার।

জীব, প্রত্যগাত্মাকে অবলম্বন করে পরমাত্মায় উপস্থিত হতে পারে। নিজবোধ ঠিক-মত প্রকাশ হলেই দেহবোধ ছেড়ে যাবে। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে ক্ষর আত্মাকে ছেড়ে অক্ষরাত্মায় যেতে হবে; আত্মা তখন বিভু হবেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানময় হবে। নিজত্ব তখন অসঙ্গত্ব প্রাপ্ত হবে। "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥" জল জলই; তাকে ঘটি থেকে পুকুরে ঢেলে দিলাম, মানে—ক্ষরাত্মাকে অক্ষরাত্মায় দিলাম।

মুক্ত পুরুষ দুই রূপে অবস্থান করেন,—১। চিন্মাত্ররূপে অবস্থান বা স্বরূপাবস্থান, ২। ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হয়ে অবস্থান। ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তৃত্বে ব্রহ্মের ন্যায় তাঁরও কর্ম্মবন্ধন আসতে পারে না। এই জন্য ভগবদ্‌যুক্ত কর্ম্মে বন্ধন নেই। ভগবান্‌কে না দেখে কর্ম্ম করলে আত্মহনন হয়। কি ভীষণ! এই নিজত্ব-নামে যে জ্ঞানবিলাস, এঁর মধ্যে অন্য কিছু পাবে না, শুধু নিজ-বোধই পাবে। অনাত্মবোধেও নিজত্ব ও পরত্ব, এই উভয় দিক্ বজায় আছে। ঈশ্বরই নিজ ও অপর, এই দুই মূর্ত্তিকে চালাচ্ছেন, দুরকম বোধ ফোটাচ্ছেন। তাই আত্মত্বকে মহিমময় বলে জানবার জন্য আত্মত্ব নিত্য ও স্থির বলে জোর দিই। প্রত্যগাত্মা বা পরাশক্তিকে জেনে, নিজবোধ যখন ভূমা হন, অর্থাৎ নিজেই সর্ব্বত্র সর্ব্বকেন্দ্রে রয়েছি বলে দেখতে পান, তখন তিনি কূটস্থ আত্মা।

২৫এ আগষ্ট, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা।

সত্ত্বসংশুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রকাশক বুদ্ধি। আমি আপনাকেই দর্শন করছি, এর নাম আত্মসংস্থ বুদ্ধি। বুদ্ধি একদিকে আত্মাকে, একদিকে জগৎকে স্পর্শ করে আছে। এই যে আত্মসংস্থ বুদ্ধি, এতেই প্রাতিভ, শ্রাবণ প্রভৃতি জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। নিজবোধ-স্বরূপ এই আমার আত্মা, এঁতেই আমার জন্ম, ইনিই আমার স্বরূপ, এঁতেই আমার অবস্থান। সত্ত্ববুদ্ধির সাম্যে সত্ত্ববিলয়—চিত্তবিলয় হয়। তখন যিনি রইলেন, তিনিই চিতিশক্তি। এই জন্য আত্মতত্ত্বই পরাশক্তি। মা বলে, মহাশক্তি বলে পরাশক্তির উপাসনা শ্রুতিসিদ্ধ।

তোর অন্য কোন পরিচয় নেই, এই 'আমি'ই তোর পরিচয়; এই 'আমি'ই তাঁর মধুবর্ষী ঈক্ষণে জাত। আত্মত্বের কিরণ যে হৃদয়, সেই হৃদয়ের বাহ্য আবরণ 'অস্মি'। 'অস্মি' মানে, রয়েছি এই জ্ঞান। এই অস্মিতানন্দই মহানন্দ, আত্মার তটস্থ লক্ষণ; এর নাম বিশোকা, জ্যোতিষ্মতী। সেই আমাকে ধারণা কর, যাঁর দ্বারা আমি বিধৃত হয়ে রয়েছি। তোদের স্বীকৃতি নেই, আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিস। জ্ঞানস্বরূপে বসবাস করছিস, এর কোন ভুল আছে? তাঁ থেকে 'অস্মি' এই জ্ঞান জাত হয়েছে।

চিন্তা করা, ভোগ করা, আর গতিময় হওয়া, এ ছাড়া আর কিছু দেখতে পারছিস? এই যে অহর্নিশি ঘুরছিস, ঠায় গতি-শীল রয়েছিস, এমন অদৃষ্ট, এর ভিতর যে সময়টা তোমা গতি-

হীন থাকিস, তা তোরা জানতে পারিস না ; আর যখনই জানতে পারলি, অমনি গতিশীল হলি। অহর্নিশ ছুটছিস, ছুটছিস— তা কি সোজা হয়ে ছুটছিস ? কখন ডাইনে, কখন বামে। গতি কি সাংঘাতিক জিনিষ! ভাবলুম, চলতে গেলে উঠতে হবে, নড়তে হবে ; সে এই ক্ষেত্রের কথা। কিন্তু আমি যে গতির কথা বলছি, কথা কয়েছিস কি সে গতি আরম্ভ হয়ে গেছে, ছুটে গেছিস সাপ, কি ব্যাঙে। গতি হল, জানতে পারলি ? সেখানে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য, ত্রিপুট হাজির হয়ে গেল, ত্রিপুট জগৎ তৈরি হয়ে গেল। যেখানে যাচ্ছ, ভূভু বঃ স্বঃ যে কথাটার পিছনে ছুটছ, সেখানে এই কাণ্ড হচ্ছে। সাপ দেখলুম, ব্যাং দেখলুম, হাতী ঘোড়া দেখলুম, এ কথার মানেও যা, সাপ হলুম, ব্যাং হলুম, হাতী ঘোড়া হলুমও তাই, প্রায় এক কথা। এত বিদ্যুদ্‌বৎ গতিশীলতা, এত চপলতা ; এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার কি উপায় আছে ? আছে, ঐ যে স্থির দিক্ রয়েছে। কার বুকে ছুটছি, এই দিকে যেমন দৃষ্টি পড়ল, তখনই বুঝলুম, স্থিরত্বেরই এক ভঙ্গিমা গতি। এ কি সাংঘাতিক! স্থির পুরুষেরই এক ভঙ্গিমা হল গতি!

বলে দিয়েছি,—রূপতত্ত্ব ; সমগ্র রূপ যেখানে নিহিত আছে, সে নিজে অরূপ ; সমগ্র রস যেখানে নিহিত আছে, সে অরস ; সমগ্র গন্ধ যেখানে নিহিত আছে, সে অগন্ধ। এইরূপ সমগ্র গতি যেখানে নিহিত আছে, সে নিজে অগতি। তোমার এই স্থির শান্ত বুকের উপর চপলা মাকে দেখতে পাব। আজ

শিব-কালী দেখব। এই চপলা, স্থির সৌদামিনীবৎ কেমন শিবের বুকের উপর বিরাজ করছেন। স্থিরনামীয় তত্ত্বের একটি ধর্ম্মবৎ এই চঞ্চলা তাঁর বুকের উপর আছেন।

বৎস! আমার শিবত্বের ভিতর আমার শক্তিত্ব আছে, সেই শক্তিত্ব দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিস? মনে করছিস, ওঁর ভিতর কোথায় আমি লুকিয়ে বসে রয়েছি; কিন্তু আমাকে, শক্তিকে না দেখে ওঁকে দেখতে পাচ্ছিস কি? এ স্বরূপটি না দেখে ও স্বরূপটি দেখতে পাস? শান্ত, পরম-শিবত্ব উপলব্ধিতে আসছে, স্থির সত্তার উপলব্ধি করছি, স্থিরে প্রবিষ্ট হয়েছি, তখন আমাকে, শক্তিকে আর দেখছিস না। আত্ম-স্বরূপটি ত তাঁরই স্বরূপ—এ আত্মস্বরূপ যখন দেখছ, তখন তাঁকেই দেখা হচ্ছে। আর যখন বলছ, 'আমি শিবমূর্ত্তি ধারণ করছি,' তখন কে শিবমূর্ত্তি ধারণ করছে? আমার আত্মত্বই ত? শক্তির দুই মূর্ত্তি—আত্মা ও অনাত্মা, পরাশক্তি ও অপরাশক্তি। পরাশক্তি যখন যে রূপ না ধরবেন, তখন সে বিশ্বের প্রকাশ নেই, রূপ নেই। মায়ের অংশস্বরূপ, অর্থাৎ অক্ষরার অংশস্বরূপ না থাকলে সে পরাশক্তি হয়ে যায় জীব, আর অংশস্বরূপ থাকলে হয় শিব। তখন শিবত্ব পরিদৃশ্যমান হয়, শিব বলে নিজেকে অনুভব করি।

যে দিকে বাক্‌প্রকাশ হচ্ছে, সেই দিকেই দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন, এই ত্রিপুট বা ত্রিভুবন রচনা হয়ে যাচ্ছে। যখন যে বাক্য উচ্চারণ করছি, যে দিকে চাচ্ছি, তার মানে, সে দিকে

পরাশক্তির ঈক্ষণই পড়ছে। এই ঈক্ষণকে ধরা বড় শক্ত। এই ঈক্ষণ থেকে তেজ, তেজ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন বা বিশ্বরচনা হচ্ছে। এ ঈক্ষণ এত দ্রুত যে, ধরার জো নেই। বীর্য্যবতী স্বাধীনা শক্তি যে দিকে যখন ঈক্ষণ করছেন, সেই দিকে জগৎরচনা হচ্ছে, আপনি জগৎধর্ত্তা হয়ে আছেন, আপনাকে জগন্ময়ী বলে দেখছেন, আপনার পায়ের তলায় অশক্ত শিবকে দেখছেন। সমস্ত বিশ্বের অণুতে অণুতে তাঁকে অর্থাৎ শিবকে ছাড়া আর কাউকে দেখছেন না; ঐ শিবকেই ভাঙ্গছেন, গড়ছেন, টুকরো করছেন, অথচ তিনি ঠিকই আছেন; এই হল ঈক্ষণ-শক্তি। এক দিকে দিক্ দেশ কাল রচনা হচ্ছে, এক দিকে কোথাও কিছু নেই, স্থির হয়ে আছেন। এ কি ব্যাপার বল্ ত? অব্যক্ত বা Negative বিশ্ব না থাকলে ব্যক্ত বা positive বিশ্ব ফুটবে না। বিশ্বের তা হলে দুই মূর্ত্তি; এক অব্যক্ত মূর্ত্তি, এক ব্যক্ত মূর্ত্তি। ব্যক্ত মূর্ত্তি বিশ্বকে দেখলেই সব বিশ্ব দেখা হল না। এই জগতের ব্যক্তমূর্ত্তি হল আছি, আছি, আছি, অব্যক্ত জগতের মূর্ত্তি নেই, নেই, নেই। 'বিশ্ব' এই শব্দটি দুটি বিশ্ব রচনা করেছে—একটি 'নেই'এর বিশ্ব, একটি 'আছি'র বিশ্ব। অব্যক্ত বিশ্ব থেকে সহস্র সহস্র ব্যক্ত বিশ্ব ফুটে ফুটে রইল, অথচ অনন্ত অব্যক্ত বিশ্ব যেমন, তেমনই রয়ে গেল। অনন্ত ফুটলেও অনন্ত অফোটা রয়ে গেল। এমন একটা ভূমি কি নেই, যেখানে বসে নড়া-চড়া না করে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখে নেওয়া যায়? চতুর্দ্দশ ভুবনের পিছনে ছুটলে কি

তার সবটা দেখা যাবে? না। দেখা যাবে, এই অব্যক্ত বিশ্ব যেখানে, সেইখানে দাঁড়ালে। ফুলের কি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। এ গন্ধ কি আমার ঘরে নেই? আছে বই কি। ঐ 'নেই'এর ঘরে আছে। ঐ 'নেই'এর ঘরে ঢুকে পড়; ঐ ঘরে বসে ক্ষণমাত্রে চতুর্দ্দশ ভুবন তৈরি করবি। ক্ষণমাত্র মানে, আমার 'ঈ'র একটি ক্ষণ। এইখানকার এক ক্ষণ মানে, এত বড় কালবিস্তার? দেবতা আমার!

কোথায় ভগবান্‌কে দেখবি, এবার বুঝতে পারলি? অনন্ত ভুবনকে মথিত করে ভুবনেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন, এটা দেখতে পাবি এইখানে। যেখানে কালের, দেশের বিস্তৃতি নেই, সেখানে ভাবের বিস্তৃতি থাকবে? পরমাত্মার বিস্তৃতি থাকবে? এখানে থাকবে হ্রীং। 'নেই'এব বিশ্বে ভাবের দুর্গা একেবারে নয়; এখানে হ্রীং fact, ত্রিকালাতীত দুর্গা, ত্রিকাল্ যার পায়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই দুর্গা। তখন বলব, "দেবি, তোকে কোথায় বনে বাদাড়ে খুঁজছিলুম?"

বাইরে শব, ভিতরে শিবমূর্ত্তি। 'নেই'এর ঘর শবমূর্ত্তি। জ্যান্তের উপাসনা করতে বেরিয়েছিলুম, আমার মৃত্যুঞ্জয় কৈ? মরবার পূর্ব্বক্ষণে সমস্ত জীবনের ঘটনা বা experience of the whole life একটা ক্ষণের ভিতর ফুটে যায়; কেন না, ওটা 'নেই'এর ঘর কিনা। এ পাশ থেকে যা বেরোবে, ব্যক্ত হৃদয়ের, ব্যক্ত বিশ্বের যিনি ভগবান্, তিনি খালি হৃদয়ের ভিতর ব্যক্ত হবেন। কিন্তু চাক্ষুষ ভগবান্ বেরোবেন 'নেই'এর ঘরে। এখানে

যেতে হলে কি কি ভাঙ্গতে হবে, এখানে যাবার কি কি বাধা? কাল, দিক্, দেশ, অস্মিতা, এই সব ঠেলে এখানে আসতে হবে। চাক্ষুষ ভগবান্ মানে, যে ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পর্য্যন্ত দেখতে পাব, যে ভগবান্ চতুর্দ্দশ করণের দ্বারা উপলব্ধ হবেন। এই করাল, মহান্, বিশ্বনাথকে দেখতে হবে, এই অব্যক্ত ভূমিকে দেখতে হবে। এখানকার ভূমি কি? 'নেই'ই এখানকার ভূমি! এই 'নেই'-ভূমিতে ভগবান্‌কে দেখতে হবে। এখানকার মাটি ফাটাতে হবে। তবেই আকাশ বিদীর্ণ করে, জল বিদীর্ণ করে এখানকার ভগবান্ বেরোবেন।

২৬এ আগষ্ট, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার।

হয় আমাতে আত্মসমর্পণ করে আমার প্রজ্ঞান গ্রহণ কর, কিম্বা আমার বিজ্ঞান নিয়ে আমায় সব সমর্পণ কর। জীবভাবে আমি তাঁর পায়ের তলায় নিজেকে ফেলছি। প্রজ্ঞান শব্দটির মানে কি? প্রকৃষ্টরূপে যাঁর জ্ঞত্ব জানা যাচ্ছে, তিনি প্রজ্ঞ। সেই প্রজ্ঞের শক্তির নাম প্রজ্ঞান। জ্ঞত্বের; পরাশক্তিত্বের উপলব্ধির নাম প্রজ্ঞা। স্বয়ংপ্রকাশের যে জ্ঞান, তাই আত্মত্বের প্রজ্ঞান। আদি প্রজ্ঞা, আদি শক্তি, পরা শক্তি, আত্মত্ব, চিতি-শক্তি, এ সব এক কথা।

অনাত্মজ্ঞানতত্ত্বে dimensions আছে, কাল আছে। তাতে dimension ও কাল গৃহীত হয়; সুতরাং আছে। কিন্তু

প্রজ্ঞানে বিন্দুমাত্র কাল ও dimension নেই; সুতরাং তিনি অব্যাহত। অবাধ বোধের নামই বিভুত্ব। আর এ ভূমির অলৌকিক জিনিষ হল, অব্যক্তত্ত্বের সান্নিধ্য গৃহীত হলেই আত্মার বহুত্ব উপলব্ধি হয়। এর .ব্যাবহারিক দিক্ অতিশয় গোপনীয়। প্রজ্ঞা অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত হলেই সে প্রজ্ঞা বহু হবে। উদাহরণ—তুমি নিজবোধসম্পন্ন পুরুষ এবং পরমাত্মাও তাই। তোমার এই নিজবোধ কি বিভু? তুমি কি নিজেকে বিভু বলে বোধ করছ? জীবভাবে তুমি যতটুকুতে আছ বলে বোধ করছ, সে এই শরীর। এর বাইরে আর বিভুত্ব পাচ্ছ না। আচ্ছা, আরও দেখ, এই গোটা শরীরে কি তুমি আছ? মাথায় থাক ত পায়ে নেই, পায়ে থাক ত বুকে নেই। তুমি বলবে, জড়ে না হলেও ভাবরাজ্যে আমি সর্ব্বত্র আছি। কোথায়? রসে আছ ত রূপে নেই, রূপে আছ ত গন্ধে নেই; সর্ব্বদা খণ্ডিত। সুতরাং তুমি কিসের দ্বারা ব্যাপ্ত? আত্মহীনতা দ্বারা। হত আত্মা, চারি দিক্ থেকে কাটা, অন্ধকারে ঢাকা, বিভু তুমি, পরমেশ্বরের অংশ তুমি কিসে বেষ্টিত? আত্মহীনতায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু, পশু পক্ষী, যার যতটুকু গণ্ডী, তাতেই সে সে বেষ্টিত। একখানা কাপড়কে গুটিয়ে এইটুকু করে দেখাচ্ছি। এ আত্মহীনতা তোমার পিছনে নেই? যেখানে যেখানে আত্মপ্রকাশ, যেখানে অব্যক্তের প্রকাশ, সেইখানে আত্মা এইরূপে খণ্ডিত। অব্যক্তের গর্ভস্থ এই আত্মা দাবী করছে, এ অংশটা আর সে দেখবে না। এই পর্য্যন্ত পাওয়া যার লক্ষ্য, সে কি দেখবে? জ্ঞানস্বরূপ

পরমতত্ত্বের দুই মূর্ত্তি আছে, একটি আত্মহীনতা, আর এক আত্মসম্পন্নতা। এই আত্মহীনতা জিনিষটা কি? আত্মহীনতা আর তমঃ এক জিনিষ নয়।

কৃষ্ণবর্ণ দুরকম—এক, তামসিকতা, অসহ্য ঘন কালো, জ্যোতির্ব্বহির্ভূত, আবার অব্যক্ততাও কৃষ্ণ অর্থাৎ অবর্ণ। অবর্ণতার কালো আর কৃষ্ণবর্ণতার কালোতে অতিশয় পার্থক্য। কৃষ্ণবর্ণতার কালো আচ্ছন্নতা ও নিদ্রা এনে দেয়। কাণাও বলে, অন্ধকার দেখছি। অবর্ণ ও তামসিকতা, এ দুই কোন্ তত্ত্ব? সমস্ত যেখানে 'নাস্তি' হয়ে গেছে, সমগ্র তত্ত্ব যেখানে অরূপ হয়ে গেছে। এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা, ইনিই অবর্ণ বা অব্যক্ত। আর অন্যটা, বাইরের স্থূল কৃষ্ণতা, সে হল গাঢ় তামসিকতা।

আত্মহীনতা, অনাত্মত্ব একটা তামসিক ব্যাপার নয়, তমঃ নয়; যেমন বাক্ আর বাক্য এক নয়, তেমনি। অব্যক্ততত্ত্ব ও তমস্তত্ত্ব, এ দুয়ের তফাৎ বুঝলে? যেখানে নির্দ্দিষ্টভাবে আত্মবোধ ফুটবে, আত্মহীনতার জাল তাতে ফেলতে হবে। আত্মা যখন নির্দ্দিষ্টতা গ্রহণ করলেন, তখন অব্যক্ত তাঁর সীমা রচনা করলেন। অব্যক্ত দ্বারা মণ্ডিত না থাকলে আত্মা নির্দ্দিষ্ট হয় না। সীমাময় হয়েছে, নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, চৌহদ্দি বর্ণিত হয়েছে, এ একই কথা। অব্যক্ত-প্রকাশ ও আত্মপ্রকাশ যুগপৎ ফুটবে। আত্মপ্রকাশ মানেই হল বহুত্বের প্রকাশ। ভগবৎতত্ত্বের এই দুই প্রকাশ দেখলে বলব, দুটি তত্ত্ব আছে—অব্যক্ততত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব।

এই অব্যক্তকে চিনলে চতুর্বিবংশতি-তত্ত্বজ্ঞান হল, এবং পুরুষতত্ত্ব দেখলে পরমপুরুষকে দেখা হল। তাঁকে আমরা এই দুরকমে উপলব্ধি করছি, তাঁর দুই মূর্ত্তি। আলো সংহরণ করা অব্যক্ত, আর ফুঁ দিয়ে নেবান তামস। অব্যক্তত্ত্বের সাক্ষিত্ব আছে। অব্যক্তকে একটা অবস্থা বলে শঙ্কর বলেছেন, কিন্তু তা নয়; এ একটা পরমতত্ত্বভূমি। তামসিকতায় সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। অব্যক্তত্ত্বে প্রবিষ্ট হলে যোগনিদ্রা হবে।

অব্যক্তের ভিতরেও একটা সার্থকতার স্পর্শ পাচ্ছ? অশব্দ অস্পর্শ ইত্যাদি কূটস্থ আত্মার ঘর। এ ঘর পার হলে আব অব্যক্তত্ত্ব নেই। এর পরে যিনি, তিনি অনির্ব্বচনীয়—ব্যক্ত ও অব্যক্ত, দুই-ই যাঁর রূপ। এঁর নাম পবমা ঈশ্বরী, পরমেশ্বরেব আদিতত্ত্ব, চেতোমুখ, আনন্দভুক্। চেতোমুখ মানে, সার্ব্বজ্ঞ্য গজগজ করছে।

অব্যক্তের দ্বারা বিভুত্ব আচ্ছাদিত না থাকলে তিনি অনু-প্রবিষ্ট হতে পারতেন না। এই নিজবোধ এমন ভাবে আছেন যে, নিজে নিজেকে জানছি, এ শব্দও ব্যবহার করতে হচ্ছে না; সেখানে কোন ব্যাপ্তি, ধর্ম্মগত কোন পরিচয় দেবার জো নেই। এ কি শক্তি? যদি চেতনকে মান, তা হলে তিনি আপনাকে স্বতঃসিদ্ধভাবে জানছেন, যেমন আলো জ্বলছেই; তিনি তেমনি আপনাকে জানছেনই, নিজের দ্বারাই নিজেকে জানছেন; সেই শক্তি যাঁর ভিতরে আছে, তাঁর নাম চেতনা। নিজেই নিজের শক্তি—"স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো যদি বা ন মহিম্নীতি।"

শক্তি বলতে ইচ্ছা কর বল, না বলতে ইচ্ছা কর, না বল। এই বলার নাম আত্মত্বের প্রকাশ। নিজের দ্বারা নিজেকে জানছি, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। তুমি নিজত্বের দ্বারা এই ঘরটাকে দেখছ; কিন্তু অনুভব করছ, যেন চোখ দেখছে। সেই জন্য এই অভ্যাসটা থাকা দরকার যে, নিজেই সব দেখছি, নিজেই সব শুনছি, নিজেই সমস্তের মন্তা বোদ্ধা ইত্যাদি। আর একদিকে নিজেই আত্মত্বের দ্রষ্টা, এক দিকে নিজে নিজের দ্রষ্টা, আর এক দিকে নিজে সর্ব্বের দ্রষ্টা। এই দুই ধর্ম্মই তোমার ভিতর রয়েছে; কিন্তু তুমি তা দেখছ না বা দেখতে অভ্যাস করছ না। নিজেই নিজের রাস্তা, নিজেই তাতে চলেছি? আর কেউ নেই, আর কেউ নেই, আর কেউ নেই। এ কথা কে বলছেন? নিজের কালীমূর্ত্তি বলছেন। উনিই অব্যক্ত, উনিই আমার অন্য সমস্ত সংহরণ করে নিয়েছেন। এই শক্তিত্বের দিকে দেখ, 'কেউ নেই, কেউ নেই' বলবে! আবার শিবের বুকে দেখ, কেউ নেই বা কেউ আছে, কিছুই বলবে না। এইখানে শিবের বুকে কালী; তাঁর পূজা কর্। এই রকমে দৌড়ে' নিজত্বের হাত-'পাগুলো ছাড়িয়ে নে। সব বন্ধ হয়ে গেছে। এই শক্তি নিজেকে অব্যক্ত রেখে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ফুটিয়েছেন। এক দিকে ঢাকা দিয়ে আর এক দিকে ফুটিয়েছেন। ইনি শিবকে পেটের ভিতর পূরে এই বিমর্ষ তামসী জগন্মূর্ত্তি ধরেন। জ্ঞানীরা এই তামসী জগন্মূর্ত্তিকে অন্ধকার বলে দেখছেন, অজ্ঞানীরা একে

উজ্জ্বল দেখছে। নিজজ্ঞান অব্যক্ত থেকে বিশ্বজ্ঞান ফুটছে। এই ব্যক্তের পিছনে অব্যক্ত বলে একটি জিনিষ রয়েছে, এখন তা জ্ঞানে আসছে? যে ভাবে অব্যক্তের বর্ণনা করেছি, তা থেকে আর কি মনে হচ্ছে যে, কালিকা দেবীর যে নামকরণ ও রূপ-বর্ণনা করা হয়েছে, তা কাল্পনিক?

তা হলে অব্যক্ত বলতে একটা সার্থকতা এখন অনুভব করছ? এ শূন্যতার ভাব নয়? ঐখান থেকেই আমি বেরিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছি। এ কে করলে? কালী করলেন, না শিব করলেন? আত্মাই আত্মশক্তি; একজনেরই দুই রূপ। তলায় ভগবতীর স্বীকৃতি থাকলেই হবে। "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" প্রকৃতি করলেন, কি পুরুষ করলেন, সে ভেদজ্ঞান তখন হবে না।

তিন শক্তি ভগবৎকৃপায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন,—দেবশক্তি, পিতৃশক্তি, ঋষিশক্তি। শ্রাদ্ধের মন্ত্রে আছে,—"দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।" দেবঋণ, পিতৃঋণ শোধ করা যায়; কিন্তু ঋষিঋণ শোধ করা বড় কঠিন। আত্ম-জ্ঞান লাভের পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তবে ঋষিঋণ শোধ হবে। এই যে তোদের কালীতত্ত্ব বোঝাচ্ছি, এর দেনা শুধতে পারবি? কত বড় ভুল ধারণা ভাঙ্গছি দেখ। আর একদিকে যারা দেবতত্ত্ব মানে না, তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেবতত্ত্ব ছাড়া ব্রহ্মতত্ত্বে যাওয়া যায় না। হিসাব করে কথা কইবি, টক্ করে একটা পয়সার মত

একটা কথা ছাড়বি না। কালী মানে,—অব্যক্ততত্ত্ব ; যাঁর দ্বারা কৈবল্য প্রকাশ হয়। কালী কৈবল্যদায়িনী।

মনের আয়তন মন, প্রতিষ্ঠা আকাশ। এই যে আমাতে ক্রমাগত প্রাণময়, মনোময় ও বাঙ্ময় বিশ্ব রচিত হচ্ছে, সে এই প্রজ্ঞাকাশ। কথায় যে জ্ঞানায়তন রচিত হল, ওর প্রতিষ্ঠা এই জ্ঞানাকাশ। চিন্তা ও অনুভূতিতে আমি এই জ্ঞানাকাশ ছাড়া আর ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অব্যক্তের উপর হৃদয়, তার উপর অস্মিতা। হৃদয়ের রং নীলবর্ণ। 'অস্মি', 'এই আমি রয়েছি রে!' এই একান্ত সুস্পষ্ট realised বোধ পাস? তার তলায় আকাশ, না নিজবোধ? আকাশ মানে দহরাকাশ; আর তার ধর্ম্ম নিজবোধ। পূর্ণমাত্রায় চিন্ময়তা, সপ্রকাশত্ব, সুপরিস্ফুট ভাবে দেখা যাচ্ছে, না অস্পষ্ট ভাবে? এখন তোদের যা আসে, সে অত্যন্ত insignificant বা অস্পষ্ট ভাবে। কারণ, ওখানে ভাল ভাবে প্রকাশ হলেই অক্ষরত্ব এসে যাবে; তাই এখন তোদের কাছে অচেতন আকাশের সঙ্গে এঁর বেশী সাদৃশ্য থাকে। কেন বল ত? ঐ অব্যক্ত-তত্ত্ব রয়েছেন—পূর্ণ অস্মিবোধ আর ঐ আকাশ, এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যেও। পরদা ফুঁড়ে অস্মিতার আলো বেরোচ্ছে।

২৯এ আগষ্ট, ১৯৩৭, রবিবার, জন্মাষ্টমী।

স্থূল বিশ্বরূপে পরিচিত এই যে জগৎ আমার চোখে ভাসছে, আমার শরীর এরই একটা অংশ ত? কিন্তু এই শরীরের সঙ্গেই আমার আপন-সম্বন্ধ; তার কারণ, শরীরকে আত্মসংযুক্ত দেখছি; কিন্তু বাইরের জগতে তা দেখছি না। সুতরাং পরম সত্তা যিনি, তাঁকে এই একটা মাত্র অংশে চেতন বলে অনুভব করছি। এর ফল কি হয়েছে? নিত্য, অপরিমেয়, চেতনস্বরূপ পরমতত্ত্ব যিনি, কি জানি, কেমন করে তিনি এক জায়গায় খণ্ডিত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন, অন্য জায়গায় তাঁকে দেখতেই পাচ্ছি না। এখানে তিনি রয়েছেন খণ্ডিত ভাবে, চারি দিকে একেবারেই নেই। নিজবোধের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সত্তাতে এই ব্যাপারটি ঘটে বসে আছে। আর শুধু তাই নয়, সেই যে শিবস্বরূপ পরমতত্ত্ব, যিনি নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফুটিয়ে রেখেছেন, তিনি এখানে নিজেকে স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান দেখতে পাচ্ছেন না। যতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে, সেও যে দেবী এই ভাবে এঁকে খণ্ডিত করেছেন, তাঁর দ্বারা, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই সব তত্ত্বের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে। করালী দেবী ওঁকে আপনার রূপ, রস, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বৈচিত্র্য দিয়ে একেবারে গিলে রেখেছেন। আদ্যাশক্তি এঁকে নিজের নানা শক্তিগুলো ভোগ করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন। এই শক্তি এমনি করে 'অস্মি' আদি মূর্ত্তি ধরে তোকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে, পূর্ণব্রহ্ম যিনি, তাঁকে ঢেকে রেখে দিয়েছেন, যে

অভিমানটি তোকে খাওয়াচ্ছেন, তার বাইরে আর কিছু বলতে দিচ্ছেন না, 'সরলা', 'সতীশচন্দ্র সেন', এই মাত্র বলতে দিচ্ছেন; বাইরে যে এত বড় বিশ্ব, তা ভোগ করতে দিচ্ছেন না, তোকে অনুপ্রবিষ্ট করে নিয়েছেন। তোকে দেখান, শোনান, খাওয়ান প্রভৃতিরূপে নিজের শক্তিগুলো ভোগ করাচ্ছেন। যে তোকে এইরূপ টুকরো করেছে, তাকে দেখতে পাচ্ছিস ?

এই দেবীর প্রধান ভাব অব্যক্ত; তোকে অর্থাৎ আত্মাকে ইনিই অব্যক্ত করেছেন, তাই এঁকে বললাম, অব্যক্তা দেবী। যে সুখ দেয়, আদর দেয়, তাকে তোরা বলিস—সুখময়, আদরময়। ইনিও অব্যক্ত থেকে একটু একটু ব্যক্ত করে তোদের খাওয়াচ্ছেন। এই হল আদ্যাশক্তির মাতৃত্ব, ভোগদাত্রীত্ব, মায়ের মত একটু একটু করে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে তাঁর রূপ-বৈচিত্র্য দেখান, আমাকে টুকরো করা, এতে তাঁব কি প্রয়োজন, কি উদ্দেশ্য ? লীলাবিলাস। মাত্র তাই নয়। তাঁর ব্রহ্মত্ব তিনি দুই ভাগে ভোগ করতে চান। এক সমগ্র-ভাবে, এক অণুতে অণুতে। এই দুই ভাগে ব্রহ্মত্ব ভোগের জন্য তাঁর এই লীলা হচ্ছে। যখন আত্মজ্ঞানের, আত্মতত্ত্বের উদয় হয়, তখন প্রতি অণুতে প্রতি ক্ষুদ্র আত্মা আপনাকে ব্রহ্ম বলে পরিচয় দিতে সক্ষম। এই দেবী যতক্ষণ না আত্মতত্ত্বে বিলীন হবেন, ততক্ষণ ব্রহ্মত্ব ফিরে পাবি ? এ মহাদেবী আর কেউ নন, এই আত্ম-তত্ত্বেরই একটি রূপ বা এক মহিমা। এর মানে, শিব-শক্তির একীকরণ। অব্যক্ত আত্মা ও অব্যক্ত শক্তি, এ দুইয়ের দ্বারা

এই বিশ্ব-প্রকাশ হয়েছে। আমি সর্ব্বদা আহারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই আহার বাইরে থেকে আসছে, অব্যক্ত থেকে আসছে, আমি যেথা নেই, সেখান থেকে আসছে ; ব্যক্ত হলেও সে সব আমার পক্ষে অব্যক্ত। অব্যক্ত জ্ঞ-তত্ত্ব, অব্যক্ত অন-তত্ত্ব, এই দুয়ে একীভূত হবে। একবার শিব-শক্তিরূপ প্রচণ্ড ভেদ দেখিয়ে দিলেন, অনন্ত বিশ্ব রচনা করলেন ; আবার মিলিত হয়ে গেলেন। এর মানে ? এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কি মহিমা লুকান আছে, সেথায় কত কি আছে, কিছু জাননি,—তোমায় যে ভাবে তাঁ থেকে টুকরো করা হয়েছে, তাও জাননি, এই মা একমাত্র আশ্রয় হয়ে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন, টুকরো আত্মা থেকে এটা দেখনি। এখন যত দেখতে লাগলে, তত অবাক্ হতে লাগলে। তখন স্বস্থ, নিজত্বে ফেরবার জন্য লাফালাফি করলে। তখন দেবী বললেন,—"আমি আর কেউ নয়—তুই-ই !" এই আত্মমহিমা দেখতে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। এখন তোকে টুকরো করে আজকের যোগ্য আহার দিচ্ছেন ; বার্লি দিয়ে ছেলে মানুষ করে, পরে পূরো ভোগ দেবেন।

অব্যক্ততত্ত্ব ভাল করে দেখতে পেলি ? এ নিয়ে এত কথা কেন বলছি ? সমগ্র বীজ—মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি সকল তত্ত্বের বীজ ঐখানে নিহিত বলে। "শক্তিযুক্তো ভবেৎ শিবঃ।" ইনি 'শিব' বলে না উঠ্‌লে কোন মূল্য নেই। কে বলছে ? এই মা বলছেন ? আমি বলা মানে, মায়েরই বলা। অস্মি কে ? ঐ 'অমা' আমাকে যতটুকু ভোগ করতে দিয়েছেন,

সেই 'অস্মি'-ভোগী 'আমি'। 'অস্মি' বলে পরিচয় দিচ্ছেন মহদ্‌ব্রহ্ম, কিন্তু তোকে খেতে দিচ্ছেন—'অহং সরলাস্মি।' ঐ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র একটি অংশ 'অহং সরলাস্মি' বলছে। কে বলছে? ঐ দেবীই। যিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি'তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উপলব্ধি করছেন, তিনিই আবার যেখানে বলছেন 'সরলাস্মি', 'বৃক্ষোঽস্মি', সেখানে তারা তাই বলছে। মাথায় জ্ঞানভূমিতে বলছি 'অহং ব্রহ্মাস্মি', বুকে ভোগ-ভূমিতে বলছি 'অহং সরলাস্মি', এ উভয় একই জন। তিনি কথা কন? কথাবার্ত্তা সব ত ওঁরই রে! আমরা আত্মত্ব, অচেতন-ফচেতন কত কি শিখেছি! কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সমগ্র আত্মত্ব তাঁরই। সুতরাং এই বিশ্ব যে জাগ্রত স্বয়ং পরমাত্মাই রে!—মহদ্‌ব্রহ্ম! কিন্তু আমি 'সতীশ', আমি 'সরলা' এ কথা তিনিই বলছেন। যেমনই এই ভোগ শেষ হবে, অমনি 'সরলাত্ব', 'বিজয়ত্ব', 'ঘোড়াত্ব', 'বৃক্ষত্ব', সবই শেষ হবে। একজন খালি থাকবেন—পরমাত্মা; একজন নিত্য-জাগ্রত, নিত্য-সচেতন, গতিশীল অথচ গতিহীন। আর কাউকে কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস? এক চেতনস্বরূপেরই, একজনেরই দুই রূপ; এক, এই ভোক্তাস্বরূপ মহিমা, আর এক স্বরূপ—দাতৃত্বস্বরূপ।

লক্ষ্য রাখলে দেখবি—এক জ্ঞাননামীয় পরমতত্ত্ব আত্মত্ব ও অনাত্মত্ব, দুটি রূপ প্রকাশ করে রয়েছেন। তিনি দুই রূপ প্রকাশ করে রয়েছেন—আত্মত্ব অনাত্মত্ব, চেতনত্ব অচেতনত্ব, দুঁই রকম মহিম-জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং এ বিশ্বরূপের কারণ, এ

বিশ্বপ্রকাশের কারণ, ধর্ত্তা ও পাতা এই জ্ঞানস্বরূপই, এই প্রকাশ-স্বরূপই (ব্রহ্মের প্রথম পাদ প্রকাশ)—এইরূপ দর্শনের নাম হল তাঁকে দেখা, তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। তিনি নিত্যই ঘরে ঘরে জন্মান, নিত্যই গুরুর কাজ করেন, আলো দেন। হিঙ্গুলেশ্বরীর মত যে দিন যে তাঁকে চেনে, সেই দিন সে উৎসব করে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের বিভাগ যখন বিশেষরূপে হয়ে গিয়েছিল, তখনই উভয়ের সমন্বয়ের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। উপনিষদ্ দোহন করে গীতায় তিনি সে সমন্বয় দেখিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে গুরু বলে পূজা করাই আজ প্রধান জিনিষ। জ্ঞানকর্ম্ম-সমন্বয় যে অপৌরুষেয় জিনিষ, তর্কসর্ব্বস্ব তথাকথিত পণ্ডিতদের মুখে থাপ্পড় দিয়ে তা তিনি বুঝিয়েছেন। কিন্তু সেই জ্ঞানস্বরূপই তোর বুকেও একদিন ফুটবেন এবং সেই দিনই তোর বুকে কৃষ্ণেরও প্রকাশ হবে।

তোরা জগতের সর্ব্বত্র এই দুর্ব্বলতা দেখতে পাবি যে, জ্ঞানে ঝোঁক দিলে কর্ম্ম ডুবে যায়, কর্ম্মে জোর দিলে জ্ঞান ডুবে যায়। তাঁর আত্মস্বরূপতা ও শক্তিস্বরূপতা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। যে অংশে তিনি জানেন, তার নাম দিলুম চেতনা, আর যে অংশে করেন, তার নাম দিলুম শক্তি। কর্ম্মার মধ্যে দুইটি ব্যাপার—বিভাগ ও ভোগ। আলো ও তাপ এক কথা। কিন্তু আলাদা করে দেখলে দুটোয় একেবারে স্বাতন্ত্র্য এসে গেল। আসলে কিন্তু এক। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বত্র সমভাবে সপ্রকাশ রয়েছেন; তাঁতেই শক্তিত্বের ও নিজত্বের দুরকম ভোগ চলছে;

জিনিষ কিন্তু একই। তোরা তাঁকে তরমুজ-কাটা করিসনে। ছোলার দুটুকরো ইত্যাদি শব্দার্থ নিয়ে তাঁকে দেখিসনে। যেমন তোকে দেখলে কি দুজন মনে হয়? পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তিময় একজনের একত্বেরই দর্শন হয়। আমি যখন 'জ্ঞানময়ী' বলে দেখি—কাকে? এই যে রে! হাঁ করে কোথায় ভগবান্ দেখতে যাস? তোর এখন শরীর-বোধ আছে? জ্ঞানস্বরূপ এখানে বসে আছেন? একেবারে 'ইনি' সেজে বসতে পারছিসনে? ইনিই ভগবতী ত? এঁতে কি কি মহিমা আছে? এক আত্মমহিমা, এক অনাত্মমহিমা। এখানেও আছেন, ওখানেও আছেন; এইরূপ যে দেবী, তাঁকে দেখছি। দেখা কখন্ সার্থক হবে? যখন হৃদয়ের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ-রূপে ব্যবহারশীল হবি। ভগবতি! আহাহা! ভগবতী আমার সর্ব্বস্বের দাতা। তুমি নিজে মহান্ হয়ে আমাদের ছোট করে দিচ্ছ, এই টুকটুক্ করে কেটে দিচ্ছ। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে এই বোধটি যত জাগ্রত হবে, তত অনুভূতি আসবে। হৃদয় যেখানে দান করেছ, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেছ কি না দেখ। সেই জন্য স্থির সিদ্ধান্ত করেছি, হৃদয়ের, বুকের উপর যে খেলা, সেও হৃদয়ই। হৃদয় দিলাম, আমি গেলাম না, তা হয় না। জ্ঞানময়ীর ত্রিধা মূর্ত্তি—তিনি পর সাজেন, আপন সাজেন, একেবারে আত্মভূত হন। এই তিন সীমা যে ভেদ করবে, সে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করবে। ১। একেবারে আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আপনার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে, অব্যক্ত থেকে আসা।

২। একেবারে আপনার। তাঁকে হৃদয় দিয়ে ফেলায় আমি তাঁর, তিনি আমার। ৩। একেবারে আমি; ইহাই হৃদয়-দানের পরাকাষ্ঠা। এই শক্তি যে আয়ত্ত করবে, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করবে। এই যে পর, এই যে আপনার, এই যে আপনিই হয়ে গেলাম, এই তিন খেলা যদি খেলাতে পারিস, তবে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হয়ে গেল।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার।

আমরা হৃদয়েই সমস্ত ভোগ করি। যে স্থান থেকে অস্মি ও পঞ্চ তন্মাত্রা সব জাত, চিন্ময়ীর সেই অংশই হৃদয়; তাই নিয়ে আমরা খেলা করি। সেই হৃদয়ময়ী মা, যাঁর বীজ হ্রীং, তাঁকে আমরা বাইরে দেখতে চাই। আমি বাহিরের রূপ রস নিয়ে আছি, পেছনে তিনি আছেন; এতে আমি তৃপ্ত না হয়ে মাকে বললাম,—"আমি তোমায় সামনে দেখব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে সুনির্দ্দিষ্টভাবে এখানে তোমায় দেখব।" আরও বললাম,—"হে দেবি, আমি আছি, তার মূলে তুমি আছ; আমি সেই জন্য সামনে তোমাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে দেখতে চাই।" আমার আহ্বানে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে পেছন থেকে আসবেন। বাহির-জ্ঞানে ছিলাম, তা থেকে অস্মিজ্ঞানে ফিরছি মানে, অন্তরে ফিরছি।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অগ্নি, জল, আকাশ, অস্মি জ্ঞানের উপর এই সব স্তরে স্তরে সাজান আছে। হৃদয়ে যা কিছু জাত হয়েছে

এবং সামনে রয়েছে, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি ও তৎগ্রহণের উপযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি, এ সবের ভিতর দিয়ে তিনি বুকভরা ভালবাসা নিয়ে আসবেন। বিষয়কে গ্রহণ করি মানে, ব্যক্তের দিক্ থেকে নিজের ভিতরে অন্তঃস্থ করে নিই। কথা কওয়া মানে—ভিতর থেকে তিনি বাইরে আসছেন। তিনি আসছেন অব্যক্তভূমি পার হয়ে, আমার অস্মিতার ভিতর দিয়ে।

তিনি যখন পিছন থেকে সামনে আসবেন, সেই গতি-ভঙ্গিমায় আমি পর পর দেখতে পাব,—১। পিছনে আমার দিকে চেয়ে আছেন। ২। আমাতে মিলে গেলেন। ৩। আমার দিকে সামনে ফিরে দাঁড়ালেন। কোন্‌খানে ফিরলেন? অস্মিতায় এসে। ফিরলেন—গতিটা intersected হল—আবার গতিটা পিছনে গেল ; এতে কি চেহারা হল ?—শিবের ডমরু হল।

অস্মিতা নিজেকে দুর্গা বললে। দুর্গা কোথায় আছেন? পিছনে। তৎসংজ্ঞা অর্থাৎ দুর্গা-সংজ্ঞাত্মক জ্ঞান হল। ডম হল, রব হল, আমি দুর্গা হয়ে গেলাম। ঐ দুর্গাসংজ্ঞাময় যিনি, তিনি বেরোচ্ছেন ; তিনি ফিরে দাঁড়াবেন। অস্মিতত্ত্ব থেকে ইন্দ্রিয়গুলি অমনি দুর্গাময় হয়ে প্রসৃত হবে। দুর্গাময় ইন্দ্রিয় থেকে দেবীর ব্যক্ততা ও স্থূলত্ব আসবে। আমার ইন্দ্রিয়ে গৃহীত হয় বলে এই বিশ্ব ব্যক্ত বিশ্ব। ইন্দ্রিয়গুলি ও তা থেকে ব্যক্ত বিশ্ব তখন অস্মিতা থেকে আসবে। তোমার বাড়ী, ছেলে ইত্যাদি পিছন থেকে বেরুল, তার পর সামনে এল। এদের ব্যক্ত হওয়া, রূপময় হওয়া, ইন্দ্রিয়ময় হওয়া, এ সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পর্য্যন্ত না ঢুকলে

সেই সেই তত্ত্বের পূর্ণ ক্রিয়া হবে না। জ্ঞানতত্ত্বে ভিতর-বাহির নাই। তুমি দেহী, তাই মাকে তোমার ইন্দ্রিয়ময় করতে হবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে হবে। দুর্গা বললে তোমার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-যোগ্য হয়ে দুর্গা আসবেন। তোমার চক্ষু যদি পীতবর্ণ না দেখে, তবে দুর্গার পীতবর্ণ বেরোবে না। তোমার চক্ষু পীতবর্ণ দেখলে, তবে দুর্গা পীতবর্ণ হবেন। বাক্যের দ্বারা দুর্গার দশ হাত তৈরি করেছ; তখন তাঁকে তোমাব অভিমুখে ফিরতে হবে। তোমার ইন্দ্রিয় তাঁকে যে ভাবে বেঁধে বেখেছে, তিনি সেই মত হবেন। ইন্দ্রিয়ময়ী হয়ে তিনি যে সংজ্ঞা ও রূপ নেবেন, নিজবোধ যদি ডমরু ধরে থাকে অর্থাৎ তাঁকে যদি ঠায় দেখতে থাকে, তা হলে সে তার পিছনে রূপময়ী মাকে দেখবে। তোর পিছনে তিনি আছেন; কারণ, তুই বহির্ম্মুখ; তাঁর নাম সম্মুখ, সুতরাং বাহির হবে তাঁর পিছন। বাহ্য বিশ্বে দেখা মানে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে দেখা। তোমার হৃদয়ের পিছনে মা হৃদয়ময়ী হয়ে রয়েছেন। তোমার হৃদয়ের অনন্ত রূপ। "মা, তোমার জ্ঞানস্বরূপ যে এক বর্ণ, তা দেখে খুসী হতে পারছি না। আমাদেব মত রূপময়ী হয়ে দেখা দাও।" 'এহি' বলে আবাহন করলি। যে মূল ভূমি পর্য্যন্ত তোর অস্মিতা, সেখানে তোর বাহ্য বিশ্ব নাই; সেখানে তুই বিন্দুমাত্র হয়ে রয়েছিস। তিনি সেই বিন্দুতে এলেন, তুই প্লাবিত হলি। দুর্গা বলা মাত্র তোর সব দুর্গায় ভর্ত্তি হয়ে গেল, ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে মর্ত্তে নামিয়েছিল, সেইরূপ। মর্ত্তে নামান আর ইন্দ্রিয়াদিতে নামান এক কথা। অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত বিশ্ব

ফুটতে গেলে এই law of intersection বা এই বিজ্ঞান তিনি প্রকাশিত করেন।

আমি এই চেহারা ধরেছি, আর যিনি জ্ঞানময়ী, তিনি ধরেননি, তা হয় না। তুমি মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছ, মানেই প্রজ্ঞাদেবী মানুষের মত হয়েছেন। তোমার এমন হয়ে থাকা মানে, তাঁরই থাকা। তোমায় গঠন দিতে স্বয়ং মহাদেবী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তিকে পরিচালিত করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ ধরে আছেন। আমার কথা দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন।—'দেবি! তুমি এস। আমার সুখ ইন্দ্রিয়ে; সুতরাং তুমি আমার ইন্দ্রিয়ে এস। তোমার ভিতরেই কৈলাস বৈকুণ্ঠ সব আছে; সেখান থেকেই তুমি এস।' অব্যক্ত থেকে যা কিছু আসে, সে সব ব্যক্ত হলেই সামনে আসে। ব্যক্তাব্যক্ত খেলার ঈক্ষণ-মূলে যিনি আছেন, তাঁকে মানুষের মত করে দেখতে চাই। ডমরু না চিনলে শিবকে চিনবে না। শিবের বর্ণ সাদা, তিনি বিরূপাক্ষ, ফণিভূষণ, বাঘাম্বর, ডমরুহস্ত, এ সকলের বিজ্ঞান অসাধারণ।

আমার কাছে ভজহরি হলে চলবে না। বিজ্ঞানময় হতে হবে। কত বড় বিজ্ঞান—জড়ের সঙ্গে চেতনের সম্পর্ক ও সংযোগ, এই law of intersectionএ আছে। 'গিরি-কাননাদীন্ প্রচালয়েৎ'; চেতনাবান্ দেবতা আসবে, সে আর বেশী কথা কি? জড়ত্ব হল চেতনার একটা স্থূল মূর্ত্তি, এ না দেখলে বিশ্বময় মাকে দেখতে পাবে না। বললেও সে শুধু কথার কথা হবে। সুতরাং এ বিজ্ঞান না জানলে কিছু হল না।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার।

আমিত্বের বহির্ভূত যে দৃশ্য, সে মনের ক্রিয়া। অন্তরে জ্ঞানময়ত্ব—জ্ঞানঘনত্ব। তিনি অসঙ্গরূপে ধর্ত্তা, ঈশ্বররূপে নিয়ন্তা, ভোগী আত্মারূপে ভোক্তা। অস্মিতা পঞ্চমুখ হয়ে বেরোয়। আমি যখন বহির্ম্মুখী, বাইরের দিকে চাই, তখন এদিকে দৃষ্টি থাকে না। আমি বা অহং একটি অভিমান; অভিমন্যতে, যে ভাবে তিনি আপনাকে বিবেচনা করছেন, তাই অভিমান। অভিমান অংশে তিনি খণ্ডভাবে ভোগ করেন। চেতনার অভিমান তখনই হয়, যখন একটা বাঁধা মূর্ত্তিতে তিনি নিজেকে identify করে রাখেন, তার ভিতরে ক্ষর আত্মা হয়ে থাকেন। ক্ষর অভিমানী ব্যথায় জ্বলে যায়, অক্ষর সেই ব্যথায় নির্লিপ্ত থাকেন, ঈশ্বর উভয়কে নিয়ন্ত্রণ কবেন। এঁর এই তিন রূপ। এই ত্রিশক্তি সমেত আত্মত্ব জিনিষটি আমারই ভিতরে, ইহা যতক্ষণ না ফুটে ওঠে, ততক্ষণ আমার ভগবান্ বলা, আত্মা বলা, পূর্ণ সার্থকতা দেয় না।

তাঁকে স্ত্রী, পুত্র, বিপুলা, যা বলব, তিনি তাই হয়ে আমার ভিতর ঢুকে পড়বেন। আমার আসলে চাই, অচ্যুতভাবে, ক্ষরণ-হীনভাবে তাঁতে সংলগ্ন হয়ে যাওয়া। ফুল একবার বলে ফেলেছি, ফুলের এ গঠন আর যাবে না। চখের দেখা ফুল ঝরে যায়, কিন্তু সংস্কারের ফুল, জ্ঞানের ফুল কখন ঝরে? আসল প্রকাশ হয় এখানে, এখানকার প্রকাশ কখন মরে না; তাই

এর নাম অমরাবতী ভূমি। এখানে যে সবই রয়েছে। যা বলি, তাই উপস্থিত হয়ে যায়।

স্বপ্নকালে যেমন বাইরের ফুল আর স্বপ্নের ফুলে বিন্দুমাত্র পার্থক্য থাকে না, এমন করে অমরাবতীতে যদি ভোগের ফুল পেতাম! মা তোমাকে একবার মর্ত্তে ভোগ করাচ্ছেন, আবার অমরাবতীতে নিয়ে যাচ্ছেন। একবার ভূলোকে আসছ, আবার স্বর্লোকে যাচ্ছ। এখন তুমি জানলে যে, তোমার এই জ্ঞানেই সব লোক নিহিত আছে। রাঙা টুকটুকে কচি ছেলে, দেখলি—ছুটছে। তোরাও তেমনি ছুটছিস—একবার মর্ত্তে, একবার অমরাবতীতে। বেগুনি ফুলুরি হেঁকে এদের সারা জীবন যাচ্ছে। আহা! এরা আর কোন শব্দ জানে না, আর কোন খাবার তৈরি করতে পারে না। প্রভাস-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বললেন, 'তোমরা আমার বাহ্য রূপকে ভালবেসেছ, অন্তরের রূপ কখন দেখনি। তা না দেখলে চিরকালের মত আমায় পাবে না। সুতরাং ফিরে যাও, ঘরে গিয়ে ধ্যানস্থ হও।' বৈরাগ্যযোগ বড় কঠিন বলে রাধা প্রাণত্যাগ করলেন। নারায়ণের অশেষ দয়া আমার বল্লা ধরায় নয়; তাঁর ব্রহ্মত্বে আমায় একীভূত করে নেওয়ায়। প্রতি কথাটি তাঁর বৈচিত্র্যের এক একটি রেখা। যার এঁতে চোখ পড়েছে, সেই এ কথা বলবে। একটি একটি জ্ঞানায়তন এঁতে বসিয়ে বসিয়ে তোরা আর্টিষ্টের মত এঁক গড়ে নে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার।

পরমেশ্বরীকে শক্তিস্বরূপিণী বলে স্বীকার করে, শিব হয়ে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে থাক্। অব্যক্তভূমিতে আমার প্রতি অব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমি জাত হচ্ছি; সেই জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁর দিকে দৃষ্টি দিই ত দেখতে পাই, তাঁর দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়ে আমি জাত হতে পারি না। এই স্পর্শ যে ভগবৎস্পর্শ, এ কথা শুনেও এখন পর্য্যন্ত এমন অবস্থায় তোরা যেতে পারিসনে যে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ হয়। ঐ ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু সে সংস্পর্শ বা হৃদয়-যোগ উপলব্ধি হচ্ছে না। গাড়ীর চাকা যেমন তার axleএর মধ্যে ঘোরে, তার মাঝখানে তেল দিলে যেমন ঘর্ষণ হয় না, তেমনি এই যে নিয়ন্ত্রিণী শক্তি, যাঁর দ্বারা আমি পরিচালিত হচ্ছি, সেই axleএর সঙ্গে যেখানে আমার সম্পর্ক, সেইখানে হৃদয় ন্যস্ত থাকলে আর ঘর্ষণ হবে না। এ তৈলটুকু, স্নেহটুকুর অভাবে তোরা ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে চলেছিস। ঋষি এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,—গোশকট যখন চলতে থাকে, তখন তার চাকা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। তেমনি প্রাজ্ঞ পুরুষ যখন জীবকে আকর্ষণ করেন, তখন সেও ঐ রকম শব্দ করে। সুতরাং চাকায় তেল দিতে হবে।

এই যে আলিঙ্গন, একে লক্ষ্য করে ঋষিরা এর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে দিলেন। একে মিথুন বললেন, দুইয়ের একত্বে সমাবেশ বললেন; শুধু তাই নয়, শব্দ-স্পর্শাদির যে সংযোগ, তাতেও মিথুন দর্শন করলেন। কারণ, তার পিছনেও তত্তদভিমানী আত্মা

রয়েছেন। রসের সঙ্গে শুধু যে আমিত্বের সংযোগ হল, তা নয়; এক দিকে যেমন আমি রসে আলিঙ্গিত হলাম, সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মতত্ত্বেও আলিঙ্গিত হলাম। অব্যক্ত থেকে রসত্ব ব্যক্ত করে তিনিই ধরলেন, 'রসোঽহং' বলে তিনিই এলেন; সুতরাং আমি রস ত খাইই, তা ছাড়া যিনি রস হয়ে এলেন, তাঁকে পর্য্যন্ত ছুঁলাম, তাঁর সঙ্গে স্পৃষ্ট হলাম। যিনি সর্ব্বরসময়, সর্ব্ব-গন্ধময় ইত্যাদি হয়ে প্রকাশ পান, তাঁকে না ছুঁয়ে রূপ-রস-গন্ধাদির স্পর্শ হয়? সুতরাং প্রতি রস-ভোগের সময়ে তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন, মিথুন বা এই সংযোগ হচ্ছে। সুতরাং আমার দৃষ্টি যদি উন্মালিত থাকে, তবে জগদ্‌ভোগে আমি তাঁর স্পর্শ-বর্জ্জিত হই না; শুধু জগদ্‌ভোগে কেন, কিছুতেই তাঁর সংস্পর্শ 'আমি হারাতে পারি না—হারাই না। অথচ আমরা সর্ব্বদাই হারিয়ে বসে আছি। কিসের অভাবে এ হয়? খালি দর্শনের অভাব, চক্ষের অভাব, গুরুর অভাব। চক্ষের অভাব, এ কথাটার অর্থ একটু ভাল করে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে চক্ষুর অভাব নয়, অভাব ইচ্ছার। ইচ্ছা জাগ্রত করার জন্য দরকার হল চক্ষুর। কারণ, যে বস্তু দেখা না যায়, তার লোভনীয়তা বুকে ফোটে না। এই জন্য চক্ষুর দরকার। যেমন ক, খ, গ, ঘ যখন শিখেছিলুম, তখন সে শিক্ষা বড় কষ্টকর বোধ হয়েছিল। এখন সে বিষয়ে কোন চিন্তামাত্র না করে কত বিদ্যুৎবেগে লেখা হয়ে যাচ্ছে। তেমনি এই দর্শন এখন বড় কষ্টকর মনে হচ্ছে, কিন্তু একবার

অভ্যাস হয়ে গেলে তখন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে এমন একটা ক্ষণ থাকবে না, যখন আয়াসসাধ্য মনে হবে।

আচ্ছা, কাল যখন শুনলি যে, ডমরুর দুই অংশ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সে একটা আলিঙ্গন, অথচ দুজনের স্বাতন্ত্র্য থেকেও পরস্পর এইরকম একটি স্পর্শ হচ্ছে, তখন সেটা একবারও অনুভব করতে পেরেছিলি ? তোরা গীতায় পড়েছিস, "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হৃদয়াকাশে এই ব্রহ্মসংস্পর্শ অত্যন্ত সুখদায়ক। তা হলে আমি এই যে সংস্পর্শ বা আলিঙ্গনের কথা বলছি, এ ঋষিরই কথা। তোমার সুখ কম হল, আমার বেশী হল, তার কারণ, উনিই যে মা, এই বোধের তারতম্য। গগন, চিন্ময় গগন যার যত বেশী ফুটবে, সে তত বেশী সুখ উপলব্ধি করবে। বাতাস গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি জ্যান্ত বলে দেখতুম ত বলতুম—"আহা, কত সুখ দিচ্ছ, এস এস !" চেতনতা দেখার অভাবে এই সকল হচ্ছে। চেতনতা মানে, আত্মচৈতন্য। চেতনতার স্বরূপধর্ম্ম হল নিজত্ব। আর এই নিজত্বরূপ পরাপ্রকৃতি থেকে অপরা প্রকৃতি জাত হন। সুতরাং এঁরই অভাবে মড়া দর্শন হয়, জগৎ মর্ত্ত হয়। এইটুকু দর্শনের অভাবে এত বড় জগৎটা মরে যায়, আর বাঁচাবার সোনার কাঠি, চেতন-সম্পদ্ পড়ে রয়েছে, ঐটুকু ছোঁয়াতে পারলে জগৎকে চেতন করতে পারি। তাই একবার ভরসা করে বলব, "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা।" এ জগৎ তুমি, তুমিই জগৎ সেজেছ ! জগৎ বলে যা কিছু ব্যক্ততা নিচ্ছে, সে সব

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানমূর্ত্তিরই ব্যক্ততা। এই যে শুনছি, এ ত ইনিই মূর্ত্তি ধরছেন; ইনি মূর্ত্তি ধরে তোর ভিতরে মূর্ত্ত হচ্ছেন বলে তুই ভোগ করতে পারছিস। ইনি সাদরে এই কথাগুলো ধরে গ্রহণ করছেন; তাই অবিরাম এই কল চলছে। আমার কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা, তিনি ধরছেন মূর্ত্তি। চিৎ অচিৎ, দুই-ই তাঁর মূর্ত্তি। চিৎ মানে, আত্মবোধ, পরাপ্রকৃতি। এই দুই ভাবেই তিনি জাত হয়েছেন। সমগ্র বিশ্বকে এঁর উপর ছেড়ে দে। এ ছাড়া আর কিছু তোদের করতে বলি না। চন্দ্র ফুটুক, জল ফুটুক, আকাশ ফুটুক, আমি দেখছি—সেই ভগবতীই এই সব হয়ে ফুটছেন। গুরুকৃপায় জ্ঞানভূমিতে দাঁড়াতে শিখে বুঝলাম, ঋষিরা কেন বলে গেছেন—তুমিই সব। আচ্ছা মশায়, না হয় আপনার কথামত একবার তাঁর ধারণা পেতে পারি; কিন্তু একেবারে জ্যান্ত কৈ? চিরদিনের মত সংশয় বিদূরিত করে দাঁড়ালেন, এরূপ কৈ? এ কথা যে বলছে, সেও ত প্রাণই। এ কথার অর্থ হবে—জল নিজেই জলাভাব বোধ করছে। এই দুঃখ এখনো ঘুচছে না। সে জন্য হয় আমাকে তাঁর সামীপ্য নিতে হবে, নয় তাঁকে আমার সামীপ্য নিতে হবে। হয় আমি নাম রূপ ক্রিয়ার সংস্থান ছেড়ে, স্বরূপে গিয়ে অবস্থান পেলে অব্যাহতি পাব। নয় তিনি মূর্ত্ত হয়ে আবির্ভূত হলে আমার এ দুঃখ ঘুচবে। এর জন্য বলে দিলেন, ওঁরই শরণাগত হও। তুই বললি, "মা, তুমি প্রত্যক্ষ মানুষের মত মূর্ত্ত হয়ে দেখা দাও; তোমার জ্ঞানতত্ত্ব দেখে আমার সব গলে যাচ্ছে না।" এই

কথা বলার নাম মাকে আবাহন করা,—“দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।” এই ‘মা’ বলবার সময় দৃষ্টি কোন্‌খানে দিলি? মায়ে? মায়ে মানে, আমার অব্যক্ত ভূমিতে, যেখানে আমি সুপ্ত হচ্ছি, যেখান থেকে জাত হচ্ছি। সে এইখানেই ত? অব্যক্তের ভিতর দিয়ে গলে আসা—তার উজ্জ্বল প্রকৃষ্ট পন্থা কি? নিজবোধ। এই যিনি অব্যক্তে ঘেরা স্বয়ম্ভূ সেজে বসে আছেন, এইখানে দেখা যাচ্ছেন? তা হলে স্বয়ম্ভূর বুকে ছাড়া ইনি পদক্ষেপ করেন না?

বলে দিয়েছি, তুই যে জীবাত্মারূপে এই দেহে ভোক্তা হয়ে রয়েছিস, এর স্থান হল হৃদয়। আর যিনি এই সব জানিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরই দ্বারা জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। তা হলে তিনি আপাদ-মস্তক বেপে ভোগ দিচ্ছেন, অব্যক্ত বোধভূমিতে—যে ভূমি থেকে এই ক্রিয়ার আবর্ত্তন উঠছে, তিনি সেই সমস্তটা ধরে পরিচালন করছেন। এই সমগ্র আবর্ত্তনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের ক্রিয়া পরিচালনা করছেন তিনি, আর তুই ভোক্তা হয়ে রয়েছিস। দেখতে পাচ্ছিস? পৃথিবীর এক নাম যজ্ঞ, এই দেহের এক নাম যজ্ঞ। “গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে। বরাহ-রূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥” বারাহী শক্তির উপরে বরাহ-যজ্ঞ। তিনি কর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীকে অব্যক্তভূমি থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাতালস্থ এই পৃথিবীকে তিনি কর্ম্মচক্ররূপে উদ্ধৃত করেছেন দাঁত দিয়ে। বারাহী শক্তি, এই শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডকে ফুটিয়ে জাগ্রত করে বসে রয়েছেন। এই দাঁত, শৃঙ্গ,

বিষাণ, এ সব এক কথা। এই বিষাণ হল মহাদেবের এক হাতের বাঁশী। একজন শৃঙ্গে ঘা মারছেন—তিনিই সব টেনে নিয়ে গেলেন। তিনিই আবার ঐ শক্তিকে অতল থেকে ফুটিয়ে তোলেন। এক হাতে ডমরু ডম্-ডম্ করছেন, এক হাতে শিঙ্গা ফুঁকছেন। কৃষ্ণের বাঁশী, ঋষি, ওঙ্কার, এ সব বুঝেছি। কৃষ্ণের বাঁশী হৃদয়ের খেলা। ঋষি—অপৌরুষেয় শক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা শক্তি যেখানে জাগ্রত হন। কিন্তু শিবের বিষাণ কি? বলে দিয়েছি, শিবলিঙ্গের নাম স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। সেই লিঙ্গ অবলম্বন করে 'স্বয়ং' এই জ্ঞান জাত হয়ে বিশ্ব প্রকাশ হয়েছে। তাঁর আদি প্রকাশ হল কি? ব্যোম। ওমের দ্বারা অনুভূতিময় বিশ্ব, সর্ব্বানুভূত্ব উপলব্ধি হচ্ছে, আর ব্যোমের দ্বারা সর্ব্বভূতি-বিশ্ব বা physical বিশ্ব রচিত হচ্ছে। ওমের দ্বারা তিনি ব্রহ্মভাবে গৃহীত হচ্ছেন, আর ব্যোম দ্বারা বিশ্ব আকারে রচিত হচ্ছেন। অনুভূতির ভূমি হল সংজ্ঞাত্মিকা, আর ব্যোমভূমি ব্যক্ত রূপ বা physical aspect, ব্রহ্ম থেকেই প্রকাশ হয়েছে। ওঙ্কারেরই বাহ্যগত যে রূপ, তার নাম ব্যোম। এই ব্যোম হল বিষাণের রব। তা হলে নাম ও রূপ, সংজ্ঞা ও মূর্ত্তি, 'ডম' ও 'রু' বলে যা বুঝেছিলে, তাকে ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করতে হলে 'ওম্' ও 'ব্যোম' বলে তোমায় গ্রহণ করতে সক্ষম হতে হবে। ব্যক্ত ব্যোম=ব্যক্ত বিশ্ব, অন্তর্বিশ্ব=সংজ্ঞাত্মক ওম্—এই দুয়ের তফাৎ কি রইল? ঐ 'বি'-র তফাৎ। 'ওম্' থেকে যেমনি বহির্গত হল, অমনি 'ব্যোম' হল। আবার যেমন

জ্ঞানমূর্ত্তিতে দেখলে, অমনি হয়ে গেল 'ওঁ'। এই যুগলভাব অবলম্বন করে হরি-হর-মূর্ত্তির ধারণা করলাম। যারা এর ভিতরকার শক্তিতত্ত্ব দর্শন করলে, তারা এঁকে অর্দ্ধনারীশ্বর বললে। আর যারা প্রকাশ দেখলে, তারা বললে হরি-হর। তা হলে দেখছি, এই চিন্ময়কে লঙ্ঘন কবে অন্য কোথাও দেবতা দর্শন হয় না। এই ব্যোম তোদেব ভিতরে ঠায় ফুটছে। ব্যোম অনবরত আন্দোলিত হচ্ছে বলে শরীরের জড় বা **material** অংশেই আণবিক গতি, চুম্বকগতি বা **magnetic flow** প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন বাইরের বিপুল ব্যোমে শক্তি রয়েছে বলে **electricity** ইত্যাদি হাজার রকম জিনিষ দেখতে পাচ্ছ, যেমন **electrical current, wave** ইত্যাদি বইছে, তেমনি এই ব্যোমেও শক্তি পরিচালিত হচ্ছে। এই ব্যোম চিন্তা করলে শরীরের আণবিক **gross** বা স্থূলতা ফাঁক হয়ে যায়,—শরীরের ভিতর বাতাস, শক্তিপ্রকাশ চলতে পারে, এবং তার দ্বারা সর্ব্বদা শরীর গঠিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে। তা হলে যে কোন জ্ঞানক্রিয়া হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাতে এক দিকে আত্ম-বোধময় চেতনসত্তায় চালিত হচ্ছি, আর এক দিকে ব্যোমশক্তি পরিচালিত হচ্ছে। এই দুই ক্রিয়া চলছে। "যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥" তা হলে ব্যোমের সাহায্যে নিরেট জড়ত্ব-বোধ ফাঁক করে, ভেঙ্গে-চুরে, সরিয়ে, রাস্তা বার করি, এবং অনুভূতির দ্বারা সেই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতিসম্পন্ন হই।

তোদের অনুভূতি বার বার ভেঙ্গে যায়। তার কারণ, ভাল করে ব্যোম দেখা হয়নি। আমার ব্যোমেতে যতক্ষণ **waves detected** বা স্পন্দনানুভূতি না হয়, ততক্ষণ ভাল ফল হয় না। এর উপায়? উপায় তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কি করে করব? ওঃ! তুমিই করাবে যে! যে চিন্ময়ের কথা কয়, সে কি আবার উপায় খুঁজতে হাত বাড়ায়? এ কত বড় ভুল? তার মানে, যদিও তাঁর কথা শুনছিস, তত্রাচ তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ফেলে রেখেছিস। "আমি ছাড়া অগ্নির একটি তৃণ দাহনেরও শক্তি নেই।" সুতরাং তিনিই শক্তি, তিনিই উপায়, তিনিই গতি,—যদি ঠিক জ্ঞানে, ঠিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলিস। 'উপায়' বলে আর একটা বোঝা খুঁজতে বেরিয়েছিলি। এখন দেখছিস, উপায় একমাত্র ভগবতী; তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁকে ছাড়লেই আমরা নিঃস্ব। ভগবৎপ্রাপ্তি যে জ্ঞান-প্রকাশের বা আত্মপ্রকাশের দিক্ দিয়ে, তা তোরা ভুলে যাস্!—matterএর প্রাপ্তির সঙ্গে তুলনা করিস। ভগবতীরূপ বিদ্যুৎ-চমকান কখন ব্যর্থ যাবে না। এঁতে যত দৃঢ়তা হবে, তত এগোবি; যত এঁকে তুচ্ছ ভাববি, তত পিছিয়ে যাবি। জ্ঞান-ভূমির ব্যাপার—ওঁর প্রতি বিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করবি; কাজ দেবে। এইরকম করে ওঁতে না ঢুকলে, এইরকম করে ওঁকে আনতে পারবি না। তুই কত জন্ম ধরে ওঁকে তোর পিছনে পিছনে ছুটিয়েছিস; আজ তুই ওঁর পিছনে পিছনে একটু ছুটবি না?

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার।

যে ভগবতী এত দিন আমাদের কাছে সুদূর-কল্পিত একটি সংস্কারজাতরূপে প্রকাশমান ছিলেন, গুরুপ্রকাশে আমরা তাঁকে এখন প্রত্যক্ষতার ভিতর এনে ফেলছি। তার মানে, শুধু অনুমান নয়, অনুভূতি থেকে আরম্ভ করে রূপেব প্রকাশ প্রভৃতি পর্য্যন্ত আমরা তাঁকে আনবার চেষ্টা করছি। রূপ চোখের গ্রাহ্য, শব্দ শ্রবণের গ্রাহ্য, রস রসনার গ্রাহ্য; সেইরূপ আত্মা আত্মার গ্রাহ্য। এত দিন শুনে আসছিলাম, আত্মতত্ত্ব নিষ্ক্রিয়, শান্ত এবং অনাত্মতত্ত্ব ক্রিয়াশীল। দেখতেও পাই, নিজ-বোধ অপরিণামিভাবে বিরাজ করে এবং অন্য অন্য অংশ তার উপর ক্রিয়া করে। সুতরাং আত্মাংশ স্থির, অনাত্মাংশ ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই যে প্রকৃতি ক্রিয়া করছে, অনাত্মাংশে এ ক্রিয়া ততক্ষণ ঘটে না, যতক্ষণ না ওঁর প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়। ক্রিয়ার বাহ্য প্রকাশ প্রকৃতি-অংশে হলেও, যিনি শক্তিকে পরিচালিত করছেন, তিনি আত্মাংশে জ্ঞানময়ী দেবীরই অংশ। ইনি শান্ত নিষ্ক্রিয় হলেও, তার মানে এ নয় যে, এর কোন প্রভাব নেই। এঁর প্রভাবে প্রকৃতি-অংশ অনন্ত রূপ গ্রহণ করে। সে প্রভাবটি কত তৈজস, সে জ্ঞান মাথায় রাখতে হবে। এই জন্য বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অবলম্বনে দেখলে, সমস্ত ক্রিয়া ভগবতীতেই পর্য্যবসিত হয়। আর অপরা প্রকৃতিতে যে ক্রিয়া প্রতীয়মান হয়, তার নাম দিয়েছি—নাম রূপ ক্রিয়া; একটা ক্রিয়া আকারিত হচ্ছে মাত্র। ক্রিয়ার গতিকে রূপ বলছি, অনুভূতিকে নাম বলছি।

নাম রূপ ক্রিয়ায় এই উপায়ে মূর্ত্তি-প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু যাঁর শক্তি, তিনি defined হচ্ছেন না। আমরা সে দিন দেখেছি, এক দিকে নামপ্রকাশ, এক দিকে রূপপ্রকাশ, এর মধ্যস্থলে প্রত্যগাত্মতত্ত্ব। ঋষি এঁকে একটি aspect বলে গ্রহণ করলেন ; করে এঁকে কর্ম্মময় বললেন। "সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং আত্মা একায়নঃ, যথা সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকা একায়নঃ" ইত্যাদি। সমস্ত কর্ম্মশক্তির একমাত্র স্থূল আত্মা। "সত্যেন প্রাণশ্ছন্নঃ, নামরূপে সত্যং, প্রাণো বা অমৃতং"—সত্যের দ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাক্, প্রাণ, মন, আর নাম, রূপ, কর্ম্ম। নাম রূপ অপরাশক্তির প্রকাশ, পরাশক্তির প্রকাশ কর্ম্মশক্তি বা প্রাণ। যিনি শক্তির তিনরূপ প্রকাশ সম্পন্ন করেন, তিনি পরাশক্তি। ডমরুর দৃষ্টান্তে দেখিয়েছিলুম, মাত্র অব্যক্ততার দ্বারা এই ক্ষীণ কটিদেশ পরিচিত হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরী যখন অব্যক্ততত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব, এই দুই বিভাগ সম্পন্ন করেন, তখন আত্মবোধ-আকারীয় 'নিজ' নামে এই যে জ্ঞান, ইনি আত্মারূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন। শক্তিত্ব অব্যক্তরূপে থাকলে আত্মতত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশমান হন। কিন্তু আমরা এখানে ক্রিয়ার দ্বারা নিজত্বকে প্রতিফলিত দেখতে পাই ; যা নাকি ভৃঙ্গীর সাধনা এবং এতেই আমরা ভাল করে পরিচিত। ও দিকে কিন্তু অব্যক্ততার বেষ্টনের মাঝেই আত্মত্ব বিশেষ করে পরিচিত হন। এই আত্মপ্রত্যক্ষজ্ঞান, 'নিজে রয়েছি' এই জ্ঞান সতঃসিদ্ধভাবেই প্রকাশিত রয়েছেন। জীবের দিক্

থেকে দেখছি, একটি নামরূপক্রিয়াময় ত্রিকোণ বা **triangle** হয়েছে এবং তাতে আমরা মসগুল হয়ে রয়েছি। জগৎকে সুন্দরভাবে বাইরে দেখছি। কিন্তু জ্ঞানে প্রবেশ করলে দেখি, এ জগৎ জ্ঞানমূর্ত্তি হলেও, আমার বাইরে যেখানে যা কিছু ফুটছে, সে সব আমার উপরই ফুটছে, আমি তাতে নড়ছি-চড়ছি না। সে সব আমার আত্মবোধেব বাইরে, অথচ আমার ভিতরে। আমার জ্ঞান-সীমার উপরে, অথচ আমার ভিতবে। অস্মিদ্বারা যে নিজত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে, এটি একটি জ্ঞানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এ আত্মত্ব জ্ঞানসমুদ্রেই ঠেকেছে, অথচ যেন তার বাহ্য। মনে যা ফুটছে, প্রাণে যা ফুটছে, তাও বাহ্য। হৃদয়ে যা ফুটছে, সে যেন আমাতে ঠেকে আছে ; সেও জ্ঞান। মাটি কাঠ জ্ঞান দিয়ে তৈবি, অথচ তোর বাইবে। হার্দ্দ ব্যবহার যা ভোগ করছিস, তাও তোর বাইবে এবং এগুলো অনবরত চক্রের মত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এব উপরে তোব কোন কর্ত্তৃত্ব নেই, অথচ ভোগ করছিস। তবে এ ক্রিয়া চলছে কেমন করে? আমরা দেখেছি, আত্মতত্ত্বের প্রভাব ভিন্ন কোন জ্ঞানক্রিয়া হয় না। আমার আত্মত্ব যখন এ সবকে চালাচ্ছে না, তখন অবশ্যই আর এক পরিচালক আত্মত্ব আছে, যে এই সব ভোগ পরিচালনা করছে। আত্মত্বে শক্তিত্ব আছে. ভোক্তৃত্বও আছে।

সকল সন্দেশ ছানা ও চিনি দিয়ে তৈরি হলেও পরিমাণের তারতম্য আছে। সেইরূপ আমার যে আত্মত্ব, এ ভোগপ্রধান, আর আমার ভিতরে এই যে আত্মত্ব, তিনি শক্তিপ্রধান ;

কেন না, তিনিই পরিচালন করছেন। ভোগপ্রধান আত্মাকে পেলুম বাহির বলে, শক্তিপ্রধান আত্মাকে পেলুম অব্যক্ত বলে। সামনে বিশ্ব-আকারে যে জ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে, তা অব্যক্ততত্ত্বের পরিচালনাতেই হচ্ছে। অব্যক্ততত্ত্বে যেমন করে পরিচালনা হচ্ছে, সেই ভাবেই জ্ঞান ফুটছে। এ দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, অব্যক্ততত্ত্বও আত্মাব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিণী শক্তি অব্যক্ততত্ত্বে। ভোগ করা, নাম রূপ প্রকাশ করা, এ এক কথা। একটার নাম অনুভূতিক্ষেত্র, কর্ম্মময় ক্ষেত্র, আর একটার নাম রূপময় ক্ষেত্র। পিছন অংশের নাম হল নামময় ক্ষেত্র, যে নাকি পরিচালনা করে। রূপময় জগৎ মন পরিচালনা করছে এবং তার পরিচালন অনুসারে অনুভূতি হচ্ছে। একদিকে রূপের ত্রিকোণ, একদিকে নামের ত্রিকোণ রচনা করে যিনি আমাকে তার মধ্যে বসিয়েছেন, তাঁর নাম শিব, আর আত্মার নাম স্বয়ম্ভূ। ইহার নামই ডমরু। পশ্চাদ্দিকে অব্যক্তভূমি ডম, যেখানে সব জিনিষ জ্ঞানাকারে আছে; আর ব্যক্ত অংশ মন, রু—যেখানে সব রূপ ফোটে। মন অবলম্বন করে খাদ্য বেরোয়, অনুভূতি বেরোয়। যেমন ভাত খেয়ে, মনকে খেয়ে—ভোগতৃপ্তি, অনুভূতি, বেঁচে থাকা-রূপ রস নির্গত হয়।

নাম রূপ কর্ম্ম দুই ত্রিকোণেই আছে, কেবল পরিমাণের পার্থক্য। একটা রূপপ্রধান, একটা অনুভূতিপ্রধান। এই তত্ত্ব ভাল করে গ্রহণ না করায় রূপ ও নাম কেমন করে ধরতে হয়, তা জানিস না। তিনি সপ্রকাশ মানে, নিজেকে নিজের দ্বারা

জানছেন ; এই ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে তাঁর ভিতর। এই কথাতেই দেখা যাচ্ছে, 'নিজে' বলে একটা definiteness বা নির্দ্দিষ্টতা দেওয়া হয়েছে, এবং জানছেন বলে একটা জানবার অনুভূতিও রয়েছে। জানা ও জানবার বস্তু, দুই এক সঙ্গে রয়েছে। যখন তাকে ফাটিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, তখন বিশ্ব হয় ; এই দিক্‌টা নামপ্রধান, এই দিক্‌টা রূপপ্রধান। তোমার ভিতর দেখ। মনের মধ্যে যখন চিন্তাজাল বিস্তৃত হয়, তখন সে কখনও অব্যক্তভূমি থেকে এসে ক্রিয়া করে, আবার কখনও বাইরের জগতেব রূপের দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। প্রকাশ দুই দিক্ থেকেই হবে ; ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে। রূপের প্রাধান্য বাহিরে, নামের প্রাধান্য ভিতরে, গুহার ভিতবে। প্রতি জ্ঞান-প্রকাশেই, প্রতি জ্ঞানক্রিয়ায়ই শিবের এই ডমরু বাজছে। এ ছাড়া আর এক বাদ্য আছে—বিষাণ। বিষাণ না বাজলে ডমরু বাজে না। বাইরে যা ব্যোম, অন্তরে তা জ্ঞান। রূপক্ষেত্র ব্যোম দ্বারা ব্যাপ্ত, নামক্ষেত্র কাল দ্বারা ব্যাপ্ত। তাই মহাকালপুরুষ শিঙ্গা বা বিষাণ না বাজালে ব্যোম কোন রকমে ফুটবে না। তাঁর এমন একটি শক্তি আছে, যার দ্বারা তিনি নিজেকে দু ভাগে বিভক্ত করতে পারেন। তা না হলে শক্তির পরিচালনা হবে না। ইনিই আদিশক্তি। তিনিই আদিশক্তি, যিনি 'ব্যোম্' ও 'ওম্' দুরকমে অনুভূত হচ্ছেন। এর জন্য এক আদি-শক্তি বা আদি-শব্দ বার করতে হল। মায়ের সুরে বিষাণ-বাজনা থেকে ব্যোম তৈরি হয়। যে পাশে ব্যোম তৈরি

হয়, সে পাশে বিষাণের শব্দ; যে পাশে নাম বা সংজ্ঞা তৈরি হয়, সে পাশে ডম বাজে। ব্যোম কল্পনা না করলে তিনি ওমের পরিচয় দিতে পারেন না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মানেই হল—আমি বিশ্ব হতে পারি। জানতে পারার নাম 'ওম্'-ময় বিশ্ব, আর এক পাদে 'ব্যোম'-ময় বিশ্ব। 'ওম্' ও 'ব্যোম' সুপরিস্ফুট ভাবে ফোটাবার জন্য যে বেগ এল, এ বেগ কোথায় ছিল? অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে। তাকে প্রথম প্রকাশ করলেন মানে, বিষাণ বাজালেন। তা হলে আগে বিষাণ বাজল, তার পর ডমরু বাজল।

আর বলেছি, এই ত্রিকোণ রূপময় ও অনুভূতিময়। এই যে আমার পিছনে আমার আত্মত্বকে যিনি ফুটিয়ে রেখেছেন, এঁর নাম আমার মা, দেবী। তোর পিছনে কে? ঐ মা। ওঁকেই ত্রিকোণ বলছিলি? আঁর সামনে এই ভোগ্য জগৎ—ইনিও মা, ঐ ত্রিগুণময়ী। সামনে পাচ্ছিস ভোগে, রূপে; আর পিছনে দাতৃত্ব,—রূপ দিচ্ছেন, ভোগ দিচ্ছেন। জগতের দিকে পিছন ফিরলে মা ব্যক্ত হন, মায়ের দিকে পিছন ফিরলে জগৎ ব্যক্ত হয়। তখনই জগৎ একেবারে অব্যক্ত হয় না, ধূমকেতুর পিছনের লেজুড়ের মত আমাদের পিছনে জগতের লেজুড় লম্বমান থাকে। যখন তাঁকে সামনে পেলি, তখন তুই হৃদয়ময় পুরুষ। পরে একটা triangle অন্যের দিকে এগিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে যায়; ষট্‌কোণ যন্ত্র তৈরি হয়।

এইরূপ করতে পারলে একে বাহ্য-জগতে রূপে ফোটাতে পারবি। মাকে জ্ঞানে দেখছিস; কিন্তু তাঁকে রূপময়ী করে না

ফোটাতে পারলে আমরা সন্তুষ্ট নই। তিনি বিশ্ব আলো করে রয়েছেন, আত্মাকে আলো করে আছেন, তাতে তোরা 'আহা!' বলিস না, কিন্তু বাইরে তাঁকে রূপময়ী করার কথায় একেবারে মসগুল হয়ে যাস। আমরা দুর্ব্বল, বহির্ম্মুখী; তাই আমরা চাই, মা যদি একবার বাইরে ফোটেন। প্রকৃত পক্ষে এ কঠিন ব্যাপার নয়। তবে অন্তরে যে ব্রহ্মতত্ত্বে স্থিতধী হতে পারে নি, তার পক্ষে কঠিন বটে। তোরা ছোট ভাবে ব্যবহারময়ী মা খুঁজছিস বলে তোদের কাছে এটা অলৌকিক ব্যাপার; প্রাজ্ঞ পুরুষের কাছে এটা তত দামী জিনিষ নয়। যদিও এ বিদ্যা আমি তোদের শেখাব বলেছি।

এই দুই হৃদয়। আমি যখন মা বলি, তখন ভিতর দিকে মুখ করে মা বলি; অমনি মা বুকে এসে পড়েন। আগে বলতিস, মা মনে পড়েন; আজ জানছিস, মা বুকে এসে পড়েন। যেখানে তুই ও মা, উভয়ের সংস্পর্শ হয়, তার নাম হৃদয়, বুক। জগৎ বা মা, একের সংস্পর্শ হলেই বলা যায়, বুকে বুক ঠেকল, অনুভব এল।

চোখে দেখার, কাণে শোনার কোন মূল্য নেই, যত মূল্য এই বাক্যের। তোরা বাক্‌শক্তিকে পূর্ণভাবে চিনতে পারিসনি। এই বুকে বুকে সংলগ্ন করলে কে? বাক্‌শক্তি। মনে রাশি রাশি বিশ্ব ফুটে আছে, এ ভুলে যা। আছে মাত্র ঐ হৃদয়। ভিতরে চোখ রাখ। এ বিশ্বটা ভোল। পরে এ বিশ্বকে আপনা হতে পেয়ে যাবি। বাঙ্ময়ীর যে ক্রিয়া এক পাশে অনুভূতি,

এক পাশে ভূতি, যে শক্তি আছে বলে তাঁর নাম ডমরুধর, শক্তিধব তোব ভিতরও এ সেই শক্তিই। জাগ্রত থাকবে শুধু এই বাক্‌শক্তি। এ দেবী বিচিত্র রূপ ধরবেন। এখন মনে করছিস, আমি একজন বুড়ো মানুষ, গুরুর কথা শুনছি। কিন্তু এ কাণ্ডটা কে করাচ্ছে? এই ধারণা তোব চোখে ফুটিয়ে রেখেছেন; অচলভাবে নয়, ক্রমাগত কম্পন দিচ্ছেন, তবে সিনেমার মত এ ক্রিয়াপ্রবাহ হচ্ছে। গতি বা বেগ হল আসল জিনিষ। স্থিতির কোন বিশেষ মূল্য নেই। গঙ্গায় নেমে স্রোত অনুভব করিস; জল তুলে ঘটে কবে নাইলে খালি জল অনুভব হয়, স্রোত অনুভব হয় না। তোবা জল তুলে, শব্দ তুলে খালি নাইছিস, তাই স্রোত অনুভব করছিস না। এইখানটায় তোদের বেশী মাত্রায় খাটাচ্ছি। কারণ, দেখবি, এই সমগ্র শরীব যিনি ধরে আছেন, তিনি হলেন আত্মবোধসম্পন্না ভগবতী, আর প্রত্যগাত্মারূপে, অনুপ্রবিষ্ট হবাব যোগারূপে তুই হৃদয়ে pointer হয়েছিস। এ পাশে এই প্রকাশময়, ভোগময় বিশ্ব রয়েছে, পিছনে স্বয়ং ভগবতী, মধ্যে তুই। এই যে তুই বিচবণ কবছিস, ভোগ করছিস, এ কিন্তু একসঙ্গে নয়; কিন্তু তিনি একসঙ্গে সব দেখছেন; তিনি এককালীন আমার সমগ্র গতির অক্রমদ্রষ্ট্রী। তাঁর দ্বারা প্রেবিত হয়ে আমার সামনে যা উপস্থিত হয়, আমি তা ভোগ করি; এই আমার মূর্ত্তি।

এই ভগবতী—যিনি আমার পিছন থেকে **transverse** গতি নিয়ে, মেরুদণ্ডে বা **nervous system**এ চলছেন, তিনি আমার

সামনে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়ে দাঁড়াবেন। রূপময় জগৎ যেমন করে তোর মধ্যে ঢোকে, তেমনি তোর চোখ তাঁকে দেখবে, কাণ তাঁকে শুনবে, ত্বক্ তাঁকে স্পর্শ করবে ইত্যাদি। আবার বেরোবার সময় সেই নামরূপময়ী ভগবতী অনুভূতি-ভূমি থেকে সেই রাস্তা দিয়ে তেমনি করে রূপময় চেহা ধরে দাঁড়াবেন। শিঙ্গা ও ডমরু না বুঝলে, শিব-বিজ্ঞান না বুঝলে শক্তিবিজ্ঞান ধরা যাবে না। এই **triangle** আত্মস্থে এসে একটা **transverse** গতি নেন। হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মমিলন তাঁর প্রথম প্রকাশ এবং পরে রূপে প্রকাশ। এখন মাত্র আন্তর রূপ, আন্তর নাম; পরে তিনি বাহ্য রূপ, বাহ্য নাম গ্রহণ করে গৃহীত হবেন। সেই জন্য এই বিজ্ঞান শেখাচ্ছি। এটা তোদের নিজের বিজ্ঞান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হবে মায়ের সঙ্গে। এটা যেন শুধু কথার কথা বলেই ফুরিয়ে না যায়। যাঁকে মা বলছিস, তাঁকে ঠিক জানা থাকলে, তবে এ রকম করে বললে পাবি।

জ্ঞানময়ীকে ছুঁচ্ছিস্ অনুভব হল; কিন্তু বাহ্য শক্তির খেলা ঐ অনুভূতির সঙ্গে নেই বলে ভগবান্‌কে ছুঁয়ে এলুম, এ আর মাথায় এল না। যাতে সাড়া-শব্দ নেই, এমন মাটির বা পাথরের ভগবতীমূর্ত্তি হলে ভক্তিভরে প্রণাম করতে পারিস; কিন্তু নিজের অনুভূতিতে যে মা, যে মা জ্ঞানে ফুটে উঠলেন, তাঁকে তেমনি ভাবে প্রণাম করতে পারিস্ না। অন্তরে যে বিশ্ব ভোগ করিস, তাঁকে মা জ্ঞান করিস না। ভাবিস, ও ত যথার্থ ভোগ নয়—মনে বা স্বপ্নে দেখলুম মাত্র। একে বলে **heathenism**।

পূজার ভিতর এইটি ভাল করে শিখে নিতে হবে ; তবে পূজা করতে পারবি। আগে শ্রদ্ধার দ্বারা জগদ্‌ব্যবহার ছিল ; এখন জগদ্‌ব্যবহার চালিত হয় মেধার দ্বারা।

ঐ হার্দ্দ রস ঘনীভূত হয়ে জীবের স্বাধিষ্ঠান-চক্র নির্ম্মাণ করেছে। এবং জড় বা Physical রসতত্ত্বের আধার হয়ে নীচে রয়েছে। এ উপর দিকে পরিচালিত হলে স্ব-অধিষ্ঠানে চলে যায়। বিরূপাক্ষ পুরুষের মূলাধারের সব তেজটা উপর দিকে উঠে যায়, তা থেকে কৌমারী শক্তি, স্কন্দ-শক্তি জাত হয়। হৃদয়ে হৃদয়ে যে সংযোগ, তা থেকে নিম্নে আমাদের মত কার্ত্তিক জন্মায়, উপরের দিকে গেলে শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় জন্মায়। অক্ষরের স্থূল আজ্ঞাচক্রে—নীচে হল রসভূমি, primal gland। যে যত ঊর্দ্ধরেতা হবে, সে তত ঊর্দ্ধশক্তি, দেবলোকে যাবার শক্তি, কার্ত্তিকেয়-শক্তি পাবে। এই মিলন হল হৃদয়ে হৃদয়ে। এই দুই হৃদয়ের সঙ্গমে যে বীজ স্থাপিত করে, ভগবতীরূপ আধারে 'আমি'-রূপ আধার চাপা দিলে সে বীজ ফুটে ওঠে। নিম্ন ক্ষেত্রের হলে নিম্ন দিকে ফুটবে, ঊর্দ্ধ ক্ষেত্রের হলে ঊর্দ্ধ দিকে ফুটবে। 'ভগবতী' ও 'আমি', এই দুইয়ের হৃদয়ের মিলনে সব কিছু জাত হয়। ফুল ফল বলে দেখলে, সে মিলনে নিম্নাভিমুখে রস সঞ্চার হবে। অহর্নিশ তোর রস-সঞ্চার নিম্নাভিমুখে হচ্ছে কি না, দেখে বল। সব নীচে চলেছে!

শক্তির তিনরূপ প্রকাশ—heat, light, motion বা উত্তাপ, আলো ও গতি ; এই তিন ভাবে শক্তিকে প্রকাশ করা

যায়। তোরা খালি **luminous** অংশ জ্বালিয়ে ভগবতী হিঙ্গুলেশ্বরীকে কি ভাবে দেখতে চাস? দুটো অর্থ-দাত্রীরূপে, না ভবদুঃখহন্ত্রীরূপে? রূপ-জগতের ত্রিকোণতাই ভবদুঃখ; এই **triangle**এ যত দুঃখ, এতে তোরা মজে যাচ্ছিস্। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, ইন্দ্রিয়, তোমার এই সব ব্যক্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখছি; এ মূর্ত্তির সেবা করছি। এ সব মূর্ত্তি কিন্তু খালি মেপে মেপে দেয়। তাই তুমি মা, অন্য মূর্ত্তি, অব্যক্ত মহাকালময়ী মূর্ত্তি ধরে, মহিমময়ী হয়ে এসে দাঁড়াও। যে ডাল-ভাত রাঁধছে দেখছিস, তাকেই ভগবতী বলে দেখতে হবে। এ তত্ত্ব কাছাকাছি আসছে, সান্নিধ্যে আসছে? অন্তশ্চক্ষু ফুটল? ঈক্ষণ আসছে? যতক্ষণ না এই শরীর ছেড়ে ঐ ঈক্ষণ দেখতে পাবি, ততক্ষণ বার বার শরীর ধরতে হবে। এর নাম মৃত্যুময় ভূমি। অমরাবতী ভূমি হচ্ছে—জ্ঞান-সংস্কার বা বোধভূমি। শরীর-যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান পাকিয়ে নিতে হবে; নয় ত বার বার এই যন্ত্রের শরণ নিতে হবে।

এই ভূমি, এই তোর আত্মত্ব, যেখানে তুই মায়েতে একীভূত হবি। সে কত বড় হৃদয় বল ত, যেখানে ভগবতীতে ও আমাতে অহর্নিশ একটা সমতা অনুভব করতে পারব? আত্মত্বে সর্ব্বদা ব্রহ্মত্ব নিহিত রয়েছে। ততক্ষণ আত্মজ্ঞান হয়েছে বলব না, যতক্ষণ না বল্‌তে পারবি—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' 'প্রয়াগ' বললেই যেমন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম মনে হয়, তেমনি 'আত্মা' এই শব্দ বললেই প্রত্যগাত্মা ও ভগবানের মিলনভূমি দেখা চাই।

ভগবতী অক্ষর-মূর্ত্তি। তিনিই দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হয়ে স্তরে স্তরে সব সাজিয়ে বসে আছেন। এখন যদি এঁর জন্য আকুল না হস্, তবে কি হল? এখানে স্বয়ং ভগবতী রয়েছেন, এ জ্ঞান ফুটছে? এখন আত্মভূমির মত, সমস্ত বিশ্বটা পাওয়ার মত একটা জ্ঞানের পোঁটলা লাভ করছিস? ভগবতীকে পেতে হবে কোথায়? একেবারে তোতে? তুবড়ীতে আগুন ধরালে তুবড়ি থেকেই যেমন জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি বেরোয়, তেমনি এইখান থেকেই ভগবতী বেরোবেন? দুর্গা কোথা থেকে বেরোবেন? এই তোর থেকে? তিনি রয়েছেন? এইটি খালি প্রকট হবে। Triangle কাটছে? ডমরুত্ব ঘুচছে? ভগবতি! দেখি! জ্ঞানস্বরূপিণী ভগবতীর জ্ঞান, জানা বা দেখার একটু নড়া-চড়ায় হীরার মত নানারকম রং খেলছে। সবই এঁর ঈক্ষণের অদল-বদল। বিজ্ঞানবিৎ পুরুষের নিকট দেখার মূল্য দর্শকের চেয়ে বেশী নয়, যদিও এ বিজ্ঞানের মূল্য আছে। সবই ঐ কথার ঘুরোনি। কথার পরিবর্ত্তনে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন, কথার ঘুরোনির সঙ্গে জ্ঞানের ঘুরোনি, হীরার রংবেরঙি আলো অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কথা এইরূপ? তোরা হৃদয়ে ক্রমশঃ এইরূপে জ্ঞান নিতে পারছিস? সবই মায়ের মুখের কথামাত্র? এই কথা যে বলতে শিখেছে, তার নিজের কথাও সেই মায়ের কথার মত। সে যদি বলে, এই বিশ্বটা মরে যাক, অমনি মরে গেল; ফুটুক—ফুটে গেল। বাঙ্ময়ীর কথায় বিশ্ব ফুটতে পারে, নিভতে পারে। তা হলে সমগ্র বিশ্ব এই দীপ্তা দেবীতে,

জ্ঞান-প্রদীপে পতঙ্গের মত প্রবিষ্ট হচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে কথায় কথায় ?

প্রতি জীবক্ষেত্রে ভগবতী এই কয় স্তর সাজিয়ে রয়েছেন,—১। জীবত্ব, ২। অসঙ্গ আত্মত্ব। যখন যেখানে জীবত্ব ভোগ করেন, তখন সেখানে ক্ষরিত হন। জীবত্বের প্রকাশ নিতে গেলেই তার নীচে অসঙ্গ আত্মত্ব থাকবেই। এঁর স্থিতি বা location দহরাকাশে, ভাবের ক্ষেত্র হৃদয়ের মধ্যে। ভোগটা সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁ থেকেই হচ্ছে বলে, তাঁরই reflection বা প্রতিবিম্ব জীব সাজছে। তিনি বিশুদ্ধ আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছেন, অথচ আপনাকে ভোগী বলে বোধ করছেন। তাঁর অভোক্তৃত্ব দেখলে দেখা যায়, না দেখলে শুধু ভোক্তৃত্বই উপলব্ধ হয়। ৩। তার পর কূটস্থ অক্ষর অব্যক্ত আত্মা ও অব্যক্ত অপরা প্রকৃতি—অর্থাৎ যে অব ক্ত শক্তি জগৎ সাজছেন, অস্মি-জ্ঞান সাজছেন, জীবও সাজছেন। 'অস্মি'জ্ঞান থেকে ভূত-প্রকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভৌতিক বিলাস যে মূল ক্ষেত্র থেকে ওঠে, তাঁর নাম অব্যক্ত শক্তি। এর Location বা স্থিতি ললাটে। এই অব্যক্ত শক্তি ও অব্যক্ত কূটস্থ আত্মা, এঁদের সংযোগে যে প্রকাশ, তাঁর নাম মহদ্‌ব্রহ্ম, 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' তিনি সমস্ত সৃষ্টি-পরম্পরাকে আত্মা ও আত্মশক্তি বলে দেখেন। দেখা মানেই প্রকাশ হওয়া। ৪। পরমেশ্বরী—এই মহদ্‌ব্রহ্মত্ব প্রকাশ করা বা না করা যাঁর ইচ্ছা, তিনি পরমেশ্বরী ; তাঁর স্থিতি বা Location সহস্রার। সহস্রার-পদ্মের পাঁপড়িগুলি ঈশ্বরীর

স্থান, আর তার কোরক পরমাত্মত্ব। নিত্য পরমাত্মত্বের নিত্য ঈশ্বরত্ব। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর দ্বিদল হয়ে ললাটে অব্যক্ত প্রকৃতি ও অব্যক্ত কূটস্থ আত্মারূপে অবস্থান করছেন। ভাঁড়ার-ঘর আজ্ঞাচক্র, নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্র, যেখান থেকে ক্ষর আত্মা পরিচালিত হচ্ছে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তদনুভূত ভোগে ভোগী হয়ে, প্রত্যগাত্মা হয়ে নেমে আসছেন, ভোগের দিকে যাচ্ছেন। সমস্ত বোধক্রিয়ার হুকুম আসে ঐখান থেকে। তিনি radiate করে রস চালনা করেন। সহস্রারস্থ তিনিই দ্বিদল নামিয়ে সব করছেন, আমি মাত্র ভোক্তা হচ্ছি। যখন যেটিকে ভোগ করান দরকার হচ্ছে, সেটি ভোগ করাচ্ছেন, সেই ভোগ ফোটার শক্তি অব্যক্তে (ভাঁড়ারে) জমা রাখছেন। সব ক্রিয়া দেখতে দিচ্ছেন না, পেটের খাদ্য জীর্ণ করা, রক্তপ্রবাহ পরিচালিত করা প্রভৃতি আমরা দেখতে পাই না। যখন একটা ফোঁড়া ভোগ করান প্রয়োজন বোধ করলেন, তখন ফোঁড়া করিয়ে দিলেন। ওঁকে না দেখলে জীব ভাগ্যাধীন, ওঁকে দেখলে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ব-অধীনতা। আত্মত্ব দেখা মানেই পরমদেবতার সঙ্গে একীভূত হওয়া।

———

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার।

ক্ষর আত্মবোধ, যেন ঘটিতে গঙ্গাজল তুলে গঙ্গাজলে স্নান; ঐশ্বর আত্মবোধে গঙ্গার স্রোতে স্নান। ঈশ্বর বললেই সমষ্টি দেবভাব মনে রাখতে হবে। আত্মত্ব ধরলেই যে সব হয়ে গেল,

তা নয়। আত্মত্বকে অবলম্বন করে ওঁর যে পরমেশ্বরত্ব, শক্তিময় প্রকাশ, দেবসমূহমূর্ত্তি নিয়ে তাঁকে ধরতে হবে। আত্মত্ব দিয়ে দেবভাবে উপনীত হতে হবে। 'আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং।' নিজের ভিতর আত্মত্ব যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ বীর্য্য পাওয়া যায় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' এখানে সর্ব্ব অমৃত নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অমৃত নয়, নিজে মাত্র অমৃত। 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং'—যখন মর্ত্ত্য বলে কোন জিনিষ দৃষ্টিতে ঠেকবে না, তখন অমৃতত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হল। আমাদের ষট্‌কোণ, পুরুষত্ব, বীর্য্যত্ব, রসত্ব নেমে গেছে নীচের দিকে। আর ঊর্দ্ধরেতা ষট্‌কোণ তৈরি করেছেন মুখে, তত্ত্বচক্রে। জৈব বীর্য্য হল শুক্র, সন্তানোৎপাদক। আধ্যাত্মিক বীর্য্য বাক্য—মানস সন্তানোৎপাদক, কৌমারী শক্তির দ্বারা, বাক্‌বীর্য্যের দ্বারা গঠিত। স্বাধিষ্ঠান-চক্র থেকে উঠে যেতে হবে ললাটে, ষট্‌কোণ চক্রে। দ্বিদলে ষট্‌কোণ আছে, সেইটে দেখতে হবে। এই জন্য কার্ত্তিকেয়ের এক নাম ষড়ানন। ওঁর বাহন ময়ূর। ময়ুর, ময়ূরীর মুখে মুখ দিলে বীর্য্যপাত হয়; এখানে ঐ বাক্ লক্ষ্য কর। কৌমারী শক্তিকে দাঁতের দেবতা করা গেল—'দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী।' 'দন্ত'—যা জিহ্বাকে দমন করে রাখে।

ষট্‌কোণ হল ডমরুর ঊর্দ্ধাংশ, সংজ্ঞাত্মক বা প্রজ্ঞাত্মক ভগবান্। নিম্নাংশ জীব বা রূপ। জীব উপরে উঠবে, তিনি নেমে আসবেন, তবেই তাঁর সঙ্গে ষট্‌কোণ হবে। দাঁতের দুই পাশ + চোখ + ললাট = জীব ত্রিকোণ। কাণ + জিহ্বা + কণ্ঠ = দেবী

ত্রিকোণ। কাণ, জিহ্বা, কণ্ঠ দেবীতে প্রধান; দমন, চক্ষু, মন জীবে প্রধান। মন হল রূপতত্ত্ব—জীবে এর প্রাধান্য। নামাত্মক প্রাধান্য ভগবানের—রূপাত্মক প্রাধান্য জীবের। অনুভূতির দুই দিক্—বোধ ও আয়তন। ভগবতী এই রকম ভাবে আমার বুকের ভিতর বসে, ষট্‌কোণ রচনা করে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে আমায় পরিচালনা করছেন। বাক্ বড় ভয়ানক জিনিষ; ইনি বর্ণমালিনী—আদিশক্তি। শক্তিকে পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করে তার নামকরণ করা হয়েছে—অ আ, ক খ ইত্যাদি। আমাদের ভাষা শুধু ভাষা মাত্র নয়; অভিজ্ঞের দৃষ্টিতে এ দেবতার প্রকাশ।

ভগবান্‌কে তিন রকমে ডাকা হয়,—১। মনে মনে ধারণা করে, তাঁর সম্বন্ধে যত কিছু সংস্কার আছে, তাই নিয়ে ডাকা। ২। আর একরকম—খালি ভাব; হরি হে! অত ধ্যান-ধারণা জানি না, যা কর তুমি। ৩। আর এক রকম,—ডাকলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দেবতার আবির্ভাব হল। এই তিন রকম ডাকার প্রত্যেকটাতেই ত্রিবৃৎ-ভাব আছে। বিশেষ বিশেষ ফুলে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজার বিধান—ঐ বিজ্ঞানকে আরও পরিস্ফুট করবার জন্য। সাধারণতঃ সব ফুল দিয়েই পূজা করতে পারি; কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে পূজা করতে হলে বিশিষ্ট ফুল ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়। আমাদের থাকাটাই যেন আমাদের কাছে একটা বোঝার মত; তাই শঙ্কর যখন বললেন—জগৎ মিথ্যা, তখন বেশ সন্তুষ্ট হলুম। কিন্তু এই

না থাকাটাও কেমন করে ভগবানের একটি মহিমা, তা বুঝতে কেউ চেষ্টা করলে না।

এ ভগবতীকে এখন না হলেও একদিন চাক্ষুষ দেখতেই হবে। এই শরীরের ভিতর এত বিপুল শক্তি-বৈচিত্র্যে এত বড় ক্রিয়া চলছে। এতে আমি নানা খণ্ডে টুকরো টুকরো হলে সমষ্টিভাবে 'আমি'কে ধরা যায় না। আগে চিন্ময়ত্ব অবলম্বন করে দেবতাকে ডাকতে হবে; তবেই দেবতার আবির্ভাব হবে। পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত হল,—মন্ত্রই ভগবান্। আর মন্ত্র যে বাক্যের আবৃত্তি, জৈমিনিও এ কথা বলেছেন। এখন মন্ত্র হয়েছে প্রাণহীন শব্দ উচ্চারণ মাত্র!

এই যে চিন্ময় তত্ত্ব আমার ভিতরে জীবের সাজ নিয়ে অনবরত ক্রিয়াশীল রয়েছেন, এই এখানে তেত্রিশ কোটি দেবতাময়ী ভগবতী সহস্র বাহু দিয়ে আমাকে ধরে রয়েছেন, সহস্র চক্ষু দিয়ে দেখছেন, যত শক্তি খেলা করছে, তত ঈক্ষণ এবং প্রতি ঈক্ষণ একেবারে আমাতেই সংন্যস্ত, এইটুকুর ভিতরে সারা ব্রহ্মাণ্ড গুটিয়ে আসছে? আমার ভিতরকার আত্মনামীয় ও অনাত্মনামীয় যত রকম বৈচিত্র্য, তা জ্ঞানশক্তিই রচনা করছেন, যত কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে ভগবান্ই বসে আছেন। চামড়া যেমন গোটা দেহকে ঢেকে আছে, তেমনি আমিও পরিচয় দিচ্ছি ভগবানের ও তেত্রিশ কোটি দেবতার। এই ভগবতীকে "তুমিই যে!" বলে শুধু স্বীকার কর; 'আমি'র আকার নিয়ে তুমিই প্রকাশ হয়ে রয়েছ। 'সূর্য্যায় নমঃ' বলতে বলতে প্রথম বোধ

হবে, আমি সূর্য্যে চলে গেছি। দ্বিতীয় বোধ হবে—আমি সূর্য্য। তৃতীয় বোধ—আত্মা থেকেই সূর্য্য জাত হয়েছেন। জ্ঞানদেবতাই তাঁর সমস্ত শক্তি ও ক্রিয়া নিয়ে সূর্য্যের মূর্ত্তি ধরেছেন। যার বিশেষ কোন ধর্ম্ম জানি না, তার বিষয় চিন্তা করতে গেলে বুদ্ধিতে যতটুকু জানা আছে, ততটুকু ভাবই হবে। কিন্তু এমন এক অদ্ভুত ভূমি আছে, যেখান থেকে ভাবলে, আমি জানি বা না জানি, তার যা কিছু ধর্ম্ম আছে, সবই অব্যক্ত থেকে আমার ব্যক্তভাবে ফুটে আসবে। সুতরাং "তুমি এইখানে আমায় বুকে করে বসে থাক, আমায় তোমাকে পাইয়ে দাও, এইখানেই আমায় তোমাকে পাইয়ে দাও," শরণাগতিতে এই হল তোর প্রধান চক্ষু। তোর বুকেই যে ভগবতী—বাক্সে সব ধন-সম্পদ্ আছে, এই স্মৃতি জেগে ওঠা চাই। পরে সে বাক্সের চাবিকাঠি খুঁজে বার করতে হবে। 'তুমি আছ বটে!' অহর্নিশির এত হাহাকারের মধ্যে, নিরাশ্রয়তার মধ্যে এই 'বটে' বোধটুকু কত সৌভাগ্য এনে দেয় বল ত?

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥"—যে নিজের আত্মা ছাড়া অন্য ভগবান্‌কে দেখে না, সেই হল নিত্যযুক্ত পুরুষ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের পক্ষে এটা ভয়ানক কথা! যোগক্ষেমের

আমরা এত পাগল্! এঁকে ভগবান্ বললেই যদি ইনি সেই বোঝাটা টেনে নেন, তা হলে এই পথটা একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। লক্ষ লক্ষ চেষ্টা, লক্ষ লক্ষ ব্যর্থতা যেখানে হচ্ছে, সে রকম গ্লানিময় জীবনে এ কথা কি আশাপ্রদ!

মানুষের দুরকম কাপড় থাকে—আটপৌরে, আর পোষাকী। লোকের সামনে ক্রোধাদি চেপে সংযত ভাব দেখান, এ হল পোষাকী কাপড় পরা। সরল সত্য, সরল শ্রদ্ধা, সরল সখ্যে বসবাস করা আমাদের মধ্য থেকে উঠে গেছে। আজ-কাল অনেক সময় সরল সত্য অসভ্যতা বলে বিবেচিত হয়। এই-রকম গ্লানিময় জীবনে এমন যদি কেউ থাকেন, যিনি নিজের দ্বারা, আত্মজ্ঞানের দ্বারা লক্ষিত হচ্ছেন, তাঁকে পেলে কি শান্তি!

'অনন্যচিন্ত' হয়ে এঁকে ধরতে হবে, তার ফলস্বরূপ এঁতে নিত্যযুক্ততা আসবে। তা হলে 'অন্য'কে দেখে এখন আর তৃপ্তি হবে না। 'আমার ভগবান্' বলতে ওঁকে দেখাই একটা বাঁধা জিনিষ হয়ে যাবে। আমায় তা হলে চিত্তবৃত্তির সাহায্যে এই আত্মাভিমুখে ধাবিত হতে হবে অর্থাৎ ভগবানের দিকে মুখ ফেরালেই পড়ে যাওয়া চাই হৃদয়ে। কেন হৃদয়ে পড়ে যাব? আমি এখন এমন একজনের কাছে চলেছি, যাঁর কাছে গেলে আমার সকল দুঃখ দূর হবে। 'আমার সর্ব্বদুঃখহরার কাছে যাচ্ছি', এই ভাবই হল হৃদয়ের লক্ষণ। কিন্তু ঠিক এইরকম পুঁজি নিয়ে কি আমরা মোড় ফিরি? যখন আমরা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি, তখন এই ভাবে করি কি? "মা আমার

বসে রয়েছেন এই যে!" এই বোধকে পুঁজি করে নেওয়া অভ্যাস করতে হবে। সুতরাং ভগবানের আত্মরূপ, যাঁতে যেতে হৃদয় ভিন্ন অন্য রাস্তায় যাচ্ছি, তাতে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। দ্বিতীয় পরিচয়—আমার জন্মস্থান যে হৃদয়, এই কথাটা ভাল করে দেখা। কেন হৃদয়, খালি জ্ঞানস্বরূপ বললেই ত হয়? হৃদয়ের তলায়ই জ্ঞানস্বরূপ রয়েছেন। আনন্দ যাঁর স্বরূপ, তাঁর প্রকাশ হল হৃদয়; সুতরাং আমি জাত হয়ে রয়েছি হৃদয়ময়েতে, আনন্দ-ময়েতে! হৃদয়ের এই দুই প্রান্ত আমাদের দেখতে হবে,—এক, আমি ফুটেছি যাঁতে, তিনি হৃদয়ময়। আমার হল হৃদয়ের আর্ত্ত-প্রান্ত। আর হৃদয়ের আনন্দ-প্রান্তে থেকে যিনি আমায় জাত করেছেন, আমি এখন তাঁরই কাছে চলেছি। কিন্তু এই উভয় প্রান্তের মধ্যে এক বিপুল তত্ত্ব রয়েছেন, যেখানে গিয়ে পৌঁছলে আমার এই আর্ত্তভাব একেবারে ঝরে পড়ে যায়। যেমন আত্মস্বরূপ ভগবানে যেতে লাগলুম, অমনি দেখলুম যে, ইনি অসঙ্গ। তখন প্রথমে মনে করলুম, আমার স্বরূপ এ নয়; এ একটা সাময়িক অনুভূতি মাত্র। আমি চির দুঃখী; ক্ষণেকের জন্য বিশোক আনন্দময় অসঙ্গত্বে এলুম। জগতের সম্বন্ধ তখনও ভূতের মত পিছন দিক্ থেকে আমায় গ্রাস করছে। বিষ্ণু যখন নিদ্রিত ছিলেন, ব্রহ্মা তখন অসুর-ভয়ে ভীত হয়ে দেবীর শরণাপন্ন হলেন,—"মা, তুমি জাগ্রত হও; নয় ত অসুর আমার সব গ্রাস করে ফেলছে।" তেমনি আমাদেরও ঐরকম ভাব। অব্যক্ত অসঙ্গতায় ত এসেছি। তবু ঈশ্বরী অব্যক্ত রয়েছেন।

সুতরাং "হে অব্যক্তে, তুমি ব্যক্ত হয়ে ওঠ, ভুবন রক্ষা কর।" এই আমাদের প্রার্থনা নয়? অব্যক্তে পৌঁছে অব্যক্তকে সাধনা করতে হবে। অব্যক্ত-ভূমিতে যতক্ষণ না ঈশ্বর বেরিয়ে পড়বেন, ভাগবতী শক্তি প্রকাশ হয়ে পড়বেন, ততক্ষণ অসুরের ভয়ে ত্রস্ত থাকব। অসুর মারবেন তিনি। ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে জাগিয়ে খালাস; তাঁকে লড়াই করতে হল না। সুতরাং বিষ্ণুকে জাগাতে পারলেই বিষ্ণু যোগক্ষেম বহন করবেন। এই যে 'জাগাতে পারলেই করবেন', এটা ঠিক কথা? জ্ঞানস্বরূপ যিনি, তিনি যা করবার ঠিক করছেন, কিন্তু আমার চোখে তিনি অব্যক্ত, তাই তাঁর জাগরণ যেন আমার বোধগম্য হয়।

দেবতারাও জীব। তবে তাঁরা সিদ্ধ পুরুষ; মুক্ত পুরুষ নন। ত্যাগীরা একটি ভাব নেয়, সে হল কৈবল্যভাব। যোগীরা দুই ভাব নেয়—আত্মা ও অনাত্মা। তা হলে মোট কথা হল, অব্যক্তভূমিতে আমার সাধনা। অব্যক্তাকে জাগ্রত করে ওঁরই সাধনা করতে হবে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, এর প্রকৃত মানে, আমি অব্যক্তা ভগবতীতে চলে গেছি। যখন তুমি নিদ্রিত, তখন তুমি তাঁর অব্যক্ত-ভূমিতে প্রবেশ করেছ। আমি যখন জাগলুম, ভগবতীরই জাগ্রত ব্যক্ত-ভূমিতে ফিরে এলুম। ঘুমোলে অব্যক্তা ভগবতীতে প্রবিষ্ট হলুম, জাগলে ব্যক্ত ভগবতীতে ফিরে এলুম। আমি যখন জাগ্রত, আমার চতুর্দ্দশ করণ যখন খেলা করছে, তখন জাগ্রত ভগবতীতে আমি প্রবিষ্ট রয়েছি? এই জাগ্রত ভগবতীকে স্বীকার করলে, ঘরে ছড়ান হীরার টুকরার মত

তাচ্ছিল্য না করলে, ইনিই অব্যক্ত পর্য্যন্ত তুলে দেবেন। এই ব্যক্ত-ভূমিতে প্রকাশিত দেবীর নাম হল পার্ব্বতী, এখানে তিনি পর্ব্বে পর্ব্বে আছেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, ইত্যাদি আকারে যিনি প্রকাশ হয়ে আছেন, তাঁর নাম পার্ব্বতী। এঁকে দুরকমে আমরা পেতে পারি। এক—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।" ইত্যাদি প্রকারে। দেবতারা এঁর এইরূপ স্তব করেছিলেন। তখন পার্ব্বতী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাকে স্তব করছ?" দেবতাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাঁর ভিতর থেকে কৌষিকী দেবী বেরোলেন এবং বললেন, "আমারই স্তব করছে।" কালী যখন যুদ্ধ করছেন, তখন অব্যক্ত-ক্ষেত্র থেকে একটি প্রকাশ। আর একটি প্রকাশ হল ব্যক্ত-ভূমি থেকে, যখন দেবতারা স্তব করছিলেন। কৌষিকীর প্রকাশ মানে, তত্ত্ব-ভূমির প্রকাশ। কোষ, যার ভিতরে সব নিহিত থাকে এবং যা থেকেই সব বেরোয়। আত্মতত্ত্বের সাধনা করলেও, আমরা ব্যক্তভূমিতে বিশেষ জোর দেব। তার মানে, ব্যক্ত চেতনা বা চিন্ময়ীকে অবলম্বন করে তাঁকে ডাকব। "যা দেবী...চেতনা ইতি অভিধীয়তে," ব্যক্ত চেতনাকে ভগবতী বলে ডাকব। ক্ষুধা এলে বলব, "মা, বেশ ছিলুম, তুমি এসে কষ্ট দিলে; এখন রক্ষা কর।" এই ভাবে সমস্ত রূপেই মাকে দেখতে অভ্যস্ত হব এবং তা হলেই ভগবতীতে পাকা হয়ে যাব।

মায়ের কথা এত করে শুনছিস, তবু তাঁকে হারিয়ে বসিস?

কাকে ডাকছিস? যদি এঁতে শ্রদ্ধা এসে থাকে, সত্য বলে ধারণা এসে থাকে, তবে ব্যক্ত চেতনার উপাসনা অতিশয় সহজ।

তা হলে এই চিন্ময়ী ভগবতী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, কান্তি, এই সব মাতৃকা যাঁর অঙ্গ থেকে সর্ব্বদা বেরোচ্ছেন, যিনি এই সবের কোষস্বরূপ, তিনিই ভগবতী? তা হলে "মা, ক্ষুধামূর্ত্তি ছেড়ে তুমি একবার অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধর," এই কথা যদি ঠিক চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে বলি, তবে দেখব, ঐ চেতনাই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। 'অন্নপূর্ণা,' এই আয়তন ইনিই ধারণ করলেন ত? সুতরাং যে ক্ষুধা-মূর্ত্তি ছিল, সে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হল; মাতৃরূপিণী অন্নপূর্ণা আত্মা হয়ে ফুটে উঠলেন। তা হলে এ অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিও ঐ চেতনকোষেই ছিল, যিনি ঐ আর্ত্ত চেতন জীব ফুটিয়ে রেখেছিলেন। এই কোষেই ক্ষুধাময়ী ও অন্নপূর্ণা, দুই-ই আছেন। ক্ষুধা সত্যি সত্যি হচ্ছে? ক্ষুধা যেমন প্রকট, জ্বলজ্যান্ত, হাড়ে-মাসে জড়ান, অন্নপূর্ণা এইরকম প্রকট, জ্বলজ্যান্ত, হাড়ে-মাসে জড়ান না হলে ঠিক অন্নপূর্ণা দেখা হল না। "মা, যতক্ষণ আমি ক্ষুধাতুর, ততক্ষণ যেমন ক্ষুধামূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তিতে পরিচয় দিতে পারি না, তেমনি তোমার প্রতি দৈব প্রকাশেই সেইরূপ প্রোজ্জ্বল ভাবে প্রকট হও। অন্য অন্য বিষয়ে যেমন তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত ভোগ করিয়েছ, দেবীমূর্ত্তিতে প্রকাশ হবার সময়ও ঠিক সেইরূপ শেষ সীমায় এসে তোমায় দাঁড়াতে হবে। একটু পাতলা

হাওয়ার মত বুকে ফুটলে, তোমার সে প্রকাশ ঋষির কাছে কার্য্যকর হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে তোমাকে একেবারে স্থূল মূর্ত্তিতে ইন্দ্রিয়ময়ী হয়ে প্রকাশ হতে হবে।" চিন্ময়ী মানুষ সেজেছেন একেবারে ভৌতিক মাত্রায়। কঠিন অসুখের পর যখন প্রথম জ্ঞান হয়, তখন নিজেকে আবছায়া আবছায়া মনে হয়। এখন সুস্থ শরীরে পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়ময়, ভূতের সঙ্গে identified হয়ে রয়েছ। চিন্ময়ী বলতে একটু আভাস আসছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলে চলবে না। যে মাত্রায় আমায় 'জীবত্ব' ভোগ করিয়েছ, সেই মাত্রায় আমায় অন্নপূর্ণা ভোগ করাতে হবে। নিজে জীব না সাজলে, জীব বলে নিজেকে উপলব্ধি না করলে যেমন জীবত্ব ভোগ হয় না, তেমনি অন্নপূর্ণা দেখা আমার ততক্ষণ সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ আমি সম্পূর্ণরূপে অন্নপূর্ণা না হব। যতক্ষণ আমি জীব আলাদা এবং অন্নপূর্ণা আলাদা থাকবেন, ততক্ষণ পূর্ণভাবে অন্নপূর্ণা ভোগ হবে না। স্বপ্নে রসগোল্লা খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন জেগে উঠে মায়ের হাতে রসগোল্লার থালা দেখলে, এ কথা বলব না যে, "স্বপ্নে খেয়েছি, আর খাব না।" অথচ স্বপ্নে রসগোল্লা খাওয়ার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু যেমন ঘুম ভেঙ্গে গেল, ভৌতিক রসগোল্লা দেখলুম, অমনি বললুম—"দাও দাও।" এতে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা যতটা ভূতাশ্রয়ী, ততটা জ্ঞানাশ্রয়ী নই। আমরা প্রকৃত পক্ষে ভূতেই পড়ে আছি। সুতরাং জ্ঞানে অন্নপূর্ণা দেখা স্বপ্নতুল্য হবে, যদি না তাঁকে স্থূলরূপে পাই।

'অয়মাত্মা অন্নপূর্ণা' বললেও এখন তাঁকে দেখব স্বপ্নের মত ; তিনি ভূতময়ী, স্থূলমূর্ত্তি না হলে আমার মত জীবের অন্নপূর্ণা দেখা সার্থক হবে না। ভূতনাথের বুকে অন্নপূর্ণা সেজে দাঁড়াও, তবেই ভৌতিক ভাবে পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণা দেখা হবে। তাঁকে শম্ভুব ঘবে দেখেছি ; এখন তাতে হবে না। শম্ভুব ঘর ত আমাদের ভিতর রয়েছে দেখতে পেয়েছিস। ঠিক এই স্থূল মূর্ত্তির ভিতর, এই দিক্ ও কাল ব্যক্ত করে, এইখানে একেবারে শম্ভু-গৃহিণী' হয়ে বসে, ভূতময় জীবটিকে প্রসব করে, ছেলে নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন। এত দূর যখন এসেছ, চামড়ার কাছাকাছি যখন এসেছ, তখন আর একটু ঠেলে বেরোও। শম্ভু ভূমি হল অব্যক্ত-ভূমিরও পরে—পরমাত্মভূমি। তোদের চোখ-কাণের গোড়ায় এসে মা দাঁড়াচ্ছেন ; তোদের ইন্দ্রিয়ে ঠেল দিচ্ছেন, না খালি মনে দাঁড়িয়ে আছেন? যখন 'অন্নপূর্ণে!' এই শব্দের দ্বারা অন্নপূর্ণার ভাব পেলি, তখন কি তিনি ইন্দ্রিয়ে ঠেল দিচ্ছেন? না মাত্র মনে মনেই বলছিস মনে করছিস? যেন আমার চোখের ভিতরে তাঁর চোখ দেখতে পাচ্ছি ; আমার হাতে তাঁর হাত, আমার পায়ে তাঁর পা, আমার রূপে তাঁর রূপ যেন প্রকাশ হচ্ছে। স্বপ্নের মত আগে ভিতরে তাঁকে পেতে হয় ; পেয়ে, সেই পাওয়া এমন মাত্রায় হল কি না, যে, আমার ইন্দ্রিয়-সকল তাঁকে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে, তাই দেখতে হয়। তোর চোখ তাঁর রূপ, কাণ তাঁর শব্দ, পা তাঁর গতি পাচ্ছে? তোর বাহু তাঁর স্পর্শ পাচ্ছে?

তাঁর ইন্দ্রিয় তোর ইন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হচ্ছে? সারূপ্যের তিন স্তর। তাঁকে গ্রহণ করা হল সংস্কারের সাহায্যে; হৃদয়ের সাহায্যে সারূপ্য এল; তার পর ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভৌতিক প্রকাশ হল। এই সব কথার দ্বারা বুঝতে পাচ্ছিস, আমি আমার প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে নৌকা কতকটা টেনে আনছি?

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার।

বিরাটে যা কিছু আছে, আমাদের অধ্যাত্ম ক্ষেত্র তার সহিত একেবারে এক সূত্রে গাঁথা। আমরা বুদ্ধিহীন, তাই মনে করি, যেন স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমস্তই বিপুল, বিরাট্ বিশ্বমূর্ত্তির দ্বারা corresponding ভাবে শৃঙ্খলিত। বাইরে বায়ু, ভিতরে প্রাণ; বাইরে জল, ভিতরে রস; বাইরে অগ্নি, ভিতরে বাক্; এইরকম বাইরের সমস্তের দ্বারা আমাদের ভিতর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বাইরের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাগুলির সঙ্গে একত্র সমাবিষ্ট হয়ে, তাদের সঙ্গে পূর্ণভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আমরা ভিতরে ভোগ করছি। তাঁর ঘরে শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞান থেকেই তৈরি। যখন দেখি, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি বহিঃ-প্রকাশও জ্ঞানই, তখনই দেখি, এই বিশ্ব মনোময় একজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে আমারও অস্তিত্ব পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। তার পরে আরও দেখি, শৈত্য, তাপ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি যখন জ্ঞানাধিকারে পাওয়া যায়, তখন আর

বৈশিষ্ট্যে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জ্ঞানের জল অনুভূতি-প্রধান, বাইরের জল রূপ-প্রধান। দুটো বিরুদ্ধ জিনিষ। মাটি, কাঠ স্থূল, আর জ্ঞান যেন বায়বীয়ের মত সূক্ষ্ম। একটা লম্বা গাছ কল্পনা করলে, সঙ্গে সঙ্গে লম্বা গাছ জ্ঞানে ফুটে গেল, কিন্তু বাইরে একটা লম্বা গাছ তৈরি করা আর পাওয়া কত শক্ত। কাজেই বিশ্বরূপে যিনি প্রত্যক্ষ ভগবান্, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, এ কথা ধারণায় আনতে পারি না। সেই জন্য এই ধারণা আনতে হলে উভয়ের সংযোগ-ভূমি দেখতে হয়। আবার সংযোগ-ভূমি দেখতে গেলে আত্মতত্ত্বে পৌঁছতে হয়। কেন না, আত্মত্ব ভিন্ন অন্য কোথাও কোন জ্ঞানের উদ্ভব বা স্থিতি নেই। আত্মতত্ত্বই সমস্ত জ্ঞান-জগতের কেন্দ্র বা আশ্রয়। তার পর জড়-জগতে শক্তি চালিত হয় শুধু জ্ঞানের দ্বারা। যদি জড়শক্তি জড়শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হত, তা হলে জগতে কোন শৃঙ্খলা দেখতে পেতুম না। আবার কালের ক্ষেত্রে, কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে জগৎ, সেখানে দেখি, ঘোড়া, মানুষ, ঘাস, মশা, এরা এত বছর বাঁচবে, এর ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং কালের একটা ভয়ানক অস্তিত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বত্র দেখতে পাচ্ছি। কালের গতি সকলের ভিতর আছে। কাল নামে এক অভিনব শক্তির দ্বারা অন্য সব শক্তি পরিচালিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার কালতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে অন্য কোন পদার্থ নেই, কাল খালি জ্ঞানের ধারা। শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি জ্ঞান, তা

জেনেছি। তন্মাত্রাকে বিচার দ্বারা দেখে নিয়েছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্যকে পেতে হলে কাল ও জ্ঞানের ধারাকে বুঝতে হবে। এখানে হল তন্মাত্রা, ওখানে ভূত। অধ্যাত্মে প্রাণশক্তি ভিতরে ক্রিয়া করছে, রক্ত মাংস মেদ ধরে রাখছে; কিন্তু বিরাটে বাতাস ত ও কাজ করছে না। আমার প্রাণ, আমার শরীরের বিধৃতি-শক্তি, শরীরের ভূত-সকলকে জ্যান্ত করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু খানিকটা মাংস কেটে ফেললে, বাতাস ত তাকে জীবন্ত করে রাখতে পারে না। আমার শরীরের মাংস হল মাটি, হৃদয় হল জল ইত্যাদি; কিন্তু এতে এক জীবন্ত সত্তা ফুটে উঠেছে, বিরাটে ত সে সব মড়া দেখছি, চেতনতার কোন পরিচয় তারা দিচ্ছে না; অথচ বিচার দ্বারা এক জিনিষই দেখেছি। ঋষি বলেছেন, এ সব এক জিনিষ। কিন্তু এই যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, সে কিসের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে? জড় বলে এক জিনিষ, আর আধা-জ্যান্ত আধা-মড়া জীব বলে এক জিনিষ কি করে হয়েছে? এই দুই বিভিন্ন রকম যেমন করে হচ্ছে, সে হল কাল-নামীয় শক্তির খেলা। কালের ক্রিয়া দুই জায়গায়ই চলছে; এক জায়গায় জ্ঞানপ্রধান, এক জায়গায় ভূতপ্রধান। মস্তক হল হৃদয়ের কূটক্ষেত্র, প্রকাশ-ক্ষেত্র; তার এক অংশ পিতৃলোক —মড়া বাপ-মায়ের লোক; যেখান থেকে বীজকে ব্যক্ত করে অনবরত পাঠান হচ্ছে। বুক হল হৃদয়ের ভাল লাগা না লাগা-রূপ ভোগক্ষেত্র। কূট থেকে শরীর তৈরি হচ্ছে, সেখানে

ভোগভূমির কোন আধিপত্য নেই। প্রাণশক্তির ভৌতিক প্রকাশ শরীর, আধ্যাত্মিক প্রকাশ অনুভূতি।

৩রা অক্টোবর, ১৯৩৭, রবিবার।

পূজার তিনটি কথা বলে দিয়েছি, তা মনে আছে? সে তিনটি কথা হল, জ্ঞানের সমন্বয় সাধন। জ্ঞানের বিপরীত ভূত, এ বুদ্ধি থাকলে চলবে না, তাঁতে ভূত ও জ্ঞানের সমন্বয় করতে হবে। এই সমগ্র বিশ্ব যাঁর অধ্যাত্মভূমি, তিনি হলেন পরমেশ্বরী; আর এই ক্ষুদ্র শরীর যার অধ্যাত্মভূমি, সে হল জীব। এই দুজনেই মিলিত রয়েছেন জ্ঞানস্বরূপে, আত্মতত্ত্বে বা চিন্ময়ে। আত্মতত্ত্বও একটি প্রকৃতি; তিনি নিত্যা, পরা প্রকৃতি, চিৎস্বরূপ, সদা জাগ্রত, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই হিসাবে তাঁকে দেখছি। আত্মতত্ত্ব এমন জিনিষ, যিনি এক দিকে ব্রহ্ম, এক দিকে শক্তি। আত্মতত্ত্বের দ্বারাই সমস্ত উপলব্ধ হয়, সেই দিকে ইনি হলেন শক্তি। আবার 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো যদি বা ন মহিম্নীতি,' এই জন্য তিনি একেবারে আপনি আপনার মহিমা।

'জ্ঞান' এই শব্দের ব্যবহার কখন আত্মবোধশূন্য হবে না; যদি হয় ত সে ভূতের মত ঐকাঙ্গিক ক্রিয়া হয়ে যাবে। আত্মত্ব বাদ দিলে মাত্র দেখা-শোনা-রূপ ক্রিয়াই হয়, আর কিছু হয় না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, জ্ঞানের এই দুইটি রূপ। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এখানে জ্ঞানের এই দ্বিবিধ প্রকাশকেই

লক্ষ্য করা হয়েছে। এর পরম লক্ষ্য হল—জ্ঞানের সত্যতা। জ্ঞানতত্ত্বের সত্যতায় দৃষ্টি পড়ে গেলে 'এই পেয়েছি, এই পেয়েছি,' এইরূপ ধ্রুব প্রত্যয় এসে যাবে। তোদেরও এইরূপে সত্যতার সত্যবোধে উজ্জীবিত হতে হবে। তখন দেখা যাবে, এঁতে ছাড়া জগতের আর কিছুর কোথাও কোন সত্তা নেই। ইনিই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করেন। আপনার সত্তাবোধ বা অস্তিত্ব-বোধকে যত প্রকারে পরিচালিত করার ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্র সেই সেই নানা রূপে নিজেকে পরিচালনা করেন। 'রয়েছি' এই জ্ঞান তখন নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। 'নিজে রয়েছি' এর কোন পরিবর্ত্তন হল না; অন্য যে সব নানা জ্ঞান করলেন, তাতেও বা তাদের অস্তিত্বেও রইলেন, আবার আত্মত্বেরও বিধর্ত্তা রইলেন। তাঁর চেতনতায় দুই অঙ্গ ভাসছে; দুই অঙ্গের এক অঙ্গ যা খুসী, তা হতে পারে; এমনই আত্মকাম তিনি। "রয়েছি" এই জ্ঞান আকাশ, পাতাল, জীব, পতঙ্গ, ইত্যাদি অনন্ত মূর্ত্তিতে আয়তনবান্ হতে লাগল; আত্মত্ব সে সকলের দ্রষ্টা রইলেন; তারা সব অনুভব করতে লাগল আত্মত্বেরই উপর এবং তাদের পরিচালন করতে লাগলেন আত্মত্ব। 'রয়েছি'কে আমিও বাক্যের দ্বারা অনন্ত আকার দিতে পারি। সাপ বললে সাপ হয়ে যাবে, দুর্গা বললে দুর্গা হয়ে যাবে; শুধু বাক্যের পরিচালনায় অনন্ত মূর্ত্তি গ্রহণ করবে। আবার খানিক বাদে এরা সব চলে গেল; অন্তরে ছাড়া এরা বাইরে ভূতবৎ ব্যবহার দিলে না। এই প্রকাশের ত্রিবিধ স্তর

দেখ। প্রথম—প্রকাশ হল, কিন্তু অন্তরে ছাড়া বাইরে কোন ব্যবহার দিলে না। দ্বিতীয়—স্বপ্নে সাপ দেখলুম, সে আমায় কামড়ে দিলে, বাইরে ব্যবহার পেলুম; কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ সে ব্যবহার ভোগ করলে না। তৃতীয়—ঋষি ভৌতিক প্রকাশ দিলেন; সে প্রকাশ সকলকেই ভোগ দিলে। সৃষ্টির এই তিন মাত্রা।

যে সব জীবের বোধ আছে, প্রথম মাত্রার সৃষ্টি তারা করতে পারে। আর একটু বোধ-সম্পন্ন হলে দ্বিতীয় মাত্রাও সকলের হয়। Super conscious planeএ স্বপ্নে supramental কাজ করে। তার উপর আমার আধিপত্য নেই। কিন্তু যে প্রত্যগাত্মত্ব চিনেছে, যে জেনেছে, আত্মত্বের সংস্পর্শ ভিন্ন জগৎ বা কোন কিছু জাগে না, সে আপনার ভিতর সব ফোটাতে পারে। যোগস্থ হলে যেমন আপনা হতে গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি সব পাওয়া যায়, সেইরূপ। সুতরাং আত্মতত্ত্বে যারা সিদ্ধিলাভ করেছে, আত্মার কূটস্থ ব্রহ্মত্ব যারা দর্শন করেছে, তারা সব পারে। এই হল তৃতীয় মাত্রা।

আমরা বামনের চাঁদ ধরার মত তৃতীয় ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাবার অধিকারের আশা নিয়ে পূজায় অগ্রসর হচ্ছি। মা তাঁর জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশ করে আপনি এসে সামনে দাঁড়াবেন, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। তার জন্য ঋষি অপূর্ব্ব জ্ঞান দিয়েছেন। বলেছেন,—একটা মাটি, কাঠ, পাথর, যা কিছুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর; তাঁকেই এই মূর্ত্তিতে নিয়ে এলুম বলে দাঁড় করা; তা হলেই

পাবি। আমি প্রতিমা গড়ে, প্রতিমা অবলম্বনে পূজা করে সাধনা করছি, এই ভাবলে হবে না। এই বিরাট্ বিশ্বমূর্ত্তিতে, মহদ্‌ভূত-মূর্ত্তিতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, এ কথায় যার সংশয় আছে, সে এরূপ করতে পারবে না। এত বড় তোমাকে আমি এখনও ধারণা করতে পারি না ; সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ শূদ্রত্বে আমি নেমে পড়ি। এই বিরাট্ বিভূতিময়ী মহাদেবীকে কাজেই আমি এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে নিলাম। তিনিই এই মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই মূর্ত্তিতে এঁকে আমি জাগাব, তা নয়। ইনিই এতটুকু হয়ে আমার সামনে দাড়িয়েছেন, তাই আমি এঁকে দেখছি। এতে এঁকে কিছু খর্ব্বিত করা হল না। কেন না, গঙ্গায় স্নান করতে হলে হিমালয় থেকে সাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্নান করতে হয় না। তুমি জগদম্বা নিজে দাঁড়িয়ে আছ এই মূর্ত্তি নিয়ে। এক আঁজলা বাতাসকেও মা বলতে পারি, আবার সমগ্র বাতাসকেও মা বলতে পারি। এই হবে তোদের প্রথম কাজ, এই জ্ঞান অবলম্বন করে পূজা আরম্ভ করতে হবে।

তুমি জগদম্বা, তোমাতেই আমি জাত। গুরুমুখে শুনেছি, চিন্ময়ী তোমাতেই আমি জাত। তা হলে সামনে এই সেই আমার চিন্ময় তত্ত্ব, যাঁতে আমি জাত হয়ে রয়েছি। এইরূপ দেখবার যে উপায়, তার নাম হল প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আমার সমগ্র চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, আমার হাত-পা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ঐখানেই ফুটে আছে অর্থাৎ এ সবের উপলব্ধি আমার শরীরে নয়, ঐখানে—মায়েতে। এঁকে যদি জ্ঞানময়ী

বলি, তবে কত সহজ জ্ঞানেতে আমার সমস্ত অস্তিত্ব ঐখানে ফুটে উঠবে। তা হলে এই জ্ঞানময়ী থেকেই আমি জাত হয়েছি। ইনি জগদীশ্বরী, এইখানেই আমার সব, হৃদয় দিয়ে যে এইরূপ দেখতে শিখেছে, সে ঠিক পারবে।

এক খণ্ড হীরা হারিয়ে গেলে সামনে যা চক্-চক্ করবে, তাই টিপে দেখব; কেন না, তাতে গোটা হৃদয় জড়ান আছে। আমাদের মাত্র হীরা হারান নয়; যিনি আমাদের প্রকৃত হৃদয়, তিনিই হারিয়েছেন। সেই হৃদয়ময়ীর জন্য আমাদের কি এতটুকু ব্যাকুলতা আসবে না? হৃদয় যেখানে তীব্রভাবে গেছে, সে তীব্র বোধ দেবেই। আর তিনি যদি হৃদয়ময়ী হন, হ্রীং হন, তবে 'এই আমার হ্রীং' এই কথা মনে হলে সে মাটিতে বা জলে, যেখানে থাকুক, পাগলের মত হয়ে ছুটে আসবে না? এই হৃদয়ের তলাতেই ত সার্ব্বজ্ঞ্য সংস্থিত। হৃদয়গ্রন্থি = আমার বাসস্থান। হৃদয়কূট = ভগবানের বাসস্থান। তোরা হার্দ্দ ধর্ম্ম দেখে তার তলায় লক্ষ্য কর। Physically দেখার জন্য লালায়িত হস্ না। ওখানে কূটস্থা অক্ষরা দেবী আছেন। আমি এখানে কর্ম্মানুসারে ভোগ করছি, আর কর্ম্ম তৈরি করছি। জ্ঞানের প্রকাশ-অংশকে তোরা অচেতন বলে দেখিস, তাই তোদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। ওঁকেই ভগবান্ বলে দেখবি; কারণ, তলায় আত্মত্ব না থাকলে কোন জ্ঞান-প্রকাশই হয় না।

কতকগুলকে ভোক্তা আমি ইচ্ছা করে ফোটাই, কতকগুল আপনা হতে এসে উপস্থিত হয়। 'দশটা বেজেছে, এখন স্নান

করতে হবে,' কালবাহন হয়ে স্মৃতি এল। দশটার সময়ে স্নান করার তপস্যা করেছিলি বলে, সে ঐ সময় স্নানের স্মৃতি দেয়। সংস্কারের ঘরই মায়ের ঘর। সে এক বিপুলা ভয়ঙ্করী শক্তি ভগবতীতে সংস্থিত। সেই শক্তি নিয়ে আমার প্রাপ্য মা আমায় দিচ্ছেন। এতে শুধু দার্শনিক চক্ষু নয়, হার্দ্দ চক্ষু রাখতে হবে। এইখানে তুই, ভগবান্ ও ব্রহ্মাণ্ড, সব পোঁটলা হয়ে, একসঙ্গে solid হয়ে বর্ত্তমান। যে পাশে আমি দাঁড়িয়ে, সেখানে ভোগ হচ্ছে। যে পাশে তিনি, সে পাশে ভোগ দিচ্ছেন। ভোগ্য হল ব্রহ্মাণ্ড। একসঙ্গে পোঁটলা বেঁধে অনবরত এই তিন ব্যাপার হচ্ছে। ব্রহ্মতত্ত্বেও এইরূপ; তিনি আপনাকে ত্রিবৃৎ করছেন। ভোগ্য হল তমঃ, ভোগ হল রজঃ, প্রেরক হলেন সত্ত্ব। সত্ত্ব রজঃ তমের একসঙ্গে তিনটি ক্রিয়া না হলে কিছু ব্যাকৃত হয় না; বায়ু পিত্ত কফ যেমন একসঙ্গে চলে। চললেই তিনটি একসঙ্গে চলবে—মাত্রার তারতম্য হবে। ক্রিয়া, স্থিতি, লয়, এই তিন না হলে কিছু হয় না। চেতন-তত্ত্বের ত্রিমূর্ত্তি হল—ভোক্তা, ভোগ্য, মহেশ্বর—এ ত্রিতত্ত্ব, একসঙ্গে ফুটে আছেন। আমি রয়েছি, মা রয়েছেন, মায়ের স্তনে দুধ রয়েছে; এই হল ব্রহ্ম-দর্শন, তাঁর ঈশ্বরীমূর্ত্তির দর্শন। আমি নেই, জগৎ বা শক্তি নেই, অথচ ঈশ্বরী ধারণা হচ্ছে, এর কোন মূল্য নেই। ঈশ্বরী ধারণা মানে, আমাকে, ভোগ্য শক্তি বা বিপুলাকে এবং ঈশ্বরীকে সব জায়গায়, চোখে মুখে, ডাইনে বামে, যেখানে ইচ্ছা পাবি। এই মাকে দেখবি?

২১এ নবেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার।

আমি ছেলেবেলায় এক দিন স্বপ্ন দেখেছিলাম,—অতিশয় অন্ধকারের, সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি; যত অন্ধকার, তত নীরব। একটা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি; বাগানটাকে বিশেষ পবিত্র বলে বোধ হল; মনে করলাম, মধ্যে ঢুকি। বাগানের দরজার কাছে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে; সে আমার দিকে চেয়ে, ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলে, আমি যেন বাগানে না ঢুকি। তখন নিজের দিকে চেয়ে দেখলুম, আমি কি নোংরা! সে স্থান কি পবিত্র, আর আমি কি অশুচি, এই প্রভেদটা ভারি স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। তখন যোড়হাত করে নীরবে প্রার্থনা করলুম,—"আমায় একবার যেতে দাও।" তখন সে লোকটি ভিতরে চেয়ে, যেন কার কাছে অনুমতি নিয়ে, আমায় ঢুকতে ইঙ্গিত করলে। সেখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার সকল অপবিত্রতা মুছে গেল। দরজার সামনে থেকেই দেখলুম, ভিতরে মায়ের মূর্ত্তি; দেখেই ছুটে যেতে ইচ্ছা করল। কিন্তু সেই লোকটির এমন গম্ভীর মূর্ত্তি যে, তাকে লঙ্ঘন করে যাবার উপায় নেই। সে মায়ের দিকে চাইলে মা হাসলেন। সে লোকটা মায়ের সঙ্গে মিশে গেল; আমিও চাইতে চাইতে মায়ের সঙ্গে মিশে গেলাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

আমরা যে পরম তত্ত্বের আলোচনা করছি, এইখানে সেই পরম পবিত্র পুরুষোত্তম আছেন ত? তাঁর থাকা সুস্পষ্টভাবে

দেখলে যদিও আমার অপবিত্রতা প্রথমে মনে পড়বে, কিন্তু পরে আর সে অপবিত্রতা থাকবে না। যতক্ষণ না এইটি ঘটে, ততক্ষণ মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ হল না। যে দুর্লভ আত্মতত্ত্বে মা আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, তার একটি স্তর আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ; সে স্তর হল এই যে, মা ভূতে ভূতে অবস্থান করছেন। আমার জ্ঞানের প্রতি ভূতমূর্ত্তির তলায় তলায় তিনি যে অবস্থান করছেন, সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এর তলায় তলায় ভাল করে দেখলে, তাঁর অসঙ্গ মূর্ত্তিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যখন তাঁর সেই অসঙ্গ মূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সেই অসঙ্গ অবস্থার ক্রিয়াও ত স্পষ্ট হবে। যেমন ভোগ-ভাবে নিজে ভোগময় হয়ে যাচ্ছি, হৃদয়-গ্রন্থিতে এ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস। আমি সুখী, দুঃখী, জ্বালাময়, যুবা বা বৃদ্ধ হয়ে গেলাম ; এটি আত্মার ক্ষরভাব। এ দেখতে পাচ্ছি সন্দেহ নেই। কিন্তু অসঙ্গের তলার যে কাজ দেখা যায় না, সে কাজ কি ? অসঙ্গ আত্মত্ব থেকে ক্ষরের জন্ম হয় ; তাঁর প্রভাব কি ? তাঁর প্রভাবে অব্যক্ততত্ত্ব ব্যক্ত হয়, ফুটে ওঠে। তিনি অব্যক্তকে ফুটিয়ে ভোগ করান। তিনি নিজে ভোগে লিপ্ত রইলেন না, ব্যক্তক্ষেত্রে শুধু ভোগ ফুটিয়ে দিলেন। তাঁর প্রভাবে অসঙ্গ আত্মা আপনা হতে ফুটে উঠলেন, জেগে উঠলেন —এই পর্য্যন্ত রইল অক্ষরত্বের অনুশাসন। যেখানে তিনি জেগে উঠলেন, সেখানে অক্ষর রইলেন ; যেখানে ভোগবান্ হলেন, সেখানে ক্ষর পুরুষ নেমে এল। আচ্ছা, দৃষ্টান্ত মনে কর। মশার কামড়, তার জ্বালা এবং সেই জ্বালা আমায় জানিয়ে দেওয়া, এ সব

শরীরে—ক্ষর পুরুষে হল ; কিন্তু তৈরি হল মাথায়, অক্ষরে। মশার কামড় আমায় জানিয়ে দিলে কে ? অক্ষর পুরুষ জানিয়ে দিলেন, ফুটিয়ে দিলেন। বলে দিয়েছি, অক্ষরের স্থান ললাট ; এখানে ভোগ হয় না। নাক, কান, চোখ যে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, এদের জানার কেন্দ্র হল ললাট। ভোগের কেন্দ্র হৃদয়ের মত এ ভূমি স্পষ্ট দেখতে পেলি ? 'আঃ, বুকখানা জ্বলে গেল মশায়', কিম্বা 'প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মশায়', এরূপ যেমন দেখতে পাস, তেমনি শব্দ স্পর্শাদি সকলই এখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। বুকে যেমন সব ভোগের স্পষ্ট অনুভূতি হচ্ছে, তেমনি সাক্ষাৎভাবে জানার কেন্দ্র এখানে দেখতে পাচ্ছিস না ? জানা ব্যাপারটা, ললাটে ছাড়া কোথাও হয় না, যেমন বুকে ছাড়া কোথাও ভোগ হয় না। স্পস্ট দেখতে পাচ্ছিস ? জানার দুই অংশ। জানার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভোগ আছে, সে অনুপ্রবিষ্ট ভোগ নয়। অনুপ্রবিষ্ট ভোগ হল, কোন কিছুর মধ্যে প্রবেশ করে ভোগ করা। জানা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ ভোগ হয় ; কিন্তু এ ভোগ ও হৃদয়ের ভোগে স্পষ্ট প্রভেদ দেখা যাচ্ছে ; ঐ অংশে জানাই ক্রিয়া, এই অংশে ভোগই ক্রিয়া। তোরা যখন কূটস্থ আত্মায় উপস্থিত হবি, তখন ভোগপ্রধান হৃদয় আর জ্ঞানপ্রধান ললাট, এ স্পষ্ট দেখতে পাবি। সমস্ত ভোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে হৃদয়ে এবং এখানে তিনি ভোগময় পুরুষ হয়ে আছেন ; আর ললাটে জ্ঞান-প্রকাশময় পুরুষ হয়ে আছেন, এতে কোন ভুল নেই। পঞ্চ মুখঃ

ফুটিয়ে পঞ্চানন বসে আছেন। আত্মত্বের সঙ্গে মিশিয়ে ভোগ হচ্ছে না, ভোগ্যে একীভূত হয়ে যে ভোগ, তা হচ্ছে না। জানা মানে, খালি আলো, খালি প্রকাশ। তোরা রাস্তায় কত কি দেখছিস, তার ভোগ হয় না; তার মধ্যে কোন কিছুতে একটু আমিত্ব মিশে গেলে, একটু হার্দ্দ ভাব জড়িয়ে গেলে তবে ভোগ হয়। মা এইখানে বসে ভোগ ফোটাচ্ছেন, আর হৃদয়ে বসে আমি ভোগ করছি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? এখানে মায়ের অসঙ্গত্ব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস? জগৎ ফুটিয়ে ধরেছেন, অথচ অসঙ্গ আছেন, পেলি? এসব illustrations কোন শাস্ত্রে পাবি না। এবার কথাটার রস পেলি? একটা নতুন ছবি দেখিয়ে দিলাম। নিজের শরীরে অক্ষর পুরুষের বাসস্থান দেখিয়ে দিলাম; আর কিছু অস্পষ্ট রইল না। এখানে ভোগ হচ্ছে না, শুধু intellect ও feeling বা মন ও হৃদয় যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এ তাঁরই ক্ষেত্র। হৃদয় না থাকলে sympathetic nerve তৈরি হয় না। জ্ঞানক্রিয়ার প্রকাশ হল ওখানে, ফুটল ওখানে, আর অক্ষর আত্মার প্রভাবে সুখময় বা দুঃখময় হয়ে সে ক্রিয়াশীল হল হৃদয়ে। নিজবোধ বলে যে বোধভূমি, সুষুম্না-ভূমি, তার নিম্নাংশকেই আমরা সাধারণতঃ হৃদয় বলি। হৃদয়ের তিনটি অংশ,—হৃ আহরণ, দ দান,. য নিয়ন্ত্রণ। হৃ বুকে, দ ললাটে, য় primal glandএ। নিগুর্ণ আত্মত্ব ফোটানো, ক্ষর-রূপ ফোটানো এবং বিশ্বলীলা সম্পাদন, এই তিনটি তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন।

সমগ্র সৃষ্টি যুগপৎ দর্শনের দ্বারা মস্তিষ্কের পিছনে নিয়ন্ত্রণ করলেন, ললাটে জানারূপ ক্রিয়া করলেন, বুকে বসে ভোগ করলেন। ওখানে লিঙ্গশরীর নিয়ে আমি ভগবানের সঙ্গে মিশে আছি। ঐখানে আমি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, ঐখানে 'জ্ঞ' পুরুষে আছি, এখানে ভোক্তা হচ্ছি। এমনি করে উঠতে থাকলে এবং তিন ভাবে পরমতত্ত্বকে দর্শন করলে, primalএ আমি পরমেশ্বর, এ দেখতে পাব।

ভোগ করা যেমন অনায়াস-সাধ্য, তেমনি ক্ষরত্বকে উঠিয়ে নিয়ে গেলে, আমি যা ইচ্ছা, তাই ফোটাতে পারি বা নিভাতে পারি, এইরূপ প্রভাব অনায়াসে দেখতে পাবি। অসঙ্গত্ব বোধ হলে অবাধ বিভুত্ব এসে গেল। তখন বাস্তবিক আমি সর্ব্বত্র অবস্থান করছি, এই দর্শন হবে। এখানকার সহজ ভাব হল ভোগ-ভাব, ওখানকার সহজ ভাব হবে,—আমিই সব ফোটাচ্ছি, আমি আলো-স্বরূপ, আমার প্রভাবেই এই সব আলো হচ্ছে। আমাকে আবার কে প্রভাবিত করছে, তা পরে বলব।

জ্ঞ+অন্—এইখানে আমার বাসস্থান। এইখান থেকে বহু আত্মা তৈরি হবে। দ্রষ্টা আত্মা, শ্রোতা আত্মা ইত্যাদি এক এক আত্মা এক একবার দেখে বা শুনে অতীত পুরুষ হয়ে গেল, আবার এক এক পুরুষ ক্ষরিত হয়ে এল, আবার অতীত হয়ে গেল। microcosmএ যেমন দেখতে পাচ্ছি, বিরাটেও তেমনি ভাবে তৈরি হচ্ছে; নিয়ম এক, ঘটনাও এক। পরমেশ্বর নিজে রয়েছেন, তাঁ থেকে অসঙ্গ আত্মা জাত হচ্ছেন,

অসঙ্গ আত্মা থেকে ক্ষর আত্মা জন্মাচ্ছে। জ্ঞানভূমিতে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে জীব, অসঙ্গ আত্মা এবং ঈশ্বর নেই। অক্ষরে অব্যক্ত জীব ও অব্যক্ত ভগবান্। এমন অবস্থা হতে পারে না, যেখানে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম নেই। আত্মতত্ত্বে এই তিন পুরুষ যুগপৎ নেই, এ হতে পারে না। সুতরাং 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'; জীব নিত্য, অক্ষর নিত্য, ঈশ্বর নিত্য। যখন তিনি কিছু বলেন না, তখন সব গুটিয়ে গেল। যখন বলেন, তখন অক্ষর জানলেন—আমি অক্ষর আত্মা, জীব জানলে—আমি জীব, জ্বলে মরছি। আত্মমূর্ত্তিতে কি কি মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে? এ সবই আত্মার মহিমা। 'জ্ঞ'য়েতে আর 'অনে'তে যেখানে ঠেকাঠেকি হচ্ছে, সেখানে ভোগ হচ্ছে। যেখানে ভোগ হচ্ছে না, সেখানে শুধু প্রকাশ হচ্ছে। একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এ প্রকাশ একান্ত প্রকাশ, মোটেই সূক্ষ্ম নয়। তোরা চোখের ছ্যাঁদা বড় কর।

হৃদয়ক্ষেত্রে যে আত্মত্ব প্রকাশ হচ্ছেন, তিনিই বিষ্ণু। আমিত্বের সঙ্গে সংযোগ করে, গেঁথে রেখে, তবে আমরা ভোগ করছি। আর ওখানে শিব, নিজত্ব থেকে কেটে বার করে দেখাচ্ছেন, উপর থেকে নেমে আত্মার সংস্কার ফোটাচ্ছেন। আবার নীচ থেকে নতুন সংস্কারকে উপরে তুলছেন, ভগবানে চালিত করছেন। নিম্নাভিমুখী ও ঊর্দ্ধাভিমুখী আলো দিচ্ছেন। আমাদের ঊর্দ্ধাভিমুখী গতি নেই। এই তত্ত্বে দৃষ্টি পড়লে এবার ঊর্দ্ধাভিমুখী গতি পাব; একেবারে ভগবানে চলে যাচ্ছি দেখতে পাব।

এই শরীর হল আমার ব্রহ্মাণ্ড। এর ভিতর কূটস্থ অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর আমি একসঙ্গে আছি। ঐ তিন স্থানেই আত্মত্বের অর্থাৎ জ্ঞানময়ের সংস্থিতি দেখে নিয়েছি। আমি জানছি—আমি দেহী। তোদের আমি বুঝিয়েছি, 'দেহ', এও এক জ্ঞানমূর্ত্তি। কঠিন, বড় শক্ত, এ কার মূর্ত্তি? তেমনি 'দেহ'—এ কার মূর্ত্তি? জ্ঞানের। 'দেহ' এই জ্ঞানায়তন কোথা থেকে বেরোল? প্রকাশ হচ্ছে কোথায়? ভাল করে দেখ, ঠিক ওখানে উঠে যাবি। যেমনি 'জানলাম' বলে জ্ঞান-প্রকাশ হল, অমনি ওখানে উঠে গেছিস্। এই স্থান সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস? বুক ভোগের জায়গা, ললাট দানের জায়গা। মা আমার ত্রিবিক্রম পুরুষ। যাঁতে ফুটে রয়েছিস, তাঁকে দেখতে পাচ্ছিস্? ত্রিপাদ, ত্রিমূর্ত্তি, বামন, এই শরীরের ভিতর তিন মূর্ত্তি ধরে তিনি বসে আছেন। তোদের চিন্তা করতে বারণ করেছি। তোদের সাধনা meditation নয়, গুরুর কথা ধরে রাখাই তোদের সাধনা। 'হ্ন' ত দেখছিস, 'দ'ও দেখতে পাচ্ছিস। এখানে জাগলে আর ঘুম আসে না। 'যস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী' মানেই এইখানে উঠে যাওয়া। এই সব Location, এই মশার কামড়ের দৃষ্টান্ত কোন শাস্ত্রে পাবি না। তোরা স্থূল ভগবান্‌কে দেখ। এই স্থূল জ্ঞানস্বরূপকে যেমনি নিয়ন্তা বলে বোধ করবি, দেবসংস্কার, জ্যোতিঃসংস্কার থাকলে তৎক্ষণাৎ তদাকার হয়ে যাবে। ঋতম্ভরায় যে সারূপ্যের কথা বলেছি, এই গাঁটে উঠলে তৎক্ষণাৎ তা পেয়ে যাবি। মানুষের সঙ্গে দেনা-পাওনার শেষ হয় না।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাতে 'মা' বলেছ কি মা হয়ে গেছ ; এ ছাড়া হবার জো নেই। আমি মায়ের ঘরে ঢুকব, আর মায়ের ঐশ্বর্য্য পাব না, এ হবার জো নেই। এখানে relativity বা আপেক্ষিকতা থাকবে না ; আমি যদি এতটুকু দি ত সে আর এতটুকু থাকবে না। তোর দুনিয়া কোন্‌খানে ফুটছে ? এই মাথাটায় ? তোব হাত-পা সব ফুটছে এরই ভিতর ? গোটা শরীরও ? ভাবিস্‌নে, ভাবলে মাথা ঘুরে যাবে। খালি আমার কথাটা ধরে রাখ। বিস্মৃতি যেন হয় না। 'হৃ' আর 'দ' শিখলেই তার পর 'য়' শিখাব অর্থাৎ নিয়ন্তৃত্ব বুঝাব। যতক্ষণ না 'য' পর্য্যন্ত দেখা হবে, ততক্ষণ বিরাটের সঙ্গে সংযোগ হবে না। এই যে জল নিয়ে, বায়ু নিয়ে বেঁচে আছি, বিরাটের সঙ্গে এতেই আসল সংযোগ নয়। 'য'এ গেলে তখন দেখবি, ও বাবা ! আমি যে সত্যি সত্যি ভগবানের সন্নিহিত। আমার হাত, পা, শিরা, স্নায়ু, রস, সবই ব্রহ্মস্ফুরণ, আর কারও স্ফুরণ নয়। তখন প্রকৃতই দেখবি—'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।' তখনই হৃদয়ের কথা শেষ করব। সেইখানেই কালের বীজ আছে। নাস্তিক কখন এই জ্ঞান নিতে পারবে না। 'তুমি রয়েছ, তোমাতে এই সব ফুটে রয়েছে', এই জ্ঞানকে ভূমি করে যে না উপদেশ শুনবে, সে হল নাস্তিক।

সাধনা মানে, ভগবৎ-সম্বন্ধে কোন চিন্তা নয়। খাচ্ছি-দাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, এর মধ্যে যখনি ভগবান্ সম্বন্ধে অস্তিত্বজ্ঞান এসে গেল, অমনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলুম, তাঁর পায়ে মাথা ঠেকালুম।

এই গুরুবোধ যেন তোদের সর্ব্বদা ফুটে থাকে। এই জ্ঞান কে দিলেন? জ্ঞান-গুরু? আহা! দেখ না। গুরু এই মূর্ত্তি ধারণ করলেন? ভূতেতে, স্থূলে তাঁর প্রতিবিম্ব খেলে গেল। যথার্থ বিম্বিত হলেন কে? গুরু! গুরু ভিন্ন গতি নেই, এখন বুঝতে পেরেছিস?

২৮এ নবেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার।

ভগবানের স্থান আমরা দেখে নিয়েছি। আদি বিরাট্ পুরুষ, বৈরাজ পুরুষ, যিনি বিরাট্ অভিমানে এই বিশ্বে বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার যোগ কোথায়, তা দেখে নিয়েছি। তিনি স্বয়ম্ভু শিব। তাঁর সঙ্গে আমার যোগ ব্রহ্মরন্ধ্রে। এই ভগবানের এত সান্নিধ্য পেয়েও এখনও দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জীব-ভাব যেমন প্রবলভাবে কাজ করছিল, তেমনই করছে। অথচ এই অজ্ঞান জীবত্ব দূর হওয়াই তাঁর কাছ থেকে এখন একমাত্র প্রাপ্তব্য। যা কিছু পাচ্ছি, তাঁরই কাছ থেকে পাচ্ছি, এতে ভুল নেই; কিন্তু তিনি দিচ্ছেন বলে সে সব গ্রহণ করছি না; তাই প্রাপ্তির পরিমাণ এত কম। আমরা খণ্ডিত জীব, তাই সীমাবদ্ধ প্রাপ্তি, সবই অন্ধকার। এখন দুই ভাবে আমরা ভগবানের কাছে এগোতে পারি; তাঁর দুরকম সংস্থিতি আছে। এক—ভোগময় সংস্থিতি। আমরা ভোগের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত; তাই 'ভগবান্, ভগবান্' বললেও 'এ চাই, ও চাই'

বলে ভোগের ভাবই জাগ্রত হয়ে ওঠে। ভগবানের 'দেব-' ভোগই আমাদের উপর আধিপত্য করে, ভগবান্ আধিপত্য করেন না। আমরা শিবত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি; তাই আমাদের প্রাণ খণ্ডিত হয়েছে; সেই খণ্ডিত প্রাণই আমাদের এই ভোগমত্ততার কারণ। ভগবানের অস্তিত্ব-বোধ আমায় অধিকার করে নেই বলে এই ভাবে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছি, আস্তিক্য-বোধ হারিয়েছি। তাতে তত দুঃখ ছিল না, যদি তাঁর জন্য কামনা থাকত; তাঁকে হারিয়েছি; কামনা থাকলে আবার বার করে নিতে পারতুম। কিন্তু ভগবানের কামনা পর্য্যন্ত নিভে গেছে; কোন মতে জীবনটা কাটান, আর ভগবানের দিকে একটু চোখ রাখা মাত্র।

এই যে ভোগমত্ততাময় পুরুষ, এই ভোগমত্ততা আর মদমত্ততা একই কথা। এইরূপ মদভাবের ভোক্তা বলে পুরাণে ঋষিরা আমাদের নাম দিয়েছেন—'মদন'। এই মদনকে গুঁড়িয়ে অনঙ্গ করতে হবে। মহাদেব তপস্যা করছেন, উমা সেখানে উপস্থিত; তখন সেখানে মদন গিয়ে উপস্থিত হল। তাতে শিবের রোষ-বহ্নিতে মদন ভস্ম হয়ে গেল। ভস্ম হয়ে, অনঙ্গ হয়ে, অঙ্গহীন হয়েই জীবিত রইল। এই জন্য এত করে তোদের অসঙ্গ-তত্ত্বকে অবলম্বন করতে বলি। তা না করলে ভস্ম হবি। শিবের কাছে গেলেই মদন হবে অনঙ্গ পুরুষ; অঙ্গের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, এই বোধে সে উজ্জীবিত হবে। আমরা যখন অসঙ্গ-বোধে যাই, তখন অনঙ্গ হই?

'আত্মা আত্মনি আত্মানং বিন্দতে' এই হল গুরুর উপদেশ। আত্মাতেই পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা লাভ করবে, হাত-পা দিয়ে লাভ করবে না। কেমন করে ভগবানের কাছে যেতে হয়, তা এই গতি, এই উপদেশ কি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলে। আত্মবোধ ভিন্ন, সুষুম্না ভিন্ন ভগবানে যাওয়া যায় না। ভগবানে গেলেই 'আমি পাচ্ছি', 'তিনি দিচ্ছেন', এ ছাড়া অন্য দর্শন হবে না। আমিই আত্মতত্ত্ব থেকে বহুধা হয়ে বেরোচ্ছি। আগে ছিল —'অন্যে দিচ্ছে, আমি পাচ্ছি।' আত্মবোধে প্রবেশ করলেই 'আমি অনন্ত মূর্ত্তিতে প্রতি শব্দের আকারে বেরোচ্ছি।' ও ভূমিতে আর কোন উপলব্ধি নেই। 'আমি'ই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, ব্রহ্ম হলাম; এই বোধই ঈশ্বর-বোধ। ঋষিদের বর্ণনা এই রকমই দেখি। ও স্তরের উপলব্ধিই এই রকম। এই ঈশ্বর-ভূমিতে গিয়ে পড়লাম, এইরূপ জ্ঞানের প্রকাশ হল। তার পরে ঐশ্বর মহিমা, ঈশ্বরের শক্তি আমাতে খেলা করবে, যেমন জলে নামলেই ঠাণ্ডা অনুভব হয়। এই হল ভগবানে প্রবেশের সার্থকতা।

"এবার ঠাকুর সব ঢেলে দিলেন," এই দিকে চোখ থাকলে হবে না। অসঙ্গতত্ত্বে, অসঙ্গ আত্মত্বে অবস্থান না করলে কিছু হবে না, যেমন ঈশ্বর আপনিই সব হয়েও আবার আপনি কিছুই হননি, এইরূপ দেখতে পাচ্ছেন। আমরা যদি ভোগ-বৃত্তিতে ঢুকে পড়ি, তবে ঈশ্বরের শক্তি আসবে না; সতী মরে যাবে, আস্তিক্যবোধ হারিয়ে যাবে। অসঙ্গ আত্মবোধ ছাড়া ও ভূমিতে

খাওয়া যায় না। ভগবদ্‌বুদ্ধি এলেও বুকের যেটা প্রধান ভাব, সেই ভাবের গন্ধই বেরিয়ে থাকে। যেমন ভগবদ্‌ভাবে, অসঙ্গ-ভাবে ঢুকে থাকলে, সংসারের কাজ করতে গেলেও অসঙ্গতার গন্ধ থাকবে, খেয়েও খাচ্ছি না, মেখেও মাখছি না, এইরূপ। ভগবান্ সেই ভাবে বিশ্ব দর্শন করেন—'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।' যে মুহূর্ত্তে আত্মতত্ত্ব কোন বস্তুর সারূপ্য নেয়, সেই মুহূর্ত্তে সেই বস্তুর এমন কিছু বাকী থাকবে না, যেটি 'আমি' নই, যেটি আত্মসাৎ হয়নি। এইরূপে গ্রহণ করার মানে—চরাচরগ্রহণ। জীবভাবেব ভোগে চরাচরগ্রহণ হয় না। নিজে সমগ্ররূপে তাই হয়ে গেলাম, এমনি ভাবে যে বোধ হল, সেই হল আত্মত্বে চরাচর-গ্রহণ। সাধারণ ভোগের মধ্যে থাকে নিম্ন হৃদয়। তুমি দিলে খানিকটা, আমি দিলুম খানিকটা, মেপে মেপে দেওয়া নেওয়া; একেবারে নয়, খানিকটা খানিকটা। আত্মত্বের দেওয়া নেওয়া সেরূপ নয়। আত্মা যাকে নেবে, আত্মভূমি একেবাবে তাই হয়ে যাবে। এ ভদ্রতার দেওয়া নেওয়া নয়, একেবারে পূর্ণভাবে দেওয়া নেওয়া। আমরা বলি,—"তুমি আমার বড় আপনার।" কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় বস্তু চাইলেই বলি,—"ওটা হয় না ভাই।" সম্পূর্ণরূপে আমি তাই, এই কথা বলতে গিয়ে কি আত্মবোধ ফুরিয়ে যাবে? কখনই না; বরং আত্মবোধ অধিকতর ফুটে উঠবে; এই হল অনন্তের ধর্ম্ম। আমি যত পূর্ণমাত্রায় তাতে ঢুকব, তত সে ঢোকা-আমি, মূল আমা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে;

আবার আর একটা 'আমি' ফোটাব। মূল 'আমি' যেমন আছি, তেমনই থাকব। 'আমি অমুকচন্দ্র অমুক' এ কথার মানে, তুমি আত্মবোধে ঢুকে বলছ না; অনুপ্রবিষ্ট জীব হয়ে, আচ্ছন্ন হয়ে বলছ। যদি পূর্ণমাত্রায় কাকেও আত্মদান করতে পারি, তবে দেখব যে, আমি পূর্ণ হয়ে গিয়েছি; অথচ আমি যেমন তেমনই আছি। আত্মার বহুলা-ধর্ম্ম এইখানে সার্থক হয়।

আত্মা যতক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা সমাচ্ছন্ন, ততক্ষণ সে গ্রহীতা; যা পায়, তাতেই ডোবে, খণ্ডিত হয়ে যায়। কিন্তু ঐশী ভূমিতে গিয়ে দেখে, আমিই তাই হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, অথচ আত্মত্বের বাইরে নয়; চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ, দেবতা, সব হচ্ছি, অথচ যেমন আত্মা, তেমনি আছি। হর হর শিব শিব শম্ভো!

সেই জন্য আগেই বলেছি, প্রতি বোধের তলায় তলায় আত্মাকে দেখ। যা ফুটছে, তাতে আত্মা রয়েছেন। আত্মাতেই জল খাই, ভাত খাই। স্ত্রীকে দেখে আত্মাকেই দেখি, জল দেখে আত্মাকেই দেখি ইত্যাদি। বুদ্ধি দিয়ে যেও না, আত্মা দিয়ে যাও, রাস্তা ঠিক হবে। খালি লিখছিস, দেখে দেখে লিখছিস?

এই পর্য্যন্ত বলে দিয়ে জ্ঞান-দান সমাপ্ত করতে পারতাম। ঋষিরা তাই করতেন। কিন্তু এ বড় দুর্গম যুগ—সবাই স্থূলে প্রমাণ দেখতে চায়; জড়ে একটু দেখিয়ে দিন, তবে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। প্রজ্ঞা পেলে অবশ্য জড় তাদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে যেত। কিন্তু লোকের এখনও জড়-কাঙ্গালীত্ব এত বেশী যে, এরা জড়ভূমিতে ক্রিয়া না দেখলে নিশ্চিত হয় না। সামান্য

নেশা চড় মেরে ভাঙ্গান যায়, কিন্তু আফিমের নেশা সহজে ভাঙ্গান যায় না। ঘোরতর মদন পেয়ে বসেছে, তাই জড়-শক্তিতে ফুটিয়ে না দেখলে হয় না। তখন এর প্রতিষেধক ছিল। গুরু একটু জ্ঞান দিয়ে বনে পাঠিয়ে দিতেন—যাও, তপস্যা কর, গরু চরাও, স্থিতিশীল হও। এখন যদি বলি, নৈমিষারণ্যে গিয়ে তপস্যা কর, তবে তার কোন ভরসা থাকে না। তপস্যা করতে পারব না, খাটাখুটি পারব না—অথচ ভগবান্‌কে চাই। কি চমৎকার!

কি হয়েছে? এই যে মদনগ্রস্ততা, মত্ততা, এতে প্রকৃত ব্যাপার কি হয়েছে? আমাদের সতী, সৎবুদ্ধি, আস্তিক্য-বুদ্ধি মাটিতে নেমে গেছে, দেহাশ্রিত হয়েছে। সেই জন্য মাটি না হলে নিজের পরিচয় দিতে সমর্থ হই না। কোথায় জীবের সে সতী? মূলাধারে। মা আমার মাটি হয়ে মূলাধারে মিশে আছেন। মাকে যদি জাগাতে হয় ত সেখান থেকেই জাগাতে হবে। কি সুন্দর গতি! বুকের ভিতর খাবার-ঘরে মাকে ধরিয়ে দিলেন; সেখান থেকে নিয়ে গেলেন অসঙ্গের ঘরে; তার পরে ফেলে দিলেন মাটিতে। আমরা মাটি-কামড়ান জীব কি না, তাই মাটি থেকে মাকে তুলতে হবে। এই জ্ঞান শিখাবার জন্য তন্ত্র এল। মাটিই যখন একেবারে মানুষের লক্ষ্য হল, তখন ঋষিরা কুণ্ডলিনী নাম অবলম্বন করে তাঁকে বিশেষ ভাবে জাগাবার জন্য চক্র বিভাগ করে সাজিয়ে দিলেন। যেমন বেদব্যাস বেদের বিভাগ করলেন, সাজালেন। ঋষি বললেন,—"বৎস, এই যে বিরাট্

পুরুষ, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজ করছেন, যাঁকে ব্রহ্মরন্ধ্রে দেখলি, তাঁকে এইখানে দেখ।" Practical sideএ চলে আয়। Theoretical জ্ঞানে আত্মবোধ পরিস্ফুট হলেও এই শরীরে কি ভাবে ঈশ্বরত্ব ফুটে আছেন, মূলাধারে—আপনার ঘরে তা দেখ ; তবেই বিরাটের সঙ্গে যোগ পাবি। নিজের ঘরে শব্দ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব পেলে, বিরাটেও তাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব পাবি। এই সকল মাটি-জলকে কেমন করে আমার অঙ্গীভূত করে, জ্যান্ত করে রেখে দিয়েছেন, তাই দেখ। এই জীবনময়ীকে দেখ। দেখ, তিনি কেমন করে শিবের ঘরে যাতায়াত করছেন এবং সেই যাতায়াতে এই শরীরের জল-মাটিকে প্রাণবন্ত করছেন, তোর ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ধরে একটা নির্দ্দিষ্ট ভোগ স্পষ্টভাবে তোকে দিচ্ছেন।

"মশায়, দেহ ত চলে যাবে ; সুতরাং দেহে এ সব দেখার প্রয়োজন কি ? শুধু বিজ্ঞান জানলেই ত হল।" একটা লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পাবি। এত করে পেয়েও যাকে মেনে উঠতে পারছি না, এই লজ্জা। তাঁতেই সর্ব্বতোভাবে বসে আছিস দেখছিস ? আমার মুখ দেখছিস কেন ? তোদের মুখ দেখলে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' দেখতে পাচ্ছিস ? সাধারণ জীবের বুদ্ধি নিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করলে কিছুতে তাঁতে প্রবেশ করতে পারবি না। তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ গুরু, তাঁর কাছে বসে শোন্। তোরা সেরূপ করিস্ না বলে আমার বলার ইচ্ছা কুঁচকে যায়। নমো নমো নমঃ !

জ্ঞানময় গুরুকে কখন অবহেলা করিস না। জ্ঞানস্বরূপকে সর্ব্বদা উদিত ও সপ্রকাশ রাখ। উনি কারও অধিকার-সম্বন্ধ পুরুষ নন। এমন গুরু, ভোলা মহেশ্বর আর আছে? আমরা ঠিক তপস্যা করছি। মেরে ধরে এগোতে চেষ্টা করছি। এই জ্ঞান-তত্ত্বকে ঠিক ভাবে ধরে থাক। এই জ্ঞানরূপ বিল্ববৃক্ষ দিয়ে তাঁকে মারছি, কি পূজা করবার জন্য এনেছি, তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি সবেই বলেন,—"বরং বৃণু।" এমনি বিজ্ঞান এই প্রাণ-বিজ্ঞান। মাটি, জল, এই সব মাখাতে চলেছিস এমন ভূমিতে, যেখানে ফুলের ঘা সয় না। অথচ এই যে ভূমি, এমন আত্মভোলা পুরুষ সে, আপনাকে দিগ্‌দিগন্তে বিতরিত করছে, বিলিয়ে দিচ্ছে, আর বলছে—'বরং বৃণু'। আত্মত্ব ছেড়ে চলেছিলাম যে মাটি জলে, তাদের আবার জ্ঞান-মূর্ত্তি বলে দেখলেই তাতেই তাঁর পূজা হয়ে যাবে, এমনি সে আত্মভোলা পুরুষ। সাংঘাতিক দেবতা!

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার।

জ্ঞানস্বরূপ পরম দেবতায় আমরা সজ্ঞানে, না মরে, ডোববার চেষ্টা করছি। তাতে আমাদের হাত-পা বন্ধ হয়ে যাবে কি না, এ সব ভাববার দরকার নেই। 'নৈষ্কর্ম্ম্য' মানে, একেবারে জড় স্থবির হয়ে বসে যাওয়া অথবা সব করেও কিছুতে লিপ্ত না হওয়া। প্রথমটি নন্দীর সাধনা, দ্বিতীয় ভৃঙ্গীর সাধনা। কোন

কোন ঋষি বলতেন,—'অবাক্ অনাদর ব্রহ্ম'; তাঁদের আর 'ভগবান্' শব্দ উচ্চারণ করবারও দরকার হত না। যেমন তুমি বামনদাস; তোমায় কি আর বলে বেড়াতে হচ্ছে যে, তুমি বামনদাস? এ তোমার স্বতঃসিদ্ধ; তেমনি তাঁদেরও। ঋষি হয়েও দেবতাদের শশব্যস্ত করে তোলা যায়, আবার অসুর হয়েও দেবতাদের সন্ত্রস্ত করা যায়। আমরা এখনও দেবতাদের কবলে আছি; তবু তাঁদের শশব্যস্ত করছি। দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিকূল। তাঁদের সন্তুষ্ট করে ব্রহ্মে যেতে হবে, অথচ তাঁরাই অন্তরায়; কেন না, জীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তিতে তাঁদের যজ্ঞভাগ অর্থাৎ এক একটি বলি ফুরিয়ে যায়। তাই দেবতাদের অন্তরস্থ আত্মাকে দর্শন করে প্রার্থনা করলে তাঁরা আর অন্তরায় হন না। নয় ত জীব-সকল দেবতাদের পশু। সৃষ্টিতত্ত্বে আমরা দেবতাদের পশু; দেবতারা আমাদের পুষ্টিকারক। কিন্তু আত্মবোধে তাঁদের কাছে প্রার্থনা করলে তাঁরা প্রসন্ন হয়ে পথ ছেড়ে দেন। আমাদের শরীরের যত কিছু শক্তি, প্রত্যেকে এক এক দেবতা; তাঁরা শরীর নিয়ন্ত্রিত করছেন। দেবতা বলছেন,—'দেখ, কেমন ভূত রচনা করেছি।' আমার ব্রহ্মজ্ঞতা বলছে,—'যা-ই রচনা হক, তা আমার আত্মত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি দেখছ—ভূতমূর্ত্তি, আমি দেখছি—চেতনতত্ত্ব।' দেবতা মানেই জল প্রভৃতি এক এক শক্তির এক এক অভিমানী পুরুষ; এক এক শক্তির কেন্দ্র। আমরা ভূতে ও আত্মায় মিশ্রিত, ওঁরা শুধু শক্তি-অভিমানী। আমরা অত্যন্ত

সীমাবদ্ধ, একেবারে ভূতের দ্বারা আচ্ছন্ন। ওঁরা মনোময়, ভূতের স্রষ্টা; তাই ভগবানের সান্নিধ্য ওঁদের বেশী। আমাদের ভূত-বিধারক প্রাণাংশে প্রাধান্য, ওঁরা মনোময়, ওঁদের মন-অংশে প্রাধান্য। "...এতানি সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি", জ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াংশ বোঝাবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ নাম। শরীরের কাঠিন্য, পরিধি ইত্যাদি দেখে তোরা নিজেকে ভূতময় বোধ করছিস্। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ-ঐ-রূপে জ্ঞানকেই উপলব্ধি করছিস। শরীর গোটাটাই উপলব্ধি; কর্ণ, চক্ষু, যকৃৎ, পিলে, ইত্যাদি উপলব্ধির সমষ্টির নাম শরীর। এই মনোময় শরীরই হল দেবতা। শরীরকে দেবময় দেখে যদি মৃত্যু হয়, তবে দেবলোকবাসী হবি। মা-এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকে দেবত্ব অর্থাৎ একটা ভূতের উপর নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃত্ব দেন। এঁরা বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি হন, সেই সেই ভূতের উপর আধিপত্য করেন। কিন্তু মনোময় জলজ্ঞান ইত্যাদি এঁরা যেই হারাবেন, অমনি নেমে আসতে হবে; আবার শুধু ভূতময় শরীর হবে।

আমি জ্ঞানভূমির কথা বলে দিয়েছি। জ্ঞানভূমি মানে, 'অন'-ভূমি, আর 'জ্ঞ'-ভূমি। 'অন'-ভূমি হল গ্রহীতা—নিজেকে চারি দিক্ থেকে টেনে টেনে সংগ্রহ করাই হল অন-তত্ত্বের ধর্ম্ম। সুতরাং এই অংশের ধর্ম্ম বা শক্তি হল সংগৃহীত করা, রূপান্তরিত করা। জ্ঞ-তত্ত্বের ধর্ম্ম হল অনন্তে বিভক্ত হওয়া। 'অন' একীভূত হয়, দশটা নিয়ে একটা হয়ে যায়; আর 'জ্ঞ' আপনাকে দশটা করে। আমার মন সূর্য্য দেখলে; দেখে, আগে সূর্য্যের

রূপ নিলে, তার পর তার আয়তন নিলে। ভগবানের বিশ্ব-রচনা থেকে আমার বিশ্ব-রচনায় প্রভেদ এই যে, তাঁতে যুগপৎ সবই ধরা রয়েছে, সবই স্থিতিবান্ সত্তা; আর আমার মন পর পর এক একটি গুণ ফোটাচ্ছে মাত্র। আমার সূর্য্য দেখা মানে, এক ক্ষণে সূর্য্যের রূপ, পরক্ষণে আলো ইত্যাদি দেখা। কিন্তু যিনি সূর্য্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি একেবারে ভূতি-মূর্ত্তিতে সূর্য্য হয়েছেন, সে সূর্য্য একটা বাঁধা মূর্ত্তিতে চল্‌বে, অনন্ত কাল একই রকমে চলবে। অক্রমদ্রষ্টার সূর্য্য ভূতি, ক্রমদ্রষ্টার পর পর সূর্য্যের অনুভূতি। এখন যে পরিমাণে আমি যৌগপদ্য নিতে পারব, সেই পরিমাণে তাঁর শক্তিত্ব আমাতে আসবে। আমার পুঁজি মাত্র মন; সে অণুস্বরূপ; একসঙ্গে একটি ছাড়া দুটি সে গ্রহণ করতে পারে না; তাই কখন রং, কখন আকৃতি মাত্র সে গ্রহণ করছে। আমি সেই মনে অনুপ্রবিষ্ট; সে মন যতটুকু দেখছে, আাম ততটুকু নিচ্ছি। কিন্তু আমি যদি জানতুম, এই যে মন, একে আমি বহু হয়ে বহু করতে পারি; যে পরিমাণে আমি বহু হয়ে যাব, সে পরিমাণে মনও বহু হবে; আমি একসঙ্গে দশ জন হলে আমার মনও দশটা হয়ে সূর্য্যকে দেখবে, তা হলে আর এরূপ অবস্থা থাকত না। মন শুধু যোগ করায়, দ্রষ্টৃত্ব আমার কাজ। যেটুকু মনে আমি ডুবে আছি, সেইটুকু মনই খেলা করবে। আমি সীমাবদ্ধ হয়ে যেটুকুতে আচ্ছন্ন আছি, ততটুকুই দেখব। কিন্তু আমি যদি নিজেকে অনন্ত বলে জানি, তবে আমার মনও আনন্ত্য পাবে। তখন সূর্য্যের সব গুণ একসঙ্গে

মনে সমাবেশ হবে। বড় দামী কথা এই যে, আত্মা আপনাকে বহু করতে পারেন। তুমি একসঙ্গে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দর্শন করতে পার না; কারণ, তুমি মন দিয়ে দেখ। কিন্তু যে আত্মা শরীরকে ধরে আছেন, তিনি সব শরীর একসঙ্গে দেখছেন। আমি বহু হয়ে দেখছি, একসঙ্গে ষোলটি আত্মার ভোগ্য ভোগ করছি। কি সুন্দর ভাবে ওখানে ঐটি দেখছি, এখানে এইটি দেখছি। 'তদ্ধাবতোঽন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ।' মন, ইন্দ্রিয়, সবকে অতিক্রম করে আত্মা দর্শন করেন। তোমাদের দেখা মানে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার পর পর দেখা। আত্মার দর্শন ঠিক এর বিপরীত। প্রথমে আত্মা গিয়ে বৃক্ষরূপ গ্রহণ করলে, তাঁর পিছনে পিছনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় যায়। আত্মদেবতা আগে আলোময় করেন, প্রকাশবান্ করেন; আগে চেতনা যান; তার পর বুদ্ধি-মনঃক্রিয়া, তার পরে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। আগে আলো, পরে আর সব। সূর্য্যের আলো বাঘছালের উপর পড়েছে বলে তোমার মন ইন্দ্রিয় একে গ্রহণ করছে; অন্ধকার থাকলে তোমার মন-আদি একে দেখত না। ঠিক তেমনি আগে আত্মদেবতা গিয়ে প্রকাশ করেন। চেতনা না থাকলে মন কাজ করে কি? মন কাজ না করলে ইন্দ্রিয় কাজ করে? চেতনা না ঠেকলে সবই অব্যক্ত, অন্ধকার। সুতরাং আমার মা না গেলে কেউ কোথাও ফোটে না। মা যদি আগে যান, তবেই বৃক্ষ, স্ত্রী-পুত্ররূপ, অন্ন ভোগ করি। যেটি ভোগ করতে হবে, মা আগে গিয়ে সেটি না দিলে ভোগ করার উপায় নেই। এত vivid মা; তাঁকে দেখতে

পাচ্ছিস না? নমস্তে! মানুষ, গাধা, ঘোড়া দেখছিস, সুখ পাচ্ছিস। কেমন করে পাচ্ছিস? মা না দিলে একটাও পাচ্ছিস? কত সহজ কথা। নমো নমঃ!

'চিন্ময়' শব্দের মানে বুঝিস না, তাই মা পালিয়ে যান। তোরা খালি 'চোখ' অভ্যাস করেছিস। চোখ দেখে, মন ছুটো-ছুটি করে, দিবানিশি এই সব নালিশ। মন বেটা পালিয়ে যায়, আমি কি করব? এই তোদের অভ্যাস! মানে বোঝ। গুরুকে লাভ কর্। এ দিকে বলছিস, যা কিছু দেখছিস, সব্ জ্ঞানকেই দেখছিস; তার মানে, ওটা জ্ঞানক্রিয়া। চেতনার দুই অংশ; এক অংশে ক্রিয়া, এক অংশে আলোর মত পড়ে থাকা। তলার অংশ না ধরলে কোন জ্ঞানক্রিয়া হয়? সূর্য্যের আলো খড়মে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার মানে—খড়ম দেখা। বৃক্ষ দেখছি মানে, আত্মদেবতার আলো বৃক্ষমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ হল জড়ের দৃষ্টান্ত; জ্যান্তের দৃষ্টান্ত ধর। মা আমার, চেতনা আমার দৌড়ে গিয়ে ওখানে দাঁড়ালেন। তোদের ভাষা বোকার ভাষা; কি বলছিস, তা জানিস না। পাগলা ভাষার অর্থ নেই। মা ওখানে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, এর নাম হল ভাষা ফোটা; কথা এখানে অব্যক্ত হল। যা! চিন্ময়ী মা! মুহূর্ত্তের মুহূর্ত্তের দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি কে রচনা করছে? চিন্ময়ী! আর নিজবোধ কে রচনা করছে? মা? এর চেয়ে গুরু আর কি খুলে দেবে? 'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' আলো ছাড়া কোথাও ফটো ফোটে—প্রকাশ হয়?

'অনেজৎ একং মনসো জবীয়ঃ।' অচেতন-শক্তির খেলার দিক্ দিয়ে নিও না; 'একজন'—এই চোখ দিয়ে নাও। মা একজন, এ কথা স্থির। মা মনের চেয়েও গতিশীলা; দেবতারা ছুটে গিয়ে দেখে, আমরা পরে এসেছি; মা আগে এসে গেছেন। আত্মা, যে আমার সব, সে আগে গিয়ে হাজির হয়েছে, তবে আমাকে ভোগ দিচ্ছে। চিন্ময়কে চিন্ময় বলে বুঝতে চেষ্টা কর। তাকে যদি বাহ্য-শক্তির মত দেখিস, তবে রস পাবি না; বিজ্ঞান পাবি। সে নিজে আমার মা; এই আত্মা, যাতে আমি জাত হয়েছি, সে নিজে গিয়ে সেই সেই রূপ ধরে আমায় সব ভোগ করতে দিচ্ছে; এ ছাড়া আর অন্য কথা নেই। আর শোনবার কোন কথা আছে? যার আছে, সে এখনও চিন্ময়ীতে শ্রদ্ধাবান্ হয়নি। লুটিয়ে পড়া ছাড়া, একেবারে বদ্ধদৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছু আছে? এ কি? এ মাকে খুঁজে বার করতে হবে? একটা মেলা বসেছে; রাশি রাশি স্ত্রীলোক সেখান দিয়ে যাচ্ছে; তার মধ্যে আমি আমার মাকে খুঁজতে গেছি, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে দেখছি—এই কি মা? এই কি মা? মায়ের **similarity** সব স্ত্রীলোকেই রয়েছে; তাই আমার চোখ 'এ কি মা, এ কি মা?' বলে খুজছে। কিন্তু কোনও অসৎচরিত্র লোক তার মধ্যে গেলে সে প্রতি স্ত্রীলোকে অসৎ ভোগ খুঁজবে। আমরাও তেমনি এই জগতে খুঁজছি, কেমন করে ভোগ পাওয়া যায়, কেমন করে মান পাওয়া যায়। কিন্তু যে মা খুঁজতে বেরোয়, সে ভাবে, হয় ত ঐ মা! আজ আবার গুরু

এমন জ্ঞান দিলেন,—'তোর মা এক জায়গায় নয়, সব জায়গায়ই তোর মা।' নমঃ! কে রে! মা, তুই দাঁড়িয়েছিস্—এই সব ঘর-বাড়ী, লোক, এই সব মূর্ত্তি ধরে! তুই দাঁড়িয়েছিস! অহো! ভোক্তাংশ যখন দেখতে পাচ্ছে, তখন দাতা-অংশ নিশ্চয় দাঁড়িয়েছে। ভিখারীর খাওয়া দেখলেই বুঝা যায় যে, দাতার দেওয়া এইখানে হয়ে গেছে। আত্মাকে খুঁজে পাইনি মশায়, এ কথা আর বলবি? মায়ে সব ভরে গেল রে! 'আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।'

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" মা আমার আত্মত্বের প্রভাবে সর্ব্বদা বহুরূপ ধারণ করছেন। যখন সংসারে মগ্ন থাকবি, তখন পূর্ণমাত্রায় না ধরতে পারিস; কিন্তু যখনি একটু নিরিবিলি হবি, দেখবি,—মাকে ছাড়া আর কাকেও দেখছিস্ না। এই গুরুবাক্য অপৌরুষেয়। কালের পর কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এ বাক্যের অন্যথা হয়নি। সনাতন পুরুষ সনাতন ঋষির মুখ দিয়ে এ বাক্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এরকম আলো নিয়ে ত আগে দাঁড়ায়নি। এ শ্লোক কত বার মথিত হয়েছে; কিন্তু এমন সজীব হয়ে ত দাঁড়ায়নি! ঋষির মন্ত্রের দর্শন হল? এইরূপ ভাবে অর্থ গ্রহণ করতে পারলে মন্ত্র পরিগৃহীত হয়। এর নাম মন্ত্র-দর্শন। মা খোঁজবার জিনিষ, না জগৎ খোঁজবার জিনিষ? এর নাম 'অবাক্ অনাদর ব্রহ্ম।' পরের মাকে মা বললে সে বশ হয়। ঘরের মাকে গাল দিলেও সে মা হয়েই আছে!

গ্রহণ অংশ যা, তা তোদের বললুম। এখানে কোন ভাষ্য-কার উপস্থিত থাকলে তাকে বলতুম, তোমরা কত ভুল অর্থ করেছ। শঙ্কর বলেন, মায়াময় মনের গতিতে বোধ হয়, যেন আত্মা গতিশীল। কিন্তু চেতনতত্ত্ব জানা থাকলে তিনি ও কথা বলতেন না। তিনি লেখবার সময় চেতনতত্ত্ব ভুলে গেছলেন, জড়-শক্তির দিকে চোখ রেখেছিলেন। নতুবা ঋষি যে আত্মার বহু হওয়ার কথা বলেছেন,—সে কিরূপে হয় ?

এইরূপে না দেখতে শিখলে আত্মতত্ত্বে—মায়ের ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হয় না। মন প্রাণের কথা নয়, আত্মবিজ্ঞান কেমন করে খেলা করে, তাই দেখাচ্ছি। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ঢের বলা আছে। এ পর্য্যন্ত চেতন-বিজ্ঞান যারা লিখেছে, সে সব মনো-বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। যেখানে কিছু দর্শন হচ্ছে, তার মানে, আগে সেখানে আত্মা গেছেন, তার পরে মন গেছে, তার পরে ইন্দ্রিয় গেছে। এ ছাড়া কোন ক্রিয়া হচ্ছে না। তিন জন্ম পাত করেও তোরা এই কথার দাম দিতে পারবি না। কোন্ চোখে জাবাল বলেছিল,—"গুরু, আপনিই আমায় সব জ্ঞান দিয়েছেন।" সে বুঝেছিল, গুরু মানে—আত্মা। এ কোন মিথ্যাচার নয়, সরল সত্য। পূর্ণমাত্রায় অনুভবে সে বলেছিল, "গুরু, আপনিই আমায় হংস প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করে জ্ঞান দিয়েছেন।" এখন বুঝলি, ঋষিরা কেন বলেছেন,—সব জায়গায় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না ? ব্রহ্মজাল পড়ে গেছে ! আর কোথাও যাবার জো আছে ? একটা জায়গায় মিষ্টান্ন

বসান থাকলে, পরে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও সেখানে দশ হাজার পিঁপড়ে আসে। এই জ্ঞানস্বরূপকে তেমনি আমি এখানে, ওখানে, সেখানে, সব জায়গায় দেখব; প্রতি ভোগে আমার স্মৃতি আসবে,—এ ভোগ আর কেউ দিলে না, মা-ই দিলেন! এ মা-ই যে! এ মা-ই যে! এইরূপ দর্শন করতে থাকবি। সুতরাং 'আত্মদেবতা' বলতে আত্মানামীয় একটা পোঁটলা নয়, একটা বৃত্তি নয়, চির-উজ্জ্বল অনন্তস্বরূপিণী মা আমার। এই তত্ত্বের এক অধ্যায় বলা হল। পরের অধ্যায় বাকী আছে। তা একটু বিশদ করে বলতে হবে; মনে করিয়ে দিও।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা।

চামড়ার ভিতর যেমন শিরা পাই, তেমনি নিজের জ্ঞানের ভিতর ঢুকলে তাতে ভগবান্‌কে পাই। ভগবতী রয়েছেন ঠায়, এই জিনিষটির উপর তোমরা বিশেষ জোর দেবে। জ্ঞানক্রিয়ায় তাঁকে সৃষ্টি করা হয় না, তাঁতে পৌছান হয়। তোমরা এই বিষয়টি সংকল্পবদ্ধ করে নেবে,—"এই যে জ্ঞান পেলুম, এতেই আমি স্থির থাকব।" তোমাদের আর কোন শক্তি নেই, শুধু সংকল্পের শক্তি আছে। "এই জ্ঞানের সান্নিধ্যে, এই অবস্থায় স্থিতিবান্ হই," এইরূপ সংকল্প করবে। এই ত যোগ অভ্যাস—না?

বিভু ভগবান্ আমার আপাদ-মস্তক ধারণ করে রয়েছেন, এতক্ষণ আমি তা দেখছিলুম না। আমার উর্দ্ধে, অধে, বাইরে, আবার আমার মূলেও। আমার দৃষ্টি মানে, আমার জ্ঞান যেখানে গিয়ে ঠেকছে, আর আর সব ভেদ করে তোমাতে গিয়ে ঠেকে, তবে নিরস্ত হচ্ছে। এ ভিন্ন আমার দৃষ্টি আর কোথাও ঠেকে না, আটকায় না।

নিজত্বকে একটি **definite point** বলে, আর জ্ঞানত্বকে বিভু আত্মা বলে গ্রহণ করবে। প্রথম হল "স" আদেশ, দ্বিতীয় "অহং" আদেশ, তৃতীয় "আত্মা" আদেশ। সাধনার এই তিন ভূমি। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান থেকে ভূত পর্য্যন্ত সবই তিনি। আত্মত্ব তাঁর প্রথম বিকাশ; তিনি পরাপ্রকৃতিকে প্রথমে জাগিয়ে, 'নিজের দ্বারা নিজেকে জানছি', এই জানায় ক্রিয়াশীল হয়ে, তার পরে ভূতময় অপরা প্রকৃতিকে জাগালেন। 'নিজেকে' ও 'জানছি', এই দুই শব্দে দ্বিবিধ রস ভরা রয়েছে। ১। 'নিজেকে' মানে, নিজের সবটাকে, সব বহু-ভবনতা, বহু আত্মা ও বহু অনাত্মাকে পর্য্যন্ত। ২। 'জানছি' মানে, জানবার সমস্ত করণ ওর ভিতরে উহ্য রয়েছে। 'জানলেই', যাদের দ্বারা জানছি, সেই চোখ কাণ সব ভিতরেই রয়েছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, তিনই তিনি নিজে। অপরা প্রকৃতিকে মানে, বিশ্বজ্ঞান-ক্রিয়াশীলতাকে, বিশ্ব ফোটানকে। তিনি মধুময় বুক পেতে আছেন; প্রতি আত্মাকে, প্রতি নিজত্বকে—আমাকেও, তোমাকেও, বুকে করে মমত্ব দিয়ে, 'মম' এই জ্ঞান দিয়ে ধরে

আছেন ; 'নিজে' থেকে বার-করা প্রত্যেক আত্মাকে ও ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে। তোমরা এই সংযোগের ঢেউ দর্শন কর। যদি আমি এঁতে লেগে থাকি, তবে আর 'আমি' থাকি না— 'ইনি' হয়ে যাই। যদি 'আমি' রচিত হল, তবে হৃদয়ও হল, মমত্ব জ্ঞানও হল। হৃদয় হল জড়ানর একটা যন্ত্রস্বরূপ, মন যেমন সংযোগের বা জোড়ার যন্ত্রস্বরূপ। 'সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাস' এবং 'সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত' যিনি, তাঁব সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ধৃত হয়ে রয়েছ তুমি ; তাঁর সেই দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পৃশনের দ্বারা তুমি জাত। উল্টা দিক্ থেকে দেখতে গেলে তুমি এঁতে বাঁধা আছ। ওঁকে মা বলে দেখনি, তাই মনে করছ—বাঁধন। এখন শুধু মা শব্দ যোগ করে দে! এ চোখ তোর নয় ; এ বিধারিণী শক্তি, এ টান মায়ের। গেরুয়া পরে এ টান ছাড়তে পারবি ? ঐ টান ধরে মায়ের বুকে চলে যা! কে দাঁড়িয়ে আছে ? চিন্ময়ী মা ? তার আত্মত্ব আছে, অহং বলে বোধ আছে ? সুতরাং মূর্ত্ত মা! সর্ব্ব-আনন্দময়ী, রসময়ী, স্পর্শময়ী, বিজ্ঞানময়ী মা! মায়ের হৃদয়ে ছাড়া আর কোথাও 'আমি' এই জ্ঞান জন্মায় না। 'আমার' জন্ম মাতৃহৃদয়ে। তিনি যে বিজ্ঞানে বিজ্ঞানময়ী, সেই বিজ্ঞানেই হৃদয়ময়ী। জ্ঞান হচ্ছে যানে, মা হাত দিয়ে আমায় ধরে রয়েছেন, আমায় সাজাচ্ছেন। শরীরের প্রতি কণা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। ছাল চামড়া এখানে কি আছে ? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এ ছাড়া কিছু আছে ? শুধু শরীরে নয়, বাইরেও রূপতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদিই জড় ভূতের

আদি অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর! জ্ঞানময়ী যিনি, তিনি শব্দ বা স্পর্শ বা রূপ, এই 'ঈক্ষণ' প্রকাশ করলেন। 'শব্দ' এই ঈক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মত্বকে সেখানে নিয়ে গেলেন, শব্দতত্ত্ব-রূপে তাকে কঠিন করলেন; সেখানে শব্দ ভিন্ন আত্মত্বের আর কিছু নেই, এইরূপ একটি কঠিন স্বরূপে এলেন অর্থাৎ শব্দনামীয় সন্তান প্রসব করলেন। শব্দতন্মাত্রা থেকে শব্দতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত সেই সন্তানে ভরে গেল। এই ভাবে শব্দরূপ, গন্ধরূপ ইত্যাদি এক এক neutral মূর্ত্তি ধরে তত্ত্বময় দেবতারা আত্মত্বে বসে আছেন। তত্ত্ব বললে তাকে এমনি একটা কণা বলে মনে হবে; কিন্তু মায়েতে যাও; তাঁতে তত্ত্ব বললে একজন দেবতা বোঝাবে—কে জানে বজ্রনির্ঘোষ, পাখীর রব, গাড়ীর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ—সব নিহিত ঐ তত্ত্বাভিমানী দেবতায়। এইরূপ সব—স্পর্শরূপ, গন্ধরূপ এক এক দেবত্বে নিহিত। তন্মাত্রা হল উপলব্ধি-অংশ, তত্ত্ব হল প্রকাশ-অংশ। তা হলে এখানে বসে আছেন কে? শরীররূপে যাঁকে ধরে আছি, ইনি কে? তত্ত্ব-মালাবিভূষণা মা? সে তোমায় ধরে আছে? নমঃ! আর এই সমস্ত তত্ত্বের মূল হল আকাশনামীয় তত্ত্ব। সমস্ত তত্ত্বই ব্যোমরূপ তত্ত্বে ক্রিয়াশীল রয়েছে। ক্রিয়াশীলতার নাম প্রকাশ। সুতরাং সাংঘাতিক বীজ হল হং। যেমন জ্ঞান-ক্ষেত্রে, চেতন-ক্ষেত্রে অহং সাংঘাতিক জিনিষ! অহং একদিকে ভগবানে ঠেকে আছে, আর একদিকে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিতে বিশ্ব ধরে আছে। স্থূলেতেও তেমনি 'অহং' আর 'হং' প্রায় এক-

জাতীয় জিনিষ। অন্য চারি তত্ত্বকে সে নিজেতে ক্রিয়া করতে দিয়ে ধরে রেখেছে। অনন্ত স্পর্শময়, অনন্ত গন্ধময় ইত্যাদিরূপে এই বিশাল জগৎ আকাশেই ভাসমান। অহংয়ের দ্বারা যেমন সমগ্র জগৎ বিধৃত রয়েছে, তেমনি এই হংয়ের দ্বারাও সমগ্র জগৎ বিধৃত রয়েছে। রয়েছে? ইনিও শক্তির প্রকাশ ত? ইনি টেনে রেখে দিয়েছেন সবটাকে? খালি ওঁতে সবাই খেলে বেড়াচ্ছে—এমনি না? এঁতে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সব লীলা করছেন; ফাঁকা জমি পেয়ে যে যার লাফাচ্ছে, তা নয়;—হং সবাইকে টেনে রেখে দিয়েছে। এই টানও একটা ক্রিয়া; এতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হবে। হং বাহ্য জগতের আত্মাস্বরূপ রয়েছে। ধারণা কর, যত দূর পর্য্যন্ত বিভাজ্য, তার সকলের ভিতর ব্যোম আছে। তার পর যখন একেবারে অবিভাজ্য, তখন খালি ব্যোম। শম্ভো! এই হলেন ভূতনাথ, মহেশ্বর, ব্যোমকেশ। তিনি যখন বহির্ম্মুখে ক্রিয়াশীল, তখনই বাহ্য আকাশ তৈরি হচ্ছে ত? আর অন্তর্ম্মুখে প্রলয়। মহেশ্বর বাঙ্ময়; শব্দতত্ত্বের বিকাশ বাক্। বিশ্বনাথ! আহা! এ সব বলতে কুণ্ঠিত হতে হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা ক্রিয়া তা হলে পূর্ণমাত্রায় এই চারি তত্ত্বের ভিতরই প্রকাশিত হচ্ছে; আকাশের ভিতর ত আছেই। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শশক্তি-আত্মক যে বিশ্ব, সে ত তাঁরই লীলায়ন; জন্ম-মরণ এ চারেই দেখা যাচ্ছে। আকাশে মৃত্যু দেখা যাচ্ছে? না। যং রং লং বং—এই চারিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, খালি এই ক্রিয়া চলছে। স্থূল বিশ্ব শূন্যে বিলীন হয়; আকাশ কেমন

করে বিলীন হয়, তা পরে বলব। শং ষং সং=সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। চারি তত্ত্বের যে ক্রিয়া হচ্ছে, তার সঙ্কেত করে দিলাম। শং—শোয়া, সং—সৃষ্টি, ষং—নিধন। সৃষ্টি ও লয়ের এক বিক্ষোভরূপ স্থিতি। এই চারি তত্ত্ব এই তিন তালে আকাশের বুকে নাচছে। এই সমগ্র ব্যাপারটার নাম দিলাম 'হৌম্'। শূদ্রেরা 'হৌম্' বলবে, আকাশ পর্য্যন্তই যাদের দৃষ্টি। জ্ঞানতত্ত্বে ঢুকলে ওঁং—এ হল ব্রাহ্মণের দর্শন। এই নিয়ে স্থূল শক্তিতত্ত্বের মহামূর্ত্তি হল। যং রং লং বং শং ষং সং হৌম্। ঋষি মন্ত্রটি কেমন সাজালেন! এই হল মহাকাশ তৈরি করে নেবার মন্ত্র; এই মন্ত্রই এই বিশ্ব রচনা করেছে। মূলমন্ত্র এই। স্থূলভূতাত্মক মহাদেব এই মন্ত্রে বিশ্ব রচনা করছেন। বাহ্য বিশ্বকে ভেঙ্গে দিলাম, মহাকাশে পর্য্যবসিত করে দিলাম। মরে যাবি বেটা, এতে মাকে না দেখলে; শূন্যে গ্রস্ত হয়ে যাবি, শূন্যের ভিতর অব্যক্ত হয়ে যাবি! সব ফাঁক—ফাঁক—ফাঁক! মরে যাবি, মৃত্যুর ভীতি আসবে। কেমন সুন্দর! এতে শিক্ষার কিছু আছে? মহাকালের আমার মহামূর্ত্তির বিজ্ঞান। ও দিকে আত্মাকে বিভু করে দেখিয়ে দিয়েছি, এবার মহাকালের বিভূতি দেখাচ্ছি—তিনি কি করে এ সব রচনা করেন। পাতঞ্জল বলে, আকাশে সংযম নিলে মহাবিদেহলয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোরা খালি ব্যোম্ ব্যোম্ কর, তা হলে আর দেহজ্ঞান থাকবে না। যদি আত্মবোধ না থাকে ত অব্যক্ত হয়ে যেতে পারবি। আত্মবোধ নিয়ে যদি করিস ত জ্যান্ত মহা-

কালকে দেখতে পাবি। জয় ভগবান্! নমঃ শিবায়! ওঁম্! আহাহা!

'হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
উদয়াস্তবিহীনস্তু কথং সন্ধ্যাম্ উপাস্মহে॥'

জয় ভগবান্! গুরু বিশ্বেশ্বর! জয় মৃত্যুঞ্জয়! প্রলয়ঙ্কর মহাদেব!

'যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥'

বায়ু আকাশে খেলছে, তাতে আকাশ ক্ষুব্ধ হচ্ছে না। তেমনি আমাতে সমগ্র বিশ্ব খেলা করছে; আমার দ্বারা বিধৃত বিশ্ব আমাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারছে না। এমনি আমার মা! এই হল বাহ্য মূর্ত্তি। আবার আকাশের ভিতর হৃদয় বা ক্রিয়ামূর্ত্তি দেখ। ও হল স্থূলভাবের ক্রিয়া, যেমন বিভু আত্মত্বে। এখানে অপ্রাকৃতে ক্রিয়া চলছে—আমি আমাকে দেখছি, এই আকারে। খোদ আকাশের ভিতর কি চলছে? 'আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হুং ফট্ মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয়, মহাকালভৈরবায় হুঁং ফট্ স্বাহা।' যে বিজ্ঞানে অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করা যায়, সেই বিজ্ঞানে মূর্ত্তকেও অমূর্ত্ত করা যায়। এখন এ শরীরকে মনে হচ্ছে যেন, একটা কঠিন নোঙরের মত, আমায় টেনে রেখে দিয়েছে। তখন দেখবে, এটা ফাঁপা, কিছু নয়। একে এখনি ইচ্ছামাত্র বাঘ করা যায় বা সাপ করা যায়। এই গুরুমূর্ত্তি—জ্ঞানমূর্ত্তিকে পেলে তখন সব করতে পারবি। মা

আমার রূপময়ী হয়ে কেমন করে মহাকালের বুক থেকে ওঠেন, তাই দেখব, আর কিছু দেখব না।

'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বস্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥'

কি শক্তি, বাক্যে কি **command**! এরূপ বাক্য প্রকাশ করবে কে? যে মহাকালের দ্বারা নিজের শরীর গঠন করে না নিতে পারে, তার মুখ দিয়ে এ মন্ত্র বেরোবে? এ সেই পারবে, যে জানে, এগুলো সব হয়ে রয়েছে, ফুটছে, ঘটে বসেছে, তারই প্রকাশ দেখছি। এই যে বিদ্যুন্ময়ী দেবতা, এঁরই ইচ্ছায় এখানে বসে কথা কইছি আর দেখছি। নিজেকে মনুষ্য-গণ্ডীর ভিতর দেখলে এ মন্ত্র একেবারে মূল্যহীন।

আজ এই যে মূর্ত্তি দেখলাম, এই হওয়া চাই আমাদের আসল চোখ। দু একবার হারাতে পার, কিন্তু এমন সংস্কারবদ্ধ হয়ে যাবে যে, মাথায় যেন রয়েছেই। এঁকে দেখতে গেলে আর দ্বৈত খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাঁতে **identified** হয়ে যাই, ইনি এমন ঘন। গাছ নড়লে যেমন ছায়া নড়ে, আমাদের সব ক্রিয়া তেমনি এঁরই প্রকাশ।

'অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র ফলাস্বাদন-মোদবৎ॥'

গাছের কথা ভুলে, ছায়া দেখে নাচা কোঁদা যেমন। ব্রহ্মানুভূতি —ভগবদ্দর্শন না হলে এইরূপ হবে। পশুকে বলি দে, দে! সবটা দেবতা হয়ে যাবে, দেবদর্শন হবে। বিশ্বে এমন একটা

কিছু থাকবে না, যাতে দেবদর্শন হবে না। 'সিদ্ধামর-সেবিতাং স্নেহকরুণা-ভার-নম্রাং।' ঢেলে দাও সব আকাশে বাবা! ঢেলে দিয়ে, আকাশকে মহাশক্তির অবয়ব মনে করে, আকাশের ভিতর তাঁকে দর্শন কর, যিনি সবার ভিতর আত্মা হয়ে বসে আছেন; যিনি বাইরে বাহ্য আকাশ, অন্তরে চিদাকাশ। দেখ, শিব হতে কতক্ষণ যায়! জয় ভগবতি! জয় মা!

দেখা এই-রকম, এ বিদ্যুন্ময়ীকে স্মরণ করা এই-রকম? মনে যদি এ কথা আসে, তবে বিদ্যুৎ ছুটবে না? 'সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জ্জন্যস্তৃপ্যতি, পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুৎ তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং'…মাকে মনে করলুম? মা, মা, মা জপ করা, এর নামই কি মনে করা? মনে করা মানেই জ্বলে ওঠা, প্রকাশ হওয়া। সমাননামীয় প্রাণ তৃপ্ত না হলে মনে করবে কে? যেখানে দুই বিপরীত গতি একীভূত হয়, তার নাম সমান বায়ু। আত্মাভিমুখী গতি ও বহির্ম্মুখী গতি, আকাশ ও চিদাকাশ, এই দুই দেখলে বায়ুব সমতা হয়। এ শরীর আর কারও তালে চলছে না; এর এমন কোন তাল নেই, যাকে আমার বলে ধরা যায়। সমস্ত বাহ্য জগতের সঙ্গে মিল রেখে এ চলেছে। মাথার জাড্য কাটাতেই তোমাদের আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার লেগে যায়। শরীরের বিদ্যুৎ মানে, **magnetic force**। মনে বিদ্যুৎ-প্রকাশ হলে, গন্ধ মনে করলে, ভূতে পর্য্যন্ত সে গন্ধ ফুটবে। সে মন কই? সমান-ভূমি কই? মনকে অন্ধকার করে রেখেছ; তাতে যা কিছু ফোটে, সবই কালো, অন্ধকার হয়, **shadowy** হয়।

আকাশ তৈরি করে ফেল ; ঠিক ফোটে কি না দেখি। একেবারে যেমন বাইরে জগৎ, ঠিক তেমনি অন্তরে জগৎ দেখবি। মনে হবে, যেন একেবারে খোলা চোখে দেখছি। মনঃক্রিয়ার এই হল প্রথম phase, একেবারে বাহ্যই দেখ্‌ছি। এর দ্বারা বুঝবে, আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। Opaque থাকলে খালি ছবির মত figure ওঠে ; মালিন্যের জন্য ভৌতিক গঠন, রূপ বা ধর্ম্ম থাকে না। একটু নিরেশ জপ যারা করে, তারাই দেখে, একেবারে বাইরেই দেখছি। মন মানেই আত্মত্বের বাহির। মনের জ্ঞান সব মৃতবৎ দেখায় কোথায়? আত্মার বাইরে। অথচ মনকে ভিতর বলে মনে হয় কেন? কেন না, মন এইটুকু মাত্র নয়। আমার সমস্ত জগৎটাই যেন মন। ঐ opaque অংশে তা আটকে যাচ্ছে। এই দেখ, একজন অসুখে কষ্ট পাচ্ছে ; তাই আশীর্ব্বাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মনকে বাইরে ছড়াতে গিয়ে তা দেখলাম।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার।

যেমন 'ঠিক' মাটি, তেমনি জ্ঞানই 'ঠিক' সব হন, এই কথা ঠিক বলতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ; শীত থেকে গ্রীষ্ম জ্ঞান 'ঠিক' হয়ে যাবে।

তোমরা সব বুড়ো হয়েছ ; তথাপি যে যার সংসার-জালে ব্যাপৃত রয়েছ। তবু তারই মধ্যে পূজার আগে সবাই একটু

তদারক করো। যেন জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব আমাকেই না করতে হয়; তাতে তোমাদের অগৌরব। সরলা যা লিখেছে, পূজার সে চিত্র শুনলে স্থির থাকা যায় না। একেবারে পূজা যেন সামনে এসে উপস্থিত হয়। পূজায় কত মাধুর্য্য আছে, পূজা কত সার্থকতায় ভরা, তা তারাই উপলব্ধি করবে, যারা অধ্যাত্ম-জীবনের স্বাদ পেয়েছে। এই সব তত্ত্ব সরলাই কুড়োচ্ছে; ও যদি পারে, তবেই লিপিবদ্ধ হবে। নয় ত এ সব তোমরা হারাবে; আর খুঁজে পাবে না।

আত্মা নিজেই আত্মশক্তি। কিন্তু সব দার্শনিকেরা এঁকে আলাদা করে দেখেছে। পরমাত্মত্বই যে মহাশক্তি-রূপ ধারণ করেন, এ অংশটুকু তন্ত্রে পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে দেখায়নি, শুধু সাধারণ ভাবে দেখিয়েছে। এই দুই অংশ আমি দেখিয়েছি—'জ্ঞ' ও 'অন' নাম দিয়ে। নানা লোকে নানা ভাবে আত্মতত্ত্ব স্থাপন করেছে; কিন্তু কেমন করে আত্মত্বের সঙ্গে শক্তিত্বের পূর্ণভাবে সংযোগ হয়, তা কেউ বলেনি। এ দুটি বিরুদ্ধ দিক্; একটি স্থির-জ্ঞান, অন্যটি চঞ্চল শক্তিজ্ঞান; যেন আলো অন্ধকার ও সুখ-দুঃখের মত পৃথক্। মাঝখানের অংশ, যেখানে উভয়ে মিলিত হন, সে তত্ত্ব **neutral** বা অসঙ্গ, এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছি। যিনি অসঙ্গ আত্মা, তিনিই **neutral** তত্ত্ব। ইনিই দুই দিকে দুই রকম বিরুদ্ধ প্রকাশ গ্রহণ করেন। আত্মতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বেও ঐ এক কথা। আত্মতত্ত্বে স্থির বিশ্বাস না হলে, আত্মার শিবত্ব না ধরতে পারলে তোমাদের শক্তিতত্ত্ব বলব না; কেন না, তা হলে

তোমরা বিভূতিকামী হয়ে যাবে। বিভু হলেই শিব হয়। এই শরীর-ব্রহ্মাণ্ডের এমন একটি অংশ বা কণা নেই, যেখানে আত্মা আগে গিয়ে না দাঁড়িয়েছেন। কি করে? সে অংশ তৈরি হবার পূর্ব্বেই তাতে গেছেন কেমন করে? অপ্রাকৃত ভাবে। তার counterpart বা অপ্রাকৃত ভূতি হল নিজত্ব। প্রতি অংশে আগে আগে গিয়েছেন, তবে ভূতি-অংশ তৈরি হয়েছে। আত্মত্ব আগে আগে গেলে তবে ভোগ হয়। এই যে আত্মিক গতি, এই গতি যদি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখতে পাই, তবেই শিবত্ব উপলব্ধি হল; শিব হলাম; আপাদমস্তক আত্মময় হল। এ কেন দেখা যাচ্ছে না? নিজেরই মহত্তী পরিচালিনী-শক্তির স্থিতি-রূপা মূর্ত্তি, অথচ দেখতে পাচ্ছি না কেন? শক্তির ভোগরূপা তীব্রতাকে ভাল করে জাগাবার জন্য। ভোগাত্মক অংশ সাংঘাতিক অংশ—তীব্র বিদ্যুতের প্রজ্বলন। যেমন negative ও positiveএ সংঘর্ষণ হয়, সৃষ্টির জন্য মিথুন—জাত হবার জন্য, জন্ম দিবার জন্য, বহু হবার জন্য ভোগ—স্বামি-স্ত্রীর মিলন তার সাধারণ দৃষ্টান্ত। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিন শক্তি ওখানে একীভূত হয়, পরে কিছু জাত হয়। ক্রিয়া মানেই যুগপৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়, সমবায়ী ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। সৃজনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গন, সৃজনের সঙ্গে সঙ্গেই নিধন। তা হলে সৃষ্টি ও ধ্বংসের আলাদা আলাদা স্থিতি নেই। সৃষ্টি ক্রিয়া করা মানেই সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত গতি তৈরি হওয়া। এই দুয়ের combination যা পরিদৃশ্যমান হয়, তার নাম স্থিতি।

আমি বললাম, কিছু ভোগ করতে পারি না ; মানে, আমার আত্মত্ব ঢাকা রয়েছে। আমার শরীর, হাত, পা, মাথা, একেবারে সব দেখতে পাই না। পর-মুহূর্ত্তে কি আসছে জানি না ; চামড়া, হাড ইত্যাদি কেমন রয়েছে, বলতে পারি না, তার চেয়ে সূক্ষ্ম স্নায়ু ইত্যাদিব ত ধারেই যাই না। কত অন্ধকার! গর্ভস্থ শিশু যেমন উল্বনের দ্বারা আবৃত থাকে, আমরা তেমনি আত্মার তামসী শক্তির দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছি। পুনঃ পুনঃ গ্রসিত হচ্ছি মায়ের গ্রাসে, তামসী শক্তি আমাদের বেপে রয়েছে। এই আত্মত্ব যে দিকে বিভু, শিব, তিনিই সমগ্র শক্তিকে ধরে জাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই যে দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজানন ইত্যাদি, এ সব আত্মার ভিন্ন কারও হয় না, আত্মত্ব ভিন্ন হয় না, তবু এমন তামসী শক্তির প্রভাব, তবুও যেন আমার শক্তি নয়। 'মশায়! আমি যে দ্রষ্টা, তা চোখ টিপে ধরলুম, কাণা হলুম। আমি যে শ্রোতা, তা কাণ ঢাকলেই কালা হলুম' ইত্যাদি। তা হলে এ সব শক্তি আমার নয়। চোখ, মুখ, কাণ, নাক ওদের—ওরা শক্তি দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমি ইন্দ্রিয় নই, মন নই জেনেছি, তত্রাচ এদের বাদ দিয়ে দ্রষ্টা হতে পারছি না। এরা যদি ফুরোল ত আমারও দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন সব ফুরোল। অনন্ত বিষয় পড়ে রয়েছে ; চোখের ভিতর রূপতত্ত্ব রয়েছে—স্বপ্নে ফুটে ওঠে। কিন্তু জাগ্রত হলে আর সেরূপ পাই না। স্বপ্নেও কিছু কর্ত্তৃত্ব দেখি না ; যে যেমন ভাবে আসে, সে তেমনই আসে। দেখ, আমরা কেমন তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়েছি। তাই

হৃদয়কে বলে,—ঘোর তমোময়ী মূর্ত্তি।/ অনুপ্রবেশের ঘর হৃদয় কি না। অনুপ্রবিষ্ট হলুম মানে, তমে আচ্ছন্ন হলুম। বিভু হলেন পূর্ণ আলোকময়, সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। নিয়ন্তা ও ব্যাপক এক কথা। তিনি এই শরীরকে ফুটিয়ে রয়েছেন, ফোটাচ্ছেন, পরিবর্ত্তিত করছেন আমার ভোগানুসারে, আর আমি ঠায় ভোগ করছি। পরিবর্ত্তনরূপ ক্রিয়া অসঙ্গ আত্মত্বের প্রভাবে হচ্ছে। ওখানে অসঙ্গরূপী আত্মা দেখছেন, আবার এখানে ভোগে মথিত হয়ে রয়েছেন।—আত্মত্বের স্মৃতি মথিত হয়ে বেরোচ্ছে। বিভুত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে তিনি স্রষ্টা। ব্রহ্মত্বের জ্ঞান মানেই হল, যাঁ থেকে, যে জ্ঞানস্বরূপ থেকে ব্রহ্মাণ্ড জাত হচ্ছে। বিভু আত্মা রয়েছেন আপাদ-মস্তক; তাঁকে না দেখলে শক্তিত্ব জাগান যাবে না। আমরা খালি ভোগ-অংশই দেখছি, কিন্তু যে ভূমিতে তিনি ভবন-শক্তিত্বে রয়েছেন, সেইখানটায় যাওয়া হচ্ছে না।

একটা মৌমাছি মধু খাচ্ছে; তখনও তার স্বাধীনতা আছে। ক্রমে পা জড়িয়ে গেল; আর উঠতে পারে না। তার পর পা, বুক, পাখা, সবে টান পড়ল; তখন মধু খেতে খেতে বললে, পালাতে পারলে বাঁচি। তোরাও তেমনি ডুবে গিয়ে বলছিস, ছাড়াতে পারলে বাঁচি। কিন্তু ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলে ভয় নেই। বিষয়ের কোন দোষ নেই। আমার নিমজ্জিত, মথিত আত্মাকে, ভোগময় আত্মাকে ছেড়ে, অসঙ্গত্বের পথে যদি শিবত্বে যাই, তবে যা খুসি তাই করতে পারি; ওই মধু সংগ্রহ করে চিনি করতে পারি, যা খুসি তা পারি। বিশ্বময় নিজেকে দেখা ছাড়া আমার

আর কিছু দরকার নেই। অসঙ্গ আত্মাকেও দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গবান্ আত্মাকে ত পাচ্ছি-ই। অনুভূতি, যে অংশ ভোগ, তা বুকে; কিন্তু যেখানে তিনি পরমেশ্বর, সেইখানটা অন্ধকার। আমার কিছুই হচ্ছে না; অসঙ্গতা দেখছি, আবার মুহূর্ত্তের তর সইছে না—ডুবে যাচ্ছি। ভাল করে ভেবে দেখ। অসঙ্গ নির্লেপ বোধ এলে যে স্থিতি আসে, তাতে উপস্থিত হয়ে কি হল? বলে দিয়েছি, আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি সব। এঁরই প্রভাবে দর্শন ইত্যাদি সব ফুটে উঠছে। যদি দেখতে পাই, এই তত্ত্ব—এই অসঙ্গই যথার্থ শ্রোতা, ঘ্রাতা ইত্যাদি সব, তা হলে আমার যথার্থ অসঙ্গকে দেখা হল। এখন দ্রব্যে বা বিষয়ে ডুবে আছি। কিন্তু শক্তির ভিতর-অংশ অর্থাৎ জানা, শোনা, দেখা, এই সবের ভিতর-অংশ যেখানে দেখতে পাব, বুঝব—এই অসঙ্গত্বে বেরিয়ে এসেছি, বিষয় থেকে শক্তিত্বে এসেছি। দর্শনাদি আমারই দ্বারা হবে, আর কারও দ্বারা হবে না। তোমরা যে অসঙ্গত্ব দেখছ, তাতে তিনিই যে দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি সব, তা দেখছ না। যে অসঙ্গ আত্মাটুকু দেখতে পাচ্ছ, সেইটুকুই যে যথার্থ দ্রষ্টা, শ্রোতা, আস্বাদয়িতা, তা বুঝতে পেরেছ? এমন ভাবে দেখছ কি? আত্মা মানে নিজে। আমার হয়ে আর কেউ দেখে দেয় কি? দর্শনাদি শক্তি আত্মারই। আমারও ত নিজেরই দেখার জন্য ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্র চাই। তাই আত্মার নাম প্রকাশময়। সূর্য্য যেমন নিজের আলোকে নিজেকেও দেখান, অন্যকেও দেখান, আত্মাও

তেমনি। তোমরা যখন আত্মাকে দেখ, তখন তিনি যে সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসময়, এমন ভাবে দেখ কি? সকল ইন্দ্রিয়গুণ তাঁতে ঢল-ঢল করছে—বিষয়-কল্পনা বা মনন পেলেই ফুটে ওঠে, এমন ভাবে আত্মাকে পেয়েছ? না। যে আত্মত্বের এই সব স্বধর্ম্ম, যে আত্মাতে ইহাদের ঘনীভূত প্রকাশ, সেই অসঙ্গ আত্মত্বে ঠিক যাওয়া হয় নাই; তাই পাও নাই। আত্মার বাইরে যে অপরা প্রকৃতি, তার মানসিক বা ভৌতিক সংস্পর্শ পেলেই এরা বাহ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলে দিয়েছি,—"আছি" জ্ঞান পর্য্যন্ত হল অপরা প্রকৃতি, আর আত্মত্ব হল পরা প্রকৃতি। এক মেরু হল বিষয়—যে ফুটে উঠবে; আর এক মেরু আত্মা। এরা ঠেকেছে কি ফুটে উঠেছে। কেমন করে? নিজত্ব এক পাশে, বিষয় এক পাশে—মাঝখানে সংস্পর্শ-কারিণী মহাশক্তি। গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সৃষ্টি স্থিতি লয় neutralise হওয়ার নাম প্রকৃতি। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিনই প্রকাশ, আর প্রকৃতি হল অপ্রকাশ। ব্যক্ত প্রকৃতি মানে, প্রকৃতির বিকার—ব্যক্ত মূর্ত্তি। যা থেকে কোন কিছু জন্মাতে পারে, সেই তার প্রকৃতি। কোন বস্তু সুধা বা ক্ষীর বলে যে পরিচয় দেয়, তার মানে, ঐ সুধা বা ক্ষীর, যা কিছু ফুটবে, তা তার প্রকৃতিতে আছে। এই জন্য জ্ঞানতত্ত্বে 'স্বভাব' বললে 'স্বয়ং' এই ভাব বুঝিয়ে যায়। 'মহদ্‌ব্রহ্ম' হলেন 'স্বভাব'—'স্বয়ং' এই জ্ঞান। আমার ভূমা পুরুষ এখানে সৃষ্টি স্থিতি লয় একসঙ্গে করছেন। নিজে এখানে বিষয় ফুটিয়েছেন।

আমরা ভোগক্ষেত্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছি। যেটুকুতে ঢুকেছি, মাত্র সেইটুকু ভোগ করছি, বাকী দুনিয়া হারিয়ে যাচ্ছে। 'ফুল' দেখছি মানে, অনন্ত, ইয়ত্তাহীন আমি এখন মাত্র একটি ফুলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তালে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ফুল-জ্ঞানের জন্ম-মৃত্যুর বিঘূর্ণনে রয়েছি।

তিন রকম ক্রিয়া করে তিনি আয়তন ফুটিয়ে রাখেন। ঐ একটি বস্তু ভোগ করতে গিয়ে আমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ভিতরে যাচ্ছি। একবার ফুল বলে ঢুকলাম, একবার বেরোলাম। যেমন ঢুকছি, অমনি একটি ফুলজ্ঞান সন্তানবৎ উৎপন্ন হচ্ছে ; সৃষ্টি-স্থিতি-লয় থেকে সন্তান উৎপাদন হচ্ছে ; আমি মহাশক্তির গর্ভে যাচ্ছি। বাকী যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বিপুল অন্ধকাররূপ যে সংস্কার, সে কিন্তু মুছে যাচ্ছে না। কেন না, একমাত্র আলোক-স্বরূপ যে বিভু আত্মা, তাঁকে দেখছি না। এ দিকে ভোগে ডুবেও ডুবছি না, মরেও মরছি না ; খালি ফুল-আত্মার সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আত্মায় চোখ রাখতে পারি না বলে, আত্মা যে বিভু-মূর্ত্তিতে ছড়িয়ে আছেন, তা দেখতে পাই না বলে এই-রকম অণু আত্মা, মানে—অনুপ্রবিষ্ট আত্মা তৈরি হচ্ছে। এখন দেখতে হবে, আত্মা শক্তিরূপে কি ভাবে কাজ করছেন। তিনি একদিকে আপনাকে দ্রষ্টা সাজাচ্ছেন ; এ হল সাংখ্যের সাত্ত্বিকী শক্তি বা উপনিষদের শুক্লা শক্তি। আমি দ্রষ্টা অথচ শক্তিত্ব থেকে অভিন্ন ; 'ন স্বরূপো বিরূপো বা'—একেবারে আত্মত্ব নয়, অথচ বিশেষ পার্থক্যও নয়। আমিত্ব বলে একটা স্ফুট এসেছে ; সে

স্ফুট নিজত্বই সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন। বলা যায়, এখন 'নিজে' বলে **definite** ভাব নিয়েছেন, **assertion** নিয়েছেন। দ্রষ্টা বা শ্রোতা, এই কথা মাথায় এসেছে; তখনও রসয়িতা ইত্যাদি আর কিছু মাথায় আসেনি। এর প্রত্যেকগুলোতেই হল শুরুা শক্তির অধিষ্ঠান; যাতে আমিত্বের ও আত্মত্বের **direct** সংযোগ। দর্শনরূপ ক্রিয়া না এলে দ্রষ্টৃত্ব-ব্যাপার ফোটে না। সুতরাং নিজেতে দর্শন বলে একটা শক্তি খেলা করে এবং দৃশ্য তৈরি হয়ে তবে দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। যদি আত্মাকেই দেখি, তবে নিজের দ্বারা নিজেকেই দেখছি; তা হলে এখানে দর্শন রয়েছে, দ্রষ্টৃত্ব রয়েছে, দ্রষ্টব্যও রয়েছে। এই তিন আমিই; এ প্রকাশ এই নিজেতেই রয়েছে। তেমনি রসন, রস ও রসয়িতা, এই তিনই নিজেতে রয়েছে। এইরূপে যে আপনাতেই আপনি আপনাকে পাওয়া যায়, এই হল মায়ের পরাশক্তি-রূপ। নিজবোধই পরাশক্তি। তাঁতে শক্তিত্ব না থাকলে পরাশক্তি বলার প্রয়োজন কি? গীতা, সাংখ্য, সকলেই আত্মাকে পরাশক্তি, চিতিশক্তি বলেছেন। এই সব শব্দের দ্বারা পুরুষকে অভিহিত করার মানে, তাঁতেও এই শক্তি আছে। বাইরে প্রকাশিত হলেই অপরাশক্তি; অপরাশক্তি থেকে বিশ্ব।

কিন্তু এই আত্মায়ই যে শক্তির মূল প্রতিষ্ঠিত, 'তিনি নিজের দ্বারা নিজেকে দেখছেন,' এই বাক্যেই তা সুপ্রকাশ। এইখানে যা হচ্ছে, সেই জিনিষ কি, তাই দেখ। নিজেকে নিজে দেখি, শুনি, এ সব এক কথা। দ্রষ্টা, দর্শন, দ্রষ্টব্য—মায়ের এই ত্রিভঙ্গ

মূর্ত্তি আছে কি না, মা আমার ত্রিনয়না কি না, তাই দেখ। ত্রিনয়না=দর্শন, দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য=বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত= স্থিতি, সৃষ্টি, লয়, এই তিনটি যিনি একসঙ্গে দেখতে পান, তিনি ত্রিনয়না। আত্মত্বে যদি এই তিন জিনিষ দেখতে পাই, তবেই জগৎ আত্মা থেকে জাত বলতে পারব। জগৎ যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ময় এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়, আত্মার এই তিন প্রকাশ আত্মত্বেই দেখতে পাও, তখন বিশ্বের কারণ আত্মা, এ কথা বলতে পারবে না? এই তিন **aspect magnified** হয়ে বিশ্ব ফুটে উঠেছে; সুতরাং আত্মত্বে এ সব দেখতে পেলে আত্মত্বেই আবার গুটিয়ে নেব। এই হল মূল তত্ত্ব; তুলো ধরে টানতে পারলে গোটা কাপড়খানা এসে যাবে।

অন=জগৎ, জ্ঞ=আত্মা। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম,' এখানে 'জ্ঞ'-অংশকে ব্রহ্ম বলে সম্ভাষণ করেছেন। তা হলে 'অন'-অংশ নিবিড়ভাবে আত্মায় ঢুকে থাকতে পারে; না হলে আত্মা ব্রহ্ম হতে পারেন না। 'যোঽয়ং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়মেব সঃ যোঽয়ং আত্মা'—একেবারে পূর্ণমাত্রায় শক্তির essence—একেবারে 'জ্ঞ'-অংশে ঢুকিয়েছেন। জ্ঞ+অন—দুই অংশে যিনি ফুটে থাকেন, তিনি ব্রহ্ম। কিন্তু আরও আছে। আমায় যেমন এই ক্ষুদ্র আত্মত্বে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন, যেমন আমি 'জ্ঞ'য়ের বা পরাশক্তির গর্ভে ঢুকে গেছি, অমনি সেই তাঁরই ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী সেই মহতী শক্তি দেখতে পেলুম। এক দিকে আমি অর্থাৎ অপরাপ্রকৃতির শেষ সীমা: তার সীমান্তে

পরাপ্রকৃতি। এই মহতী শক্তি তোর ভিতর ঢুকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রূপে প্রকাশ হন; আত্মত্ব বা মাত্র নিজবোধের ভিতরও দেখি, এই মহাদেবীই জাগ্রত হয়ে রয়েছেন। এইটুকু দেখা বা হওয়ার নামই শিব হওয়া, বিভু হওয়া। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখতে পেলে দেখবি, ঠিক বলেছি। কিন্তু আরও উচ্চ তত্ত্ব এখন বলছি। কোথাও যেতে হয় না; আত্মার ভিতরই সমস্ত বিভুত্ব জেগে উঠবে। এই জ্ঞান যেখানে ফুটে আছে, সেই স্থানই বিভু আত্মার লোক, পরমেশ্বর আত্মার physical আসন—সহস্রার। কারও কোন সাহায্য ভিন্ন তিনি মহাশক্তি-মূর্ত্তি ধরতে পারেন, প্রকাশ করতে পারেন। আমি নিজের দ্বারা নিজেকেই জানছি, 'আত্মনা আত্মনি আত্মানং পশ্যামি,' এই কথা বলতে পারলেই আমি না দেখলেও, যে আমি ভিন্ন বিশ্বের ধর্ত্তা কেউ নেই, সেই আমির সমগ্র বিশ্বের দুয়ারে ভিখারীরূপে এই-রূপ জন্ম হয়ে যাবে। আমার নিজত্বের যে সপ্রকাশত্ব, সেই প্রকাশটি রয়েছে মানে, নিজের দ্বারা নিজেকে জানা যাচ্ছে। এইটি দেখলে সে জ্ঞানের বিভু হতে আর কিছু বাকী থাকে? অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে অতিক্রম করে আর কি কিছু পরিদৃশ্যমান হয়? ওই জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই রইল না। 'স্বয়ম্ভূ'-ভূমিকে এই জ্ঞানের দ্বারা জাগ্রত করতে হবে। এই কথাটি যেমনি বলবে, অমনি ঈশ্বর, অসঙ্গ আত্মা ও ভোগী আত্মা, এই ত্রিবৃৎ দেখতে পাবে।

পিতৃলোক এবং দেবলোক আত্মত্বের ঈশ্বর-কেন্দ্র থেকে পাচ্ছ।

আত্মত্ব তিন ভূমিতে তিন মূর্ত্তিতে রয়েছেন,—ভোগ করছি, জানছি, নিয়ন্ত্রিত করছি। আত্মায় যা সন্নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই ভোগ। স্থূল হিসাবে আত্মার সংস্পর্শ যাতে কম, তার নাম জানা। ব্রহ্মভূমির মূর্ত্তি হল নিয়ন্ত্রণ। নিজের দ্বারা (মাথায় দ্রষ্টা) নিজেকে (ললাটে অসঙ্গ) ভোগ করছি (ভোগ্য বুকে)। ব্রহ্মভূমিকে, আত্মাকে, ব্রহ্মকে আলম্বিত করে দেখান হল। ব্রহ্মজাল রচনা করা, ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেখা, অণুতে অণুতে এই কাজটা যখন বড় করে দেখতে লাগলেন, তখন সৃষ্টি; ভিতরে যখন টানলেন, তখন প্রলয়। **Detail** এ **magnify** করে দেখান বিশ্বরচনা, ব্রহ্মজাল রচনা; গুটোলে গাছ গুটিয়ে গেল, বীচি রইল। যেমনি 'নিজের দ্বারা নিজেকে ভোগ করছি' দেখা, অমনি বীজশক্তি লাভ করা। আত্মত্বের ভিতর বিশ্বরূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষের বীজশক্তি দেখা হল। তা হলে বীজমন্ত্র জাগাবার অধিকার পেলে। কোন্‌খানে বীজমন্ত্রের কাজ হবে, তা দেখা হল।

আমি মনে করছি, এই খাঁচার ভিতর আছি। কিন্তু এই খাঁচাটাও এই আত্মারই ঈশ্বরীমূর্ত্তি। তিনি নিজে এই চেহারা ধরে আছেন, তা আমরা অনুভবে আনতে পারছি না।

স্থিতি মানে, জন্ম ও মৃত্যুর মিলন—একসঙ্গে গাঁথা দুটো **phase**। স্থিতিবোধ জন্ম-মৃত্যুময়; মুহূর্ত্তের মধ্যে অস্তিত্ব ও

নাস্তিত্ব, একটার উপর ভর না দিয়ে অন্যটা বলার জো নেই। যেখানে এ দুয়ের উপলব্ধি হয় না—না স্থিতি, না নাস্তি, সেইটি অনির্ব্বচনীয়; যেখানে কোনটারই উপলব্ধি-বৈশিষ্ট্য নেই। 'আছি' বললেই 'মরেছি'; 'মরেছি' বললেই 'আছি'। বোধ-বিশেষণের যত বিস্তার হবে, জগৎ তত বিস্তৃত হবে।

অসঙ্গত্ব মানেই হল, যাকে বাড়ালে একসঙ্গে দুপাশে বিরুদ্ধ মেরু বেরোতে থাকবে; ছেড়ে দিলে আর কোনটাই থাকবে না। এই কোনটাই থাকবে না অথচ দুটোরই জনক, এমন যে তত্ত্ব, তার নাম অসঙ্গ।

'জ্ঞ'ত্বের বা আত্মত্বের ভিতর দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এইরূপ ত্রিবৃৎক্রিয়া হচ্ছে দেখতে পেলাম। 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।' নিজের দ্বারা নিজেকেই পাচ্ছি—মানে, নিজে দ্রষ্টা হয়েছি, দ্রষ্টব্যও নিজে, দর্শনশক্তিও নিজেই। এই যে নিজেই ঈক্ষণশক্তি, এই হল মহাশক্তি। এই শক্তিরূপে দেবী একদিকে আমাকে দ্রষ্টা করেছেন, একদিকে দ্রষ্টব্যও করেছেন; দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই-ই করেছেন। এইরূপ ভাবে আমারই যে শক্তি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই আমার দেবী।

তা হলে আমি তাঁর একটা পুঁটলি মাত্র নয়—একটা শক্তি। এই হল আত্মার শক্তির দিকের aspect। আত্মাকে শক্তিরূপে পরিচালন করতে হলে এই aspect দেখতে হবে। তাই—'বদন্তি কেচিদাত্মেতি কেচিচ্চ পরমেশ্বরী।' এই জ্ঞানটি

ফুটে ওঠা মানেই আত্মা সহস্রারে গেলেন—নিজের আধিপত্যে পৌঁছলেন।

আত্মত্বের ভিতরে যখন দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এই ত্রিমূর্ত্তি দেখলে, তখন এই ক্ষেত্র হল বীজ ফেলার জমি। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনশক্তি-সম্পন্ন যে আত্মত্ব, তাকে দেখবে। আমার আত্মত্ব একটা static জিনিষ নয়, এটা dynamic। শুধু এক জায়গায় সংস্থিতি নয়; ক্রিয়া প্রকাশ করবার সামর্থ্য আছে।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার।

জ্ঞানস্বরূপিণী মা আমার শরীরে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস টানছেন আর ছাড়ছেন, এ বোধ যতক্ষণ না পাইয়ে দেব, ততক্ষণ মাকে পাওয়া পূর্ণ হবে না। এই জ্ঞান হলে তবে তার তন্মাত্রার উপর অধিকার আসে। যদিও 'এজন' অংশ দেখার কোন মূল্য নেই, সে হল মুক্তির মধ্যাবস্থা। আমরা চাই, মায়ের বুকে একেবারে মিলিয়ে যাব, নির্ব্বাণ লাভ করব।

হীরা আর কাচের পার্থক্য জহুরি ছাড়া অন্যে বুঝবে না। আমাদের সাধারণ অনুভূতি দিয়ে আমরা তাঁকে দেখতে যাই। এই যে অসঙ্গ আত্মত্ব তিনি দিয়েছেন, এ ছাড়া আর পরিত্রাণের উপায় নাই। এঁকে অবলম্বন করে ভগবান্ থেকে মাটি পর্য্যন্ত যেখানে ইচ্ছা চলে যাও; কোন ভাবনা নাই। জ্ঞানস্বরূপের অসঙ্গত্ব ধরে ফেলা, এর নাম ভূছিদ্র। এঁকে ধরা কিছুই কষ্ট-

কর নয়। খালি চল্ চল্, ভেদ করে চল, ফিরে আসিস না। জল ছেঁদা করে কত দূর যাবি? হর হর হর!

ঈক্ষণ হল অসঙ্গত্বের ভিতরকার প্রভাব বা শক্তি। দহরাকাশ = ক্ষুদ্র গভীরাকাশ। আকাশ হল নদীর ভূমি, bed, আর সুষুম্না হল তার ভিতরকার রাস্তা। যেমন বলে দিয়েছি,—'জীব' আর 'বীজ'; তেমনি 'হৃদ' আর 'দহর' এক কথা। এইরূপ এক এক শব্দ-রচনার আসনে গুরু স্বয়ং বসে আছেন দেখবি। যে অংশে আমরা হৃদয় নিয়ে খেলা করি, Law of Intersection এতে উপর দিকে চলে গেল।

এ বিচারের জিনিষ নয়, খালি ভালবাসার জিনিষ। ওঁকে আপনা হতে ধরতে হয়; সেরূপ পারি না বলে, কাণা হয়ে গেছি বলে, এত করে বলা-কওয়ার প্রয়োজন। আমরা নিজেকে কোন রকমে বিশ্বাস করতে চাই না; আমার যে একটা সনাতন স্থিতি আছে, তা কিছুতেই মনে হয় না! তাই ভিখারীর ভালবাসা pathetically বেরোয়,—"ওগো, আমায় দয়া কর।" এ কথা খাড়া হয়ে বলতে পারি না, "আমি যে তোমারই!" আমি তোমার, এই দাবী পেশ করি না। আমার আত্মা দেবতার দ্বারা বেষ্টিত। ছিল আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন; তার পর বুঝলি,—দেবতার দ্বারা বেষ্টিত; তার পর বুঝলি, আর কোন দেবতা নয়, মায়ের বুকে একেবারে গাঁথা, একেবারে একীভূত হওয়া। আমি মা ছাড়া আর কারো দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিচালিত হচ্ছি না। দেবতারা রয়েছেন; কিন্তু 'যোঽয়মন্তরাত্মা অহমেব সঃ।' মা আমার,

মা আমার! এ দিকে যত দর্শন দিবি, তত **instantaneous** অক্রমদর্শন হয়ে যাবে। তখন তোর জীবত্বের খেলা কেমন হবে? যেমন, গরুড় বিষ্ণুর বাহন। এইরূপ নিজেকে ভগবতীর বাহনস্বরূপ জ্ঞান করতে হবে; যতটুকু জীবত্বের ভাব অবশিষ্ট থাকবে, সে ল্যাজস্বরূপ পড়ে থাকবে। এখানকার ভাব, সংস্কার, কিছুকে আমল দিবি না। কুছ পরোয়া নেই; আমি ভগবতীর বাহন। শব্দ-স্পর্শের বাহন নই, স্ত্রী-পুত্রের বাহন নই, সাক্ষাৎ ভগবতীর বাহন!

ঐ মহান্ জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বকে—আত্মত্ব ও অনাত্মত্বকে এই দুই ভাবে ধরে যিনি খেলা করছেন, তাঁর নাম ঈশ্বরীতত্ত্ব। এই দুই aspectকে ধরে ধরে দেখে যাচ্ছি। স্বীকৃতি ও দর্শন দ্বারা এঁর সমীপস্থ হচ্ছি। এই আত্মা ও অনাত্মের বিভঙ্গের দ্বারা একটা পোকাও জন্মায়, মহেশ্বরও জন্মান। এই দুই **aspect** অবলম্বনে তাঁর জ্যোতি দেখে তাঁর উপাসনা করছি। আত্মত্ব ও অনাত্মত্ব, ভগবতীর এই দুই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে; আত্মত্ব ও অনাত্মত্ব, উভয়কে নিয়েই আমাদের ভগবতীতে পৌঁছতে হবে। এই দুই প্রকাশই হল তাঁর। তিনি যখন প্রকাশ না হন, তখন অনির্ব্বচনীয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার আর কোথাও কিছু নেই, যাকে আগে কত রকম নাম দিয়েছি, স্ত্রী পুত্র, **neutron, positron** ইত্যাদি। আছে খালি আত্মা ও বাক্-বিদ্যুৎ। বাক্ই হল সমস্ত, আর কিছু নেই। হিসেব করবার আর জায়গা নেই। মা বলে কমনে যাব, কিসের প্রেরণা দেব,

কার বুকে ভগবতীকে দেখব? এই আত্মত্বকেই ব্রহ্ম বলে, অসীম অব্যক্ত বলে দেখব; আর কাউকে চাই না—আমি আমাকেই দেখতে চাই। কার কাছে যাবি আর লাথি খেতে? যাকে ধরতে যাবি, সে-ই লাথি মারবে; অনাথ-বোধ আবার জেগে উঠবে। নমো নমো নমো নমঃ!

ব্যক্ বিদ্যুৎ! তড়িৎ যেমন একবার জ্বলে উঠে সেখানে যত চেতনা থাকে, সবাইকে চমকে দেয়, তেমনি এই আত্মা যখন কথা বলেন, তখন তাঁর বাক্‌বিদ্যুতের জ্যোতি বা তেজ সমস্ত চেতনাকে স্তব্ধ করে দেয়। এক নিমিষের মধ্যে এ সম্পাদিত হয়, বুঝতে পারিস না? 'সাপ' বলেছিস কি 'ব্যাঙ্' আর নেই; বাকী দুনিয়া সব অন্ধকার হয়ে গেল; একমাত্র বাক্যের জ্যোতি খেলতে লাগল, বাকী সবটা অন্ধকার। অনন্ত বিশ্ব আমার একটা কথায় সরে যাবে, এই হল বাক্যের শক্তি, অব্যাহত অমোঘ বীর্য্য। এর জন্য কি গায়ের জোর করতে হবে, Dynamo জ্বালাতে হবে? এ পাশ থেকে দেখতে—'মশায়, একটা কথা মনে হল।' এ পাশ ছেড়ে একবার ও পাশ থেকে দেখ—একটা কথা, শুধু আমার একটা বাক্যের উদয়ে অনন্ত চিন্তা সব চলে গেল। "দুর্গা!" এই বাক্যের উদয়ে আর সব সরে গেল, মুহূর্ত্তের ভিতর সরে গেল; মুহূর্ত্তও লাগল না। এ কি ভীষণ গতি? বিভীষণ! ভগবতীর বুকে না বসে এ খেলা দেখতে, এর রহস্যের ভিতর ঢুকতে পারবি না।

আমাকে চিনবি ত আমার বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তিকে চিনতে থাক্।

বাক্‌রূপে আমিই প্রকাশ হই, আমিই ছুটি দিগ্‌দিগন্তে; শুধু কথা কই আর এত বড় বিশ্ব বুদ্‌বুদের মত ফুটতে থাকে। খালি তোদের জ্ঞানমূর্ত্তিকে ধর; 'কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং!' এ কথা কিরূপ? এ কি vocal chord-এর ক্রিয়া মাত্র, যেটা শুধু শব্দ? তা নয়। তোরা 'মা মা' বলছিস; কিন্তু মা এসে না বেরোলে কোথাও 'মা' resound হয়? মা না এসে মা বেরোন? মা এলেন, তবে মা বেরোলেন। 'ফুল' আসে, তবে ফুল বেরোয়। ঐ যে আসে, ঐ বাক্; এটা হল তার resounding। রূপের পর রূপের লহর তুলতে তুলতে মা আসছেন, লাল নীল হলদে সাদা কালো। এখন একটা জ্যোতি দিগ্‌দিগন্তে ছুটছে—মা তার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন কোন জ্যোতিষ্কণা আছে, যা তিনি নন? জলে ঢেউ উঠছে, তাতে জলত্ব নড়েছে কি? নড়েনি; অথচ ঢেউ হচ্ছে। জল নড়ছে, অথচ নড়ছে না, এ কি এক জিনিষ? যে জলের বাইরে আছে, সে দেখছে, জল নড়ছে; আর যে জল, সে দেখছে—ঠিক আছি, নড়ছি অথচ নড়িনি; নড়ছি-ও বটে, নড়িনি-ও বটে! তবে তোরা ভগবতীতত্ত্বকে ধরতে এত কষ্ট পাস্ কেন? বাইরে দাঁড়িয়ে বলছিস বলে। সে নড়েও, নড়েও না; খেয়েও খায় না, আবার না শুনেও শোনে, না চলেও চলে! সর্ব্বত্র এই লীলা জ্বল-জ্বল করছে। কত সহজ জিনিষ! জয় ভগবতি! আর এই না নড়েও নড়া, নড়েও না নড়া যে-সে ব্যাপার নয়। এতে কি জাত হচ্ছে? কে জাত হচ্ছে?

মহাকাল! এতে জন্ম হচ্ছে মহাকালের। শিবমাতা শিবানী চ! খালি শিব প্রসব করছে, দিকে দিকে শিবলিঙ্গ সকল বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কি বিশ্ব! শিবলোক! এই শিবকে না দেখলে মাকে চিনবি কি করে? সূত্ররূপ একটি সংযোগ বজায় রেখে যেমন ঘুড়ি ওড়ে, সূত্রচ্যুত হলে সে আর ঘরে ফেরে না; গৃহের দিকে সূত্র গ্রথিত রেখে যেমন আমরা বেরোই: তেমনি এই কালসূত্র মহাসূত্র। বাহ্য-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হবার জন্য তিনি বেরোচ্ছেন, কিন্তু মহাকাল সূত্র ধরে ধরে যাচ্ছেন। যেমনি বলছেন ফিরব, আর গ্রসিত হচ্ছেন মহাকালে। তোরাও মহাকাল দিয়ে মাকে ফিরছিস। মায়ের এই যাওয়া, আর এই ফেরা, উভয়ই দেখতে হবে; তবে মায়ের শক্তি-সৌন্দর্য্য দেখা হবে। তোরা প্রতি মুহূর্ত্তে যাচ্ছিস ও ফিরছিস, দেখতে পাচ্ছিস না? এই যাওয়া-ফেরা ভিন্ন সৃষ্টিও হয় না, লয়ও হয় না; এই হল গতি! নমো মা! আমাকে বাহন করে কোথায় চলেছ তুমি? তোমার অভিপ্রায় কে জানে—কোন্ মুহূর্ত্তে কি মূর্ত্তি ধরবে? সর্ব্ব-গতির গতি তুমি আমাকে বহন করছ, আমাকে বাহন করেছ! কোথায় চলেছ ভগবতি? কোথায় চলেছ? নমঃ! মা বলছেন, "শুধু কালকে দেখতে যাস না; কালীশূন্য কাল দেখিস না; লোপ হয়ে যাবি—শূন্য হয়ে যাবি।" আত্মত্বে পূর্ণ হয়ে কালে যাবি। নয় ত ব্যোম হয়ে যাবি, **annihilation** হয়ে যাবি। সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে অধে আত্মাই—এ দৃষ্টি ছাড়বি না। এ গুরু ভীষণ—বিভীষণ! এঁর ভিতর

মাকে না দেখে ঢুকেছিস কি মরে গেছিস। 'জ্ঞ'ই গুরুপদ-বাচ্য। 'জ্ঞ'কে না দেখে, খালি 'অন'কে দেখতে যাওয়া মানে, 'অন'এর বাহ্য মূর্ত্তি দেখা, 'জ্ঞ'এর হৃদয়ে তখন 'অন' থাকে না। 'অন' বাহ্যে এল মানে, বিশ্ব বাহ্য হয়ে গেল। এখন মহাশক্তি 'জ্ঞ'এর ভিতরে—শিবের বুকের ভিতর কালী। তা হলেই শুধু 'জ্ঞ'ত্ব বলে আর কিছু থাকে না, 'জ্ঞান' হয়ে যান। এঁরই নাম জ্ঞান। এখানে 'অন'এর বেষ্টনের ভিতর অব্যক্ত 'জ্ঞ'; আর ওখানে 'জ্ঞ'ত্বের বেষ্টনের ভিতর অব্যক্ত 'অন'। দর্শন শ্রবণাদি সব আত্মান্তর্গত শক্তি, এ যতক্ষণ বলতে না পারবি, ততক্ষণ জ্ঞ-তত্ত্বে অধিকার নেই। "ন অতঃ অন্যঃ অস্তি দ্রষ্টা, ন অতঃ অন্যঃ অস্তি শ্রোতা" ইত্যাদি। বিশ্ব আত্মত্বের ভিতর ঢুকে গেল, তার মানে কি? তোর স্ত্রী-পুত্র পরিবার, চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি, এ সব 'আমার' বুকের ভিতরই যে! ওঁর সর্ব্বভূমিতে পাদক্ষেপের একমাত্র সহচর এই জ্ঞত্ব। এ জ্ঞত্ব না বাড়িয়ে কোথাও এঁকে পা ফেলতে দেখেছিস? বাইরে রূপ রস, স্ত্রী পুত্র কোথাও হয়? কে রে! কে রে! কোথায় কোন্ নিজত্ব আছে, যে নিজে দ্রষ্টা নয়, শ্রোতা নয়, ঘ্রাতা নয়! জয়! জয়! জয়! চিন্ময় হয়ে যা!

আমি সেই ভয়ে খুলি না আঁখি,
নয়ন খুলিলে পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি।
এক দিন আঁখি খুলেছিনু, তদবধি…

আর বাহ্য চক্ষু খুলিস না। আত্মান্তর-চক্ষু, আত্মান্তর-ঈক্ষণ হ। তা হলে আপনাকেই দেখছি, শুনছি, ঘ্রাণ করছি, স্পর্শ

করছি, আপনা'তেই চলছি, আপনাতেই বসে আছি। আবার এত করেও কিছু করছি না অথবা সব না করেও সব করছি। আর এ করা-করিগুল কিছু নয়, শুধু আমার কথা কওয়া। আর কথা কওয়া মানে, কথা মাত্র নয়। যেমন Electricity শব্দ ও রূপ দুটোকেই বহন করে, আবার দুটোই ভাগ হয়ে যায়—একই শক্তি একদিকে শব্দ, একদিকে আলো বা রূপ; (Talkie) টকিতে শব্দ ও আলো কিসে আসছে? যে জিনিষ এসে একে দু-ভাগ করে দিচ্ছে, বাক্ হল সেই অনির্ণেয়া শক্তি, সে দুই রূপে, নাম ও রূপ প্রকাশ করছে। তোদের এত করে ধরতে হবে না; এমন একটি কথা বলে দেব, যাতে এত করে তোদের ধরতে হবে না। আত্মা দুর্জ্ঞেয়। খালি একটা সংযোগ দেখিয়ে দেব, যেখান থেকে এই দুটি বেরোচ্ছে দেখবি। এই পর্য্যন্ত জীবের অধিকার, এর বেশী নয়।

এই সব কথার দ্বারা আত্মার বিভুত্ব ফোটে, তা ধারণায় আসছে? বিশ্বকে জ্ঞানময় করে নাও। বাহ্য বিশ্বের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। আমার ভিতরের বিশ্ব যেমন পালটাচ্ছে, বাহ্য বিশ্বও তেমনি পালটাচ্ছে। তাকে জ্ঞানময় বিশ্ব করে নাও। তোমাতেই ত সব? আত্মত্বেই ত সব? যে যেখানে আছে, সব দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মন যত বড় বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করছে, সব এই আত্মত্বে। অনন্ত গ্রহ, কত অদৃশ্য লোক, সব এই আত্মত্বেই। আত্মত্ব বললেই দুটো কথা মাথায় এসে যাচ্ছে—একত্ব ও বহুত্ব একাধারে। নিজে ভিন্ন অন্য কেউ নয়। নিজে

সূর্য্য, নিজে চন্দ্র, নিজে আকাশ! নিজে? সেখানে প্রধান-ভাবে কি দর্শন হবে? 'নিজে' হবে প্রধান দর্শন, তার পর সূর্য্য বা বিদ্যুৎ।

জল যেমন চলে ও চলে না, তেমনি আত্মত্ব চলছে ও চলছে না; দুই করছে? নিজে বিদ্যুৎ হয়েছ, মধ্যেকার আকাশরূপ ফাঁকটাও হয়েছ, আর নিজে নিজেতেই বসে আছ? যখন আকাশ, বিদ্যুৎ হয়েছিলে, তখন নিজেকে হারিয়েছিলে? আর আত্মার সেই দরিদ্র জীব-মূর্ত্তিকে মনে পড়ছে? এখন মাটি যদি খেতে দেয় ত খাও, জল যদি কেউ দেয় ত পান কর, এরূপ অবস্থা আছে? আর এই বিভুমূর্ত্তি! এর অন্তর-জগৎকে আত্মা দ্বারা মণ্ডিত দেখালুম। এই জ্ঞান পাকা হয়ে উঠলেই দেখবি, বাইরে খালি মন দেখছি, আর কিছু নয়। এই আত্মত্বে অন্তর্বহি ভেদ ঘুচে যাবে। এখন মন ভিতরে বলে একটা সংস্কার আছে, তখন বাইরের বস্তুই মন, এই দেখবি। বাহ্যে জগৎ নয়, মনোময়ী এক বৈদ্যুতী শক্তিকে দেখছিস। কে সে, যে এত-বড় ব্রহ্মবিভূতি প্রকাশ করলে? জ্ঞানস্বরূপ। "সত্যং জ্ঞানং"। 'সত্য' না হলে জ্ঞানত্বের সার্থকতা পাওয়া যায় না। জ্ঞানমূর্ত্তি ভিন্ন এখানে 'আমি' বলে আর কেউ আছে? আর কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছিস? 'কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং!' এঁতে বসে থাক না। এঁর শক্তি বেরোতে না বেরোতে পালিয়ে আসছিস, এঁতে ঢুকতে ঢুকতেই পালিয়ে আসছিস। এঁতে বসা অভ্যাস কর না। এঁর অস্তিত্ব ছাড়া 'আমি', 'তুমি', আর কেউ

আছে ? 'মা' বললেই তৎক্ষণাৎ যোগ হয়ে যায়। সমুদ্র নদীতে, নর্দ্দমায় ঢুকলেও তার সমুদ্রত্ব কোথা যায়। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে জানছিস ? একটা ধারণা হচ্ছে ; এ আসল দেখা নয়, এ বিম্বের প্রতিবিম্ব। বিম্ব দেখেছিস ? আমার সমস্ত সংস্কার গ্রসিত হচ্ছে আত্মত্বে। আমার কাণে এই জ্ঞান ঢুকছে মানে, 'লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ।' গ্রসিত হচ্ছি ? ছাড় না আপনাকে, ছেড়ে দে ! জীবভাবের সেই মাটি-কাদা-মাখান সেটাকে ছাড় না। দেখ না গ্রসিত হচ্ছে কি না। জন্মের স্রোত পাল্টে যাচ্ছে। আর কেউ নেই—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', জল ধরি আর মাটি ধরি, আর কাকেও কোথাও পাই না। কে বলছে ? ভগবতী বলছেন, না আর কেউ বলছে ? নমো নমঃ ! একদিকে মর্ত্ত বিশ্বকে গ্রসিত করে দিচ্ছে, একদিকে মা বেরোচ্ছে এই মূর্ত্তিতে—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' আর কেউ কথা কয় ? তৈরি হ, তৈরি হ, না হলে বল ধারণ করতে পারবি না। সংযত হ। "হাওড়ায় গিয়ে অমুকের কাছে কথা শুনে এলুম' বলবি না। মায়ের কাছে কথা শুনে এলুম জ্ঞান করবি। জ্ঞানময়ে থাকলে, সে জ্ঞান যদি আত্মবোধশূন্য হয়েছে ত মরেছিস ; তার নামই মৃত্যু।

মুক্তিক্ষেত্র মহাক্ষেত্র, স্বাধীন ক্ষেত্র দেখাতে চলেছে মা, তোকে বাহন করে। স্বাধীন না হলে ভক্ত হয় না—ভক্তির খেলা দেখাবার সময় যদিও পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। মুক্তি পর্য্যন্ত না দেখলে এঁতে ভক্তি হয় না। হয় ?

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার।

বাইরের জগতে আত্মার একত্ব দেখা যেমন কঠিন ব্যাপার, এখানে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন, এ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি আত্মিক জগতে আত্মার বহুত্ব দেখাও শক্ত; কেন না, আত্মায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে প্রকৃতই ত বহুত্ব আর থাকে না। শাস্ত্রও বলেছেন, কূটস্থ অক্ষর পুরুষই জীব হয়েছেন, বহু হয়েছেন। তাই ভিতরে বহুত্ব দেখাও যেমন শক্ত, বাইরে একত্ব দেখাও তেমনি শক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভিতরে দেখলে দেখতে পাই, আত্মা অতি সহজভাবেই বহু হয়ে পড়েছেন; ইহাই তাঁর পরা শক্তি। আলোর যেমন বিকীর্ণ হওয়া সহজ ধর্ম্ম, আত্মার তেমনি বহু হওয়া সহজ ধর্ম্ম। প্রতি ঘটনায় আত্মা বহুমূর্ত্তি ধারণ করেন, প্রতি ঘটনায় আত্মা বহু হয়ে যান। আমি সুখী, আমি দুঃখী, এ আমরা সর্ব্বদা দেখি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি যে, ও সবটাই আমি। এইরূপে প্রতি কথায় এই কূটস্থ আত্মা থেকে বহু আত্মত্ব বিকীর্ণ হচ্ছে। জল তরঙ্গায়িত হলেও, যে নিজে জল, সে যেমন দেখে, আমি যেমন জল, তেমনই আছি, তেমনি কূটস্থ আত্মাও দেখছেন, বহু হয়েও আমার আত্মত্বের কিছু অদল-বদল হচ্ছে না। আত্মার এই অংশকে ভরসা করে কেউ বিচারের পথে আনতে পারেনি।

তোমার আমার জীবনে এই যে সব ঘটনা হচ্ছে, এ সকল ভাল করে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, আমরা কর্ম্মফল প্রভৃতি

নানা বিজ্ঞান দেখেছি, কিন্তু এ বিজ্ঞানটিকে বড় দেখা হয়নি, যে বিজ্ঞানে দেখা যায়, যিনি সব সেজেছেন, এ সব তিনিই। তা হলে সুখ দুঃখ, আনন্দ কান্না, এ সব তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আগুন যেমন আগুনকে দগ্ধ করে না, তেমনি আত্মাকে সুখ-দুঃখ সুখী দুঃখী করে না। যে যত পর হয়, সে তত আঘাত দেয়; সুতরাং এই গতিতে আত্মা নিজে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না, আত্মার নিষ্কলত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হচ্ছে না। তাঁর আনন্দের খেলা চলছে; অনন্ত বিশ্বের সুখ-সম্পদ, আলো, আঘাত, খালি একটা কণামাত্র শিল্প-কার্য্যের মত তিনি দেখছেন। সুতরাং এ সব তাঁর। 'এ সব তাঁর' এই কথাটি না বললে যত সুখদুঃখ আমার ঘাড়ে এসে পড়ে; আর তাঁর বললে তাঁর ঘাড়ে পড়ে যায়। সুতরাং এই বোঝা নিয়ে তাঁর ঘাড়ে না ফেললে আমার অব্যাহতি নেই। এতে ব্যাপার এই হল যে, ঐ বিভু আত্মার ঘাড়ে ক্ষর আত্মা সব ফেলে দিলে, অথবা তিনি ফেলালেন।

তা হলে এই ছবিতে দেখলুম, ওঁকে সমন্বিত করে না দেখা হলে এই অস্তিত্বময় জীবনকে মোটে দেখাই হয় না, পড়াই হয় না। কি দারুণ অন্ধকার! জীবনকে এত অসার্থক করে রেখেছি! কত দিকে কত যে সার্থকতা মর্ম্মান্তিকভাবে গ্রহণ করছি, অথচ এই সার্থকতা মোটে দেখাই হয়নি। এই দেখার নামই লব্ধস্মৃতি হওয়া, বিগতমোহ হওয়া। এই রে, আমি যে ভগবতীর বুকে! এত দিন যা পড়ে এসেছি, সব

ভুল। এ কি কাণ্ড রে! এ লব্ধ স্মৃতি কি প্রলয় কাণ্ড করে দিলে! তোমায় এত দিন না দেখে কি কাণ্ড করেছি! তোমাকে দেখা সত্ত্বেও আমি যে কি ভুল করেছিলাম; আজ চমক লেগেছে—"আমি তোমাতেই।" একটা কথা। "তোমাতে," এই কথা বলতেই তোমাতে সাযুজ্য দিয়ে দিচ্ছ। এত স্বাধীনতা দিয়েছ এই ক্ষরকে; তথাপি চোখ এই দিকে আছে বলে ওদিক্ উপেক্ষা করেছি; আবার মুহূর্ত্তে ছুটে আসছি। এত মিষ্ট লেগেছে, সে মিষ্টতা বাড়াতে গেলেও কিছুতে বাড়ে না; যতক্ষণ এ দিকের টানগুল অপরিস্ফুট না হয়। সুতরাং সে আকর্ষণগুল যে তুমিই, এই জ্ঞান উজ্জ্বল করে ধর। এ স্মৃতি ফুটলে এ দিকের মোহ আর ক্রিয়াশীল থাকবে? তখন মহামায়া-মূর্ত্তি থাকবেন। তুমি আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছ, অনন্ত রকম করে ভোগ করিয়েছ—এই না? এই জ্ঞানে উজ্জীবিত হয়ে আমি যখন 'ভগবতা' বলে উঠি, তার মানেই হয়, এই ক্ষরত্বের খানিকটাকে তুমি বুকে তুলে নিলে, এর খানিকটা তোমাতে প্রবিষ্ট হল। নিলে; কিন্তু দাঁড়াতে দিলে না। বুকে নিলে, কিন্তু অবশিষ্ট জীবত্ব নিয়ে পড়ে রইলুম। আত্মত্বকে গ্রহণ করে একদিকে বুকের পরশ দিলে, কিন্তু এ পাশে বাসনা পড়ে আছে বলে সম্পূর্ণ সাযুজ্য দিলে না। এটা কেন হয়? তোমার নেওয়াকে ভাল করে দেখিনি বলে। 'ভগবতী' বললেই খানিকটা যাই, খানিকটা নিয়ে নাও; তোমার নেওয়া ভাল করে দেখিনি; তাই এই দুর্গতি হচ্ছিল। সত্যি সত্যি

ভগবতী আমায় নিয়ে নেন ? এটা কি সত্যি কথা ? কেমন করে বলছিস ? এ নেওয়ায় তৃপ্তি আছে ? এ ত শুধু মেধায় দেখে বললি। এই মা বিভু, বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, আমায় বুকে ধরে বসে আছেন—এটা সত্যি কথা ? এই স্মৃতি এনে দাও, এই ভূমিতে আমাকে ধরে রাখ, আমায় সজীব করে রাখ, এই প্রার্থনা কত তীব্ররূপে জেগে উঠবে—যদি জানি, বিশ্বের আত্মা আমার প্রাণের প্রাণ। কোথায় লাগে স্ত্রী, পুত্র, স্বামী! এই প্রার্থনা তীব্র হবে না ? যদি না হয়, তবে মা বলে বলে যে মায়ে যাব, এই প্রার্থনাই যথেষ্ট ; এইটুকু বুকে নিয়েই গতি হবে। কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঞ্জাল আমার গায়ে লেগে আছে ; মাকে পেতে গিয়েও এ-সব ছোট ছোট ভাব জাগে!

আজ আমি ভগবতীতে উপনিষণ্ণ ; সুতরাং আজ আমার বাণী হল উপনিষদের বাণী, অপৌরুষেয় বাণী। আমি মহামন্ত্রের দ্রষ্টা ; যে বাণী বেরোবে, সে অপৌরুষেয় মহামন্ত্র। গরুড়কে বাহন করে তিনি যেমন ছোটেন, অথচ গরুড়ের ভিতর তিনিই গরুড় হয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন, তেমনি তোদের আজ দেখাচ্ছি যে, তোরা ধ্রুবা স্মৃতিতে যেতে চলেছিস ; এই ভূমিতে আসবার জন্য তোদের গতি আরম্ভ হয়েছে। এ স্মৃতিতে জেগে উঠবার মূল্য বুঝতে পারলি ? কিছু পারিসনি। নমো নমো নমঃ!

এইমাত্র স্মৃতি আমার বোধ ফিরিয়ে নিয়ে এল ; অসম্পূর্ণ ভাবে স্পর্শ দিতে না দিতে আবার চলে গেল ; এ কাণ্ডটা কি

জানিস? এ সহস্রার থেকে হৃদয়ভূমিতে মায়ের নেমে আসা। এ শরীর ভোল, জ্ঞানময় পুরুষে বসে শোন। মা বিশিষ্ট ভাবে সহস্রার থেকে ক্ষর আত্মার ভূমিতে, জীবত্বের ভূমিতে নেমে এলেন। আমরা মা অপেক্ষা বাসনাকেই বেশী ভালবাসি; তাই দেখে মা চলে গেলেন, আবার এলেন। কে এমন করে খেলা করছে, তা আমরা বুঝি না। তাই বলি, এক একবার মন ভগবানে যায়, আবার চলে আসে। এ খেলার জন্য আমরাই দোষী। অর্জ্জুন বললে, 'সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত!' কি সুন্দর কথা! কি গভীর তত্ত্ব বলেছিল! হে অচ্যুত, পরমেশ্বর-ক্ষেত্রেও অচ্যুত, এখানে জীবক্ষেত্রেও অচ্যুত; এই অসঙ্গত্ব হল মধ্যস্থল। এক পিঠে ঈশ্বরী-শক্তি-প্রকাশের ভূমি, এক পিঠে জীবের খেলা। যোগীর পক্ষে এই কথাটি বড় সমীচীন। হে অচ্যুত! আমায় এইখানে দাঁড়িয়ে দিক্‌নির্ণয়ের অবসর দাও; আবার বাসনার দিকে যাব, না তোমার দিকে যাব, তা ঠিক করতে দাও। যদি বল, এ ভূমি একবার দেখলে জীব আবার জগতের দিকে ফিরতে চায় কি? বাজে কথা। এই অসঙ্গ আত্মায় রয়েছ, একটা পিঁপড়ে কামড়ালে তৎক্ষণাৎ এদিকে ফিরে আসবে। সুতরাং যখন দম্ভ করে বলে যে, এই মুহূর্ত্তে যদি মৃত্যু আসে, আসুক। এ সব মূর্খের কথা, অর্ব্বাচীনের কথা;—কি বলছে, তা এরা জানে না। হৃদয়ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। আমিত্বের অভিমান, কাচ্চা-বাচ্চা এখানে কত জোরে বেঁধে রেখেছে! ঐখানে দাঁড়িয়ে বল,—"অচ্যুতে

যাব।" তা হলে জানব, সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। বাকী সব কথা অসার। সুতরাং এই ভূমিতে এসে যদি মাকে ডাকি, তবে হিসাব ঠিক হবে; নয় ত খামখেয়ালি ধর্ম্ম, নয় ত এই রকম হিসাব; একটা মামলা মেটানর জন্য আমাদের অগ্রগতি। এই হিসাবটা বুকে সজাগ আছে? একটা কিছু বুঝে নিলুম, একটা কিছু পেয়ে গেলুম, এই-রকম? না, এই যে জ্ঞানমূর্ত্তির বুকে বসে রয়েছিস, তোর সমগ্র হিসাব এঁকে পেলেই মীমাংসিত হবে? সমগ্র ভাবে অর্জ্জুন যেমন 'শিষ্যস্তেঽহং' বলে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল, আমার করণীয় কিছু বুঝি না, যা হয় তুমি কর, মা বলবার আগে তোরাও সেইরূপ তোদের জ্ঞানমূর্ত্তিকে 'শিষ্যস্তেঽহং' বলে গুরুত্বে বরণ কর। মা সেজে সুখ ভোগ করছ, অপার মাতৃত্বের আদান-প্রদান দিব্যভাবে করে আসছ, আর এর দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছ। আজ ও-রকম ভাবের মা না সেজে গুরু সাজ; আমার গতি নিয়ন্ত্রণ কর, অর্থাৎ আমার জ্ঞান এমন করে খুলে দাও, যাতে আমি দেখি, আমার কোন গতিই আমার নয়; তা হলেই আমার সব মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। হৃদয় হয়ে যাবে দহর-ভূমি। আমাকে ও আমার বিশ্বকে সত্যি সত্যি পরিচালিত করছ তুমি। ইহা দেখবার জন্যই আমাদের যত প্রচেষ্টা, এর চেয়ে নিম্নে নয়। আজ কৌশল শিখেছি; তোমায় দেখবা মাত্র আমার স্মৃতি ফিরে আসছে যে, তোমার বুকে আমিও চিন্ময়। আর

স্মৃতির এই ফিরে আসাটি একেবারে সত্যি কথা, এই জ্ঞান যদি থাকে, তা হলে আমার ধাত একেবারে বদলে যাচ্ছে; যেমন **insuline** দিলে শরীরের শর্করা একেবারে বদলে যায়। আমি চিন্ময়—আর আমার মৃত্যু নেই, হিসাবের খাতাও নেই। আমাকে খালি চোখ দাও, এমন দীক্ষা দাও, যাতে তোমা থেকে আমার চোখ একটুও নড়বে না; এই দীক্ষা আমাকে দাও। যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বললুম, সেই ভূমি তোদের জীবনের সঙ্গমস্থল; এই মর্ত্ত্য জীবন, আর ও-পাশের অমৃত জীবন, এর সঙ্গমস্থল। যা বললুম, তা ঐখানকার প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা নেবার জন্য এখনো লালায়িত হচ্ছিস না? এখনো ঐ পচা মাংসগুলোকে ধরে থাকতে, ঐ মড়াগুলোকে চিবোতে লালায়িত রয়েছিস? সব লেপ-কাঁথা ছেড়ে এই ভূমিতে উঠবার জন্য তোদের আত্মত্ব তীব্র তেজে জেগে উঠছে না কেন? অন্ততঃ এই জ্ঞান শোনবার সময়, আলোচনার সময় ত উঠুক; পরে যা হয় হবে। এই মুহূর্ত্তে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক্ না। ভুটো ধর্ম্মকথা শুনতে চাচ্ছিস? শিক্ষার দিকে, না দীক্ষার দিকে যাবি? তোর এই জীবন মড়ার মত, মৃত নিয়ে তোর খেলা; সেই তুই অমৃতত্বের দিকে যাবি; এর কত মূল্য, এটুকু জ্ঞান তোর আসবে না? কোন্ ভূমিতে এসে পড়েছিস? দীক্ষার ভূমি। বাক্ যেখানে সজীব হয়, মহাকাল যেখানে গুরু! তুই এখনো ঠায় মৃত্যু বমন করছিস। এমন তুই; সেই তোর প্রতি বাক্ সজীব হবে, ভগবতীময় হবে, বিশ্ব-পরিচালিনী-

শক্তিময় হবে তোর বাক্-বিদ্যুৎ—এমন ভূমিতে যাবি না? কোথায় থাকবি? ভাবের কথা বলছি না, শক্তির কথা কইছি; ভগবতীর কথা, মায়ের কথা এই আমাকে ধরে বসে আছে। গুরু-লাভ করবি? গুরুকে কোথায় দেখছিস? এত দিন কি গুরু গুরু করছিস? গুরুতত্ত্বের কি বুঝেছিস? এই দীক্ষার জন্য, প্রস্তুত করার জন্য কত কাল থেকে তোদের বুদ্ধির অনুগমন করে চলে আসছি; যেমন ভগবান্ অশ্বের বল্গা ধরেছিলেন। শুধু দুটা শাস্ত্রের মানে শেখাবার জন্য? এই ভূমির দীক্ষা গ্রহণ করবার মত অধিকার এসেছে? এর seriousnessএর সঙ্গে সঙ্গে তদুচিত বীর্য্য ফুটল? না। সুতরাং দেখ, এ ভূমিতে দীক্ষা গ্রহণের অধিকার নেই।

যাত্রায় যে দৃশ্যগুলি দেখিস, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবেতে উজ্জীবিত হস; তেমনি এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোরা সেইরূপ উজ্জীবিত হতিস, তা হলে গুরুকে বুঝতে তোদের একটা অধিকার এসেছে জানতুম; কেন না, তাতে তোদের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পেতুম। দেখ, এখনো এই জন্য আমাকে তোদের নিয়ে রগড়াতে হবে। তা হোক্, কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে রাস্তা, বুঝতে পারছিস্? কোন্ মহাগুরুর গুরুত্বের আসনের তলায় তোদের নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়েছি? লব্ধস্মৃতি, বিগতমোহ! মা নিয়ে যাচ্ছেন এইখানে! এমন কিছু সাধন-ভজন তোরা করে এসেছিস, যার দরুণ তোদের আত্মার একটা কণাও এ জ্ঞান নিলে? এই ভূমির ইঙ্গিত আজ দিলাম। কেন না,

পূজার আগে আর কিছু কইব না। পূজায় কোন্ দিক্ থেকে কোন্ দিকে তুলে নিয়ে যাব, তার একটা আভাস আজ দিলুম। আর যদি এ মা আমার দয়া করে ফেলে, তোরা যদি ঠেকে থাকিস, একটা মুহূর্ত্তে কটাস্ করে টেনে নিয়ে যাবে। এই তীব্র ইচ্ছায় আমরা পূজার দিকে অগ্রসর হব।

মা আজ বড় একটা বীর্য্য **injection** করে দিলেন—না? গঙ্গা যেমন ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি মা তোদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; তবু তোদের কর্ত্তা সাজা ফুরোয় না। এইমাত্র যে জীবন ছিল, সে জীবন আর থাকবে না। পূজার সময় বিজ্ঞান লক্ষ্য করবি। ভাব নয়, ভাষা নয়, এ স্রোত কোন্ দিকে যাচ্ছে, লক্ষ্য করবি। আর সত্যের দিকে চোখ দিবি। আমরা যে সত্য পেয়েছি, সে খালি একটা সত্য শব্দের, মন্ত্রের ইঙ্গিত পরিপূর্ণ করে দেয়। সে হল বাক্!

পর পর ঠিক বলে যাচ্ছি। বাকের শব্দ-অংশের কোন মূল্য নেই; **manifestation** ও শক্তিত্ব, এই হল বাকের প্রধান মূর্ত্তি। এমন শক্তিরূপিণী এই বাক্, চেতনা ও আয়তন, ফুটিয়ে ফুটিয়ে চলে। বাকের পদক্ষেপ মানেই চেতন জেগে উঠছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আয়তন, শরীর রচিত হয়ে যাচ্ছে। এই শক্তি বাক্।

আমরাও 'মা' বললে মা প্রকাশ হয়ে উঠবেন। এই ভাবে বাক্ চলেছে এই দুই কাজ সংসাধন করার জন্য। সে সব শিক্ষা

সাঙ্গ করেছি। কেউ কাদা মেখে আছে, কেউ বিধৌত হয়েছে, এ একই কথা।

শুধু স্বীকৃতি মাত্র নয়, 'মা' এই বাক্ জীবন্ত আত্মাকে জাগিয়ে ও ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে। এ কোন্ ভূমি, তা আন্দাজ করতে পারলি? তৈজস ভূমি। সাত্ত্বিক ও তামসিক, উভয় ভূমিকে ভেদ করে রাজসিক শক্তি। এক দিকে মাতৃ-চেতনার প্রকাশ হবে, আর এক দিকে মাতৃমূর্ত্তি, আলো ফুটে উঠবে, এমনি করে মা বলতে হবে। কেঁদে-কেটে, আদর করে বলছি, সে হিসাব আর নাই। এই তোদের রাজস জাগরণ, যাতে বুকের মড়া মা জ্যান্ত হয়। হে মহাকাল, গুরু, তুমি সহায়। এ মানুষে পারে না। মহাকাল যাঁর অবয়ব, সেই গুরুই খালি পারেন। রক্তমাংসের শরীরী এ পারে না। কথাটা বুঝলি? শিবের ডাক না হলে মা সাড়া দেন না, জাগেন না।

তোদের 'প্রস্তুত হও' বলা বৃথা। মা, এদের প্রস্তুত কর। কি অপূর্ব্ব ভূমি, কি অপূর্ব্ব গতি! তাই এ খেলা খেলতে ইচ্ছা করে। কত বড় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢোকা, আর কত বড় আলোয় প্রবেশ করা। ব্রহ্মাণ্ডেরও যে মূল্য, এ দোলন দোলারও সেই মূল্য। কি চমৎকার! কি অবাক্ কাণ্ড তোমার? কি গতি! কি গুপ্ত বাক্স রে! এ পাশে মৃত, ও পাশে অমৃত! কিন্তু অমৃতে ভিন্ন মৃত্যু কোথাও জাত হয় না। এত বড় খেলাটা negative হয়ে যাওয়া। কি সুন্দর, কি অবাধ! একেবারে অস্তিত্ব চূর্ণ হয়ে মরে গেল, আর নেই। তারই মধ্যে

কি প্রভাবে অমৃত parallel run করছে ; তার চোখে মৃত্যু ফোটেনি। এই এত বড় রাজপথ—এই সুষুম্নার পথে মৃত্যু থেকে অমৃত পর্য্যন্ত যুগপৎ এক টানে ফুটে ঠেলে উঠল। নমো নমঃ !

২৯এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার।

আমরা পূজায় বলিদান করি। বলি-ব্যাপারে প্রকৃত পক্ষে যিনি পশু হন, তাঁকেই আগে দেখতে হয় ; কারণ, তাঁকে তাঁর প্রকৃত ভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়াই বলিদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। পশুত্ব মানে, তিনিই সেই রূপ গ্রহণ করেছেন বই ত নয় ; পরমার্থতঃ সে একটা ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি, এই তিন দেবতাকে নিয়ে জীবত্বের যত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ; এই তিনই আদি-শক্তি ; বাক্, প্রাণ ও মন ; বাক্ অগ্নি, প্রাণ বায়ু, মন সূর্য্য। এই তিনকে নিয়ে পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে বলে আমরা বলিদানের সময় ঐ তিন দেবতার মন্ত্র পাঠ করি,—"সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ, তেনাযজন্ত, স এতং লোকম্ অজয়ৎ।" সূর্য্য—যিনি আজ সূর্য্য হয়েছেন, তিনিও অগ্রে পশু ছিলেন এবং যজ্ঞে সেই পশুত্ব বলিদান দ্বারাই সূর্য্যরূপ লাভ করেছেন। সেইরূপ বায়ু, অগ্নি উভয়েই। যে কোন জীব, যে কোন মনুষ্য সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ুলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি ঐ ঐ দেবতার বাক্, প্রাণ ও মন, এই তিনের উপাসনা

করেই তা পেয়েছেন। সুতরাং আমরাও বলিদানকালে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ুর উপাসনা করছি, এই বলির পশু যার দ্বারা ঐ সব লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এই তার গতি হয়ে গেল। এমন জায়গায় তাকে ছেড়ে দিলুম, যাতে সে ঐ ঐ ক্ষেত্রে চলে গেল। সেখান থেকে তার ঊর্দ্ধগতির জন্য উপযোগী মন, প্রাণ, বাক্ সে পাবে। এই কারণে আমরা যজ্ঞে যে পশুবধ করি, সেটা প্রকৃত বধ নয়। যজমানের জন্য যজ্ঞ করে যজমানকে গুরু ফল প্রাপ্ত করান, এই জন্য গুরুর এত দাম। গুরু কাজ করেন; তাতে শিষ্য উদ্ধার হয়। এই সব মন্ত্র দ্বারা আগে সঙ্কল্প তৈরি করে নিতে হয়, অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি, পশুকে সেই দেবতাময় করে নিতে হয়। বাক্, প্রাণ, মন যেখানে পূর্ণরূপে বিরাজ করছে, সেই হল দেবী-ক্ষেত্র। পশুকে দেবীক্ষেত্রে তুলে দেবার ঐ মন্ত্রগুলিই উপায়।

খড়্গপূজা।—খড়্গ যে-সে খড়্গ নয়; খড়্গনামীয় যে মহান্ জ্ঞান, ইনিই এই খড়্গ-দেবতা। সেই খড়্গ-দেবতার অনুকরণে আমি যে খড়্গ তৈরি করলাম, সে হল জীবের খড়্গ। আর বিরাটের যে বিপুল খড়্গজ্ঞান অবলম্বন করে আমি এই খড়্গ করেছি, সেই বিপুল খড়্গ-জ্ঞান হলেন খড়্গ-দেবতা। আমি যখন 'খড়্গায় নমঃ' বলে পূজা করি, তখন খড়্গনামীয় যে বিপুল জ্ঞান-দেবতা রয়েছেন, তাঁকেই পূজা করছি; খড়্গ-পূজা মানে, সেই দেবতাকে পূজা করা। আমাকে নিজের পশুত্ব ছেদের জন্যও বলিদান করতে হবে। সে জন্য বাইরেও একটা কিছুকে

ছেদ করতে হবে। কেন না, কোন একটা কাজকে চেতন থেকে জড় পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় যতক্ষণ না ফুটিয়ে তুলতে পারি, ততক্ষণ সে কাজটা সম্পূর্ণ হয় না। সেই জন্য 'বিনাশ' বলে জ্ঞানকে মূর্ত্ত না রাখলে পূর্ণমাত্রায় সে জ্ঞান ফুটবে না; কাজেই বাইরে একটা কিছুকে নিয়ে ছেদন করতে আমি বাধ্য। ছেদনে জ্ঞান আছে, একটা রক্তারক্তি করতে হবে। শিরশ্ছেদ, কণ্ঠচ্ছেদ মানে, আকাশ ছেদ করে দিতে হবে; এ-পাশে কণ্ঠের নিম্নে ভূতাকাশ পড়ে রইল; কণ্ঠের ঊর্দ্ধে ও-পাশে চিদাকাশ; পশুর শিরশ্ছেদ করে, তাকে ভূতাকাশ থেকে এই চিদাকাশে তুলে দিতে হবে। এক কোপে কাটতে হবে; নয় ত দ্বিতীয় বার সঙ্কল্প করতে হয়। তা নিয়ম নয়। সঙ্কল্প এক ধারায় চলবে, তাই এক কোপে কাটতে হবে। সঙ্কল্প ভাঙ্গা মানে, সেই লোক থেকে নেমে পড়া; নেমে পড়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির বাধা; সুতরাং আবার গোড়া থেকে করতে হবে। নিজের পশুত্ব বলি দিতে বাইরের কোন্ পশুকে প্রতীক করবে? এ বলির ভূমি ত বাক্‌ভূমি? বাক্‌ই হব্যবাহী অগ্নি। যে শক্তি এই ক্রিয়াকে পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, সেই শক্তি অবলম্বনে যেতে হবে; সুতরাং বাক্ বা অগ্নিই অবলম্বনীয় এবং ছাগ হল সেই অগ্নির বাহন। ছাগলে অগ্নিতত্ত্ব বেশী, তাই যক্ষ্মারোগীকে ছাগলের মাংস খেতে দিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদের মতে ছাগমাংস অগ্নি-বর্দ্ধক। সেই জন্য ছাগবলিই হল প্রধান বলি। যারা শুধু সংস্কারবশে চলে, এতটা বিজ্ঞানে যেতে রাজী নয়, তারা

কুমড়ো প্রভৃতির দিকে গেল। "কেটে গেছে", ভাল করে এই কথা বলতে পারলেই কেটে গেল। "হয়ে গেছে" এই কথা ভাল করে বলতে পারা চাই। পূজা অর্চ্চনা যা কিছু, শুধু বলতে পারার উপর নির্ভর করে। জল থেকে আত্মভূমি পর্য্যন্ত একটা "হয়ে গেছে"র উপলব্ধি ফুটে ওঠা চাই। যে ধর্ম্মপ্রধান দেবতার পূজা হচ্ছে, সেই ধর্ম্ম যে বাহ্য পদার্থে বেশী আছে, সেই বস্তু দিয়ে তাঁর পূজা করার বিধান। ছাগেতে রক্তারক্তির চাক্ষুষতায় উপলব্ধির বেশী সহায়ক হয়। আর যে কুষ্মাণ্ডেও সেরূপ উপলব্ধি ফোটাতে পারে, তার পক্ষে একই কথা। বোধের পূর্ণতায় সৃষ্টি হয়। যে জিনিষের উপলব্ধির পথে যে ক্রিয়া সব চেয়ে বেশী সহায়ক, সেই উপলব্ধির পূর্ণতার জন্য সেই ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। ছাগকে কখনই হত্যা করব না, যদি তার উপর চোখ রাখতে পারি। যার বোধ ঊর্দ্ধলোকে উঠে গেল, সে সঙ্গে সঙ্গে বলির জীবকেও সেই লোকে তুলে নিলে। সেই জন্য বলে,—যেখানে ঋষি বাস করেন, তার চারি পাশে 'ঋষি-atmosphere' তৈরি হয়ে যায়। যারা চক্ষুষ্মান্, তারা তা দেখে, নিম্নস্তরের লোক দেখতে পায় না। যে বশিষ্ঠের বাক্যে দশ হাজার মানুষ তৈরি হয়, তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়া কাটা না কাটায় কি আসে যায়? 'আমি এই জীব' এই জ্ঞানটা বলবৎ থাকায় আমরা উপলব্ধিতে পৌঁছেও তাতে থাকতে পারি না।

নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে বলিদান দু-রকম। বাসনাবিশেষ

পূর্ণ করার জন্য যে বলিদান, সে হল নৈমিত্তিক। আর শক্তি পূজার অঙ্গ নিত্য-বলিদান; যাতে বাহ্য জগতের শক্তিময়ত্বকে জ্ঞানময়ত্বে নিত্য পর্য্যবসিত করব। এই যে বলিদান, শক্তিপূজা করতে গেলে এ দিতেই হবে। শক্তিতে আত্মত্ব না দেখলে সে শক্তি জড়শক্তি। জড়শক্তিকে চেতনশক্তিত্বে পর্যাবসিত করতেই হবে। তাই বললুম, "পশু, তুমি শিবরূপী; নিজেই বলিরূপে আমার ভাগ্যবশে উপস্থিত হয়েছ।" চিন্ময়ের প্রধান তিন অংশ—বাক্ প্রাণ মন; তাই বললুম, "সূর্য্যস্তে লোকো ভবিষ্যতি, বায়ুস্তে লোকো ভবিষ্যতি, অগ্নিস্তে লোকো ভবিষ্যতি।" এখন লোক আছে—মাটি কাঠ জল; এবার লোক তৈরি হচ্ছে—সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু। এটা আমি সংশোধন করলুম; এতে তোমারও সার্থকতা হবে, আমারও সার্থকতা হবে। জড়ে পূর্ণভাবে বলিদান না ফোটালে মন, প্রাণ ও আত্মায় বলি-জ্ঞান আসে না। তাই ছাগ হোক, কুষ্মাণ্ড হোক, একটা প্রতীক চাই-ই।

চিন্ময় তত্ত্ব—ইনিই সজীব একজন, ইনিই আসল তত্ত্ব; বাকী সব এঁর হাড়-মাস। প্রকৃতপক্ষে এই জ্ঞানস্বরূপই আছেন, আর এগুলো সব এঁর গায়ের দীপ্তি, এই জগৎ-আকারে বেরোচ্ছে। The thing itself হচ্ছেন তিনি। এই ভরস্তরটা দেখলে বুঝবি, তোরা কত উল্টে আছিস্। এইটেকে উল্টে নিতে হবে। চেতনার এই উল্টানোটা কত বড় শক্ত জিনিষ! জ্ঞান নিতে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করেই এক সেকেণ্ডের ভিতর নেমে আসি, অথচ চিরকালের জন্য তাঁতে আমার স্থিতি নিতে হবে।

একবার "শাঁখ" বললে চিরকালের মত একটা জ্ঞান থেকে যাচ্ছে। একবার জানলে, সে জানা চিরকালের জন্য রয়ে গেল; এমনি ভাবে এই জড়ত্বের জ্ঞান অর্জ্জন করেছিস। এই জ্ঞানকে এখন আবার উল্টে ধরতে হবে। এক দিকে এ যত সহজ— বলামাত্রই হয়ে যাওয়া, একদিকে তেমনি কঠিন; কত সহস্র বার বলা হয়ে গেছে।

'আমি চিন্ময়'—এ কথা কি যে-সে কথা? তা হলে কি বুঝিয়ে গেল যে, আমার বাকেই সৃষ্টি হবে? চেতন মানেই হল, বাক্ যাঁর শক্তি; চেতনের বাক্ই সব গড়ে, বাকের ভিতরই পঞ্চ তন্মাত্রা ইত্যাদি সব আছে;—এই বাক্ যাঁর শক্তি, তিনি চিন্ময়। তিনি দেখছেন, তাঁর বাকের ভিতর সমস্ত বিশ্ব নিহিত রয়েছে, আর বাকেই সে সব সংহৃত হচ্ছে। বাকের অবয়ব হল বাক্য, তাব প্রকাশ বাক্যে। 'অহং' ও 'হং'—এই দুই মেরু অহর্নিশ কি ভাবে তৈরি হচ্ছে? চেতন মানেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃৎস্পন্দনের শক্তি। দুই হাত, দুই চোখ ইত্যাদি দুই শক্তি, **negative** ও **positive** জুড়লে নিজেকে **neutral** করা হয়, অর্থাৎ তখন কোন ব্যক্ত শক্তি আমাতে থাকে না; আমি **neutral** হয়ে তোমায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। হাত তোলা মানে, হাতের পিঠের দিকে **positive** শক্তি, হাতের তেলোয় **negative** শক্তি। আশীর্ব্বাদের বেলায় হাত চিৎ করতে হয়, পাপ হরণের সময় হাত উপুড় করতে হয়। বাম দিকে **negative** মাতৃশক্তি, দক্ষিণ দিকে **positive** পিতৃশক্তি। হাত যোড় করা মানে, দুই বিরুদ্ধ

শক্তিকে **neutral** করে ভগবতীব কাছে ধরা। তুমি তাঁকে কি দিচ্ছ না দিচ্ছ, তোমার মনে কোন কথা উচ্চারণ করবে না; হাঁ বা না, দুটোর কোনটা নেই; শুধু—"তুমি যা করবে, তাই হবে।"

৩০এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতি বার।

আমরা কি এঁকে এমন করে অবহেলা করতে পারব, যাতে ইনি পরাভূত হবেন? তা হবার জো নেই। কোথায় যাবি? প্যাঁচার মত কোন অন্ধকারে লুকোবি? 'তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।' যা! ইনি আদিত্যবৎ সুপ্রকাশ, এই দিকে লক্ষ্য করিস। তোর কুঠুরির ভিতর ঢোক; সেখানেও দেখবি, ইনি আলো করে বসে আছেন। কোথায় যাবি? কি জিনিষ নিয়ে বসে রয়েছি, এই আভাস নিয়ে তা অনুমান করে নাও। আর তাঁর সামনে কত চাপল্য প্রকাশ কর, তোমাদের কত দৈন্য, তা পুনঃ পুনঃ দেখে নাও।

তোদের বলে দিচ্ছি, তোদের সাধন-ভজন নেই। এত ভয়ঙ্কর জোরের কথা আর কোথাও খুঁজে বার কর্ ত। তোদের যে, এটা কর, সেটা কর বলি, সে তোদের বুদ্ধির কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য। যাকে তিনি এ জ্ঞানে জ্ঞানময় করেছেন, এতে তার নরসিংহ-মূর্ত্তি প্রকাশ হবে না? এ জ্ঞান যাতে ঢেলেছেন, তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না? খালি আমার কাছে যতটুকু সময় থাকবি,

ততটুকু সময় এই ধারণা, এই বোধেতে উজ্জীবিত হবি ; হিসাব কষতে পাবি না, পরমুহূর্ত্তের হিসাব রাখবি না। এই মুহূর্ত্তে পরমেশ্বর উদিত—বাস্ ; পরমুহূর্ত্তে যা হয় হোক। নমঃ শম্ভো! আহাহা! কি করে আগুন জ্বালতে হয় দেখিয়ে দিয়েছি। বেদি দেখিয়ে দিয়েছি ; 'হোতা বেদিসৎ।' আধার তৈরি হয়নি ; তাই ক্ষণেক flash দিয়ে চলে যায়। Carbon নেই ; ignited হচ্ছে না। আগুন দিয়ে দিয়েছি, এবার একটু কয়লা দেব ; 'কাল' ধরিয়ে দেব। এর মস্ত রহস্য হল এই যে, বর্ত্তমান ক্ষণকে ভরতি করে নে ; তার সঙ্গে জগতের যুক্তি জাল জড়িয়ে বিভ্রান্ত হস না। জগতের সঙ্গে কি করে এ খাপ খাবে, তা দেখতে ব্যস্ত হস না। নিজেদের পোঁটলায় এই সব জীবভাবীয় সংস্কার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করিস না ; নিজেকে সমর্পণ করবার, জ্বালিয়ে ছেড়ে দেবার চেষ্টা কর্।

বলে দিয়েছি, পিঁপড়ে কামড়াল ; মাথায় থেকে তা তিনি জানিয়ে দিলেন—এই দেখ জ্বালা, এই ভোগ ; আবার তাকে সরিয়ে নিলেন। মাত্র এইটুকু ছোট কাজ বলে এ কখন ছোট নয় ; এই বিপুল বিশ্বে প্রতি ঘটে তিনি এই কাজ করছেন। কে তুমি? এ দেখলে জীবত্বটা স্তম্ভিত হয়ে যাবে, আপনা হতে তাঁতে গ্রস্ত হয়ে যাবে!

আজ্য আহুতি দিলি। প্রথমে কি প্রকাশ হল? আহুতি কিসে পড়ল? শূন্যে, না পূর্ণে? পূর্ণে পড়লে কি প্রকাশ হবে? স্পর্শ। আগে স্পর্শ প্রকাশ হবে ; পরে জ্যোতি। এ স্পর্শ ও

জ্যোতি কোন্ তত্ত্বে প্রকাশ হবে? আত্মতত্ত্বে। আত্মতত্ত্বে ত আহুতি দিলি; এতে মহান্ আত্মতত্ত্ব স্পষ্ট হলেন, না আর কেউ হল? আগে কি ফুটল? স্পর্শ? স্পর্শ যদি না পেলি ত জানবি, আহুতি ধার দিয়ে চলে গেল, শূন্যতায় চলে গেল। 'আজ্যেন জুহোমি'—এ স্পর্শ কোন্‌খানে, কতটুকু পেলি? সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী, না এইটুকু? সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হলেই 'যং'-তত্ত্বের প্রকাশ হল। যদিও 'যং'-তত্ত্বের প্রকাশ হল, কিন্তু আত্মাকে ছাড়বি না। আত্মা অসঙ্গ; তাঁ থেকেই 'যং' প্রকাশ হল। সে স্পর্শে কি হল? বায়ু-দেবতা প্রকাশ হলেন। স্পর্শ পেয়ে আত্মার অসঙ্গত্ব আবার গ্রহণ করলি; সে স্পর্শে বায়ু দেবতার প্রকাশ হল; আত্মাকে স্পর্শ করে বায়ু-দেবতার আবির্ভাব করালাম; সর্ব্বাঙ্গে বায়ু দেবতা প্রবাহিত হতে লাগলেন। স্পর্শই হল মূল বা আদি তত্ত্ব। এ সব তত্ত্ব শুধু মাত্রা বা degreeর পার্থক্য। এক ডিগ্রিতে বায়ু, দুই ডিগ্রিতে তেজ ইত্যাদি। বাক্যের দ্বারা সব হবে। ব্যোম ত রয়েইছে। তাতে বাক্ প্রয়োগ করতে গেলেই প্রথমে স্পর্শ বা বায়ুতত্ত্ব এসে পড়ে। স্পর্শ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? এই জ্ঞানস্বরূপ আকাশে। রূপ, রস, গন্ধ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? এই চিদাকাশে। রূপ আকাশে প্রতিষ্ঠিত। আকাশে রূপ ফোটে, আত্মায় দর্শনেন্দ্রিয় ফোটে। আত্মায় স্পর্শ ফোটে, কালে বায়ু ফোটে। এইরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক ত্রিভঙ্গিম তরঙ্গ তুলে, তিনি আপনি তাতে ইন্দ্রিয়ময় হন,—দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি হন। কিন্তু তোমরা তরঙ্গ

থেকে আত্মাকে ফাঁক করতে পারছ না; মানে, উভয়ের ব্যবধান রচনা করতে পারছ না। যখন ফাঁক করতে পারবে, তখন দর্শনই হয়ে যাবে রূপ, স্পর্শই হয়ে যাবে বায়ু ইত্যাদি। এখন আত্মাতেই অনুভূতি হচ্ছে; কিন্তু আকাশ তৈরি হচ্ছে না, রূপ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে না। অসঙ্গতা না পেলে, মহাকালকে না পেলে, এ সব তৈরি হবে না। চিদাকাশ থেকে স্থূলাকাশকে পৃথক্ করতে পার না বলে এ সব ফোটে না। সেই জন্য কাল-তত্ত্বের দরকার। তত্ত্ব রইল আকাশে, আর তত্ত্বগ্রহণ-শক্তি রইল আত্মায়। এই ভাবে ভাগ করে নাও। "আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, স ঐক্ষত নাস্তি আত্মতোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ।" জীবে জীবে এই যিনি পুরুষরূপে প্রত্যক্ষ আছেন, তিনি আগে জানলেন,—"আমি ছাড়া আর কিছু নেই।" এই 'নেই' কথাটির মানে, non-existence বা 'নাই'-আকারে সব রয়েছে। এই হল negative pole; এখন positive কিছু জন্মাতে হলে এই 'নেই' থেকে জন্মাবে। গন্ধ, রস প্রভৃতি সব ঐ 'নেই' থেকে জন্মাবে। 'টাকা নেই'—এই 'নেই-মূর্ত্তি' টাকাতে ভরপুর। এখানে পুত্র নেই, মানে—পুত্রত্বে ভরা একটা নাস্তিত্ব। জ্ঞান-ভূমিতে ওঠ, না হলে এ সব কথা বুঝতে পারবি না। 'ন কিঞ্চ অস্তি', এর মধ্যে সব 'থাকাই' 'নেই'এর পোষাকে ঢুকে রয়েছে। তা হলে 'নেই'-মূর্ত্তিই হল প্রধান মূর্ত্তি। নেই মানেই—রূপান্তর নেই, বিকৃতি নেই; রূপেতে যা কিছু থাকা সম্ভব হয়, তা নেই। তা হলে 'নেই'-মূর্ত্তি একটা প্রধান মেরু। টাকার জন্য প্রচেষ্টা

হল 'টাকা নেই' এই মূর্ত্তি থেকে। যার প্রচেষ্টা দরকার হয় না, কথা কইলেই হয়, তার 'নেই'-মূর্ত্তি থেকে টাকা বার করতে হবে। 'সর্ব্বমস্মিন্ সমাহিতম্।'

তা হলে এই যে চিন্ময়ী দেবতা আমার, ইনি আগে টাকা হয়েছেন—টাকার অবয়ব রচনা করেছেন 'নেই'এর আকারে; পরে তা থেকে টাকা জাত হল। টাকা নেই, টাকা আছে—ইনি এই দুই মেরুই দেখছেন। 'টাকা নেই,' এ জ্ঞান না থাকলে 'টাকা আছে', এ জ্ঞান হবে? যত কিছু অস্তিত্ব-জ্ঞান, সে সব নাস্তিত্ব-জ্ঞান না থাকলে হয়? নাস্তিবোধ না থাকলে অস্তিবোধ ফুটবে না। যে উভয় মুখ দেখছে, 'নেই' জ্ঞান তার পদে পদে ফুটে উঠছে। ফুরিয়ে গেল—নেই, এই জ্ঞানের উপরই সমগ্র ব্যবহারের ভিত্তি; কেবল সীমা গণনা করতে করতে চলেছ; কে জানে টাকা, কে জানে বিষয়, কে জানে সব কিছু। 'নাস্তি' এই মেরুই যা কিছু ক্রিয়া পরিচালিত করছে। বেঁচে আছ—আছি আছি আছি; তার মানে, যেন নেই নেই নেই; সর্ব্বদা সজাগ হচ্ছ, পাছে হারাই। ক্ষুদ্র ভাবে দেখলে একটি প্রকাশই দেখছ; যে উভয় প্রকাশ দেখছে, সে দেখছে—'নাস্তি চ, অস্তি চ।'

এই যে তত্ত্ব তোদের শেখাতে যাচ্ছি, এতে প্রতি জিনিষকে দুই মূর্ত্তিতে দেখতে হবে। স্ত্রী এলে বলব,—স্ত্রী আছে, স্ত্রী নেই; পুত্র এলে বলব,—পুত্র আছে, পুত্র নেই। এই হল ঊর্দ্ধক্ষেত্রের চেতনা ধরবার জায়গা; এ প্রাকৃতিক জ্ঞানভূমি

নয়। টাকা, ফুল ইত্যাদি সবই দু-রকম জ্ঞান উপস্থিত করতে পারে—'আছে' ও 'নেই'। প্রতি বস্তুতে এই দুই ধর্ম্ম আছে। আগে বিপরীত মেরুতে জ্ঞানস্বরূপ আছেন, তবে বস্তু তৈরি হয়েছে। বস্তু থেকে গুণ হয়নি; গুণ থেকেই বস্তু হয়।

তা হলে দুইটি জ্ঞানমূর্ত্তি সুদৃঢ় ভাবে তৈরি করে তবে বস্তু হয়েছে; 'নেই' ও 'আছে' দুই জ্ঞানমূর্ত্তি থেকে একটা বস্তু জাত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের রচয়িতার জ্ঞানে এই দুই মেরু থাকবে। টাকা নেই; সুতরাং এখনি টাকা তৈরি হবে। তাই ঊর্দ্ধলোকে বিষয়তত্ত্ব সম্বন্ধে **negative** ও **positive** এক সঙ্গে দেখতে হয়; যেমন আত্মার অসঙ্গত্ব ও সঙ্গত্ব দুই মেরু এক সঙ্গে দেখতে হয়। তোমার বুকে অসাম মহাশক্তি খেলবে, অথচ তুমি অসঙ্গ থাকবে। বেলুন ওড়াবার সময় **sand-bag** খুলে নামিয়ে নেয়। সেইরূপ তোরাও নোঙ্গর তুলে ফেল। ঐ 'আছি'টাই ত নোঙ্গর—না? ওর আর এক পাদ 'নেই'কে দেখ। নিজের থাকার ভিতর যেমন মৃত্যু লুকান আছে, তেমনি বিষয়ের ভিতর 'নেই' লুকান আছে। 'নেই' দেখে ভয় পেলে বলবি,—এরই মধ্যে 'অস্তি' আছে; আবার যখন অস্তি দেখে ভয় পাবি, তখন বলবি,—এরই ভিতর 'নেই' আছে। এইরূপে নগ্ন শিব হয়ে যা। এর মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব আনতে হবে না।. এই অস্তিত্বময় জগতের 'নেই' বলে একটা মেরু রয়েছে, তাকে ভাল করে দেখ; তা হলে যে তত্ত্ব তোদের বোঝাতে যাচ্ছি, তা ভাল করে বুঝবি।

জ্ঞানস্বরূপ—যাঁতে সব জিনিষ বাক্-আকারে অবস্থান করে, তাঁতে প্রতি পদার্থ 'নাস্তি' ও 'অস্তি' দুই মূর্ত্তিতে ফুটে উঠল। নাস্তি মেরু না থাকলে অস্তি মেরু ফুটত না। সেই পুরুষ 'হাসপাতাল নেই' বলতেই হাসপাতাল প্রস্তুত হল। সকল থাকাই দুটো মেরু নিয়ে অবস্থান করে। যিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং বাঙ্ময় শক্তিস্বরূপ, তাঁর কাছে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পুত্র, টাকা প্রভৃতি সব আছে; যে মাত্র পদার্থস্বরূপ, তার কাছে নেই। এর নাম হল হরিহর-মূর্ত্তি দর্শন করা। প্রতি পদার্থেই একটা ব্যক্ত ও আর একটা অব্যক্ত মূর্ত্তি আছে।

আত্মা যেমন ভাবে সঙ্গবান্ ও অসঙ্গ হন, ঠিক সেই ভাবে 'নাস্তি' ও 'অস্তি' হন। টাকা অব্যক্ত হয়েছে তখনি বলা যায়, যখন পূর্ণমাত্রায় তার শূন্যতা বা অভাববোধ এসে যায়। ভগবান্ যেমন থাকারূপ মূর্ত্তি ধারণ করতে পারেন, তেমনি পূর্ণমাত্রায় না-থাকারূপ মূর্ত্তিও ধারণ করতে পারেন। 'কিছু নেই, কিছু নেই,' এ যদি সত্য সত্যই নেই হত, তবে এর নাম 'ব্যোম' হত না। ব্যোম ত একপ্রকারে একজাতীয় থাকা; এখানে সবই 'নেই'এর আকার হয়ে রয়েছে; জীবত্বের ভোগ দিতে ভগবান্ একেবারে 'নেই' হয়ে রয়েছেন। সব অস্তিত্বের তলায় এই যে 'নেই' বলে ভূমি, একটা শূন্যতা, এতে না গেলে মূল তত্ত্বে যেতে পারব না। এখানে 'নেই'কে টিপেই সব বার করব। বেরোনোর মূল্য নেই, ঐ 'নেই'এর মূল্য ভয়ানক। ভাঁড়ার-ঘর থেকে তিন চারটি জিনিষ বেরিয়েছে, কিন্তু তাতে লুকান আছে

তিন চার শ। বিশ হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া একটা গাছকে গুটিয়ে নিলুম একটি সর্ষপের ভিতর ; সর্ষপকেও আবার গুটিয়ে একেবারে 'নেই' করে দিলুম। এই হল শ্মশান। কি সাংঘাতিক—কিছু নেই, কিছু নেই! সব গুটিয়ে নিয়েছি! এইখানে বসে যা! চঞ্চল শিশুর মত কোথায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিস, তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিস। নেই, নেই—এই তত্ত্বে স্থিতিশীল হ। শ্মশান দেখলি? এই ভূমিতে মড়া বাঁচাব। বাঘছাল ছুঁলুম—এ যেমন সহজ, 'বাঘছাল নেই'কে ছুঁলুম, এও তেমনি সহজ। সর্ব্বজ্ঞানের আত্মস্বরূপ যেমন আত্মা, সর্ব্বপদার্থের আত্মস্বরূপ তেমন মহাকাল ; যাঁর নাম ব্যোমকেশ। ডাঙ্গা দিয়ে নৌকা চালাচ্ছি।

এ তত্ত্বের মহিমা এই যে, এঁতে গিয়ে পড়লে ইনি নিজে নিজেই সব কাজ করে যান। আমার শুধু বেদ বা জানাটুকু হলেই সব হল। আমার নিজের জ্ঞান করতে হলে কত কষ্ট করতে হত, কিন্তু একজনের জানা আমার জানায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আমি চলেছি এই 'জানা'র গভীর স্রোতে। এমন জায়গায় গিয়ে পড়ব, যেখানে আর কোন বাধা থাকবে না। ভগবৎ-অস্বীকারও একরূপ জ্ঞান বলেই জীবত্ব স্থিতিশীল হতে সমর্থ হয়েছে, না হলে জীবত্ব থাকতে পারে? ভগবানের ঘরে তাঁর ছেলে তাঁরই মহিমায় মণ্ডিত হয়ে যাবে।

এ সব জ্ঞান কি প্রকাশ করতে আছে? আমার শরীর থর-থর করছে। তাঁকে কোথায় দেখছ? কাতে দেখছ? কোথায়

তিনি প্রকাশ হলেন ? এ সব কথা কি আমি বললুম ? ইনি এই মূর্ত্তি ধারণ করলেন কোথায় ? তাঁকে দেখতে না পেলে ভগবতীর ভগবতীত্ব উড়ে যাবে ; চেনা হলে আর পালাবার উপায় নেই।

৩১এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

আকাশ যা থেকে প্রকাশ হয়, তার নাম বাক্য, আর আকাশ যাতে বিগলিত হয়, তার নাম বাক্। এমন কোন্ কেন্দ্র, কোন্ বিশ্ব দেখতে পাচ্ছিস, যেখানে ভগবতী নেই ? আহাহা! ওঃ! কি করে ছিল ? ভগবতী হতে অন্য, এই জ্ঞানে বিশ্ব বিরাজ করছিল কি করে ?

আগে পদার্থের এই দ্বিতীয় মূর্ত্তির সাধনা কর, বোঝ ; তবে আর সব বুঝতে পারবি। পদার্থের অস্তিময় সত্তা বুঝতে পারিস, এখন পদার্থেব নাস্তিময় সত্তা হৃদয়ঙ্গম কর। নাস্তি মানে, উড়ে যাওয়া নয়। অগস্ত্য সমুদ্র খেয়ে ফেললেন। মারলেন টান, খেয়ে ফেললেন। কোথা দিয়ে টান দিলেন ? কি ভয়ঙ্কর ? কি করিস ? ওর নাম কি ভগবান্ বলা ? মাত্র একটা উচ্ছ্বাসের, একটা অভাব পূরণের জন্য ভগবান্ বলা নয়। যেখানে মাত্র 'নাই', সেখানেও ত 'আছে'গুলা পূর্ণই রয়েছে। 'আছে'র reflectionএ প্রত্যগাত্মা অনুভূত হয় ; 'নাই'এর reflectionএ পরমাত্মা প্রত্যক্ষীভূত হন। ভগবতীকে দেখবি যদি, তবে এইখানে দাঁড়াতে হবে।

চারি দিকের খুঁটি ধরে কোন গতিকে নিজেকে জাগিয়ে বসে আছিস। হাত আছে, পা আছে, চোক-কাণ আছে, এই এই ধর্ম্ম আছে; এদের সাহায্যে নিজেকে দেখছিস্। অনু-প্রবিষ্ট হয়ে দেখতে হচ্ছে ত! তাঁর দ্বারা বিধৃত—সমস্তের বিধৃতি তাঁতে; যাঁতে বিধৃতি, সেই তত্ত্বই সেই জিনিষকে সংহরণ ও প্রকাশ করতে সমর্থ; অন্য কেউ তা পারবে? যদি দেখি, এই পদার্থের বিধৃতি এঁতে, ইনি ভিন্ন আর কেউ এই আকারে প্রকাশ হয়নি, ইনিই এই আকার হয়েছেন, আর ইনিই এর পিছনে অপ্রকাশ বা অব্যক্ত রয়েছেন; এমনি করে এঁকে দেখলেই না ভূতিতত্ত্ব দেখা অভ্যাস হবে। এই শরীর কে হয়েছে? নমঃ! এই শরীর তাঁর কোন্ মূর্ত্তিতে ধরা আছে? নাস্তি-মূর্ত্তিতে। জয় ভগবতি! জয় ভগবতি! জয় ভগবতি! নাস্তি ও অব্যক্তেতে কোন পার্থক্য নেই। ঐ তত্ত্বই ভাল করে ফোটাবার জন্য নাস্তি নাস্তি বলছি। অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র থাকলে সে ত 'অস্তি' হয়ে গেল; ইনি নাস্তি, অথচ এক পরমা স্থিতিরূপিণী।

তোদের গতি সাধারণতঃ এই ভাবে হয়,—যেন একটা জিনিষকে ঠেলে দিয়ে আর একটাতে গেলুম। এ হল প্রত্যগাত্মার গতি। আত্মিক গতি হবে এইরূপ,—বরফ গলিত হয়ে জল হল। জলে বরফ আছে? জল যদি চিন্ময় হত, তবে সে কি বলত? 'বরফ নেই', এই জ্ঞানই আগে প্রকাশ করত। তার পর প্রকাশ করত 'বরফ আছে'—'অহং শিলাস্মি',

এই বলত না? তুই চললি ভগবতী বলতে; তোর দেহ-জ্ঞান ঠেলে-ঠুলে গেলি; তা না করে তাঁতে তুই বিগলিত হয়ে যা। হর হর শম্ভো! ভূত বিগলিত হচ্ছে তত্ত্বে, তত্ত্ব বিগলিত হচ্ছে তন্মাত্রায়, তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়ে—এষ ইন্দ্রঃ। আহাহা—এষ ইন্দ্রঃ। "কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি!" ইন্দ্রিয়াদি গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল কাতে? যিনি পরা, তাঁতে। এই হল? নমো নমো নমো নমঃ! বৃত্র-প্রাণ-হরে! এর নাম বৃত্রের সকল আবরণের প্রাণ হনন করা। এঁর নাম কিরীটিনী। এখানে কিরীটের উপর জোর দেওয়া হল কেন? সহস্রারে যাবার জন্য। সহস্রনয়নোজ্জ্বলে! তোর চোখ-মুখ, নাক-কাণ, হাত-পা সব কোথায় রে? এই সহস্রারে? আবরণমুক্ত তেজোময়ী! জয় ভগবতি! জয় ভগবতি! দেখা, শোনা, এ সব কোথায় চলে গেছে? সহস্রারে। নমস্তে! নমস্তে! ভোগের আবরণ থেকে ভগবতী এই উদ্ধৃত হলেন—জাগলেন। মাথায় টোপর আছে বলে তিনি কিরীটিনী নন; কিরীটে বসবাস করেন বলে তিনি কিরীটিনী। দেখ না, তোর হাত-পা, চোখ-মুখ কোথায় উজ্জ্বল হয়ে আছে? কোথায় সে সর্ব্বেন্দ্রিয়াভাসময়ী, কোথায়? বলে দিয়েছি, এইখানে—এই সহস্রারে সমস্ত জানা হচ্ছে। রূপ জানা হচ্ছে, সুতরাং দর্শন আছে; শব্দ জানা হচ্ছে, সুতরাং শ্রবণ আছে; ইত্যাদি। এক ইন্দ্রিয়ময়ী—সে খালি জানছে; আর এক ইন্দ্রিয়ময়—সে ভোগ করছে। ঐখানেই প্রকৃত আমি; ঐ আমি ঘুরে বেড়াই দিগ্দিগন্তে, কার কোথায়

অভাব মোচন করতে হবে, তার সন্ধানে। ঐ আমি বহুমূর্ত্তি ধরি; এ আমি নয়। ঐ আমি আকাশ ভিন্ন আর কোথাও পদক্ষেপ করি না; আকাশ দিয়ে উড়ে যাই—কিরীটিনি মহাবজ্রে! একটু একটু করে ধর, নয় ত পাগল হয়ে যাবি।' আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎতুল্য গতি। মা! মা! মা! মা! ইন্দ্রিয়-সকলকে দু-চির করলি। এক ভাগ চির দাতা হল, প্রকাশময় হল; এক ভাগ চির ভোক্তা হল। কে এসে দাঁড়ানোতে এরূপ ভাগ হল? প্রসব হল? কালের বিপরীত ধারা। হর হর হর! মাকে দেখবি? খুঁজে পাবি? খুঁজে-পেতে ঘেটে পাবি? ঘাঁট না। অনেক ধ্যান আছে, অনেক মন্ত্র আছে, ঘাঁট। "সংস্থাপয়ামি দেবি ত্বাং মণ্ডলে কুরু সন্নিধিং" নমস্তে! নমস্তে!

দুজন ইন্দ্রিয়ময়—এক আত্মত্বে দুজন ইন্দ্রিয়ময় হয়ে দাঁড়ালেন। জানা আর ভোগ, এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে পারছ না? পরমাত্মস্বরূপের কথায় তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত; দেবী-মূর্ত্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত নন। দধ্যঙ্ মুনির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্ম্মিত হয়। ঔপনিষদিক নাম দধ্যঙ্। দেবীকে জাগ্রত করা কত সহজ! এই হল তাঁতে বিগলিত হয়ে যাবার পথ। জয় ভগবতি মা!

'অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।'—এঁতে যদি অম্বর পরিয়ে দিতে পার, তা হলে ইনি মূর্ত্ত হবেন না? "কি কর, কি কর, পর মা অম্বর।" নূতন

কথা ঠেকছে? শারীর সার্থকতা এঁতে বিন্দুমাত্র হারায়? শরীর জ্ঞানের সার্থকতা এঁতে হারায়? যা, বেঁচে গেলি। এঁকে আকাশতত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হবে; তারই নাম অম্বর পরান। সে অংশ পরে বুঝবি। আমার মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত যে সব তাত্ত্বিক কেন্দ্র রয়েছে, তা সমেত শব্দ-স্পর্শ রূপ-রসাদি তাত্ত্বিক কেন্দ্র-সকল যদি ওঁতে মিলিত হয়, তবেই ঠিক হবে না? শুধু ইন্দ্রিয় নিয়ে নয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তত্ত্ব-সকলও এঁতে মিলিয়ে দিতে হবে, তা হলেই ইনি একেবারে মূর্ত্ত হয়ে গেলেন না? ইনিই তা হলে শব্দময়, রূপময়, ক্ষিতিময়, ব্যোমময়; এ সব ইনিই হলেন? "পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞঃ শ্বপ-চোঽপি কুলেশ্বরি। দেবতাস্থাপনে শক্তঃ প্রতিমাদৌ চ পার্ব্বতি॥" দেবি! আঃ! জয় মা আমার। ইহাবহ, ইহাবহ, অত্র সন্নিহিতা ভব, হ্রীং অস্মিন্ সন্নিহিতা ভব। মনকে তুলে ধর। ইহাবহ, ইহাবহ;—ভূমি দেখালাম; এই ভূমির ব্যাপার কোন্খান দিয়ে আরম্ভ হয়, তাই দেখালাম। এই যে দুই ভাগ দেখালাম, এই ভাবে দেখিস না বলে তোরা মরিস। "অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ।" খালি আত্মা আত্মা বললে কি হয়? আত্মা মানে কি, তাই দেখ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে দেখতে হয়; যা দেখা নেই, তাই এই-রকম করে দেখতে হয়। মা খালি আবির্ভূত হননি—ভিতরে ঢুকে, ভর্গ প্রকাশ করে, ভাতি রঞ্জয়তি গচ্ছতি করে দিয়েছেন—না? দুটো ভাত না খেলে যে প্রাণ মরে যায়, হাওয়া বন্ধ হলে যে প্রাণ মরে যায়,

সে প্রাণ, আর এ প্রাণ? হর হর শম্ভো! এই মহাপ্রাণ। একেবারে জ্যান্ত, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ মা। ক্রীং ক্রিয়া চালিয়েছেন; সে ক্রিয়া ভোগের আকারে তোতে প্রকাশিত হচ্ছে। যত জ্ঞান মাথায় ফুটছে, ভোগ হচ্ছে বুকে। মশা কামড়ালে, মাথায় জ্ঞান হল—কুট্-কুট্ করল এখানে। যিনি তৈরি করলেন, তিনি ভোগ করলেন না। নিজেই জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ধরলেন, ভোগ করবে—যে বুকে আছে। তোরা কাকে ভোগ করছিস? যেখানে একে অন্যকে স্পর্শ করে, সেইখানে হয় ভোগ। যেখানে আপনি আপনাকে স্পর্শ বরে, সে হল বেদন। আগুনকে আগুন পোড়ায়? জলকে জল বিদ্রাবিত করে? শীতের শীত পায়? কে এই সব করছে? ঐ কিরীটিনী? এই বিভাগ—কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিভাগ—দাতা ও ভোক্তা, বুঝতে পারলি? ভোগ করে ওঁকে জানা যায় না, ওঁকে জানা যায় উনি হয়ে। ওইখানে তোদের সব সম্পন্ন হচ্ছে? গাছ-পালা, শোক দুঃখ সুখ—সব? 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ওইখানে? ভোগ হয় এখানে; ওখানে ভোগ হবে না। আত্মত্বের সাহায্যে তোদের ওখানে চড়তে হবে, একীভূত হতে হবে। এ চেষ্টা করে করতে হয় না, চেষ্টার জিনিষ এ নয়।

কিরীটিনীর গতি বিদ্যুদ্‌বৎ? আত্মতত্ত্বে ইন্দ্রিয়াদি সব সমর্পণ করেছ? দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় কোথায়? ঐখানে —সহস্রারে? আর তুমি কোন্‌খানে? ঐ সহস্রারে চলে গেছ? এই সমস্ত সত্তার উপরে উঠেছ? অত্যতিষ্ঠৎ—

এ-সকলের বাইরে চলে গেছ? মাথা থেকে যেমন মোট ফেলে দেয়, তেমনি এখন এঁকে, মাটির মূর্ত্তি বা শিলা-মূর্ত্তিতে বসাও এবং বল,—"ইহৈব স্থাপয়ামি ত্বাং বিগ্রহে কুরু সন্নিধিম্ " আর এখানে থাকতে পারবি—না, ওখানে চলে গেলি? তোর প্রকাশ-মান ইন্দ্রিয়াদি সবই ত ওখানে। প্রাণও ওখানে। তুই নিশ্বাস টানছিস না, উনিই টানছেন; তুই টানলে ঘুমাবার সময় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। "অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ।" তোর ইন্দ্রিয় এখানে নয়, প্রাণও এখানে নয়; পঞ্চ আনন সব গুটিয়ে ওখানে চলে যাবি। তার পর উনি পঞ্চানন বা একানন, যা তৈরি করেন, করবেন। "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।" এই সব ওঁর ঘাড়ে ফেলে দিলেই ত তোর বোঝাগুল নেমে যায়। একেবারে নেমে যায়? মোটেই থাকে না? মোটেই থাকে না, মোটেই থাকে না। মোটেই নেই নেই নেই। বাঁচলি, হাওয়া খেয়ে বাঁচলি। অন্ধকার গুমটির ভিতর ছিলি, এখন আকাশে বেরিয়ে এলি; হাওয়া খেয়ে বাঁচলিনি? জয় ভগবতি! এ দিক্‌টা যত মড়া হবে, ঐ দিক্‌টা তত জাগবে। এ দিকে কিছু নেই—তোর কেউ কোথাও নেই; ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু ন ভ্রাতা—কেউ আছে? কেয়া বাৎ, সব ফাঁক হ্যায়, কেউ কোথাও নেই! আর এ কি ফাঁক! বলতে ভয় পাচ্ছিস? ভয় পেলেই বলবি—"মাতৈব কেবলম্।" আর কিছু চাস? যে জানে, বাক্সের ভিতর এত টাকা আছে, সে কখন বাক্স বার-

করে ? কিন্তু আমি রিক্ত হয়ে বাঁচলাম ; এখন তুমি ঘর-সংসার কর। ওখানে খেলা করতে গিয়ে ভারি বিপদে পড়েছিলাম ; এখন রিক্ত হয়ে বাঁচলাম।

কোনও মূল্যবান্ জিনিষ তোরা বাইরে ফেলে রাখিস না। তোর এত আদরের স্ত্রী-পুত্র, প্রাণ, ঐ সিন্দুকে রাখ না। চোর-ডাকাতের ভয়ে বিত্রস্ত হয়ে ঘুরছিস কেন ? ওঁতে রাখ না। কি রকম বাক্স। ভাল তত্ত্ব ? এইটে তোদের শেখাব ; তার দিন এসেছে।

আত্মত্বকে মাত্র জ্ঞানস্বরূপ বললে তাঁতে যেন দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি কিছুই নেই। সেই জন্য তাঁকে ইন্দ্রিয়ময় করে বার বার দেখতে হয়। তখন তাঁতে সব সংন্যস্ত করে তুই নিশ্চিন্ত হতে পারিস। তোর চোখে দর্শনশক্তি, বুকে প্রাণ-শক্তি নয়—সবই ওঁতে। আমাদের কিছুই নয়—আঃ! ইস্! "ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি ন চানিলং মেঽস্তি ন চাম্বরং চ"—চলে যা চক্রে চক্রে। এ সব ভোক্তার নয়—দাতার। হর হর হর হর! মাটি জল আকাশ—সব জ্ঞানময় হল! এ-সবের জ্ঞানস্বরূপে প্রবেশ হল। এখন এই মাটি দিয়ে, এই জল দিয়েই তাঁকে গড়ব। এই সব একেবারে দেখিয়ে দেব বাবা! ভগবতী কঠিন-বপু—তিনি বায়বীয় নন, আকাশীয় নন—একেবারে স্পর্শযোগ্যা।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৮, সোমবার, রাত্রি।

সত্য মানে, যা কখন বিনষ্ট হয় না, যার প্রকাশ নিত্য বর্ত্তমান। আর যা থাকে না, চলে যায়, তাই মিথ্যা। সত্যকে আশ্রয় করে মিথ্যা বলে একটা জিনিষের ধারণা হতে পারে। কিন্তু একেবারে কিছু নেই, হঠাৎ একটা কিছু এল, এ হতে পারে না। ভগবান্‌কে দর্শন করা মানে, সত্য দর্শন করা। আজ আছে, কাল নেই, এ ভাবে জগতের যে নশ্বরতা সর্ব্বদা দেখতে পাচ্ছি, তা এ ভাবে পরিদৃশ্যমান হলেও, মূলতঃ সে সব একরকমে না একরকমে থাকেই, এই জন্য চোখের সামনে থেকে সরে গেলেও তাকে মিথ্যা বলে মনে করো না। এই ভাবে আমরা সত্য বলতে অভ্যাস করলুম। কিন্তু এইটুকু মাত্রই সত্য নয়। যাকে সত্য বললুম, তার যেখান থেকে জন্ম ও যেখানে মৃত্যু, সে স্থানও দেখতে হবে। গাছের মরে যাওয়া আপাততঃ দৃশ্যমান হলেও, সে যেখান থেকে জন্মেছে, মৃত্যুর পর সেইখানেই যায়। জন্ম এবং মৃত্যু, থাকা এবং না থাকা, এমন একটা আশ্রয়েই সে আছে, যেখানে ওর অব্যক্ত হওয়া নামীয় একটা ছন্দ তৈরি হয়। এই দুইকে একসঙ্গে জড়িয়ে দেখলেই 'সত্য' দেখা হয়। তাই ঋষি বললেন, প্রতি বস্তুতে যখন সত্য দর্শন করবে, তখন মাত্র তার 'থাকা'-মূর্ত্তি দেখেই তাকে সত্য বলো না—সে অন্য মূর্ত্তিতে, আমাদের কাছে 'না থাকা'-মূর্ত্তিতে চলে গেলেও সেও এক প্রকার থাকা; ঐ 'থাকা' ও 'না থাকা' যেখান থেকে

নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই ভূমি দেখেই তাকে সত্য বলতে হবে। গাছটা লুকিয়ে যায়—লুকিয়ে যাওয়াও একটা গতি। থাকা ও লুকিয়ে যাওয়া, দুটোই সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—দুটোই সমান বলবৎ অবস্থা। এই দুটোই যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, গাছের এমন একটি রূপ আছে—তাই গাছ সত্য। ওর এমন একটি মূল আছে, যেখানে ও যেতে পারে, আবাব তা থেকে বেরোতে পারে। তাই যদি বলি, চন্দ্রে ও সূর্য্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা কর, তার মানে এ নয় যে, শুধু চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ প্রকাশকেই সত্য বলে দেখ; যিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের ব্যক্ত মূর্ত্তি দেখাচ্ছেন, আবার অব্যক্ত মূর্ত্তি দেখাচ্ছেন; এই দুই মূর্ত্তি নিয়ে এমনি করে তাঁকে বলছি সত্য—শুধু একরূপে নয়। তা হলে যাঁকে মূল বা আদি উপাদান বলে পেলাম, তাঁতে জন্ম আর মৃত্যু, দুই মূর্ত্তি দেখছি। মাত্র প্রকাশ বা মাত্র মৃত্যুও সত্য নয়; এই দুইকে নিয়ন্ত্রণ করে যিনি পরমমূলরূপে রয়েছেন, তিনিই আসল সত্য। একটা প্রকাশভূমি, একটা মৃত্যুভূমি—দুই-ই তাঁর রূপ। তিনি সর্ব্বভূতে—প্রতি বিভুতে, প্রতি মহানে, প্রতি অণুতে, প্রতি জীবেতে দুরকমে আপনার পরিচয় দিচ্ছেন। মূল সত্য চির-দুর্ভেদ্য, ওঁর আর অদল-বদল হবে না। এই সত্যকে যখন আমরা সত্য বলে বুঝি, তখন বিনাশ ও প্রকাশ, এই দুই নিয়ে চিরস্থায়ী এক অবিনশ্বরতার জ্ঞানময় ধারণা অনুভূত হল। 'সত্য' এই কথাটা সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হল। নিত্যত্ব, অবিনশ্বরত্ব দেখে এর নাম দিলুম সত্য, নিত্য। অবিনশ্বরতা

আমার জ্ঞানকে 'সত্য' এই মূর্ত্তি দিলে। যে ধারণা হল, তা চিরকালের জন্য রইল। এর থাকা কখন যায় না, বস্তুর এইরূপ নিত্যতা দেখে সেই ধারণা বা সত্য জ্ঞান হল। এই ভূমিতে যে-কেউ দাঁড়াতে পারে। যাকে আমি এই ভূমিতে দেখব, তার আর মৃত্যু নেই ; তাকে আমি অমর বলে দেখব।

তা হলে পেলুম, মৃত্যু বা অব্যক্ত হয়ে গেলেও চিরদিনের জন্য তার স্থিতি আছে—চিরদিনের জন্য এই বিশ্ব স্থিতিলাভ করল, এমন এক উপাদান আছে। সত্য বলতে এমন একটি পদার্থের ধারণা পেলুম, যে 'সত্য' এই জ্ঞান ফুটিয়ে দিলে। তা হলে যেখানে সত্য বলব, সেইখান থেকেই বিপরিলুপ্তি উড়ে গেল ; বিপরিলোপ বলে কোনও জিনিষ আর দেখা গেল না। এই হল 'সত্য'-জ্ঞানের বাহ্য মূর্ত্তি। ঋষি বললেন,—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" দেবযান—ভগবানে পৌঁছবার পথ ; সে পথ সত্যের দ্বারা বিস্তৃত অর্থাৎ সত্য অবলম্বন করেই সে পথে যেতে হয়। আপ্তকাম ঋষিরা যে পথ দিয়ে সেই সত্যের পরম নিধান যেখানে, সেইখানে পৌঁছেছেন। ঋষিরা এই ভাবে সত্যে গিয়ে, পরমসত্যে উপস্থিত হয়ে আপ্তকাম হয়েছেন। সত্য অবলম্বনে সত্যের পথ অতিক্রম করেই সত্যের পরম নিধানে তাঁরা পৌঁছেছেন, পৌঁছে আপ্তকাম হয়েছেন। ঐ নিধান, ভূমি বা আশ্রয়টি কেমন জিনিষ? Positive ও Negative বা অস্তি ও নাস্তি, দুরকমের প্রকাশ যেখানে, সেখানেই তার বীজ অন্বেষণ কর বৎস। ফোটা ও

দয়া, দুই-ই যেখানে আছে, তাঁরই নামকরণ করলুম সত্য। এই ভাবে প্রতি ক্ষেত্রে তার মূলকে দেখলে তুমি আপ্তকাম হবে, যা কামনা করবে, তাই সত্য হয়ে যাবে ; কোনটা মিথ্যা হবে না। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন মানে, কামনা করছেন। তাঁর কামনার দ্বারা সব প্রকাশ হচ্ছে ও গুটোচ্ছে। তুমিও যদি কামনা কর, তবে তোমারও সে কামনা সত্য হবে।

'সত্যস্য সত্যং' মানে কি ? মিথ্যার আভাস একেবারেই নয়—সত্য বলে যে ব্যবহার, যে ক্রিয়া, তার আশ্রয় যিনি, নিধান যিনি—তিনিই হলেন সত্যের সত্য ; তাঁর ব্যবহার হল সত্যক্রিয়া, একজন সত্য-তত্ত্বেরই ব্যবহার। সুতরাং মৃত্যু বা মিথ্যার ছায়া আমার বুক থেকে একেবারে উবে গেল। আমি এঁতে এসে পড়েছি কি না, তার যাচাই হবে আমার কামনার সত্যতায়। তুমিও তাঁতে গিয়ে পড়লে তোমা থেকে যে সব কামনা জাগবে, তা সত্য হবে।

ঋষি দুই রকম—লৌকিক ঋষি ও আদ্য ঋষি। যাঁদের বাক্য সত্যের অনুগমন করে, তাঁরা লৌকিক ঋষি। আর সত্য যাঁদের বাক্যের অনুগমন করে, তাঁরা আদ্য ঋষি। আদ্য ঋষির কথা ফুটলেই সত্য তার পিছু পিছু যাবে। আমার কথা মিথ্যা হবে না—সে পূর্ণ সার্থকতা আনবে, এইটুকু দেখলেই সত্য-প্রতিষ্ঠার সাধারণ মর্ম্ম ঠিক হয়ে গেল।

এই দশ বার বছর ধরে তোদের 'সত্য সত্য' বলে শিখিয়ে আসছি। এখন শেখাচ্ছি—'সত্যং জ্ঞানং'। সত্য কোন জড়

পদার্থ নয়—জ্ঞানই হলেন সত্য। জ্ঞানের দুই অংশ—আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানকে সমস্ত জ্ঞানক্রিয়ার তলায় তলায় দেখতে পেলাম। ইনি জন্ম মৃত্যু-রহিত; অনাত্মজ্ঞানেই জন্ম-মৃত্যুর যত খেলা। প্রতি পদার্থের একটি আশ্রয় আছে, যে তার নিধান। আবার জ্ঞানময় বিশ্বেও একটি ভূমি আছে, যে সমগ্র জ্ঞানময় বিশ্বের নিধান। সুতরাং সমস্ত বাহ্য বিকাশের এবং সমস্ত জ্ঞানের নিধান-স্বরূপ এক তত্ত্বকেই পেলুম। আবার এই তত্ত্বেই আত্মাকে বা চিন্ময়কে দেখে বললাম, এবার এক জ্ঞানময় সত্যতত্ত্বে এসে পড়লাম। এত দিন যা শিক্ষা দিয়েছি, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই। এইবার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছি—'অনন্তং'। এই শিক্ষার কিরূপ পারিপাট্য দেখ,—প্রথমে সত্যং, তার পরে জ্ঞানং, তার পরে অনন্তং। এ একটি মহাবাক্য। অনন্ত ধারণা করতে যখন অগ্রসর হলাম, তখন জ্ঞানতত্ত্বে গিয়ে তার রাস্তা খুলে গেল। একত্ব-জ্ঞান না হলে অনন্তের ধারণা হয় না। কেন না, দ্বিত্ব মানেই সীমাবদ্ধতা। একটা চেতন, একটা জড়, এই ভাবে দ্বিত্ব দেখাই অভ্যাস ছিল। এখন সেটা ঘুচে গিয়ে—জড়ত্ব, জ্ঞানেরই একটি প্রকাশ-ভেদ, এইরূপ দর্শন হয়ে গেল; সুতরাং জ্ঞানতত্ত্বে এসে যে অনন্তে উপনীত হয়েছি, তা ঠিক হল। আর জড় দেখার উপায় নেই। কিন্তু এ জ্ঞানকে এখনও ঠিক করে নিতে পারিনি। বুদ্ধিতে ধারণা করলেও ব্যবহার ঠিক তদনুসরণে এখনও ফুটে ওঠেনি। এখনও বেশী সময়ই মাটিকে মড়া মনে

হয়; মধ্যে মধ্যে মাটিকে 'মা' বলি মাত্র। বুদ্ধিকে অবলম্বন করে এরূপ ধারণা করতে পারি, কিন্তু সহজ়সিদ্ধ ভাবে হয় না। সেইরূপ অনন্ত-তত্ত্বেরও একটা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই অনন্তের একটি উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়েছি, আবার বলি। সেটি হল বীজের উদাহরণ। যুক্তিতে বা অঙ্কে এর সীমা পাবার উপায় নেই। বীজের কখন কোথায়ও শেষ নাই। যত দূর ইচ্ছা চলে যাও, অথবা মাত্র এইতেই থাক, তা হলেও এর শেষ পাবে না; শুধু 'বীজ' কথাটায় বসে থাকলেও নয়। বৃক্ষ না দেখে খালি বীজ দেখলাম, তাতেও বীজত্বের শেষ হবে না। এমন একটা কথা জানি না, যার দ্বারা বীজত্বকে ভেদ করে বেরিয়ে পড়ব। বীজের অনন্ত প্রকাশ অনন্ত অনন্ত; প্রতি বীজের পরে আবার বীজের প্রকাশ চলেছে। বীজত্ব মানেই অনন্ত বীজত্ব। দেখলাম একটি বীজ—কিন্তু সেটা অনন্ত বীজ। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে,—বীজ একটি, না অনন্ত? আমি বলব,—বীজ একটিই বটে, তবু তার সীমা নেই। বীজত্ব শব্দের মানের ভিতরই আনন্ত্য লুকান রয়েছে, অনন্ততার একটা **realisation** বা উপলব্ধি লুকান রয়েছে। শুধু একটি গাছ, তার উপর লক্ষ বীজ; আবার গাছ, আবার লক্ষ বীজ। তা হলে বীজ মানেই অনন্ত। পূর্ব্বে 'সত্য' নামে যে নিয়ন্তৃত্ব দেখেছি, তিনিও ত বীজ। তা হলে সে বীজও অনন্ত। তা হলে এই যে বীজস্বরূপ আত্মতত্ত্ব, ইনি ত অনন্ত। একটি আত্মা দেখছি, এতে ঐ একটি বীচি দেখা হল; কিন্তু এর আনন্ত্য দেখ। হর হর শম্ভো!

এই যে অনন্ত-তত্ত্ব বলতে চলেছি, এরই নাম দিয়েছি রুদ্র-গ্রন্থি। আমরা যেখানে লুকান থাকি, যা থেকে বেরোই, আবার জন্মাই, সেখানকার ধর্ম্মই হল আনন্ত্য। তা হলে এ তত্ত্বের যখন নড়া-চড়া আরম্ভ হবে, তখন সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে। এখানে ছিল মাপে মাপে—সীমাময় মানবীয় সত্তা, এবার আনন্ত্য দেখছি।

একটি বৃক্ষের সত্য বিজ্ঞান পেতে হলে তার বীজাংশ না দেখলে, বীজতত্ত্ব না জানলে হয় না; কেননা, ঐ বীজত্বের ভিতরই আনন্ত্যের খেলা চোখে পড়ে যায়। গাছ দেখতে গিয়ে একটি গাছ মাত্র নয়—অনন্ত গাছ এবং তার বীজস্বরূপে একজন দাঁড়িয়ে আছেন দেখব। নমো নমঃ। এ শিক্ষা নিতে গেলে একটু যোগ্যতার দরকার হয়। 'সত্য' আর 'জ্ঞান' দর্শনে যে অভ্যস্ত হয়েছে, তার পক্ষে এ শিক্ষা কত উপাদেয়, কত সহজ হয়। না হলে অনন্তের উপলব্ধি আসতে পারবে না। কারণ, আমার চোখ খণ্ডিত হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নতা ছাড়া কোন কিছুর অবিচ্ছিন্ন ধারা আমি দেখি না। আর অনন্ত বললে ত সেই অবিচ্ছিন্ন ধারাই এসে পড়ল। এর একটা মধ্যাবস্থার জ্ঞান আছে। আমাদের বহু দেখাই অভ্যাস ত। তাই প্রথমে কাটা-কাটা, অথচ তার সীমা নাই; এইরূপ টুকরো টুকরো এক অপরিমেয় বিপুল ধারার অনুভূতি আসবে। তখন একত্ব দর্শনের পর সে সকলের বিচ্ছিন্নতা উড়ে গিয়ে এক ও জমাট হয়ে যাবে। গতি বা ব্যাপ্তির অংশে টুকরো টুকরো বহু। আর সে সব

একত্বেরই ব্যাপ্তি, একত্বেরই বহুত্ব—এই বোধ এলে তখন বহুত্ব দৃষ্টি থেকে চলে গেল—একত্বই প্রকাশমান রইল। এই ধারায় অনন্তে যেতে হবে।

আরও দেখ,—গাছ, চন্দ্র, সূর্য্য, স্ত্রী-পুত্রের তলায় তলায় তুমি আপনাকে দেখলে—যেখানে তুমি চোখ ফেরাচ্ছ, আপনাকেই দেখতে পাচ্ছ। এইরূপ দেখতে দেখতে তুমি খালি আপনাকেই দেখতে পাবে, আর সব উড়ে যাবে। এইরূপ হয়ে যাবে? এই দুই স্বরূপই বেশ বুঝেছ? এক স্বরূপ দিক্, কাল ও ধর্ম্মের দ্বারা বিন্দুমাত্র বিভক্ত নয়, মাত্র একরস—"এবমেব এষ আত্মা নান্তর্ণ বাহ্যঃ প্রজ্ঞানরসঘনঃ।" এঁর অন্তর্বহি নেই; খালি প্রজ্ঞানরূপ একরস-ঘন। ইনি দাঁড়িয়ে যাবেন। তার মানে, সেখানে দেশ, কাল বা ধর্ম্মের দ্বারা কোন রকম বিভেদ নেই। এক অংশে এই; ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে দিক্‌ও নেই, কালও নেই, ধর্ম্মও নেই। ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম, এ জ্ঞান তাঁতে থাকবে না। যিনি ধর্ম্মী, তিনিই ধর্ম্ম, এই ভাবে সেখানে সব একসা হয়ে গেল। বিচ্ছেদ পাওয়া গেল না, তার মানে, ভেদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পেলুম না। তত্ত্ব যদি এইরূপ হয়, তার মানে হল, সেখানে আকাশ বলে কোন জিনিষ নেই। ভগবতীতে ঝপ্ করে ঢুকে যাওয়া, আবার ফুটে ওঠা। আমার সমগ্রটা যদি এমনি ভাবে তাঁতে ঢোকে, তবেই আনন্ত্যের একটা নমুনা পাব। খানিকটা পড়ে থাকলেই ত একটা দ্বিতীয় রয়ে গেল। অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি যা কিছু আছে—যত কিছু ভাষার

বৈচিত্র্য আছে, সমস্ত নাম-রূপ একেবারে নিয়ে এমনি করে যদি তাঁতে ঢুকে যায়, তবেই জানব, অনন্তের উপলব্ধি—অনুভূতি আসছে।

অনন্ত দুরকমের,—১। খণ্ড খণ্ড হয়ে বহু হওয়ার নাম অনন্ত হওয়া ; মাঝে ব্যবধান বা আকাশ রেখে রেখে বহু হওয়া। ২। এক থেকেই অনন্ত বিস্তৃত হওয়া। ভিতরে কোন ব্যবধান বা আকাশ বা শূন্য না রেখে, একের এক থেকেই বিস্তৃতি ; অন্যটা হল একের বহু হয়ে বিস্তৃতি। এর জন্য ঋষি বললেন,—"বৎস! এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করতে হলে আসল ব্যাপার হল—আকাশ-তত্ত্বে আসা, আর না আসা।" খণ্ডিত অথচ বর্দ্ধিত—এইরূপ ভাবে যে সৃষ্টি, তার নাম শূন্য। খণ্ডন ও বর্দ্ধন, এ দুটোর কিছুই থাকবে না ; এই জন্য মহাকাল গুরুরূপে দ্বার রক্ষা করছেন। মহাকাল তা হলে তিনি, যিনি অখণ্ড জ্ঞানে খণ্ড-জ্ঞান ঢুকতে দেবেন না। বীজকে প্রকাশ করা বা অপ্রকাশ করা, এই খেলাটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। স্থূলতঃ আকাশ বা শূন্য রচনা না করলে এ খেলা হয় না। শূন্য—যাতে আত্মা খণ্ডিত ও বর্দ্ধিত হন ; বীজ বহু বহু বহু হয়। বীজত্বে প্রবেশ করলে দেখি, সে একটি মাত্র আত্মা নয়—বহু বীজ-আত্মত্ব। দ্বৈতের ভাণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকার উপায় নেই। সুতরাং বহু হতে হলে এঁকে এমন একটি শক্তি—আকাশতত্ত্ব নিতে হয়, যাতে গুণতিতে বা সংখ্যায় ইনি বর্দ্ধমান হতে পারেন। একটি হল পূর্ণত্বের নিরেট তত্ত্ব, একটি হল শূন্যত্বের ফাঁক-তত্ত্ব।

আমরা সর্ব্বশূন্যব্যাপী এই মহান্ দেবতাকে নমস্কার করি, আমরা শূন্যহীন এই মহান্ দেবতাকে নমস্কার করি। আমাদের সকল শিক্ষা গুটিয়ে এসে দাঁড়াল দুটি কথায়—শূন্য এবং পূর্ণ। আর আমাকে কোন বিচার করতে হবে না; এইটুকু পেয়ে গেলেই মাকে ঠিক দেখতে পাব। শূন্য মানে—এমন একটি জিনিষ, যাতে আত্মা খণ্ডিত ও বর্দ্ধিত হন। জ্ঞানতত্ত্বে দুটো জিনিষ—আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞান। রুদ্রতত্ত্বে দুটো জিনিষ—পূর্ণত্ব ও শূন্যত্ব।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৩৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

ব্রহ্ম সর্ব্বদা দুই aspect বা রূপ-সম্পন্ন। এই জন্য পুরুষ মুক্ত হলেও ভাবে জাগ্রদ্‌বৎ বা ব্যক্ত এবং অভাবে সুপ্তবৎ বা চিন্মাত্র, এই দুই স্বরূপে তিনি বিরাজ করেন। তবে যদি কোন পুরুষ ইচ্ছা করেন যে, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হব, তা হলে ব্রহ্মের ইচ্ছায় তাঁতে তিনি মিলিয়ে যান। এই মিলিয়ে যাওয়ার নামই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। মুক্ত পুরুষ যেখানে ব্যক্ত বা ভাবময় হন, সেখানে তিনি আপ্তকাম হন; যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন।

জীবত্বের লক্ষণ হল—পর-জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। ঐখানকার মাটি, ওখানকার জল; সেখানকার টাকা—সবই পর। তার পর, নিজের ভিতরেও ভাব-সকল এসে পরের মত তার ঘাড় ধরে তাকে খাটিয়ে নিলে; তার পরে অব্যক্ত হয়ে গেল। যদিও দেখছি যে, সেই সব ভারেব ভিতরে

আমি রয়েছি, তথাপি তারা সব পর হয়ে এসে আমার ঘাড়ে পড়ে এবং আমায় মথিত করে চলে যায়; এই ঢেউ ঠায় চলছে এবং আমি তাতে ভেসে যাচ্ছি। এর মধ্যে দেখলুম, আমার নিজ-বোধ ঠিক আছে; তাঁর কোন নড়ন-চড়ন নেই। আমি পরের দ্বারা আচ্ছন্ন আছি, এ যেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তেমনি নিজে ঠিকই আছি, এও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখন গৃহে যদি কোন গোলযোগ হল ত অসঙ্গ হয়ে, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাও; গোলযোগ না হল ত এখানে থেকেই খাটতে থাক। মাথার ঘাম বার করতে থাক। ব্রহ্মবাদ জীবকে এই দুই ক্ষেত্রেই মাত্র স্থান দেয়নি। তার আরও একটু বিশেষত্ব আছে, যাতে জীবের পক্ষে আরও সহায়তা হয়। সে হল ভগবানের সহায়তা; ব্রহ্মবাদে তাই পাওয়া যেতে পারবে। ব্রহ্মত্ব লাভ হল—পরজ্ঞানের একান্ত অবসান হওয়া। সাধারণ হিসাবে কথাটি বড় শক্ত। কিন্তু ঋষি বললেন, এই যে সব পরজ্ঞান আত্মতত্ত্বের উপর খেলা করছে, এ সব স্ফটিকে জবাকুসুমবৎ। স্ফটিক যেমন তেমনি আছে—নিজত্ব যেমন নিষ্কল, তেমনি নিষ্কল আছেন,' অথচ তাঁর উপর একটা খেলা চলছে। সাংখ্যবাদে এর নাম দিলে অনুদর্শন। ব্রহ্মবাদ বললে, একে যে অর্থে 'অনুদর্শন' বলেছ, সে ঠিক বলেছ; কিন্তু তবু ঠিক হয়নি। কারণ, এর প্রকৃত নাম হল—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া। স্ফটিকের জ্যোতি-অংশ দেখে তাকে স্ফটিক বলছ; সেই জ্যোতি-অংশ জবাপুষ্পের লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছে।

স্ফটিকের জ্যোতি না থাকলে, সে যদি লোহা হত, তবে তাতে লাল রঙ প্রতিফলিত দেখা যেত না। সুতরাং স্ফটিকের জ্যোতিতে জবার রং মিশে যায়; এর নাম হল—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া। এই অনুপ্রবেশ স্বীকার না করে যদি বলি, দ্বিতীয় পদার্থে দ্বিতীয়ের অনুরঞ্জন হয়, তাতে আত্মার ঈশ্বরত্ব দেখতে পেলে না। তাই সাংখ্যবাদীরা বললে—ঈশ্বর বলে একজন পুরুষ থাকতে পারেন; কিন্তু আত্মতত্ত্বে ঈশ্বরত্ব নেই। কথাটা এক ভাবে ঠিক। কিন্তু দেখছি, আত্মজ্যোতির দ্বারা আত্মা 'আমি ব্যাঙ, আমি পক্ষী' ইত্যাদি রঞ্জনা অনুভব করছে। অসঙ্গ থাকলেও রঞ্জনা চলেছে; তাই প্রত্যেক আত্মার অনুপ্রবেশ আছে, এ স্বীকার করতে হয়। অনুপ্রবেশ মানে—একটা আর একটার ভিতর ঢুকবে; সুতরাং তাতেও ত দুই বস্তু স্বীকার করতে হয়। না; অনুপ্রবেশ কিসে হচ্ছে, তাই দেখ। অনাত্মজ্ঞানে আত্মজ্ঞানের অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সর্ব্বজ্ঞানে আত্মনামীয় জ্ঞানের অনুপ্রবেশ হচ্ছে। এতে জ্ঞানেই জ্ঞানের অনুপ্রবেশ হচ্ছে; সুতরাং দ্বিতীয় বস্তু নেই।

তা হলে এই জ্ঞাননামীয় common factor নিয়ে দেখ, এঁকে ব্রহ্ম বলতে পার কি না, এবং বুঝতে পার কি না যে, এক আত্মা থেকেই বহু আত্মা হচ্ছে। বলেছি, যেখানেই জ্ঞান হচ্ছে, সেইখানেই আত্মজ্ঞান আছে। কিন্তু ব্যবহারের সময় দেখলুম, আমি আর জ্ঞানের গাছ, এ দুই আলাদা। জ্ঞান থেকেই গাছ তৈরি হতে দেখলুম। কিন্তু আমি গাছ ভোগ করলুম পর বলে।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যে প্রভেদ রইল। গাছ যখন জ্ঞানে তৈরি হয়েছে, তখন আত্মজ্ঞানও তার তলায় আছে এবং আমার নিজত্বের দ্বারা বিধৃত হয়ে সে আমাতে ফুটেছে, তাই আমি দেখছি। এই বিধারণকারী ও বৃক্ষে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকে আমি দেখলুম না; এই হল জীবত্বের অঙ্গহানি। তাই গাছকে আলাদা জিনিষ বলে নিচ্ছি। সুখ এলে দেখি—আমি সুখী, আবার আত্মত্বের দিকে চাইলে দেখি, সুখ আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল। সুখ যখন আমার দ্বারা বিধৃত, আমিই যখন সুখের আত্মা, তখন আমিই সুখ হয়েছি। এইরূপ নিজেই গাছ হয়েছি, আবার নিজেই গাছের দ্রষ্টা হয়ে স্বতন্ত্র রয়েছি। এই যে দুই জায়গায় নিজের এককালীন উদ্বোধন, একে পেলেই জ্ঞানতত্ত্বের ব্রহ্মত্ব পাবে। তখন দেখবে, আমিই অসঙ্গ আছি, আবার চন্দ্রও হয়েছি, সূর্য্যও হয়েছি, আকাশও হয়েছি। এই নিজত্বকে ভাল করে দেখতে পেলে, একই সঙ্গে বহু হয়েছি, এ দেখতে পাবে। যেমন আছি, তেমনি থেকে বহু হওয়া, এক থেকে অনন্ত হওয়া, ইহাই ব্রহ্মত্ব।

ঋষি বললেন;—"যা কিছু দেখছ, এ সব জ্ঞানের একটা ক্রিয়া এবং সে ক্রিয়ার একটা নাম ও রূপের প্রকাশ মাত্র। জ্ঞানস্বরূপ দেবতার একটা নাম ও রূপ ফুটেছে মাত্র। এর মধ্যে ওঁকে ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাবে না।" কি সাংঘাতিক কথা! পুত্রকে যখন আদর করছি, তখন আমি নিজেই পুত্র ও পুত্রের দ্রষ্টা। এই খড়মের উপর যে আলো পড়েছে, সে যদি চেতন

হত ত বলত,—আমিই দেওয়ালে বসে আছি, আবার আমিই খড়মে পড়েছি। নিজজ্ঞানকে নিজে কখন হারায় না। তেমনি আমিও যখন তোমাকে দেখছি, তখন আমি নিজে ঐ-রকম হলুম। জ্ঞান মানেই আত্মত্ব; এমন জ্ঞানক্রিয়া কোথাও হতে পারে না, যেখানে আত্মত্ব নেই। নিজে না থাকলে কোন ক্রিয়া হয় না। আমি এক জায়গায় দেখে ফুল হয়েছি—এক জায়গায় ফুল হয়েও হইনি। এই দুই স্থানে খালি নিজত্বেরই সম্বন্ধ। নিজে ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই নিজত্ব নামীয় যিনি, তিনিই ব্রহ্ম; তোমাতেও—এখানেও, প্রতি জায়গাতেই তা হলে ব্রহ্মত্ব লীলাশীল; জীব বলে কিছু নেই। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এই নিজত্ব, ইনিই ব্রহ্ম; ইনিই আপনাতে আপনি সর্ব্বদা লীলাশীল। যদি ইনি ইচ্ছা করেন, দয়া করেন, তবে আর সুখ, দুঃখ, জীব, এ সব আলাদা আলাদা থাকবে? ইনিই পরমদেবতা; আপনিই ভোগ করছেন, আবার ভোগ করেও আলাদা রয়েছেন। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই নিজেকে নিজে তৈরি করছেন; কিছু হইনি, আর সব-কিছুই হয়েছি, যুগপৎ এই দুই মূর্ত্তিতেই আছেন। বুদ্ধি—যে একদেশমাত্র গ্রহণ করতে পারে, সে কি এখানে যাবে? সে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল—অপ্রাপ্য মনসা সহ। এখন কি আর মনের দ্বারা চিন্তা করে, বুদ্ধির সাহায্যে এটা-ওটা করে কিছু বার করতে হবে? 'ব্রহ্মাস্মি'—এই চলতে লাগল। আর 'অহং'ও থাকবে না, শুধু 'ব্রহ্মাস্মি'। আহাহা!

এই চলবে? চললে কি হয়ে যাবে? 'ব্রহ্মাস্মি'ও আর

থাকবে না। অবাক্ পুরুষ বেরিয়ে পড়বেন। বাক্য বলবার আর কিছু নেই, কেউ নেই—অবাক্ অনাদর পুরুষ। আমি খড়ম দেখছি বা খড়ম বোধ করছি, তা নয়; আমি খড়ম হয়েছি। আমি কিছু হইনি, কিছু না হয়েও খড়ম হয়েছি।

এই ভূমিতে আমরা প্রবেশ করতে চলেছি। এই দুই প্রবেশকে দেখতে পেলে, আমি যে শূন্য ও পূর্ণের কথা বলেছিলুম, সেই তত্ত্বটি বুঝতে পারবে। এই জ্ঞানে ভিত্তি করে ঐ জ্ঞান বুঝতে পারবে। এখন যদি জগৎ বিচার করতে যাই, তবে একটা নাম ও একটা রূপ, এ ছাড়া আর কিছু নেই। জল, আকাশ ইত্যাদি দেখলুম মানে, আমিই জল, আকাশ ইত্যাদি কতকগুল নাম ও রূপ প্রকাশ করলাম; এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কথা নাই। 'এতদেব ব্রহ্ম।' গাছ দেখতে, মাটি দেখতে, আত্ম-দেবতাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

এখন শুধু দেবতা বললে চলবে না, দেবতা হয়ে দেবতা বলতে হবে। এইটি না বুঝলে শূন্য ও পূর্ণ রচনার কিছু বুঝতে পারবে না। শুধু এর বিজ্ঞানটা দেখাচ্ছি। নিজে খড়ম হয়ে আমি খড়ম ভোগ করছি। নিজে খড়ম হয়েছি, খড়ম ভোগ করছি, করেও কিছু ভোগ করিনি। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, নিজেকে এখানে এই ত্রিধা দেখলাম। এই তিনই প্রকৃত পক্ষে আমি হচ্ছি; কিন্তু গুরুপ্রকাশ না হওয়ায়, জ্ঞান না হওয়াবশতঃ আমি ভাবছি, যেন পরের সাহায্যে পরকে দেখছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি

নিজেতে নিজেকেই দেখছি, 'স্বয়মেব আত্মনি আত্মানং পশ্যামি।' কি অদ্ভুত! অনন্ত ইচ্ছাময় পুরুষ যুগপৎ দেখছেন, হচ্ছেন; আবার হয়েও কিছু হচ্ছেন না। আত্মত্ব ভিন্ন, নিজত্ব ভিন্ন কোথাও কিছু খেলা করছে না।

এই জ্ঞানময় পুরুষ তা হলে পরাশক্তি-সম্পন্ন, নিজবোধ-সম্পন্ন। ইনি ব্রহ্ম—না? বাক্যটা আরও সুস্পষ্ট কর; বল—দুর্গা। দুর্গাই নিজে আপনাকে নানা বস্তু করছেন; করে ভোক্তা হচ্ছেন, হয়েও অভোক্তা রইছেন। ইনিই তা হলে চক্ষু-নামক ইন্দ্রিয় হলেন, আবার চক্ষুর বিষয় দৃশ্য হলেন; ইনিই দ্রষ্টা হলেন, হয়েও কিছু হলেন না। এঁকে বর্ণনার আর কোনও ভাষা পাবে? দ্রষ্টা, অদ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—সব ইনি। এইরূপ ভাবে যে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব প্রকাশ পান, তাঁম নাম ব্রহ্ম, যাঁর কোন রকম নামকরণ করা যায় না। সুতরাং এই অনির্ব্বচনীয় ভগবতীই সব। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনিই সব হয়েছেন, সব ভোগ করছেন, আবার করেও কিছু করেননি। আমরা মাটিকে যে মা বলতে যাই, তিনি এইরকম মা। ত্রিধারূপ নেবার জন্য সচেস্ট হও কেন? শুধু মা বললেই ত হয়? না, তা না হলে পরাশক্তির বিলাস দেখতেই পাবে না। ইনিই দ্রষ্টা, ইনিই দর্শনশক্তি এবং যে আকারে দৃশ্য পাকিয়ে নিচ্ছেন, সে-ও ইনি—একেবারেই ইনি।

এই তত্ত্বটি বেশ করে এখন বুঝে নিলে, কিন্তু ধরে রাখতে পারছ না; ত্রিধা জড়িয়ে যাচ্ছে। তিন প্রকাশকে ধরে সুস্পষ্ট,

সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে স্থান দিতে পারছ না—একসা হয়ে যাচ্ছে। একসঙ্গে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনকে পাচ্ছ না। একে আকাশের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেই এই তিন যুগপৎ তিন জন আত্মা হয়ে দাঁড়াবে। তিন জন সহজে না হলেও দুজন ঠিক হবেই। নিজে দৃশ্য হবে এবং দৃশ্য থেকে নিজে আলাদাও থাকবে। শূন্য ও পূর্ণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তাও পাবে। এখন আত্মতত্ত্বে ভাল করে প্রবেশ করা হল না? ইনি আত্মাকে লহরে লহরে লীলায়ন করছেন; আর কোন কথাই রইল না, সাধন-ভজন রইল না। এই আত্মদেবতা আপনাকে লহরে লহরে লীলায়ন করছেন, করেও ঠিক আছেন। এই বিভাগ করে দেবে শূন্য ও পূর্ণ কথাটির দ্বারা। তাতে বুঝবে, ঋষিরা কেমন করে একজন, দুজন, তিন জন বা বহু হতেন, কেমন করে এক জায়গায় বসে থেকেই আর এক জায়গায় বেড়াতে যেতেন। এ হল অনন্ত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত জিনিষ। অনন্ত মানে এ নয় যে, খালি কেটে কেটে যাওয়া। অনন্ত মানে, প্রতি জায়গাতেই, প্রতি সত্তাতেই ব্রহ্মত্বের সমগ্রত্ব রয়েছে। এই হল এ জ্ঞানের গুরুত্ব—ভীষণ জ্ঞান! আর দ্বিতীয় স্বীকারের অবকাশ রইল? এর বিশিষ্ট মজা, বিশেষ আনন্দজনক ব্যাপার হবে এই যে, এতে ধারণা, ধ্যান, প্রত্যাহার নেই। স্বতঃসিদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, নমো ব্রাহ্মণায়।

আমি এমন বলছি না যে, এ জ্ঞান তোমাদের ঠাঁয় জ্বলে থাকবে। কিন্তু এ জ্ঞানকে ক্ষণে ক্ষণে তোমরা ব্যবহার করতে

পারবে, এঁতে প্রবেশাধিকার পাবে ; আমরা নদী-নালা ভেদ করে মহাসমুদ্রে পড়ে যাচ্ছি ; তার পর টেনে নেওয়া ওঁর হাত। আমরা পর-জ্ঞানের দ্বারা আর খণ্ডিত হব না। তা হলেই অবাধ জ্ঞান হয়ে গেল না ?

'শূন্য' এই শব্দটি বড় সাংঘাতিক শব্দ ! এঁর মানে অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে। জনা-কত ঋষির কথা ছেড়ে দাও ; তাঁরা ছাড়া মাঠকে মাঠ পড়ে আছে, যাদের কাছে ইনি অপরিজ্ঞাত। আত্মত্ব, জ্ঞানময়ত্ব, এ সবের আলোচনা বহু হয়েছে, কষামাজাও অনেক হয়েছে ; কিন্তু ইনি অজ্ঞাতই পড়ে আছেন।

আচ্ছা, জ্ঞানময়ত্বের যখন ধারণা কর, তখন এই জীবত্বের খেলাটা একেবারে চুপসে গিয়ে, অণুত্বে পর্য্যবসিত হয়ে, একটা ক্ষেত্র ফুটে ওঠে, না একটা আলোকময় প্রান্তরের চারি ধার যেমন বন অর্থাৎ গাছের শ্রেণী দিয়ে ঘেরা থাকে, এমনি ভাবে জ্ঞানের প্রকাশ হয় ? জ্ঞান-বিস্তারের চারি পাশে বেড়া থাকে ? জ্ঞান-বিস্তার কি আত্মবিস্তার ? না, খালি জ্ঞান-বিস্তার হয় ? ঐ যে আত্মবিস্তার হয় না, জ্ঞানবিস্তার হয় বললে, ও হল জ্ঞানের আকাশ মূর্ত্তি। আমাদের সাধনার নিয়ম হবে, সমস্ত জ্ঞানবিস্তার কুঁচকে যাবে ; তা হলে যে আকাশ ফুটবে, সেই আকাশ তোমাদের দেখতে হবে। সে আকাশের লক্ষণ হল এই,— মাটি, জল, তুমি, আমি, ইচ্ছা মাত্র সবই তাতে পাবে ; কিন্তু সে সব আর মড়া হয়ে ফুটবে না, তারা সব জীবন্ত হয়ে

আসবে। এই হল সে আকাশের ধর্ম্ম। যারা এখানে অচেতন হয়ে ফুটছে, তারাই ঐ আকাশে চেতন হয়ে ফুটবে। এই মাটি, জল, সবই সে আকাশে আছে; কিন্তু সবই চেতন হয়ে আছে। তা হলে জগৎটা দেবভূমি হয়ে গেল। এর মানে, পরদায় ঢুকে যাওয়া। Law of intersection উল্টে গেল; মানে, এখানে আছে উপরে অচেতন-ভাব, ভিতরে আত্মত্ব; সেখানে হল—উপরে জ্ঞানময়ত্ব, আর ভিতরে সঙ্কল্লাদি আকাবে অচেতনত্ব। এখানে খোলের ভিতর তুলো, ওখানে তুলোর ভিতর খোল। কিন্তু সবই জ্ঞানময় হলেও, দেবদর্শন হল—জ্ঞানস্থ আত্মদর্শন। এখানে আত্মা জড়-শরীরী; আর ওখানে অচেতন হবার সকল শক্তি ঐ জ্ঞানত্বে লুকান আছে। একজন পুরুষ, যে বলছে—আমি জলদেবতা, তার ভিতরে জল হবার সব শক্তি লুকান আছে। ইচ্ছা করলে সে সমস্তই জলে ভাসিয়ে দিতে পারে।. এইরূপ সমগ্র বায়ু, সমগ্র অগ্নি প্রভৃতি এক এক পুরুষের ভিতরে নিহিত। এই-জাতীয় জিনিষ হল দেবক্ষেত্র—স্বর্গক্ষেত্র। সেখানে অচেতন-জগৎ-প্রকাশকারী এক একজন জ্ঞানময় পুরুষ অবস্থান করছেন। এখনি এক পুরুষ অনন্ত সমুদ্ররূপে আপনাকে বিকীর্ণ করে ঢল-ঢল হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্য পুরুষ অনন্ত অগ্নি জ্বালিয়ে দাঁড়াতে পারে। এইরূপ যত কিছু তোমরা জান, সমস্তই সে দেশে মূর্ত্ত হয়ে আছে। যাঁদের কথা বললুম, এই যাঁদের চিনলে, তাঁরা—"আসুন আসুন, আমাতে কত মহিমা

আছে, দেখুন”—এই বলে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদের আকর্ষণ করেন। জড়জগৎ থেকে দেবলোকে এই রকমে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে মাটি পড়ে আছে বলে আর দেখব না; দেখব—“এই যে, মাটির চেহারা ধরে আপনি বসে আছেন।” এ ভূমি কেমন? এই সব জ্ঞান শ্রবণের দ্বারা তোদের দৃষ্টির দিকে দিকে ভগবতী জ্বলে উঠবেন। ‘ভগবতী’ এই কথা বলার তর সইবে না। এই ধারাটি ঠিক রেখে মন্ত্র বল ত। বাক্‌তত্ত্বই এইরূপ যে, তাঁকে না নিয়ে কথা বেরোয় না। কথাই বস্তু! বস্তুই আসছে কথার আকারে? বস্তু কেবলমাত্র তাঁর প্রকাশ-মূর্ত্তি। যখন জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞানেই অন আছে? শুধু বানান করলে জ্ঞান হয়? বানানই করতে জানিস না, ‘জ’ ঞ কেটে দিয়ে লিখছিস। যেটা পূর্ণভাবে জানা, অনুভব করা এবং তাই হয়ে যাওয়া, সেই অংশ ত? কে কথা কইলে? কে কথার অকারে প্রকাশ হল? তোদের আত্মা একটা বস্তু কি না —যেমন একটা শিল আছে, নোড়া আছে। কিন্তু এ নিজে— অন্য কিছু নয়, একেবারে নিজে; ঐ হল ‘জ্ঞ’। ও কি মড়ার আকারে বেরোতে পারে? একেবারে নিজে যে; ওর কি মড়া চেহারা হয়? ও যে কথা কইলে, তাই হল ওর অন্ন, ভাত, প্রকাশ, শরীর। তা হলে কথায় কথায় পুরুষ জন্মাচ্ছে? নিজেকে ছেড়ে কোথায় যাবি? ব্রহ্মতত্ত্ব কখন পরের মত গ্রহণ করবি না। ‘জ্ঞান’ এই শব্দ উচ্চারণ করবি কোথায়? ওখানে দাঁড়ালে অচেতন জগৎ আর পরিদৃশ্যমান হয়? বলছিস আত্মা,

অথচ খুঁজছিস পরকে ; কারণ, ভগবান্ থেকে জন্মেছিস, এ কথা ভুলে যাচ্ছিস। সমস্ত জগৎটা কার বুকে দেখছিস? নিজের বুকে? তা হলে সমস্ত জ্ঞান-বিশ্বের ধর্ত্তা নিজত্ব। সে নিজে কে? ভগবান্? অর্থাৎ অনন্ত নিজত্বের কূটস্থ পুরুষ, এইরকম নিজে? তাঁতেই বসে আছিস? এবং তাঁকেই 'নিজে, নিজে' বলছিস? তাঁতে বসে এই-সব কথা শোন না। এ পাশ থেকে ঘস্‌ড়ে ওঁতে যেতে পারবি? ভগবৎতত্ত্বের আরম্ভ হল সত্য থেকে। তোদের আরম্ভ হল অনৃত থেকে—'ভগবান্ নাস্তি' থেকে। তোদের আরম্ভই হল উল্টা—ডগের দিকে। ভগবান্ বলছিস ত আগে আত্মত্ব দেখ। ভগবানের বুকে ছাড়া আপনাকে দেখতে পাবি?

প্রকাশক
পণ্ডিত—শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী (ব্যারিষ্টার-এট্-ল)
৮।১, নিউ রোড, আলীপুর, কলিকাতা।

মূল্য—৪৲ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

বেদবাণী

[আচার্য্য শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলী]

৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার, সন্ধ্যা।

কি সাংঘাতিক জ্ঞানভূমি! এখানে কিছু পরিহার করতে হবে না; সব দেবতা হয়ে যাবে; স্ত্রী হবে দেবতা, পুত্র হবে দেবতা, ফল হবে দেবতা। ব্রহ্মভাবে উপাসনা মানে, 'আমি' বলে আর স্বতন্ত্র বোধ থাকবে না। ব্রহ্মতত্ত্বকে পূর্ণমাত্রায় ধরে নিয়েছি। 'সত্য' এই কথাটা তোমার বুকে বা জ্ঞানে জেগে উঠলে তবে তুমি বোধ করবে যে, সত্য মানে এই জিনিষ। এই হল মৌলিক উপাদান—যাকে ভেদ করে আর যাওয়া যায় না। শুধু থাকা দেখে তাকে সত্য বললে, সে সত্য বলা ঠিক হল না। গাছের মৃত্যু হল, মানে—সে এমন ভূমিতে এসে দাঁড়াল, যে ভূমিতে তার জন্ম ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার পরে তোমরা জেনেছ, সত্য—জ্ঞানময়। তার পরে এল অনন্ত অর্থাৎ প্রতি পদার্থ, তার পদার্থত্ব ছেড়ে হল অমৃতময়। ছিল কাঠ, হল সোনা; ছিল লোহা, হল সোনা। পূর্ব্বের আর এখনকার জ্ঞানভূমির কত পার্থক্য দেখ না। একেবারে প্রত্যক্ষভাবে ছাড়া কোন দেবতা আর চোখে ঠেকবে? যদি ঠেকে, তবে শেষের কথাটি তোমার বুঝা হয় নাই। এই কথাটি বুঝলেই হবে

গেল। জ্ঞানময় বলে যে তত্ত্ব আছেন, সেই দেবতা আমাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরে ফেলেছেন ; আমি তাঁতে ঊর্দ্ধে অধে ও সর্ব্বদিকে নিবিষ্ট হয়ে গেছি। এঁতে এসে আমি মহিমময় হলাম। আমার আত্মা দেবত্বে ঢুকে গেল। আগে দেখছিলে মড গাছপালা, আর তার তলায় তলায় আত্মা। এখন দেখছ—সে সবই জ্যান্ত, জ্যান্ত, জ্যান্ত! আর কি বলে, বুঝে, কোন কিছু ঠেলে দিয়ে, হিসাব করে 'জ্যান্ত দেবতা' বলতে হচ্ছে? এমন ভূমি আর রইল কি? এখন প্রতি খণ্ডেরই আনন্ত্য দেখছি। শব্দের দ্বারা যা কিছু পেতে পারি, সে ছিল বস্তু, মাটিব জিনিষ, একান্ত মড়া ; আজ বাক্যের দ্বারা, বাক্যকে বাহন করে সে-ই হল এক সত্য ও জীবন্ত দেবতা, যাঁর আনন্ত্যেব সীমা পাবাব উপায় নাই। 'বৃক্ষ' এই একটি মাত্র শব্দ অবলম্বন করে এক অনন্ত-বৃক্ষাভিমানী দেবতা রইলেন। ইনি যেমনি খেলা করতে যাবেন, 'বৃক্ষ' এই শব্দ বলা মাত্র অমনি তাঁর আবির্ভাব হবে। প্রলয়ের পর ভগবান্ যখন আবার জগৎ গড়বার ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি কি ব্যবহার করবেন? বাক্য। সেই বাক্যকে-দেবমূর্ত্তিতে দেখবি না? এ ভিন্ন তখন আর কোন কিছুর দর্শন হবে? বৃক্ষ-দেবতা মানে, বৃক্ষ-জগতের কূটস্থ দেবতা। তাঁর অবয়ব হল—'ব'এ ঋ-ফলা ও 'ক্ষ'। এইবার দেবতা বুঝলি? এইরূপ প্রত্যেকের বিষয়ে ; খালি বৃক্ষ নয়, খালি ব্রহ্মা নন, খালি মহেশ্বর নন, প্রত্যেকের সম্বন্ধে। তোরা এসব কথার মূল্য দিতে পারবি? জ্ঞানের জন্য যদি যথার্থ তৃষিত হতিস, তবে এর দাম

দিতে পারতিস, নিজের মাথা কেটে দিতিস, বুঝেছিস? আমি মায়ের কাছে যে দিন এ জ্ঞান পেয়েছিলুম, সে দিন বলেছিলুম, যদি এর শতাংশের এক অংশও আমাকে কেউ দিত, সে মদ্যপ হোক আর যাই হোক, তার কাছে আমি মাথা পেতে দিতুম। চুলোয় যাক এ জগৎ; আমি নিজেতে থাকব, জ্ঞানস্বরূপে থাকব, চিন্ময়ে থাকব, এই কথা একবার বলে দেখ্ ত, জীবনটা কত ধন্য হয়ে যায়। মরবার জন্য তোদের শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, এ কথা মনে রাখিস। কত বড় যোগসূত্র পেলি দেখ না। বুঝতে পেরেছিস? আনন্ত্যের ধারণা পেলি? এখনও একটু একটুর দিকে দৃষ্টি রয়েছে? দর্শন-শক্তির দ্বারা তোর মাথা বা সহস্রারই নিজেকে দেখছে। একজন দ্রষ্টা পুরুষের দ্বারা সব জায়গায় দর্শন ফুটছে। এইরূপ এক জন শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, হৃদয়বান, বাহুবান্, পাদবান্ পুরুষ রয়েছেন। যে কথা বলতে যাচ্ছি, সে কথা সেইরূপ হয়েই ফুটে ওঠে। যে দিকে দৃষ্টি দিই, সে দিকে দেবতারই প্রকাশ হয়। যারা ছেলেমানুষ, তারা গয়নার রং চং দেখে, গড়ন দেখে; বিজ্ঞ ব্যক্তি কত সোনা, তার পরিমাণ দেখে। এত দিন যে গাছ, মাটি-জল, পুত্র, আকাশ বাতাস দেখছিলি, গুরুর আশীর্ব্বাদে আজ তারা কি মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়াচ্ছে? আত্মবান্, জ্ঞানবান্ এক পুরুষ, তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হচ্ছে? "আসতে আজ্ঞা হউক মশায়।" এমনি ভাবে ব্যবহারসম্পন্ন হচ্ছিস? ইস! আহাহা! আর তোমাকে দেখছি না, মাকে দেখছি না—মায়ের অঙ্গে তেত্রিশ

কোটি দেবতা দেখছি। হচ্ছে? প্রকাশ হচ্ছে? অদ্ভুত! এঁর মহিমা কি রকম? জ্ঞান। জ্ঞানের ভিতর আত্মজ্ঞান; জ্ঞানে আর আত্মজ্ঞানে কিছু তফাৎ আছে? আব মড়া মা বেরোবে? যদি এই তিন তত্ত্ব, যা ধরিয়ে দিলুম, তা ধরতে পারিস, তা হলে জ্যান্ত মা বেরোবেন। এত সহজে এই তত্ত্ব দেব, এ আশা করিনি। এই তিন প্রধান তত্ত্ব দেখালাম—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। তুমি ব্রহ্ম, তুমি আত্মা, এ সব কথা চাই না। এই তিন তত্ত্ব ধবে ধাপে ধাপে চল—ভাবে ভাবে অগ্রসব হয়ে গণ্ডি পার হও। চুবড়ির ভিতবে বা আমের বস্তার ভিতরে থাকলে কাচা আমও পেকে যায়। তেমনি জ্যান্ত দেবতার ভিতর থাকলে আপনিও দেবতা হতে বাধ্য। মাটিতে দেরি হয়, জ্যান্ত-সংস্পর্শে শীঘ্র হয়। জীবন্ত যে, সে আমাব সঙ্গে এখানে ব্যবহার করছে; এ মড়া নয়। এই ত ছবি! মা আমাদের কোথা আনলেন, জগৎটাকে একেবারে জ্যান্ত করে ছেড়ে দিলেন! মড়া জগৎ কোথা উড়ে গেল! জয় ভগবতি! কেমন দেখলে? হল? Intersection বা ছেদবিজ্ঞান বলে যে সত্য, তাকে অতিক্রম করলে কি হয় দেখলে? যে আলো ধরলুম, সে আলো কত বড়, তা ধরতে পারছ? এখনও দেবতার আবির্ভাব হয়নি। দেবতাকে ঠিক দেখা মানেই—“আসতে আজ্ঞা হোক, বসুন,” এই কথা বলে ওঠা। এ ছাড়া ঠিক দেখা আর কিছু নেই। মায়ের প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে কত কষ্ট পাও; এ দেখ, কত সহজে হল। এর প্রণালী কি? ‘আমি’ বলে যতক্ষণ

খেলা আছে, ততক্ষণ নিয়ন্ত্রণ যাঁর হাতে, তাঁর দোহাই দেবে না। যাঁর হাতে নিয়ন্ত্রণ আছে, তিনিই এইরূপ বলছেন দেখবে। এ ভূমিতে প্রবেশের অভিজ্ঞতা হলে, "ওগো, আমায় কি বাঁচিয়ে দিলে, কি জ্যান্ত করে দিলে," এই হবে প্রথম অনুভূতি। আমি যে নিজেকে মৃত্যুময় দেখি, তার বেশীর ভাগই বাইরের মৃত্যুময় জগৎ আমায় শিখিয়ে দেয়; বাকীটা অধ্যাত্মে হয়। আজ আর তোমায় ভেবে-চিন্তে বলতে হবে না যে, "মা বসে আছেন।" এই মাকে জাগাবে? মাটি জাগাবে! এই ভূমি জাগাবে! আপন আপন গরিমায় এঁরা সব খেলা করে চলেছেন। "মশায়, একবার দাঁড়ান, আপনাকে দেখি," এই ভাবে এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। এঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে? নিজত্বের আত্মীয়তা, আত্মার আত্মীয়তা আছে। এই আত্মীয়তা না দেখলেই জীব-সকল দেবতাদের পশু, অর্থাৎ বৃক্ষ-দেবতা বৃক্ষ হয়ে আপনাকে ভোগ করছেন, আর তুমি বলছ,—ও আমার খাদ্য। এঁদের নিকট আত্মসম্বন্ধের পরিচয় দিলেই এঁরা বলেন,—"এস এস এস।" এঁদের,আত্মা বলে সম্ভাষণ করলে, তখন এঁরা কথা শোনেন, দ্বার ছেড়ে দেন।

তোমাদের কোন ভাবনা নেই। অবহিতচিত্তে খালি উপদেশ শ্রবণ কর। কিছু করো না, খালি গুরুবাক্ শ্রবণ কর, এদিক্ দিয়ে কলিযুগে কোন কথাবার্ত্তাই হয়নি। করাটা হল অপ্রধান। যিনি বাঙ্ময়, শুধু শ্রবণই তাঁতে তোমাদিগকে বহন

করে নিয়ে যাবে। এ গাড়ীতে টিকিট কিনে উঠতে হয় না। তবে আরোহীর হুড়াহুড়ি হলে বড় কষ্ট হয়। কষ্ট মানে—গোলমাল। তোমরা পরম তত্ত্বের যত নিকটস্থ হবে, উপদেশ ক্রমশঃ তত ছোট হয়ে আসবে। ঋষিরা কি আবিষ্কার করে রেখে গেছেন! আমরা অসুরত্বে ভরপূর। তথাপি তাঁদের এই সনাতন মহিমময় বাণী আমাদের অন্তরাত্মাকে মণ্ডিত করবে, অসুরত্বকে নিরস্ত করবে; এ আলো কখন ব্যর্থ হবে না। আর ধন্য তারা, যারা এর ভিতর প্রবেশ করতে পারছে। এ গুহার —মদ্‌গু-গুহার আলোকটা দেখলে? এ গুহা পাথুরে গুহা নয়; কিসের গুহা বল ত? এর ভিতর আত্মজ্যোতি খেলে? এখানে মরব বললেও আর মরতে পারবে না, এত বড় মহিমময় এ দেব-ভূমি। পূর্ব্বে অবিদ্যার আবরণে ছিলে; এখন বিদ্যার আবরণে এসে পড়েছ। লক্ষ্য রাখ, এই জগৎ কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

এই তত্ত্ব কতকটা তোমাদের উপলব্ধিতে আনতে পারলাম বলে আজ আমি আনন্দিত হলাম। এর পরের তত্ত্ব যখন বলব, তখন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে; তা ভাষায় আনতে পারবে না। এত সহজ তুমি! অথচ এমন করে লুকিয়ে থাক কেন? এ কথার একই উত্তর—"তোরা আমায় চাস না, চাস না!"

তোরা খালি চিত্রগুপ্তের মত লিখছিস? গণেশের মত লেখ। ভিতরে আস্বাদন করে করে লেখ। এ সব হারালে কতটা ক্ষতি হবে বল ত? বড় ক্ষতি বাবা!

এখন গাছপালা, ভ্যাড়া গরু, যা কিছু দেখছি, মনে হচ্ছে তাকে বলি, "আমি তোমাকে, কত বড় দেবতাকে কি ছোট চোখেই দেখছিলাম! তুমি আমাকে ক্ষমা কর!" "তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্!" আমাদের তুমি মেরে ফেল, মেরে ফেল! আহাহা! সত্যি সত্যি ভগবান্! এর নাম মধুমতী প্রজ্ঞা—দেবতারা এতে বসবাস করেন। এখানে আর চিবিয়ে বা দোহন করে কিছু বার করতে হয় না। ভগবদ্জ্যোতি এ ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার, সকাল।

মুক্ত পুরুষ মানে—স্বাধীন জীব অর্থাৎ সে পূর্ব্ব-কর্ম্মফলের দ্বারা পরিচালিত নয় বা কর্ম্মাশয়ে বদ্ধ নয়। যে নিজেকে মুক্ত বলে জেনেছে, সে সহস্র কর্ম্ম করলেও তাতে তার কর্ম্মাশয় তৈরি হবে না। সে ভাবে জাগ্রদ্বৎ, অভাবে সুপ্তবৎ অবস্থান করবে; তার মানে, জগদ্ব্যবহারকালে ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা এবং অন্য সময়ে চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করবে। যজ্ঞার্থে যে কর্ম্ম বা আত্ম-উপাসনার অঙ্গীভূত যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মের বন্ধন নেই। কর্ম্ম পুষ্ট হউক বা অপুষ্ট হউক, সে তাতে বোধ করবে না যে, আমি পুষ্ট হলাম বা অপুষ্ট হলাম।

দর্পণ আর কিছুই নয়, নিজেতে তাঁকে দেখা। আমার

শরীরের অগ্নি, বায়ু, জল আর চেতনা, এই দিয়ে আমি তাঁকে আরতি করে তাঁর তৃপ্তিবিধান করছি। আমার শরীরের অগ্নির বদলে পঞ্চ প্রদীপ তৈরি করেছি। বাক্য পঞ্চ তন্মাত্রার আকারে প্রকাশ পায় বলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুকল্পে পঞ্চ প্রদীপ তৈরি করা। আর বায়ু হল আমার প্রাণ-বায়ু; তাই দিয়ে ওঁকে আরতি বা চামর বীজন করলাম, আর জল দিয়ে আরতি করা মানে, হার্দ্দ ভাব বা রসতত্ত্ব দিয়ে আরতি করা। শঙ্খ হল আকাশের অনুকল্প। শঙ্খ—শান্ত আকাশ। সমতাপন্ন শান্ত চেতনার রসের সৃজনে হল শঙ্খ। দর্পণ হল আমার নিজত্ব। যিনি প্রতিমায় বিম্বিত হয়েছেন, নিজত্বে তাঁকে প্রতিবিম্বিত করলাম। এ দর্পণে inverted হবার বা উল্টাবার ভয় রইল না।

৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

সারা দিন তোমাদের কাদা ঘাঁটতে হয়; তাই তোমাদের জন্য গঙ্গার ঘাট সহজ করে দিয়েছি। গঙ্গার প্রবাহে একবার স্নান করলে যেমন সমস্ত দিন শরীর স্নিগ্ধ থাকে, তেমনি এই গঙ্গায় ডুব দিলে কাদা-মাটি ধুয়ে ফেলে তোমরা নবীন জীবন লাভ করতে পারবে। আমার বুকে উজ্জ্বল ভাবে এক সত্য বসে আছে; সে আমায় পাগল করে দিচ্ছে। নিরালায় বসে

দু চার জনকে এ অমৃত দিতে পারলে তারা ভাল করে পেতে পারত। আমার কথাগুল বেশ করে মাথায় রাখিস। পুনঃ পুনঃ বলতে হয় এই জন্য যে, গভীর ভাবে তোদের অন্তরে বসুক। এই তত্ত্বে যখন থাকি, তখন মনে হয়, অন্য ভূমিতে আর যাবার দরকার নেই। তোরা শুধু আমায় অনুসরণ কর। এই কথায় সব আছে ; এ জিনিষ এত গরীয়ান্।

এই বিশ্বের সমস্ত অন্তর্ভূমিতে যাঁকে দেখতে পাচ্ছি, এবং যাঁর বাহ্য মূর্ত্তি হল বিশ্ব, তাঁকে কাল দেখলাম যে, তিনি অনন্ত দেবতামণ্ডিত হলেও 'অহমেব ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ' এই জ্ঞানেতে বিভোর। তিনি নিজেই ত এই অনন্ত দেবতা-মূর্ত্তি গ্রহণ করেছেন ? এই যে দেবতাবর্গ, এঁরা হলেন বাঙ্ময় ও মনোময়। বাক্ হল এঁদের বীজস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ এবং মন হল এঁদের অবয়ব। তা হলে এই যে বাঙ্ময় ও মনোময় দেবতাবর্গ, এদের দ্বারাই ত বাহ্য বিশ্ব পরিধৃত হয়ে রয়েছে, এ জগতে এদেরই অধিকার বিস্তৃত। বাঙ্ময় মানে মন্ত্রময়। মন্ত্রময় পুরুষ থেকে মানবেরও উৎপত্তি। এই জন্য মনু বা মন্ত্রশক্তিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ হলেন আমাদের আদি জনক। মনু কেমন করে সব হলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে তার বর্ণনা আছে। মনুর স্ত্রীর নাম শতরূপা ; সেই শতরূপাকে নিয়ে তিনি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করতে লাগলেন, তাঁ থেকে অনন্ত সৃষ্টি হতে লাগল। মন্ত্র মানে বাক্ ; সুতরাং দেখলুম, যে পুরুষ অনন্ত দেবতা সেজে রয়েছেন এবং মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই যাঁর রূপ ফুটতে থাকে, তিনি হলেন একান্ত

বাঙ্ময় ও মনোময়। তা হলে একান্ত ভাবে এই মনুদেবতাকে—মনুনামক দেবশক্তি বা পুরুষকে তোমরা স্মরণ করতে পারছ। ওঁর কোন দেবমূর্ত্তির সীমা আছে? যাঁর ক্ষেত্র দেখালাম বহু, তাঁর প্রতি ক্ষেত্রই অনন্ত নয় কি? সুতরাং বহু হয়েও আনন্ত্যের বীজ প্রতি ক্ষেত্রেই রয়েছে। ইনি বহু হলেন, কিন্তু আনন্ত্যের বীজ হার'লেন না। নিজের ভিতরে দেখ। এই যে নিজের শরীরে অনন্ত স্নায়ু শিরাদি বিভিন্ন ক্রিয়ায় মত্ত রয়েছে, এরাও এই রকম প্রত্যেকেই অনন্ত পুরুষ। tissue cells বা শরীরকোষ যারা, তাদের বৃদ্ধি অনন্তে অনন্তে; মস্তিষ্ক-কোষ যারা, তাদের বৃদ্ধির শক্তি রয়েছে অনন্তে অনন্তে। ছোট আধারে সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রত্যেকটি অনন্ত বীর্য্যগর্ভ, আনন্ত্যের গতি প্রত্যেকেরই আছে। এই যে অনন্ত-বীর্য্যগর্ভ দেবতামণ্ডলীর দ্বারা নির্ম্মিত আমার এই শরীর, সে শরীরকে আলো করে অনন্ত বীর্য্যময় পুরুষ বসে আছেন; তাঁকে এখানে উজ্জ্বলভাবে দেখা যাচ্ছে। তা হলে আমার এই মাথা, পা, পৃষ্ঠদেশ, উদর, এই সমস্তই হল অনন্তের দ্বারা বিরচিত একখানি প্রতিমা। বহু সূত্রের দ্বারা যেমন জাল নির্ম্মিত হয়, তেমনি আমার এই শরীর বহু দেবতার দ্বারা নির্ম্মিত ও বিধৃত হয়ে রয়েছে। তা হলে এর কোথাও জাড্য নেই; এর ভিতরে দেখি, অনন্ত দেবতা স্ফুরিত। বলেছি, প্রতি দেবতা বাঙ্ময় ও মনোময়; বাক্ বীর্য্য, মন অবয়ব। তা হলে আমার অস্থি, শিরা ইত্যাদি, এ সব বাঙ্ময় দেবতা। তা হলে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বাঙ্ময় পুরুষের বাক্ দ্বারা

বিধৃত হয়ে রয়েছে! নমঃ! তা হলে বাক্‌মূর্ত্তির দ্বারা সমস্তই বিধৃত হয়েছে। কাল বলেছি, 'বৃক্ষ', 'ফুল', এই সব শব্দ অনন্ত অনন্ত কাল রয়েছে। 'অস্থি' এই শব্দটি যত দিন আছে, 'অস্থি'-নামীয় দেবতাকে তত দিন দেখতে পাচ্ছি। অনন্ত নাড়ী প্রবাহিত রয়েছে আর অনন্ত বাক্ স্ফুরিত হচ্ছে, অনন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে, শিখা জ্বলছে, এ সব এক কথা। যোগবাশিষ্ঠে আছে, বশিষ্ঠদেব এক দিন এক খণ্ড শিলায় প্রবিষ্ট হয়ে সেই শিলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখতে দেখতে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে পড়লেন। আমরাও তেমনি এই শরীর-শিলায় প্রবেশ করে দেখলুম যে, এতেও অনন্ত দেবতাবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এইরূপ প্রতি শরীরে—কে জানে মানুষের শরীর, আর কে জানে ধূলোর শরীর; কোথাও প্রবিষ্ট হয়ে এই পরমদেবতা ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই অনন্ত পুরুষ বহু হয়ে স্ব স্ব ধারায় প্রবাহিত হচ্ছেন—পরস্পরকে intersect বা ছেদ করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাতে ধারার কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না; পরস্পরের ক্রিয়ায় সে ঠিক সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, মূলতঃ ক্রিয়া এই তিন হলেও তেত্রিশ কোটি দেবতা তার ভিতর নিহিত আছে, সেইখান দিয়ে প্রবাহিত আছে, না?

আমাদের সামনে এখন দুটি প্রশস্ত পথ। একটি এই অনন্ত দেবরাজ্যের বিস্তার; এঁদের এক এক জনের শক্তি যত দূর যাই, দর্শন করতে পারি এবং আর একটি,—সর্ব্বদেবত্বাময়

যে পরমদেবতা, মাত্র তাঁর পরম দেবভাব উপাসনা করতে পারি ; তোমরা বলবে—হ্যাঁ, আমরা এঁকেই ধরে বসে থাকি, ইহাই সহজ কথা। অনেক সাধক এই পথে গিয়ে মরেছে, প্রত্যগাত্মত্বে আত্মার আভাস পেয়ে জগৎকে ওখানে নিরস্ত করেছে ; অনেক সাধক দেববৃন্দকে নিরস্ত করে এ কে নিতে গিয়ে ঠকেছে। কারণ, তখনও তারা নিজের চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারেনি। সাধনার মূল কথা হচ্ছে, এই আনন্দের মধ্যে যদি না বসি, স্রোতে যদি না পড়ি, তা হলে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। হাল ধরবেন ঐ এক দেবতা ; কিন্তু নৌকা বাইতে হবে দেবতাদের ভিতর। অনন্তত্বে পরিপূর্ণ হতে হবে। ইনি অনন্ত, আমিও অনন্ত-শরীরী, এই পথে যেতে হবে। গেলে তবে অনন্তের স্রোতে পড়বে। অনন্তত্বে প্রবেশ করছি শুধু এই কারণে যে, আমাদের আর কোন প্রচেষ্টার দরকার হবে না, এঁর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, এই বোধ প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ দেখব, ইনিই সব করছেন ; এই ভূমিতে গিয়ে পড়তে হবে। এই অনন্তের ছবি অর্জ্জুনকে দেখিয়ে ভগবান্ বলেছিলেন,—"তুমি নিমিত্তমাত্র হও।" এখানকার শিক্ষা—"আমিই সব করছি।" এইখানে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হবে। ঐ বিশ্বরূপ দেবতাকে দেখলে, নিজের উপলব্ধিতে ওঁকে পেলে, তবে আমি অনন্তে ভেসে যাব। এই অনন্তরূপী অনন্তদেব অনন্ত রশ্মিতে বিকীর্ণ হচ্ছেন ; আমার শরীরে তাঁর স্থান কোথায় ? সহস্রারে। আমাদের ভিতর দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কথা-সকল অনন্তে অনন্তে ফুটে আসছে। সাধারণ

জীবভাবে দেখ, সেখানেও কথার ঝাঁক ফুটছে; কিন্তু সে সব কথা মড়া—জীবন্ত বা দেবতার মত নয়। প্রকৃত পক্ষে এসব কথা কিন্তু ঐ দেবতাস্ফুরণ, যে কথাই আসুক না কেন, প্রত্যেকটি ঐ দেব-অবয়ব। যেমন বলে দিয়েছি, Law of Intersection বা ছেদবিজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যারাজ্য বিদ্যারাজ্যে পরিণত হয়; বাক্ও তেমনি, মৃত বাক্য থেকে জীবিত বাক্য হয়ে যায়। আমি যে বলি, কথা বলতে গিয়ে কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরুচ্ছি, এ কথা ঠিক? অনন্ত দেবতামণ্ডলী যাঁর অবয়ব, সেই বিশ্বরূপ পুরুষকে যদি উপাসনা করতে পার, তবে আর তোমার ব্রহ্মচ্যুতি হবে? আর আমার এই বাঙ্ময় মূর্ত্তির দ্বারাই সে দেবতা উপাসিত হবেন? আর এইখানেই উপাসিত হবেন? যে ঘরে আমি রয়েছি? এই বুকে? আহাহা! একটা মানুষ দিব্যি নিশ্চিন্তে থাকে, যদি তাকে বলে দিই যে, তোমার ভিতর অণু-পরমাণু সব চলছে। তা হলে বাঁধা শরীরজ্ঞান সব আলাদা আলাদা হয়ে গেল। শরীরে আর গাঁট্টা-গোঁট্টা হয়ে বসে থাকার জো নেই। একটা বিপুল নর্ত্তন, এই ভাব হয়ে যায়। খালি বিপুল শক্তিমূর্ত্তি, এখানে পা দিলেই স্রোত—হুড়হুড়, হুড়হুড় চলেছে। এখানে জীবত্বকে আবার টেনে আনা, এই জড় অবয়বশীলতা আর ধরে রাখা যায়? শরীরের যত দেবতা, সব এক হয়ে যায়। গতিশীলতা, একটা ক্ষুদ্র প্রবহমাণ মূর্ত্তি, স্থিতিশীল নয়, যেমন রশ্মি প্রবাহিত হয়, সেই তার আসল মূর্ত্তি। তেমনি আমার শরীর বলে যে সব বাক্য ছিল, সে সব শক্তির—দেবতার স্রোতে

ভাসছে, আর নিজের নিজত্ব পরমদেবতায় একীভূত হয়ে যাচ্ছে। এইখানে কি ভাষা বেরোবে? 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ধ্বনি ছাড়' আর কিছু প্রতিধ্বনিত হবে? ইনি এইখানেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— এই দেহেতেই জাগ্রত হয়েছেন। আমরা সেই লোকেতে এসে প্রবেশ করছি; না কি? এমন ব্রহ্মতত্ত্ব পেলে, শক্তি হয়েছেন যাঁর অবয়ব, আত্মবোধ হয়েছে যাঁর স্থিতির লক্ষণ; ইনিই বলেন,— 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' এমন যে জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময় দেবতা, এখানে আর তুমি আমি বলে কোন ভাষা নির্গত হবে? শক্তি মানে কি? তাঁর মূর্ত্তি কি? বাক্। তেজোময়ী বাক্, বাক্য নয়। আহাহা, শিব শম্ভো!

কালকের মত এ তত্ত্বে যেতে পারছ? কালকের চেয়ে ভাল পারছ? এইখানে তোমাদের বসিয়ে দিয়ে আমি ছুটি নিতে পারি? পারি না এই জন্য যে, খালি বসিয়ে দিলে হবে না; সে বসা ভেঙ্গে না যায়, এমন করে বসাতে হবে। তাই অনন্তের ভিতর কেমন করে সীমা রচিত হয়, মহাকাল কেমন করে কাজ করেন, তাই দেখাতে হবে। অনন্ত হলেও মায়ের কি বুক, যে বুককে খণ্ডাখণ্ডে টুকরো করে দেবতাদের থাকার জন্য আপনি বহু সেজেছেন। প্রত্যেকেই একই অনন্ত, অথচ পরস্পরের নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ সংজ্ঞা আছে। এইটে দিলে ফল গ্রহণ করতে পারবে; নতুবা ঝড়ের মত বয়ে যাবে। ফলের দরকার, তা না হলে দেব-সত্তার ধারার মত উপলব্ধি করতে পারবে না।

বলে দিয়েছি, সাধনার মূল হল সত্য। শুধু বিকীর্ণ হয়ে

নামলে হবে না। এ সব শক্তির বার হওয়া ও ঢোকা, দু দিক্ না দেখলে স্থিতিশীলতা গ্রহণ করতে পারবে না, নিজের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। এই জন্য insulator দিতে হবে—শূন্য। এই পূর্ণতার খেলা শূন্যতার দ্বারা কেমন করে বহু হচ্ছে, তা বুঝলে তবে ঠিক বোঝা হবে। প্রসৃত হচ্ছে অনন্ত, আবার ফিরছেও অনন্ত। "যথা নদীনাং বহবোঽম্বু-বেগাঃ সমুদ্রমেবাভি-মুখা দ্রবন্তি," এইটি দেখতে হবে। তা হলে অনন্ত-তত্ত্বের ঠিক ইঙ্গিতটি পাবে, না কি? তা পেলে কি হবে বল ত? আপ্তকাম; সে পুরুষ হবে আপ্তকাম। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'— চারি পাদের আভাস দিলাম। কেমন? গুরু দ্বার খুলছেন মনে হচ্ছে? এই কদিনের উপদেশ আর পূর্ব্বের উপদেশে কিছু তফাৎ আছে? দেবতাকে ডাকতে আর কষ্ট আছে? খোষামুদে কথা বল না। যে অবধি শুনেছ, তাতে এখন যদি কেউ কোন দেব-পূজায় তোমাকে নিযুক্ত করে, তবে দেবতাকে আবাহন করতে পারবে? যদি বলি, দেবীর আরাধনা কর, তবে তাঁকে ডাকতে কোন অন্তরায় হবে? নিজেকে যতটা জ্যান্ত মনে কর, দেবতাকে ততটাই জ্যান্তরূপে পাবে? কিছু কম নয়? কম হলে কি করতে হবে? নিজেকে জ্যান্ত কোথায় গিয়ে দেখ? যে জাজ্বল্যমান দীপ্তি, তা কি শরীরে থেকে পাও, না ভিতরে জ্ঞানময় তত্ত্বে প্রবেশ করলে পাও? তখন যেন জীবন্ত ভাব, মুক্তভূমি এসে উপস্থিত হয়। এর চেয়ে ওতে বেশী সার্থকতা—তা হয়? তা হলে ঐ দেবতা ঐ ভূমিতে অত জ্যান্ত

হবেন না? কালকের আর একটি কথা স্মরণে রেখো। বলেছি, প্রত্যেক দেবতাই চক্ষুষ্মান্। জ্যান্ত মানেই চক্ষুষ্মান্। দেবতা বলতে গেলেই তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হয়? তিনি আমায় দেখলেন, আমি তাঁকে দেখলুম, এইরূপ ভাবে হয়? এ না হলে হবে না; এখানে বিন্দুমাত্র কাঁচা থাকলে চলবে না। যদি একেবারে জ্যান্ত চোখোচোখির ব্যাপার ঘটে—মা, ক্ষমা কর! দেবি! মা! ক্ষমা কর! এই অশরীর ভূমিতে এদের নিয়ে চল।

এ তত্ত্বে শ্রদ্ধা গভীর হয়ে আসছে? যখন ঐ শরীরের অনন্ত দেবতার কথা বললুম, তার মহাস্রোত দেখালুম, অনন্ত দেবস্রোতের মাঝে তখন নিজের স্থিতি দেখলে? অনন্ত ধারায় দিগ্‌দিগন্তপ্লাবী ধারা যখন ধরিয়ে দেব, তখন এই ভূমিতে বসে শরীরকে সংহরণ ও প্রকাশ করতে পারবে। এই ভূমির মূল্য এইখানে; এই স্রোতোধারা বিকীর্ণ হয় আবার সংহৃত হয়। তিন প্রকারের গতি সর্ব্বদা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এই ভূমিতে বীজতত্ত্ব অবস্থিত। পূজার সময় তোমাদের মন্ত্র পড়াচ্ছিলাম—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং; আর পড়াচ্ছিলাম—হংসমন্ত্র। এবার হংসমন্ত্র বুঝতে পারলে? সৃষ্টি ও সংহরণ, এই দুই তত্ত্ব নিয়ে সব সৃজিত হয়েছে। খালি বিভিন্ন পরিচালিনী শক্তির বিশ্লেষণ হবে, এবং প্রত্যেক শক্তি অনন্তধারে চলছে দেখতে পাবে। তখন বাঁধা-ধরা শরীর গিয়ে শক্তিই হবে অবয়ব। যার অবয়ব হবে শক্তি, সেই কৌল পুরুষকে নমস্কার—শক্তিই হচ্ছে যার

কুল। তখন তোমাদের বর্ত্তমান অস্তিত্বের কোন সার্থকতার কোন মূল্য দিতে পারবে না, এ মহাভূমিতে সব গলে যাবে, বিচূর্ণিত হয়ে যাবে; আছে ধূলার ঢিবি, হয়ে যাবে ধূলার ফোয়ারা! কি সুন্দর! কোন বীর্য্যের দরকার হবে না। বীর্য্যময় এ বিশ্ব, তার মূল হল বাক্—খালি একটা কথা! কি ভয়ঙ্কর! মনু-পুরুষের ক্ষেত্র—না? জয় ভগবতি! এসে পড়্‌বে।

খেয়ে সুখ নেই, খাইয়ে সুখ। কেমন বিজ্ঞানে এসে পড়ছি। কেমন একটা গভার ক্ষেত্র। যোগশক্তি-হীন, সর্ব্বদা জড়-মত্ততায় বিভোর, অথচ 'যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।' এর নাম স্বর্গভূমি। স্বর্গের ছবি পূর্ণমাত্রায় দেখছি। স্বর্গ মানে, যা মনে করবে, তাই তৈরি কর আর ভোগ কর। মনে কর, বৃক্ষ শব্দ উচ্চারণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে 'বৃক্ষ' এই সংজ্ঞার স্থিতি বা ধারা বেরিয়ে গেল। তাকে দেখতে থাক। এ বৃক্ষ অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে রইল; এ রয়েছে—রয়েছে, এর আর শেষ নেই। যতক্ষণ চিন্ময় ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকব, ততক্ষণ ওর সাধ্য নেই যে, চলে যায়। শব্দ যেমন দেশব্যাপী হয়ে গেছে অনন্তে, গাছও তেমনি কালব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি যদি ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, তার আর যাবার উপায় নেই। এইরূপ সকল বস্তু, মানে —সকল দেবতা। যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা চোখের আড়াল করতে পারি না। আর এত-বড় শক্তিময়ী দেবী—মন্ত্রেণ পুটিত্বা, এঁকে চোখের আড়াল করব? এমনি করে এঁকে দাঁড় করালেই ইনি বলবেন—"বরং বৃণু।" "কি চাস? কেন আমায়

দাঁড় করালি ?" তোমাদের উপর এখনও জড়রাজ্যের সংস্কার এত আধিপত্য করছে যে, এ তত্ত্ব ঠিকমাত্রায় নিতে পারছ না। কিন্তু যে প্রজ্ঞাভূমিতে গুরু এনে ফেলেছেন, আর ছেড়ে যেতে পারবে না। যথেষ্ট হয়েছে; আর একপাদ দিলেই একে দাঁড় করাবার শক্তি পাবে। কত যোগ যাগ তপস্যা করে লোকে একে কদাচিৎ পায়; আর তোমাদের আমি বাক্যে বাক্যে নিয়ে যাচ্ছি। অন্যান্য সাধনার ও এ ভূমির কত পার্থক্য, তা এ থেকে বুঝে নাও। এসব দেখিয়ে না দিলে সংস্কার টুট্‌বে না।

তারাকান্ত! পূর্ব্বাবধি যা শিখেছিলে, তা থেকে এর অভিনবত্ব আছে? এর নাম অপরোক্ষ দৃষ্টি। চক্ষু অনন্ত, শ্রোত্রাভিমানী দেবতা অনন্ত, ইত্যাদি কাল বলেছি। ঘ্রাণ, স্পৃশন, মনন, প্রাণন, হৃদয়, বুদ্ধি-অভিমানী দেবতা, এসব অনন্ত। ইস্! আপনার সান্ত মূর্ত্তি আর রাখতে পারবে? দৃষ্টি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত; এসব যদি অনন্ত হয়ে গেল; নিজের আর সান্ত সীমাবদ্ধ মূর্ত্তি রাখতে পারবে? "ত্রীণি খলু এষাং ভূতানাং বীজানি ভবন্তি, অণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জং।" কি সুন্দর! আঃ! গুরু গুরু গুরু!

এর মানে কি এই ভূমিতে না দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে করলে হবে? সত্যং জ্ঞানং অনন্তং বলেছি। তিন বীজমূর্ত্তি এবার দেখবে, বলে দেব। ঋষি কি ভয়ঙ্কর শব্দ ব্যবহার করে গেছেন, উপর থেকে বিন্দুমাত্র ধারণা করবার জো নেই। তোদের খালি পুনঃ পুনঃ বলি, এই সব কথা শোনবার সময় জ্ঞানরাজ্যে ঢুকে

শুনিস, তবেই এর মাধুর্য্য পাবি। এদিকে চাইলে কিছুই ধরতে পারবি না।

'নিজে' মানে—মায়ের আত্মত্বের প্রকাশ। এ ভিন্ন আর 'নিজে'র পরিচয় কিছু নেই। এ ভূমিতে না হলে একটা জীব এত বড় অধিকার পেতে পারে যে, তার কথায় একজন দেবতা দাঁড়াবেন? কতক্ষণ জীব থাকবি? এমন ঔষধ ঢুকিয়ে দিচ্ছি, যাতে জন্মের মত বদ্ধ জীবত্বের অবসান হয়ে যাবে। জগৎ মিথ্যা, দেবতা মিথ্যা, এসব কথা আর বলবি? এ-সব ভাষার স্থান কোথায়? "সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" বাংলার নরম মাটি পার হয়েছ, কঠোর সত্যে, বজ্রভূমিতে চলেছ।

ব্রহ্মা—চেতন ও অচেতন সমস্ত বিশ্বের মূল উপাদান যে বেদ বা জ্ঞান, সেই জ্ঞান-প্রকাশ-নিরত হিরণ্যগর্ভ পুরুষ হলেন প্রধান ব্রহ্মা। এই জন্য ওঁর নাম হিরণ্যগর্ভ; যাঁর গর্ভে হিরণ্য বা আলোক।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৮, মঙ্গলবার।

ব্রহ্ম কেমন করে ভগবান্ হলেন, সে বিজ্ঞানকে সংক্ষেপে বুঝতে হলে ভর্গ ও গর্ভ, এই দুই জিনিষকে বুঝতে হয়। ভাতি, রঞ্জয়তি, গচ্ছতি, এই হল ভর্গ। আর গচ্ছতি, রঞ্জয়তি, ভাতি,

এই হল গর্ভ। ব্রহ্মগর্ভে অবস্থান ও ব্রহ্মগর্ভ থেকে ভর্গরূপে বেরিয়ে আসা, এই দুই ক্রিয়ায় সমস্ত চলছে। পূজার সময় প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে পড়েছিলুম,—"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥" এই যে "ধাতা গর্ভং দধাতু তে", এ কি সাংঘাতিক! এখানে এই যে প্রতিমা—বিষ্ণু, ত্বষ্টা, ধাতা এবং প্রজাপতি, এই চতুঃশক্তি এই প্রতিমাকে ব্রহ্মগর্ভ করে তুললে তবেই ঠিক প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্যোতি বেরিয়ে আমার প্রাণ হয়েছেন, ইহা দেখার জন্য ব্রহ্মকেই আমি গর্ভরূপে প্রতিমায় গ্রহণ করলাম। এখন প্রতিমার সঙ্গে কিরূপ সংযোগ রাখলে তবে প্রতিমাপূজা হয়, তা বুঝতে হবে। যথার্থ ব্রহ্মসন্নিধি দেখার কথা কাল বলছিলাম। এ দেখা বিন্দুমাত্র আন্দাজ বা অনুমানের মত হলে চলবে না; একেবারে সত্যের যে উপলব্ধি, তাই চাই। তা হলেই বুঝব, আমি ব্রহ্মস্থ জীব। ইহা দেখার জন্য অপূর্ব্ব দ্রষ্টা ঋষি আমাদের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব তত্ত্ব ঢেলে দিয়েছেন। এই তত্ত্বই হল ব্রহ্মবিজ্ঞান থেকে সকলের জাত হওয়া দর্শনের তত্ত্ব। কাল একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলেছি। এ সব কথা যাত্রা শোনবার মত কথা নয়; এলুম, বসে গেলুম, শুনে গেলুম—এ সব কথা সেরূপ নয়। নিজেকে একতান-বদ্ধ করে ব্রহ্মচ্ছন্দে যারা ছন্দিত, তাদেরই সামনে ব্রহ্মচ্ছন্দ বেরোবে, তাদেরই সামনে এ সব কথা বলতে হবে; নতুবা ঢাকের সঙ্গে সেতার বাজান চলে কি? কথাই হল সমস্ত

শক্তি ; কথা ভিন্ন কোন জিনিষ নেই ; কিন্তু তোরা তার মূল্য দিতে চাস না, চেতনকে জড়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিস, জড়কে চেতনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিস না। জড়তাকে অস্বীকার করা এর মানে নয়। নীরব নিথর থাকবে, তবে এ সব কথার আলোচনা চলবে।

এই আবশ্যকীয় কথাটি তোমরা মনে রেখো যে, এই বিশ্ব প্রলীন হয়ে গেল বা সৃষ্টি সায় হয়ে গেল বা স্থিতি চলতে লাগল, এরূপ কখন হয় না। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—একটি ত্রিভঙ্গিম ক্রিয়া অনবরত চলছে। আমি বসে আছি মানেই হল, এখানে একটি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়া অনবরত খেলা করছে। এই গাপ্পা-গোপ্পা মাটির ঢিবিটি বসে আছি, তা নয় ; এই-রূপেতে একটি আলোকক্রিয়া অনবরত চলছে। 'আমি' মানেই একটি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষতার পরিচয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপে একটি ক্রিয়া প্রকাশমান হয়েছে 'আমি'রূপে। তার তারতম্যের নাম জন্মান বা মরা। এইটি সর্ব্বদা নিষ্পন্ন হচ্ছে। সুতরাং ব্রহ্ম থেকে যে আমরা জাত হচ্ছি, ইহাই হল বড় কথা। অনবরত তিনি একটি সৃষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করছেন। তা হলে সাক্ষাদ্ভাবে আমরা ভগবতীর সন্তান। এই যে সন্তানতা, এইটি ঠায় প্রকাশ হচ্ছে, এবং Law of Intersection বা ছেদ-বিজ্ঞানের দ্বারা জীবরূপে পরিচিত হচ্ছে। সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা এই শক্তি অবিদ্যা বলে পরিচিত হচ্ছে। অবিদ্যাই হল Law of Intersection বা ছেদবিজ্ঞান। এরই উল্টো গতিতে

দেবতারা হচ্ছেন; এই হল জীব-বিজ্ঞান। এই ক্রিয়া ঠায় চলছে। আমার বুকের ভিতর চিন্ময়ী রয়েছেন, তিনি ঠায় এই ক্রিয়া করছেন; আমরা তাঁর দ্বারা বিধৃত হয়ে রয়েছি। আমাদের এ প্রকাশ আসছে বর্ণের দ্বারা। বর্ণ হল বাক্য। ব্রহ্মতত্ত্বে কেমন করে বর্ণ ফুটছে, আর সেই বর্ণ ভূতমাত্রায় রূপাদি আকারে কিরূপে পরিণত হচ্ছে, এ যদি দেখতে পাই, তা হলে আমরা বুঝব, কেমন করে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তৈরি হয়েছে এবং বর্ণময়, প্রত্যক্ষতাময় বিশ্ব কেমন করে তাঁ থেকে জাত হচ্ছে। তোরা জানিস, এক বিন্দু শুক্র ও ডিম্বকোষ মিলিত হয়ে জীবের জন্ম-সূচনা হল; এই দুই মিলিত হয়েই জীব তৈরি হচ্ছে। তোদের মধ্যে যারা ডাক্তার, তারা আরও জানিস, শুক্র ও ডিম্বকোষ, এ দুইএর মধ্যেই ক্রোমোজম (chromosome) নামে একটি পদার্থ আছে, যা অতি সহজেই রঞ্জনাময় হতে পারে। রঞ্জনাই হল তার ধর্ম্ম, রঞ্জনাই সে সহজে নিতে পারে; যেমন ফটোপ্লেট ছায়াই নেয়। তাই পিতা-মাতার সংস্কারে ধৃত ধৃতি, স্মৃতি, মেধা, চরিত্র প্রভৃতি সূত্রগুলিতে সে নিজেই রঞ্জিত হবার যোগ্যতা নিয়ে আছে। অন্য কতকগুলোর ধর্ম্ম হল, শুক্র ও ডিম্বকোষের বিকাশ সাধন করে জন্ম সম্পন্ন করা। জীব পুরুষ হবে, কি স্ত্রী হবে, তার আর আর কি কি হবে, কেমন প্রকার হবে, কোন্ মেধা স্মৃতি প্রভৃতিতে সে সম্পন্ন হবে এবং সেই সেই ধর্ম্মে তার রঞ্জিত থাকা, এসব তৈরি হবে সপ্রকাশের অধ্যাত্ম-জ্যোতির দ্বারা। আমাদের জন্মের মূল ক্রোমোজম যাঁ থেকে

গঠিত, সে হচ্ছেন তিনি। জীব, এখানকার যে রকম পরিবেষ্টনে পড়বে, তার অধ্যাত্ম আলোক, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, গতি প্রভৃতি তেমনি ফুটে উঠবে। এখানে অধ্যাত্ম আলোক মানে—প্রকাশ, কতকগুল বিশিষ্ট প্রকাশ। তবে ত বর্ণই আমাদের প্রাণ। সুতরাং ব্রহ্মের প্রজ্ঞানতত্ত্বে যদি বর্ণকে ধারণা করতে পারি, তা হলে এই বর্ণময় বিশ্বে খাপ খেয়ে গেলাম। এ পাশে আধ্যাত্মিক বর্ণ ও পাশে ভৌতিক বর্ণ।

অধ্যাত্মে সহস্রার থেকে medulla বা মস্তিষ্কের অংশ-বিশেষ দিয়ে শুক্রকোষে এসে বর্ণ মূলাধার পর্য্যন্ত নামল। এপাশের বর্ণ ওপাশে আড়াআড়ি ভাবে চলে গেল। এখানে যেমন বর্ণময় বাহ্য বিশ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি, তার দ্বারা পিতৃবীর্য্যকে পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রের যোগাযোগে বিকশিত করলুম। একটু নূতন কিছু যোগ করে সংস্কার-গ্রন্থিতে নিয়ে গেলাম, সেখান থেকে প্রজাপতি-ভূমিতে নেমে এল। আবার আমি যখন সন্তানের পিতা হব, তখন ঐ সব এল মূলাধারে, সেখান থেকে গেল সন্তানের জননীতে।

তা হলে ত আমরা শুধু বর্ণময় ছাড়া আর কিছু নই। এখন মাকেও যদি আমরা এইরকম বর্ণময়ী দেখতে পাই, তা হলে আমার কাছে চাক্ষুষ মা আবির্ভূত হবেন। এই দেখ, মা বেরিয়ে আসছেন। আলে একটা ছ্যাদা হলে সব জল যেমন তা দিয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি ব্রহ্ম—বর্ণহীনা মা আমার আজ বর্ণময়ী হয়ে এমন ভাবে আসছেন যে, কোন ক্রিয়াই আর মাকে

ছেড়ে করা যাচ্ছে না। সব কর্ম্মই মা-সমেত এবং মায়েই সে সব কর্ম্ম প্রতিফলিত হচ্ছে। যেমন সমুদ্র ছেড়ে কোন তরঙ্গ হচ্ছে না, তেমনি আমি যে অনবরত কথা কইছি, তাতে ভাব প্রকাশ করছি, বর্ণ তৈরি করছি, লাল নীল সাদা করে সে সব ব্রহ্মে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আবার সেখান থেকে জাত হচ্ছি। আজ 'কথা', 'বর্ণ', 'সজীবতা', 'সচেতনতা', এসব একটা বিজ্ঞানের ভিতর ঢুকে আসছে, না? আজ যদি কোন মানুষ কেমন করে কাজ করবে, এই হিসাব করতে চায়, তবে কোন্ বিজ্ঞানে সেই হিসাব করবে? বর্ণবিজ্ঞানে না? মায়ের মাতৃত্ব পূর্ণমাত্রায় দেখতে হলে বর্ণবিজ্ঞান ছাড়া পথ নেই। ধন্য তাঁরা, যাঁরা মাকে রাঙ্গা, পীত, হলদে করে ধ্যান করবার ব্যবস্থা করে গেছেন। ব্রহ্ম অরূপ? এ কথা যে বলে, সে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বৃদ্ধ শিশু; এদের কি বলব?

যদি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মের প্রত্যক্ষতা চাও, তবে তোমরা অবহিতচিত্তে ধারণা কর, আমি মাকে কেমন করে বর্ণ-বিভূষিত করি। যদি দেখতে পাই, আমি অনবরত পুষ্ট ও রক্ষিত আত্মরূপিণী জননীতেই; তাঁর থাকা মানেই রূপ-প্রকাশ, বর্ণ-প্রকাশ, তা হলে আমি যে গঠিত হয়ে ফুরিয়ে গেছি, তা নয়। যেমন বালুর কুচি দিয়ে নদীর চড়া তৈরি হয়, আমি তেমনি বর্ণ-চূর্ণ দিয়ে তৈরি হচ্ছি। আমার স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি সব বর্ণ। শুধু আমি নয়। পূর্ণরূপে ব্যক্ত আর যে সব মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত, সে সব ভাব নিয়ে, ঐরূপ মূর্ত্তি নিয়ে যাই

বেরোচ্ছেন্। তা হলে গাছকে ভগবান্, জলকে ভগবান্ বলায় স্তুতিবাক্যমাত্র হয়নি, বরং সত্যকে পূর্ণমাত্রায় বলাই হয়নি।

মায়ে বসে নিজের জন্মটা একবার দেখ। কি কি বর্ণ, কোন্‌টা কি, কেমন করে ফোটে, সে সব বিষয়ে এখন যাচ্ছি না। সরলা আজ বলেছে, আমি একসঙ্গে অনেক বেশী বেশী দিই। এবার থেকে অল্প অল্প করে দেব। এই সঙ্গে একটা কথা বলে দিই। স্বচ্ছতা বলে একটা জিনিষ আছে। যে জিনিষ যত স্বচ্ছ—আয়না, কি জল, সে তত সব রঙের রঞ্জনা আত্মস্থ করে নিতে পারে। আয়না স্বচ্ছ মানে, সে কিছু ফাঁক দেয় না, সব নিতে পারে, স্বচ্ছের ধর্ম্মই তাই। তোমাদের যখন তত্ত্ব বুঝিয়েছি, তখন বলেছি, neutral বা অসঙ্গ বলে এমন একটা সমবিন্দু আছে, যা থেকে সব উঠতে পারে। Neutral রস গন্ধ ইত্যাদি সব রস গন্ধ ইত্যাদির কেন্দ্র। স্বচ্ছ তা হলে সর্ব্বরূপের neutral কেন্দ্র। স্বচ্ছতা মানে—জ্যোতীরূপ। চোখে এই তত্ত্ব আছে, তাই চক্ষু সর্ব্বরূপ নিতে পারে। আমি যে ক্রোমোজম (chromosome) বোঝালাম, তার এই বিশেষ ধর্ম্ম পেয়েছি যে, সে সর্ব্ববর্ণ গ্রহণ করতে পারে। জড় ও চৈতনের যে সংযোগ, সে ত ভয়ানক স্বচ্ছ। আচ্ছা, আত্মার একটি নাম সপ্রকাশ। অবহিতচিত্তে গ্রহণ কর। তিনি আপনার আলোতে নিজের কাছে নিজে পরিচিত। দর্পণ নিজেকে গ্রহণ করতে পারে না। ক্রোমোজম নিজেকে গ্রহণ করতে পারে। স্মৃতি, মেধা, ধৃতি প্রভৃতি নিজের বর্ণরাশি—সে সব ত তার ভিতর আছেই এবং সে

সব থাকার দরুণই সে বাইরের চেতন অচেতন বিশ্বের বর্ণতরঙ্গ বা প্রকাশতরঙ্গ গ্রহণ করতে পারে। সপ্রকাশ দ্যুতিময়ী মা আমার এত স্বচ্ছ যে, সেখানে অন্য বর্ণ পর্য্যন্ত তিনি প্রকাশ করতে দেন না। তাঁর নিজের আলো এত বেশী যে, প্রতিফলিত অন্য আলো তাঁ থেকে ফুটেও তাঁ থেকে আলাদা থাকে। এত বড় সপ্রকাশ সেই সপ্রকাশত্ব। মা সপ্রকাশতায় পূর্ণ, নিজেকে তিনি পূরোপূরি নেন, আর অন্য বর্ণকে একটু প্রকাশ করেন। মায়ের নিজেরটা প্রবল—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' পর—'পাদৈকেন স্থিতং বিশ্বং।' সপ্রকাশ ধর্ম্মই তিন জায়গায় অল্প বিস্তর পেতে লাগলাম। আসল স্বচ্ছতা হল সপ্রকাশত্ব। কত ভয়ঙ্কর কথা! এই সপ্রকাশতা, বর্ণমালা রচনা করে macrocosm বা বিরাট্ বিশ্ব তৈরি করছে, অণু তৈরি করছে। তা হলে এ সব আলোরই খেলা এবং সে আলো চিন্ময়। তা হলে কোন চেতনই রঙের মূর্ত্তি গায়ে না মেখে, বর্ণব্যঞ্জনা গায়ে না মেখে আসে না। হৃদয়গ্রন্থিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে এই কথা বল, হ্রীংএ গিয়ে দাঁড়িয়ে এই কথা বল। কোনও চেতনকণা বর্ণরঞ্জনা না ছড়িয়ে আসছে না। তার ফল কি হল? "হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোতনময়ং ভবতি।" যে হৃদয়ে ভাব ফুটছিল এত দিন দেখতিস, এখন দেখলি—সেখানে বর্ণময়, জ্যোতির্ম্ময়, একেবারে জ্যোতিতে ভরা বহু প্রাণের প্রকাশ। এর নাম—হৃদয় জ্যোতির সাগর, বর্ণের সাগর। "আহা হা, তোমায় আমি বড় ভালবাসি", এই বলে আমার ভাবে বা বোধে তোমার ছবি ছায়ার মত ফুটে

উঠল, ফটোগ্রাফের ছবির মত কালো ; এ আলোয় তৈরি নয়—এ কৃষ্ণ-ভূমি। মন—'অন্নময়ম্ ইদং মনঃ।' সেখানে সব ছবি ফটোগ্রাফের মত ওঠে, সে সব কালি দিয়ে তৈরি মূর্ত্তি। 'হৃদয়স্য অগ্রং'—এখানে ছবি উঠবে কিসের? আলোর। Intersection of poles বা ছেদবিজ্ঞান—এতে এ-পাশ থেকে কালো ছবি, ও-পাশ থেকে আলো দিয়ে তৈরি ছবি। চেতন অচেতন জগতের মূর্ত্তি আলো দিয়ে তৈরি। এখন আমরা কালো ছবি আর দেখব না, জড়ত্বের ছায়া দেখে দেখে আমাদের চোখ কাণা হয়ে গেছে। বলে দিয়েছি, চেতনা আলো হয়ে আসছেন। মন, ছায়ার ছবি নিতে পারে। আলোর ছবি নিতে পারে কে? হৃদয়। সূর্য্যের বিম্ব পড়েছে মানে, সূর্য্যের আলোকই বিম্বের মত দেখাচ্ছে। হৃদয়স্যাগ্রং হ্রীং-ভূমি, মাতৃভূমি। এ ভূমিতে যে ফুটছে, সে আমার কাছে কত রূপময়! আমার ছেলে কালো ও কুৎসিত—হৃদয়স্যাগ্রং পুত্রের জন্য প্রদ্যোতনশীল হয়েছে, একটা মধুর পুত্রত্ব, হৃদয়ালোকে রং-করা ঐ কালোর সঙ্গে মিশে তাকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে।

যে এইখানে বসে দেখতে শিখেছে, তার জ্যোতিতে জগৎটা কত ভরে যাবে। 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।' 'আনন্দ হল' বললে কতটা প্রত্যক্ষ আলো ফুটছে, যেটা জড়জ্ঞানে বাধা প্রাপ্ত হলেও, স্থূল জ্যোতির্ম্ময় না হলেও চেতন-জ্যোতির্ম্ময় হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়কে বর্ণময় করে দিতে পারলে সে একেবারে সাদা। আর ভগবতীকে দেখে বলব না যে, চাক্ষুষ জগতের চেয়ে কম

সুপ্রকাশ, অস্পষ্ট, পাৎলা। বলব যে, একেবারে আলোর সাগর, জীবন্ত, নিজেই আলো। সুতরাং প্রাণ আলো ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু জ্যোতির্ম্ময়। এই যে বর্ণতত্ত্বের আলোচনা করলুম, এতে এত দিন যে মাকে শিখছিলাম, সে মায়ের রাজ্যটা আলোকের রাজ্য হল? মা অন্ধকারে হাঁৎড়ে পাবার নয়। তিনি সহস্র সূর্য্যের মত আলোকময়; কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, কোটি-চন্দ্রসমশীতল।

আচ্ছা, এইবার আত্মময়ী মাকে আলোকময় বলে না দেখে, তাঁকে দেখতে পাবার মত অন্য ভূমি আর থাকবে? গাছের ভিতর, আকাশের ভিতর আত্মত্ব আলোয় ভরা, জ্যোতির সীমা নেই, এমনি ভাবে ভরা? জ্ঞানভূমিতে বসে অবহিতচিত্তে গ্রহণ কর। আর কিসের হিসাব রাখবি? অন্ততঃ আমার কাছে যখন বসবি, এই ক্ষণটুকুতে ঐ জ্ঞান রাখ।

Law of Intersection বা ছেদবিজ্ঞান চারি দিকে খেলা করছে দেখালুম। মড়া জগৎ থেকে একটা জীবন্ত জগতে তুলে নেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পারছিস? প্রাণময় আলোকের ভিতরই জড় ও চেতনের সংযোগ রয়েছে।

তোদের কিছু করতে হবে না যে বলি, তার মানে, সহস্রারে গুরু বর্ণ রচনা করছেন। সেই সংস্কার মূলাধারে নামবে। তুমি জান আর না জান, স্বয়ং ভগবতী তোমাতে বাক্যের আকারে ঢুকছেন। মাথায় স্পর্শ করে নিয়ে যাচ্ছি, হৃদয় আপনি স্পৃষ্ট হবে। কি রকম সাত্ত্বিকভাবে এঁকে নিতে হবে দেখ;

রাজসিক তামসিক ভাবে মোটেই নয়। এই মুহূর্ত্তে স্বচ্ছতার neutral plate তৈরি করে আলো ফেলছি। আমার অস্তিত্বের উপর এর সত্য ক্রিয়া হচ্ছে, এই ভাবে নাও। কেমন করে হচ্ছে, বর্ণবিজ্ঞানে তা দেখিয়ে দিলাম। বর্ণমালা দিয়ে যখন মাকে সাজাব, তখন আরও দেখবি। একটা আলোর স্রোতের দ্বারা বিধৃত রয়েছি। সার্চ্চ লাইটের গোটাটাই যেমন আলোয় নির্ম্মিত, আমার গোটাটাও তেমনি আলোতে নির্ম্মিত। এই ভূমিতে তোদের এনে ফেলছি। এখনও আধা-মড়া আধা-জ্যান্তভাবে দিচ্ছি। একটু যোগ্যতা দেখালে পূরো জ্যান্ত-ভাবে দেব।

১৯এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার।

ঋষি বললেন,—"শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে, শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে।" সাদা থেকে আমি শ্যামেতে যাচ্ছি, শ্যাম থেকে সাদাতে যাচ্ছি। শ্যাম—শি + অ + অম্। 'শি' ধাতুর মানে—শুয়ে থাকা। 'অম' মানে—তেজোবান্ হওয়া। মাঝখানের অ—নিয়ন্ত্রিণী শক্তি; শুয়ে থাকা ও তেজোবান্ হওয়াকে ইনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং শুয়ে থাকা ও গতিশীল বা প্রকাশ হওয়া, এই দুই যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি শ্যাম। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" শুয়ে থাকতে থাকতেই

যে সব জায়গায় যেতে পারেন, এইটুকু যিনি পরিচালিত করেন, তাঁর নাম শ্যাম। আর অম্ বা জ্যোতি বা তেজ যখন হুড়-হুড় করে বেরিয়ে আসছে, সেই বেরিয়ে যাওয়াটা ওঁর দ্বারা কি গৃহীত হয়? অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে গৃহীত হওয়া মানে কি? মানে, গায়ে লেগে রওয়া; জানা গেল, উপলব্ধিতে এল, গৃহীত হতে হতে বেরোতে লাগল। বেরোনোর মানেই—দুই মেরু তৈরি হওয়া—গতি ও তার প্রতিক্রিয়া। 'ম্' হল নাস্তিবাচক। 'অ' ও 'ম'র প্রতিক্রিয়া অকার্য্যকর হত, গৃহীতই হত না, যদি এমন একটা কিছু সত্তাবান্ না থাকত। যদি এমন এক সত্তাবান্ না থাকে, তবে এ দুই ক্রিয়া করবে কে? এ দুইকে নিজেতে রেখে দিয়েও জানতে পারা চাই; মানে,—আমাতে সঞ্চিত হল, স্থিতিবান্ হল, জানা-ক্রিয়ায় আমাতে তাকে জড়িয়ে রেখে দিলাম। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই কাণ্ড করবার অধিকার তখনই এল, যখন শয়ান থেকেই তিনি গতিশীল হতে লাগলেন। বেরোলেই তাঁর দ্বারা গৃহীত হতে লাগল, বেরোতেও লাগল, গৃহীতও হতে লাগল।

তা হলে যখন 'অম্' বেরোল, তখন কি মূর্ত্তি হল? কি বেরিয়ে এল? 'অম্' বেরিয়ে ছুটল, ছুটে নিজেকে হারাল, পথভ্রষ্ট হল, না স্থিতিবান্ হল? 'অম্' বেরোলেই স্থিতিবান্ হয়ে বেরোতে থাকল। আত্মতত্ত্ব থেকে যা কিছু স্থিতিবান্ হয়ে, জ্ঞানবান্ হয়ে বেরোয়, তার নাম 'ওম'। ঐ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব, যাঁতে শোওয়া ও যাওয়া এক সঙ্গে আছে; তাঁ থেকে সব

জানতে জানতে বেরোতে লাগল। আমি কথা কইছি, এটি হল অম্, মাঝে উম্ আছে। জানতে জানতে কথা কইলে হল ওম্। কথা একটা তেজ, তার নাম অম্; সে বেরোচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে গেলেও 'আমাতে' বিধৃত হচ্ছে—এই হল 'আমি', সেই কথার ব্রহ্মমূর্ত্তি। 'আমি' এই কথা বললে আমাতেই সে জাত হয়; আমা থেকে যদিও সে বেরোল, কিন্তু আমাতেই জানা হয়ে রইল। বেশ ক'রে বোঝ্। এই হল সকল বর্ণবিজ্ঞানের মূল।

শ্যাম থেকে যে বেরোল, সে হল ব্রহ্মচেতনা। সে শুয়ে ছিল। শোওয়া আর যাওয়া, এ দুই-ই শ' শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল; 'শ' নড়তে পারে না—অম্ যত কিছু করছে, 'শ' শুয়ে শুয়ে সব দেখছে। এই সমস্ত খেলাটা—শোয়া, চলা ও শুয়ে শুয়ে চলাটাকে দেখা ও জানা, এই সমস্তটার নাম ওম্। প্রতি বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণে প্রথমেই 'ওম্' এইরূপ একটি তেজের শৃঙ্খলাময়, ত্রিধারাময় একটা শক্তি জাত হচ্ছে। কোন কথা কইতে গেলেই, তা কি এমন ভাবে কইব যে, আমি জানতে পারিনি? জানতে জানতে যখন কথা কই, তখন সে কথা যেখানেই যাক, যে লোকই রচনা করুক, আমি এখানে বসে বসেই, শায়িত থেকেই তার সঙ্গে সেই লোকে যাচ্ছি। এ কথা ঠিক? আমি বললুম,—"ওহে নরেন্দ্রনাথ, দোকানে যাও।" এই বলে নিরস্ত হলুম। জানতে জানতে এ কথা বললে, 'তুমি', 'দোকানে', 'যাও', এই তিন জিনিষের ভাব সুপ্রকাশ থাকত।

তুমি বলে একজন লোক, দোকান বলে একটা ঘর, যাওয়া বলে একটা জিনিষ, এ তিন মূর্ত্তি আমার মনে বিধৃত হয়ে রইল। তেমনি ব্রহ্মে সমস্ত বিধৃত হয়ে রয়েছে। বংশপরম্পরাগত গুণ-সমূহ পেয়ে বিপরীত দিকে যাচ্ছি, তা নয়; তাঁতে সব বিধৃত হয়ে রয়েছে। আমার জাত হওয়া-রূপ গতিটা মায়ের দ্বারা বিধৃত হয়ে রয়েছে। মাত্র অম্ নেই, শায়িত শক্তিতে একেবারে যুক্ত হয়েছি। অহংএর একটা দিক্ হল স্বচ্ছ, শুভ্র, আর একটা দিক্ পঞ্চ বর্ণে বর্ণিত। এক দিকে গতিশীল, পঞ্চ বর্ণে বর্ণিত। আর যে দিকে স্থিতিশীল, সে দিক্ শুভ্রে সংন্যস্ত। একটা মুহূর্ত্তের জন্য মায়েতে আমার সংন্যস্ততা খুলে যায়, এর কি কোন উপায় নেই? আমি এক দিকে হয়েছি পঞ্চ বর্ণের ধর্ত্তা, এক দিকে শুভ্র শিবতুল্য। শোয়া-শক্তির দ্বারা ভগবতীতে আমি বাঁধা আছি, বাঁধা থেকেই বেরোচ্ছি। মায়ে থাকা—এই জায়গাটিতে হলুম আমি শুভ্র, শুক্র; আর 'এদিকে হলুম পঞ্চবর্ণী, পঞ্চতন্মাত্রাময়। তিনটি রং' দেখালাম—শ্যাম, শুভ্র আর পঞ্চবর্ণময়। আমি যখন মা বললুম, সে আত্মাকেই বললুম; যিনি পূর্ণমাত্রায় সকল বর্ণ সংহৃত করে এমন ভাবে থাকেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না; অথচ সেই সব বর্ণ তাঁ থেকে বেরোয়; এই হল আত্মার পরাশক্তি। কেন না, ওঁর অনুস্পর্শ ভিন্ন কোন তন্মাত্রা ফোটে না। আহাহা!

এক দিকে পেলুম, উনি ছাড়া কোন কিছু বেরোয় না। আর ভিতরে পেলুম, ওঁতে সমস্ত শক্তি আছে। ওঁর প্রভাবে সব

ব্যক্ত হচ্ছে, ওঁরই প্রভাবে অব্যক্ত হচ্ছে। তা হলে শুভ্রের ভিতরেও যাওয়া আর থাকা পরিচালিত করার, বার করে দেবার ও ঢুকিয়ে নেবার শক্তি রয়েছে। তাঁর নাম দিলুম শ্যামা। শ্যামাই শুভ্র-শক্তি হয়ে, অহং বিস্তার করে পঞ্চবর্ণ হচ্ছেন। শ্যামা শুভ্র-বোধময়—নিজত্ব-বোধময় হয়ে, অহং নামে মধ্যক্ষেত্র প্রকাশ করে, পঞ্চবর্ণময় হয়ে দাঁড়াবার জন্য যোগ্যতা প্রকাশ করেছেন। অহং একান্ত স্বচ্ছ হলেও তাতে প্রকাণ্ড শক্তি রয়েছে, তা থেকে ঐ শক্তি বেরোতে পারে, জানা যেতে পারে, আবার সংহতও হতে পারে। আত্মতত্ত্বের ভিতর তা হলে সব বার করার ও সব ঢোকাবার শক্তি রয়েছে। নিজবোধ নিয়ে, অহং চেহারা নিয়ে তবে তিনি পঞ্চবোধময় হন। ওঁর নাম 'জ্ঞান' ছাড়া আর কিছু দিতে পারি না। শ্যাম হলেন জ্ঞান। জ্ঞান নিয়েই আমাদের সব পরিচালন করতে হচ্ছে। আমার কথা কওয়া মানে, পাঁচ-মুখো বিশ্ব তৈরি করা। যদি শৃঙ্খলা মনে থাকে, তবে পঞ্চ-তন্মাত্রা প্রকাশ পর্য্যন্ত হবে অহংয়ের পূর্ণ বিকাশ।

কিন্তু অদ্ভুত নিয়ম Law of Intersection। বাইরে যেতে হলে অন্তর হবে বার। তাতে ঐ বিজ্ঞানে সাদা এল গোড়ায়, তার ভিতরে কালো নিহিত। উল্টান ছাড়া গতি নেই। অন্তরই বাহির হল; শিবের উপরে এল কালো, আগে যা ছিল ভিতরে। যে মা যথার্থ ভিতরে, বুকে—সে যথার্থ বাইরে বিশ্বমূর্ত্তি নিলে। স্থূলে শায়িত হবার, স্থিতিশীল হবার

শক্তিকে বার করে নিয়ে, তবে এ শক্তি খেলা করতে পারছে, নয় ত উড়ে যেত। একটা থাকবার শক্তিকে বাইরে স্থাপন করেছেন। এ শক্তি আগে আত্মত্বের আশ্রয় হয়ে থাকেন, খেলার সময় আত্মত্বকে আশ্রয় করে খেলা করেন—সেই হল point of intersection, crossing point বা বিপরীত গতি-রেখার পরস্পর ছেদন-বিন্দু। বাইরে যাব, কি ভিতর দিকে যাব? আত্মস্থ হওয়া মানে—ভিতরে যাওয়া। বাইরে গেলে অনন্ত অনন্ত প্রকাশ করলে; ভিতরে গেলে 'শ' শক্তি। কৃষ্ণের মূলে ছিল সাদা—আত্মত্ব। যখন বেরিয়ে এল, কৃষ্ণ বাইরে, সাদা ভিতরে।

আচ্ছা, এই আকাশ বলে যে বস্তু, সে সমস্ত জিনিষের ভার বহন করছে? আকাশের অস্তিত্ব না থাকলে জগতের স্থিতি প্রত্যক্ষ হত? না। এই সব ধারণ করে, প্রকাশ করে আকাশ অস্বচ্ছ হয়েছে? এতে দুই মেরু দেখছি; এক দিকে ব্যঞ্জনাময় হচ্ছে, অপর দিকে কোন ব্যঞ্জনায় লিপ্ত হচ্ছে না। এমনি ভাবে বাহ্য বিকাশ হচ্ছে, অথচ তাঁতে তা লিপ্ত হচ্ছে না; ইহাই আত্ম-তত্ত্বের কথা, নয়? তা হলে এই আকাশ এবং ওই আকাশের একটা লক্ষণ একই পেলাম। আগে বলেছি, আকাশ ও বর্ণের মাঝে একটা মধ্যভূমি আছে, সে ভূমির দুয়ের সঙ্গেই সংযোগ আছে। এইরূপে দুদিকে সংযোগ রেখে অহং দাঁড়িয়ে আছে। ভগবতীর সঙ্গে ভগবতী-জাতের সংযোগ রেখে 'আমি' রয়েছি, আর এই থাকার দরুণ সেই থাকাই মধ্যভূমি হয়েছে; বিচ্ছিন্ন

করে রাখা ও ধরে রাখা, এ দুই-ই করছে 'আমি'। তা হলে এই আকাশ—যে সমস্তকে প্রকাশ করছে, অথচ কিছুতে লিপ্ত হচ্ছে না, তেমনি বাইরের আকাশের ভিতরও ধরে রাখবার ও আলাদা করে রাখবার কোন একজন 'আমি'-জাতীয় মধ্যভূমি আছে? থাকা উচিত। ঋষিরা বলে দিলেন,—'হং' হল বহিঃক্ষেপ, আর 'সঃ' হল অন্তঃক্ষেপ। 'হং' বিসর্গিত হল, জড়ত্ব গ্রহণ করলে, আর 'সঃ'কে বলতে হয়—চেতনত্ব গ্রহণ করলে। এখন দেখছি, অহংয়ের ব্যাপ্তি হং পর্য্যন্ত। 'অ', প্রকাশ-শক্তি বা জ্ঞান-প্রকাশ হলেন নিজে। 'অহং' বললে নিজের একটি প্রকাশকে দেখতে পাচ্ছি; তার আরম্ভ হল 'অ'-য়ে বা আত্মায়, আর শেষ হল 'হং'-য়ে বা আকাশে। এমন যে পুরুষ, তার নাম 'অহং'।

আগে বলেছি, আত্মায় আরম্ভ, পঞ্চবর্ণে শেষ। এবার দেখব, ঐ আকাশ ও পঞ্চবর্ণ এক জিনিষ কি না। যদি দেখতে পাই—এক জিনিষ, তা হলে বুঝব, 'অহং' বলে ঋষি অতি চমৎকার নাম দিয়েছেন। আকাশ ও হং এক, এ কথা যদি বুঝি, তবে অহংয়ের এক পা চেতনা, এক পা মাটি। তা হলে দেখব, আমা থেকেই একদিকে জড় ও একদিকে চেতনা প্রসৃত হয়েছে। তবে আমি ত বড় সাংঘাতিক! আমরা চেতন ও জড়-রাজ্যে যোগ সাধন করবার মানুষ খুঁজে পাচ্ছিলুম না; এখন দেখছি যে, সে সংযোগকর্ত্তা আমিই। তা হলে 'আমি' একটি পরম তত্ত্ব, যে তত্ত্ব জড় জগৎ ও মায়ের মধ্যে সংযোগ-সূত্ররূপে অবস্থিত। আত্ম-বোধ মানে নিজে। সেই নিজেকে ফুটিয়ে, বর্দ্ধিত করে দেখতে

যাচ্ছি ; তার নাম অহং। অহং-জ্ঞানের ক্রিয়া ও পরিধি কত বড়, তা এত দিন দেখা হয়নি। সে এক দিকে মাকে ধরে আছে, আর এক দিকে এই মাটির জগৎকে ধরে আছে। আমিই! এইরূপে ঠিক করে দেখলে তবেই ত আমাকে চেনা যাবে ; আর তা হলে সবই চেনা যাবে ; কারণ, আমিই ত হচ্ছি চেতন ও জড়ের সংযোগসূত্র। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এত আত্মা আত্মা, ভগবান্ ভগবান্ করছি, তাতে নিজের দৈন্য ঘুচছে না। স্থিতি-স্থাপক রবার টেনে ধরলে লম্বা হল, ছেড়ে দিলে যেমন তেমনি হল। আমাকে ভাল করে চিনিনি বলে, আমি কোথায়, কার বুকে অবস্থিত, তা এত দিন জানিনি বলে, আমার প্রভাব কি, তা এত দিন জানতে পারিনি। মায়ের বুকে, অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী যিনি, তাঁর বুকে কেমন করে জ্ঞানস্বরূপে আমি সংযুক্ত, তা দেখিনি, কেমন করে বিশ্ব আমার এক পিঠে সংলগ্ন, তা দেখিনি। আমি অনন্ত না হলে ভগবান্ও অনন্ত হবেন না, বিশ্বেরও আনন্ত্য দেখতে পাব না। ম্যাজিক দেখাবার জন্য বলছি না, আমির এই আনন্ত্যে নিয়ে যাবার জন্য বলছি। আর তোদের ছোট হয়ে থাকতে দেব না ; 'অহং ব্রহ্মাস্মি' পদে পদে বলতে হবে ; ভাত খেতে, ডাল খেতে ঐ কথাই বলতে হবে।

———

২০এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

'হুং' হল প্রথম অভিব্যক্তি, নিজবোধ বা আত্মতত্ত্বের বীজ, যাঁর ভিতরে অনির্ব্বচনীয়ত্ব। ওঁকে হারিয়েছ কি মরেছ। সংস্কার থেকে মূলাধারে যাওয়া মানে, ভৌতিক উপাদানে—শরীরে প্রতিফলন নেবার শক্তি বেড়ে যাওয়া, স্বচ্ছতা বেড়ে যাওয়া, ভূতের অস্বচ্ছতা চলে যাওয়া, সবটাতেই গ্রহণ-শক্তি বেড়ে যাওয়া। আমি এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব বলছি, শুধু তোমাদের সহায়তা করার জন্য। তোমাদের ইহা দেখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানস্বরূপতা ছেড়ে তোমরা কোথাও কখনও যেতে পার না ; এই সাদা কথায় তোমাদের দৃষ্টি সংন্যস্ত রাখতে হবে। তোমরা যেখানেই যাও, জ্ঞানকে অতিক্রম করে যেতে পার না। জ্ঞান অনতিক্রমণীয়, এই দৃষ্টি স্থির হলে তখন গেছ অথচ যাওনি, এইখানটায় বিশেষ করে চোখ রাখতে হবে। একটা ঘর আলো করতে ঘরময় বৈদ্যুতিক তার খাটাতে হয় ; এত হাঙ্গামা করতে হয় শুধু মূল বিদ্যুৎশক্তির সহিত সংযোগ সাধনের জন্য ; নতুবা তার খাটালেই ঘর আলো হয় না। ঋষিরা তেমনি তেত্রিশ কোটি দেবতা স্থাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু মূল সংযোগ হারিয়ে এত দিন সব অন্ধকার ছিল। আজ আমাকে উপলক্ষ্য করে কি আলোই যে ভগবতী জ্বাললেন, আমি তার হিসাব পাই না। কিন্তু এত নিমকহারাম আমরা যে, আজও একটা যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরে উঠলুম না। তা হোক্, তাতে ক্ষতি হবে না। তবু এদিক্ থেকে এটা দেখতে হয়।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইড়া মানে কি? বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া যে নাড়ী-প্রবাহের কাজ। আর পিঙ্গলা ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যায়। অন্তর্মুখী গতিবাহী স্নায়ু ইড়া, বহির্মুখী গতিবাহী স্নায়ু হল পিঙ্গলা। আবাহন করি ভিতরে আসতে, বিসর্জন করি বাইরে। মাত্র আসা লক্ষ্য করে বলা হয় ইড়ে, আসার শোভাটুকু ঈলে, আসার গতি ঈড়ে। সবেতেই মায়ের শক্তিত্ব লক্ষ্য করা হচ্ছে। যখন আমি কাউকে ঢোকাচ্ছি, সে এসে ঢুকল, আমাকে স্পর্শ করল, আমাতে মিশল অর্থাৎ আমার সঙ্গে একীভূত হল বা হবার চেষ্টা করল। যতক্ষণ সে আমাতে ঠেকেনি, ততক্ষণ তার ঢোকা হয়নি; ততক্ষণ প্রাণ তৃপ্ত হয়নি, যতক্ষণ না সে এসে ঠেকেছে। সে এসে আমাতে ঠেকল, আমাতে মাখা হয়ে গেল, আমার সঙ্গে তার মিশ্রণ হতে লাগল, তার নিজত্ব ক্রমশঃ সে আমাতে হারাতে লাগল, আমার দ্বারা সে গ্রসিত হতে লাগল। সে শক্তিমান্ হলে আমাকেই রঞ্জিত করবে, আমায় ছাড়িয়ে আর কাউকে নয়। যখন আমাতে কেউ ঢুকল, তখনই আমি তার স্পর্শ পেতে লাগলুম। এই স্পৃশন-ক্রিয়া ও প্রাণক্রিয়া এক কথা। কাউকে নিয়ে আমি আনন্দিত হতে লাগলাম বা দুঃখিত হতে লাগলাম; তার মানে—আমার প্রাণক্রিয়াকে সে মথিত করতে লাগল। প্রাণক্রিয়া আর বায়ুক্রিয়া এক কথা। সে যে পরিমাণে ঢেউ তুলতে থাকল, কবাট বন্ধ না থাকলে তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে আমি কতকগুল ক্রিয়া করতে লাগলাম। এই হল

radiation বা বিকিরণ; এই হল পিঙ্গলা নাড়ী। আর যে ঢুকতে লাগল, সেই হল ইড়া। যতক্ষণ conduction বা অন্তর্গতি, ততক্ষণ radiation বা বিকিরণ নয়। আমারই ভিতরে যত দূর আমি আছি, তারই ভিতর conduction বা পরিচালন, আর আমাকে ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে radiation। পিঙ্গল মানে কি? মিশ্র বর্ণ; ত্রিবৃৎ হয়ে হয়ে যা বেরিয়ে আসে। একটা কিছু রূপ নিলেই সে একটা কোন অণু বা দানা তৈরি হবে না, যার ভিতর এই তিন নেই; মিশ্র হয়ে বেরিয়ে আসবে, না মিশে বেরোতে পারে না। যতক্ষণ গতি, radiation, বিকীর্ণ হয়ে যাওয়া, ততক্ষণ একটা গতি কেটে কেটে যাচ্ছে, চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—যেমন ধূলা ছড়িয়ে দিলে যায়। আর যতক্ষণ গতি তার ভিতরে ঢেউয়ের মত চলেছে, কাটা-কাটা নয়, কিন্তু উৎক্ষেপণের দ্বারা যেগুল বাষ্প হচ্ছে, সেগুল বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তা হলে দুই গতি পেলাম, একটা চূর্ণে চূর্ণে বেরোন, একটা ঢেউ তুলে তুলে যাওয়া। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই দুই গতির কথা বলেছে।

কোন জ্ঞান কোথাও খেলা করতে গেলেই তার ভিতর আত্মজ্ঞান ত আছেনই। এই জ্ঞানতত্ত্বের কোথায় এই দুই গতির প্রয়োগ হয় দেখ। আমি জ্ঞান করছি—আমি বিজয়কৃষ্ণ; শত বার শুনেও আমার আত্মত্বই সবার আত্মত্ব, এ জ্ঞান করবার আমার ক্ষমতা নেই। এইখানে তা হলে আত্মত্ব একেবারে কেটে গেছে, চূর্ণ হয়েছে। চূর্ণ হয়ে গেল কোথায়? চূর্ণ হয়ে

এখানে একটা, ওখানে একটা, এইরূপে চার দিকে ঠিকরে পড়েছে। পড়েছে কোথায়? ঢেউয়ের মত একটা অনাত্মজ্ঞানভূমি বিস্তৃত রয়েছে; তাতেই ঠিকরে পড়েছে। ও জল-মাটি সাজুক, আর বিজয়কৃষ্ণ সাজুক, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি তত্ত্ব ছাড়া—যার নাম অনাত্মজ্ঞান, তার ঢেউ ছাড়া আর কোথাও পড়েনি। ও চলেছে, ক্ষেত্রের মত বুক পেতেছে, আর এ বীজের মত তাতে নিজেকে ছড়িয়েছে। নমস্তে!

কি সুন্দর! শত বার, সহস্র বার, অনন্ত বার আত্মত্ব চূর্ণ হচ্ছে, ঠিকরে পড়ছে—ঐ মাতৃত্বের, অনাত্মতত্ত্বের বুকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মা বেড়ে চলেছে, আর একদিকে চূর্ণে চূর্ণে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করেছে। আত্মত্বের চূর্ণ এবং মাতৃত্বের, হৃদয়ত্বের সব গতিশীল ঢেউ!

২১এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের যা কিছু বুঝতে যাবি, তাতে দুটি কথা মাথায় রাখতে হবে। এক—বিপরীত মেরুদ্বয় প্রকাশিত হবে, আর ছেদ-বিজ্ঞান বা Law of intersection। দীপ্তি-প্রকাশের দ্বারা সোমপান করতে হবে; দীপ্তির ভিতরে তাপকে বাদ দিয়ে আলোকে পেতে হবে অর্থাৎ শীতল আলো বের করে নিতে হবে। ইহাই এক অপূর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী অদ্ভুত জিনিষ, যে সমস্ত দীপ্তিকে, তার

তাপকে neutralise বা নিরপেক্ষ করে দেয়। সংস্কারের উপর আধিপত্য, মনের উপর আধিপত্য করাই দীপ্ত আলোর কাজ। চন্দ্রমার আলো না পেলে সংস্কারকে পরিশোধন করা যায় না। আর যত বীজ নামে চন্দ্রমালোক দিয়ে—কি জড় গাছপালার বীজ, কি সংস্কারের বীজ। ক্রোমোজমের (Chromosome) উপর চন্দ্রমার আলো আধিপত্য করে; তা না হলে সে পুষ্ট হতেই পারে না। 'ষোড়শকলঃ অয়ং পুরুষঃ।' আমরা বাইরে থেকে জানি যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের দ্বারা দিন রাত তৈরি হচ্ছে। আসল জিনিষ তা নয়। আসল জিনিষ—দিন হলে তবে সূর্য্য ওঠে, রাত হলে তবে চাঁদ ওঠে। কালকে চিহ্নিত করার জন্য ওরা পুতুলের মত রাজা হয়ে থাকে। কাল, দিন ও রাত্রি প্রকাশ করলে তবে ওরা তাতে আধিপত্য পায়। এর দ্বারা কি পেলে? ঐ Law of intersection। "অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী।" এ অতি গুহ্য বিদ্যা। এঁকে না দেখলে অঘমর্ষণ হয় না, পাপ বিধৌত হয় না। পাপ মানে, আত্মতত্ত্বশূন্য জগদ্দর্শন। "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" আত্মহনন হল আত্মদর্শন-শূন্যতা। ওঁকে না দেখলেই রাত্রির কবলে পড়ে গেলে। চন্দ্রমার আধিপত্যে পড়লেই তুমি পাগল হবে, তোমার বিস্মৃতি আসবে। ঐ রাত তৈরি না হলে জীব-সৃষ্টি হত না। তোমরা রাত্রে ঘুমোও, সব বিস্মৃত হয়ে যাও, পাগল হয়ে যাও; মানে—অসংশ্লিষ্ট হয়ে যাও। স্মৃতি-

বিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে মানে, আত্মার সহিত অসংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছ। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" তোমাকে নিশায় মাঝে জাগ্রত্ত থাকতে হবে, তা হলে ধ্রুবা স্মৃতি ঠিক থাকবে। আর নিশার খপ্পরে পড়লেই স্মৃতি চলে যাবে; নিশায় জেগে থাকলে ঠিক থাকবে। যেখান থেকে নিশা তৈরি হচ্ছে, সেইখানে তুমি ঠেকে না থাকলে নিশায় জাগা যাবে কি? একটি ফুল এসে হাজির হল। সে কার বাগানে ছিল জানতাম না, আমার সঙ্গে তার কোন আলাপ-পরিচয় নেই। সে আমার ঘরে এল, তবে তার সঙ্গে সম্বন্ধ হল। প্রকৃত কথা কিন্তু তা নয়; গোড়া থেকে তার সহিত সম্বন্ধ আছে বলে সে আমার ঘরে এসেছে। আমি রাত্রে আছি কি না, তাই তাঁর ইতিহাস আমার কাছে অন্ধকারে ঢাকা। আমি বিস্মৃত পুরুষ, ওঁর সঙ্গে সম্বন্ধ-হারা হয়ে রয়েছি। জগতের সমস্ত এই রকম অন্ধকারেই তোমরা পাচ্ছ। কিন্তু যদি তোমরা নিশায় জাগ্রত সংযমী পুরুষ হতে, তা হলে "তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলুম" এই ভাষা ব্যবহার করতে। সেই জন্য পিতৃলোক ও তার ভূমি হল অন্তরীক্ষ, চন্দ্রমা তার জ্যোতি। চন্দ্রমা না হলে বীজক্ষেত্র জ্বলে যাবে। চাঁদের কিরণ অবলম্বন করে পিতৃলোক থেকে ক্রোমোজম নেমে আসে। চাঁদের কিরণ শীত। সে সমস্ত সংস্কারকে ধরে আছে। বর্ণতত্ত্ব বললে তোমাদের বিশেষ উপকার হবে, সংযোগটা ভাল করে খুঁজে পাবে।

এখন তোমাদের তৃষ্ণা জাগিয়ে দাঁড় করাতে পারলে হয়।

তৃষ্ণা বড় মূল্যবান্ জিনিষ। সে একবার জাগলে তাঁকে আকর্ষণ করবেই। জ্ঞানময়ের কথা হচ্ছে, সুতরাং জ্ঞান-ভূমিতে না দাঁড়িয়ে তোমরা কোথাও নড়বে না বা কিছু বিচার করবে না। আমরা জীবন্ত জ্ঞানকে খুঁজছি। ওঁকে যতক্ষণ না দেখবে, ততক্ষণ ছাড়বে না। এই কথা কখন ভুলো না, এটি একেবারে চাবি-কাঠি। 'দুর্গা' বলে হাউ হাউ করে কাঁদলুম; এতে খালি ভূতই সৃষ্টি করলে। দুর্গা এলেন ঠিক, তবে তাঁকে রাত্রির মধ্য দিয়ে দেখলুম কি না, তাই জড়ত্ব রচনা করলে। তোমরা দৃষ্টি ঠিক রেখ।

এই চাঁদখানা কি সুন্দর ছাঁকনি। তাপকে absorb করে, খেয়ে, আলোককে ধরে রাখে। প্রাণ হল অগ্নি, তার পর সোম, তার পর সূর্য্য। "অগ্নিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে স্থিতো রবিঃ।" যেমন বাক্য থেকে ভাব, ভাব থেকে মন। ভাব হল দীপ্তি, সে মনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। রস থেকে মনের প্রকাশ।

এবার পূজার সময় হোম করাচ্ছিলুম। বলছিলুম—বাক্‌রূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকেই আহুতি দিচ্ছি। বর্ণমালা মানেই দ্যুতিমালা। Alphabet মানেই অগ্নির দ্বারা তৈরি। কথা কইছিস মানে, আগুন জ্বলছে। যে অগ্নি তোমরা দেখ, এ প্রকৃত অগ্নি নয়, এ হল অগ্নির ভৌতিক রূপ; আর সে হল বজ্রাগ্নি। ভৌতিক অগ্নিতে ফুঁ দিলে সে কাঁপে; আর এ অগ্নি বিদ্যুতের মত, বজ্রের মত ঠেলে বেরোবে, কাঁপবে না। বড় ভয়ানক জিনিষ। "কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি!"

চোখ জ্বালার আলো চোখ জ্বেলে দিলে। রূপগ্রাহী আলো রূপ খুলে দিলে। ও বজ্রাগ্নি রং নিয়ে আসছে, বর্ণতত্ত্ব নিয়ে বেরোচ্ছে। তবে সব পুড়ে ছারখার হয় না কেন? চাঁদের বাল্ব (bulb) দেওয়া আছে বলে। বাড়বাগ্নি হল জলের ভিতরকার আগুন।

জ্ঞান-প্রকাশ অতিশয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ মানে কি? স্বচ্ছ সেই জিনিষ—যে আপনি আপনার দ্বারা প্রকাশ হয়ে রয়েছে; সুতরাং অস্বচ্ছতা বিন্দুমাত্র নেই। তার ভিতর দিয়ে সব যেতে পারে। যার যত এ রকম স্বচ্ছতা আছে, সে তত আলোকে নিজের ভিতর টেনে নিতে পারে। তার ফল হল কি? আলোর যে তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, সে সব হারিয়ে যেতে লাগল। কেন হারাল? আলো তীব্র বা তীক্ষ্ণ হয় তাপের দ্বারা, চাপের দ্বারা, ঘর্ষণের দ্বারা। স্বচ্ছের ভিতর কিছুই আটকায় না, কিছুই ঘর্ষিত হয় না, সবই এলিয়ে পড়ে। তাতে কি ফুটে উঠল? শশিমৌলি, অর্দ্ধেন্দু-কৃতশেখর—চাঁদের আলো তৈরি হয়ে গেল। আগুন আর আমাকে পোড়াবে না।

আত্মদেবতা শশিমৌলি হলেন। শশিতত্ত্বের প্রাধান্য দেখতে পেলে? যেখানে সংস্কারগুল বাঁধা আছে, সেখানে চন্দ্রমা খেলছে। ওখান থেকে বেরিয়ে ঘর্ষণের দ্বারা সূর্য্যের আলো হবে। যত ছেদন বা intersect করবে, বিষয়ের সঙ্গে ঘর্ষণের দ্বারা তত দীপ্তি ফুটবে। ক্রোমোজম আগে ছিল কোথায়? চাঁদের কোলে। তাই সে পোড়াবার মত নয়, খালি

রং নিতে পারে। বুদ্ধি তাপময়, প্রাণ শীতলতাময়; কিন্তু এই প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলছে। তেমন আলোকে মড়া আলো বলে বুঝতে পারি না—দীপ্তিমান্ মানে, জ্যান্ত আলো।

Cord বা মেরুদণ্ডের স্নায়ুধারাকে অবলম্বন করে যে শক্তি খেলা করে, এ সেই প্রবাহ। তাই স্নায়ুসূত্র ক্রোমোজম নয়, তাতে যে প্রবাহ চলে, তাই ক্রোমোজম। মূলাধার-চক্র যদি মনে পড়ে, প্রজাপতি যদি মনে পড়ে, তা হলে মূলাধারে একটা জীবনীশক্তি, একটা জ্যান্ত জ্যোতির্ম্ময় শক্তিকে দেখবে। মূলাধার-চক্র তা হলে একটা জ্যান্ত আলোর কেন্দ্র?

জীব যখন জাত হয়, তখন সে কি পুঁজি নিয়ে আসে? সংস্কার—মানে জ্ঞান। জ্ঞানের কি আয়তন? বাক্। কি শরীর নিয়ে সে সব জ্ঞান আছে? শব্দশূন্য বৃক্ষজ্ঞান থাকে? তা হলে যে আলো নিয়ে সে বেরোচ্ছে, ও একটা বাঙ্ময় আলো? তা হলে কতকগুল ভাষা প্রকাশ করার জন্য কামময় পুরুষ বেরোচ্ছে। "যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি…" যিনি আপনার দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি জানেন, এবং তাদের দ্বারা যিনি আপনার সংস্পর্শ জানেন, তিনি হলেন আত্মা। এই সংস্পর্শের জন্য আত্মা বেরিয়েছেন, এই জন্য আত্মা কামময়। তৃষাতুর একজন নীরবে তোমার বাড়ীতে আসছে; সে কোন্ ভাষা উচ্চারণ করছে? ভিতরে জল জল বলে সে চীৎকার করছে, জলের সংস্পর্শ চাচ্ছে। ক্ষুধাতুর আত্মা, তৃষাতুর আত্মা, এই রকমে বেরিয়ে আসছে।

আচ্ছা, জ্ঞান যখন ফুটে ওঠে, তখন একটা কিছু আলো তোমরা দেখ না ? সে বিষয়টার সম্বন্ধে যে অন্ধকার ছিল, সে অন্ধকার কেটে গিয়ে একটা অদৃশ্য প্রকাশ হল, অথচ সেটা আলো, এইরকম ভাবেব জিনিষটা সেইখানে অনুভব কর না ? সর্ব্বদা শশিমৌলি থেকে চাঁদেব কিরণ মূলাধাবে ঝবছে, এ কথাটা ঠিক হল ? বীজ সব চাঁদের আলো ধরে ধরে মূলাধারে আসছে। কি সাংঘাতিক কথা দেখেছ !

এখানে তুমি বসে আছ। বলে দিয়েছি, একটা গাছের ভিতর অনন্ত বীজ। একটা গাছ যেন বীজের স্তূপ। তেমনি তোমার এই শরীর বাইরে থেকে দেখতে একটা মাংসপিণ্ড, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটা বীজ-ধারা। চাঁদের আলো দেখতে পাওনি বলে, সেটা জ্বলেনি বলে, অন্ধকার দিয়ে আসছ ; পরে কি হবে, তা জান না। Cortex বা মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধাংশ থেকে medulla বা মস্তিষ্কের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত চন্দ্রমার জ্যোতি নেমে আসছে দেখতে পেলে ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে। ভাল যোগী হলে স্পষ্ট, তার চেয়ে কম হলে অস্পষ্ট, তার চেয়ে কম হলে স্বপ্নে। এ মূলাধারে ভৌতিক জনন-শক্তির বিকাশ সাধন করে, আর আমার মূলাধার থেকে বাক্ ও জীব দুই জিনিষই বেরোয়। ভূত অপসরণ এবং ভূত সংগ্রহ—প্রয়োজনীয় ভূতকে সংগ্রহ এবং অপ্রয়োজনীয় ভূতকে বার করে দেওয়া হল এর তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ, সমস্ত শব্দ-স্পর্শাদিকে আনবার প্রচেষ্টা, তাদের সঙ্গে সংস্পর্শের প্রচেষ্টা।

মূলাধারের ক্রিয়া ভয়ানক ক্রিয়া ; মূলাধার জাগ্রত হলে সব চক্র জাগ্রত হয়। সুতরাং এ চক্রকে একটা সামান্য চক্র বলে মনে করে বসে থেক না। শুধু আত্মজকে জাত করা শুক্রের কাজ নয়, শুক্র এবং ওজঃ শরীরকেও ধারণ করে রাখে। এর নাম hormone, এই হল পরিচালিনী শক্তি।

তা হলে ত সাক্ষাৎ ভগবতী ওখানে বসে রয়েছেন, যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমার জীবনকে বস্তুতঃ জ্বালিয়ে রেখেছেন, আমাকে দিয়ে প্রজনন করাচ্ছেন। তা হলে আমি দেবক্ষেত্রে পড়লুম না ? Spermকে শুধু একটা পোকা বলে না দেখে, তাতে অনন্ত শক্তি নিহিত রয়েছে, একটা অণুতে অনন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে, এই ই প্রকৃত দর্শন হবে না? গাছের বীচির ভিতর যেমন একটা গোটা বৃক্ষ রয়েছে, একটি সরষে যেমন শুধু একটি সরষে নয়, লক্ষ লক্ষ সরষে তার ভিতর আছে, এইরূপ অনন্ত বীজের আগার রয়েছে মূলাধারে। তুমি বাহ্য-মূর্ত্তি নিয়েছ ত জীব হয়েছ, অন্তর্ম্মূর্ত্তি নিয়েছ ত দেবতা হয়েছ। তাই তোমাদের দেবচক্ষু খুলে দিচ্ছি। এমন বিজ্ঞান তোমাদের বলে দেব, যাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে তোমরা থ করে দেবে। ছেদ-বিন্দুই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার জিনিষ। তোরা হয় ত বলবি—“শুনে কি হবে মশায় ?” শুনলে তোদের অন্তরে ভগবান্ ফুটে উঠবেন, আর তাঁকে খুজতে হবে না ; তোদের ভক্তি শ্রদ্ধা থাক্ বা না থাক্। কোন জিনিষের তত্ত্ব না জানলে তাতে ঠিক ভক্তি হয় না ; তবে ভাবের উচ্ছ্বাস হতে পারে।

আমি এত দিন এদের জড় বলে জেনেছিলুম। এখন দেখছি, —"ও বাবা, এঁরা সব দেবতা!" আর কি হবে? ভাত খেতে গিয়ে একটা ভাতে পেট ভরে যাবে। এইরকম সব জিনিষ, এমনি করে ভূতের পর ভূতকে নিতে হবে; কেন না, তোদের ক্ষুধার অন্ত নেই।

সীতা এক দিন হনূমান্‌কে খাওয়াতে লাগলেন। তিনি যা কিছু দেন, হনূমান্ সবই খেয়ে ফেলেন, ক্রমে সীতা যা কিছু রেঁধেছিলেন, সব ফুরিয়ে গেল। হনূমানের তাতেও ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না। তখন নিরুপায় হয়ে রামচন্দ্রের পরামর্শে সীতা একটি ভাত নিয়ে "নমঃ শিবায়" বলে হনূমানের মাথায় দিলে তবে তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়ে তিনি তৃপ্ত হলেন। দেবতত্ত্বে যেমন সংস্পৃষ্ট হওয়া, অমনি তৃপ্তি। তেমনি তোমাদেরও দারিদ্র্য অতিক্রম করার এই বিন্দুতে একটু ভৌতিক স্পর্শ দিয়ে এ জীবত্ব একেবারে তিরোহিত হবে অর্থাৎ সমস্ত ভূত তার সমস্ত সীমা হারিয়ে, সসীম আয়তন হারিয়ে অনন্ত আকারে পর্য্যবসিত হবে। তখন দেখবে, সমস্ত ভূত তোমাতেই অনন্ত অনন্ত আকারে আছে। জীবতত্ত্ব হল সীমাময় ও আপেক্ষিক তত্ত্ব। দেবতত্ত্ব অনন্ততত্ত্ব।

দেবতা কারা, এই জিনিষ তোমাদের এত করে বোঝাচ্ছি। এ শুধু জহুরিরা, যারা হীরা কষতে জানে, তারা বুঝবে। হাতে-কলমের রাস্তায় তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। সীতা যেমন 'নমঃ শিবায়' বলে হনূমানের মাথায় ভাত দিয়ে তার ক্ষুধা শান্ত

করেছিলেন, তোমরাও তাই পারবে। যে-সে জ্ঞান তোমাদের দেব না। এই উপদেশ শুনে দেবতার অভাব এখন কোথাও ঠেকছে? কাঠ, মাটি, কাপড়, জুতো, মানুষ, কোন্ জীবটা এখানে আছে, যার পিছনে দেবতা নেই? অন্ন-দেবতা মানে, অনন্ত অন্ন জ্ঞানময় একজন দেবতা। একটি ভাত বটে, কিন্তু তুমি তাতে দাঁড় করালে অন্ন-দেবতাকে, যে অসীম অন্নময়, তাকে। যারা দেবতা-সাক্ষাৎকার করেনি, তারা কস্মিন্ যুগে এর সমাধান করতে পারবে না।

২৪এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, সোমবার, সকাল।

জীবতত্ত্ব থেকে যখন আত্মতত্ত্বে যাও, জীবত্ব থেকে যখন ভগবানের দিকে যাও, তখন গতির ভিন্নতা বুঝতে পার? এক দিক্ থেকে আর এক দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছি। এ চলেছিলাম বহির্ম্মুখে, এ যাচ্ছি অন্তর্ম্মুখে—দুই বিপরীত গতি। যখন ভগবতীতে যাই, তখন তাঁর যে জ্যোতি, সে জ্যোতি অন্তর্ম্মুখী, না বহির্ম্মুখী? বহির্ম্মুখী। যখন যাই, তখন অন্তর্ম্মুখী; কিন্তু তিনি সর্ব্বান্তর, সুতরাং যখন তাঁতে যাই, তখন তাঁ থেকে যে সব জ্যোতি বেরোয়, সে সব বহির্ম্মুখী। সে স্থান নিস্তরঙ্গরূপে থাকাই উচিত, কিন্তু তত্রাচ তাঁর জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য পড়ে যায়। বলে দিয়েছি, ভগবৎসান্নিধ্যের একটি নিদর্শন

হবে, একেবারে তাঁর চখে চখে ঠেকে যাওয়া। জ্যান্ত একজনে উপনীত হলুম, এবং সে একজন স-দৃষ্টি, স-ঈক্ষণ। ভগবতী ঈক্ষণশীলা, তাঁর এই ঈক্ষণে গিয়ে পড়লুম। তিনি ঈক্ষণশীলা, এই কথাটি বড় মূল্যবান্। জানা, শোনা, স্পর্শ করা—এত রকম জানা আছে ত? তবু ঈক্ষণ বা দর্শন কথাই ব্যবহার করলাম। কারণ, দর্শনাত্মক শব্দটি বড় প্রধান জিনিষ। আর দর্শন বললেই কি দর্শন করছেন, এও তার সঙ্গে জড়ান থাকে। 'তদৈক্ষত'—কি ঐক্ষত? একটা কিছু আছে, যাকে দর্শন করলেন। সে হল—সংজ্ঞা বা নাম। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এর ভিতর ব্রহ্মের নাম ও রূপাত্মক দুইটি তত্ত্ব আছে। তা হলে ঘ্রাণাদির চেয়ে নাম আর রূপের প্রাধান্য দিলেন। তাঁতে আর সবও আছে, কিন্তু এই দুইকে নিয়েই প্রধানতঃ তিনি কাজ করবেন। এই যে আমার ভগবতী, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এঁ থেকে বিচ্যুত নই ত? কোন রকমে নয়! এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়!

এই সমস্ত জ্ঞান শেখার সঙ্গে সঙ্গে এর তলায় তলায় যদি না তোমাদের জ্ঞানময়ত্বের উৎকর্ষতা আসে, তা হলে কোন ফল হবে না। কাকে ডাকছি, সেই জিনিষে দৃষ্টি থাকা চাই। খালি রূপের দিকে আর নামের দিকে চলে গেলাম, তাতে কিছু হবে না; ও-সব দেখছি শুধু ওঁর মহিমা দেখার জন্য। কিন্তু আসলে ওঁর নিজত্ব দেখতে হবে। জড়কে ভেদ করে ওঁর ঈক্ষণতা প্রভৃতি সব দেখছি বটে, কিন্তু আসলে দৃষ্টি রাখতে হবে ওঁর জ্ঞানময়ত্বে। সচেতনতা বলতে সদা-জাগ্রত নিত্য-দ্রষ্টাকে

বুঝবে। জাল পেতে দিচ্ছি, বিশ্বময় কোথাও ওঁর একটা কুচিকে হারাতে দেব না। ওঁকে হারিয়ে যাওয়া মানেই ত মরা? ওঁকে যেখানে হারাব, সেখানে আমি মড়া। যে শক্তির দ্বারা আত্মা চৃণিত হলেন, ঠিকরে বেরোলেন, তার নাম হল উদ্ভিজ্জ-শক্তি। যে শক্তিতে তিনি লীলায়ন করেন, একেবারে ঠেকে থাকেন, তার নাম জীবজ-শক্তি। আর যে শক্তি দুই ভাগে খেলা করে, তার নাম অণ্ডজ-শক্তি; যেমন ডিমের মধ্যে পোষণ করার শক্তি, আবার বার করে দেবার শক্তিও আছে। এ কথা না বললে বর্ণতত্ত্ব বুঝবে না। কেমন করে বর্ণ বা আলো তৈরি হয়, আলো কেমন করে জ্বলে ওঠে, তা বুঝবে না; তাই বললুম।

অহং কি ব্যাপার, তা কাল বলে দিয়েছি। এক পিঠে শুভ্র শিব, আত্মত্ব, এক দিকে পঞ্চবর্ণের বর্ণত্ব। এক দিকে শুভ্র, এক দিকে যেখানে বর্ণতত্ত্বে ঠেকে আছি, সেখানে একেবারে বর্ণময়। 'আত্মতত্ত্বের সাহায্য ভিন্ন কোন বর্ণে-ই পরিচিত হবার জো নেই। গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি, লাল নীল সাদা, সুখ-দুঃখ, এ সব ধরতে গিয়ে আত্মা চূর্ণে চূর্ণে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যখন লাল দেখছি, তখন আর কালো দেখবার মানুষ নই। কূটস্থ পুরুষ হয়ে দশটা একসঙ্গে দেখতে পাব, সে যখন হবে, তখন হবে; কিন্তু এখন এইরকম। আমি ছাড়া আর কেউ দেখছে না ত? সব এই আমি দেখছি! ইস্! আমি আত্মায় ঠেকে সাদা হয়ে আছি। আমিই? আবার এই 'অহং' থেকেই পঞ্চ ঢেউয়ের উদয়, পঞ্চ তন্মাত্রা জাত হয়েছে। অহংয়ের উপলব্ধি ততক্ষণ

সম্পূর্ণ নয়, যতক্ষণ না হাত-পা ছড়িয়ে সে পাঁচটায় বিস্তৃত হচ্ছে এবং ভগবতী থেকে—সাদা থেকে ঐ পঞ্চবর্ণ পর্য্যন্ত, গোটাটা আমারই একটা বিস্তার, এই উপলব্ধি হচ্ছে। তা হলে আমি wavy বা ঢেউএর মত; আর আত্মা চূর্ণ। তা হলে 'আমি' ক্ষেত্র, উনি হলেন 'জ্ঞ'। আমি চলেছি একেবারে ব্রহ্মচক্রের কাছে। তোরা এঁকে আদর করে চল। খালি মস্তিষ্ক ব্যবহার করে শিখিসনি, সমাদরের সহিত শেখ।

আমি তা হলে দেখে নিলাম, আমি একটা প্রাণের কম্পনশীল ঢেউ। তুমি প্রাণ, আমি প্রাণের প্রাণ। ঠিক ইলেক্‌ট্রিক তার খাটানর মত, ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে জড় পর্য্যন্ত আমি জাল বিস্তার করলাম। এখন আত্মতত্ত্ব থেকে কোনও জিনিষ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে বাদ দিয়ে যাবে না। ভগবান্ আমার চূর্ণে চূর্ণে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, আজ জাল পেতে অন্তর্গতি বা conduction এর দ্বারা তাঁকে ধরে রাখলুম; তাঁর কোন গুঁড়োকেই আর আমায় ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে দেব না। এইবার লাল, নীল, হলদে আলো জ্বেলে দেব, সুইচ টিপলেই জ্বলে উঠবে। এ সব কথা তোমাদের কাজে লাগবে? কি রকম গভীর ক্ষেত্রে চলছি, তা নজরে পড়ছে? এই যে চলছি, এ চলা যদি দেখতে, তবে তোমার শরীরের সমস্ত স্নায়ুচক্র তোমার চোখে খুলে যেত। এই এখান দিয়ে চলে গিয়ে মাংসপেশী বানাচ্ছি, এইখান দিয়ে ঘুরে গিয়ে স্নায়ু বানাচ্ছি, বৈশ্বানর হচ্ছি। স্নায়ু হল গতিপ্রবাহ; বাইরের তার জড়-প্রকাশ, ভিতরের তার রেডিওর তার।

তড়িৎগতি ধরার তার ও রেডিওর তার, চোখ থাকলে এক সঙ্গে দুটোই ধরা পড়ত। জয় ভগবতি! মা! জাল পেতে রেখেছ, কেমন করে আমায় বিস্তার করেছ মা!

জ্ঞানভূমিতে না দাঁড়ালে এ সব কথার মজা পাবে? ইড়ার পথে বাইরের ধূলা এসে গায়ে ঢুকছে, পিঙ্গলার পথে বেরিয়ে বেরিয়ে বিকীর্ণ হচ্ছে, এই খেলা দেখতে পেলাম? তুমি আমার গায়ে ঢিল মারলে, আমি শান্ত ছিলাম, রেগে জ্বলে উঠলাম। সে ঢিল আমায় আঘাত দিলে, তাতে প্রাণের একটা ক্রোধমূর্ত্তি প্রকাশ হল। যদি ঐ ঢিল হঠাৎ পড়ে থাকে, তবে একটা যন্ত্রণা প্রকাশ হল মাত্র। দুয়েতেই একটা উৎক্ষেপণ রয়ে গেল। কিন্তু যদি আমি আত্মচক্ষুষ্মান্ হয়ে থাকতাম, তবে গায়ে ঢিল পড়ুক বা পায়ে দুটো ফুল দিক, দুটোকেই আমি টেনে ভিতরে একরসে পর্য্যবসিত করতে পারতাম। মহাদেবকে অশ্বত্থামা বহু অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে মারলে। তিনি সে সব একরসে নিলেন, ইড়াগতিতে সমান আদরে গ্রসিত করলেন, পিঙ্গলা-গতিতে বার করলেন না। যে তা পারবে না, তার সর্ব্বশরীর ও মনে পিঙ্গলা-গতি বাইরে বিচ্ছুরিত হবে। আমি এই যে কথাবার্ত্তা কইছি, এ কোন্ গতিতে হচ্ছে? পিঙ্গলা।

২৪এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, সোমবার, সন্ধ্যা।

জ্ঞানময়ী কে? তিনি কি আমায় দেখতে পাচ্ছেন? তাঁর ঐ দর্শনেই যে আমি জাত হয়ে রয়েছি। সে দর্শন এমন, যে দর্শনে আমি লালিত, পালিত, পুষ্ট, জাত ও বিধৃত—এমন দর্শন! কি কি দিয়ে উনি আমায় লালিত, পালিত ও পুষ্ট করছেন? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই-জাতীয় স্তন্যরস ঢেলে দিয়ে তার দ্বারা পুষ্ট করছেন। আর সজাগ সচেতন করে রাখছেন কি দিয়ে? আত্মত্ব দিয়ে, 'নিজে' এই জ্ঞান দিয়ে। শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞানক্রিয়া দিয়ে আমায় পুষ্ট ও পালিত করছেন। এ 'আমি' বড় বিচিত্র জিনিষ, না? 'আমি' যেখানে মায়েতে আত্মমুখী, সেখানে আমাতে আর মায়েতে 'ন স্বরূপো ন বিরূপো বা।' যদি একটু জোর দিই ত অমনি আমাকে অধিকার দিলেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি।' মায়ের বুকে থেকে একেবারে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলবার অধিকার দিয়ে রেখেছেন। তুমি হলদে, সাদা, রাঙ্গা,—যা হও, এই যে নিজত্ব দিচ্ছ, একে আমি কিছুতে ছাড়ব না। সর্ব্বাপেক্ষা এতেই সংলীন হয়ে থাকব।

আমরা শব্দে, রসে, গন্ধে, রূপে—যাতেই ছুটে যাই, তার তলায় তলায় মায়ের যে পরারূপ রয়েছে, সেই রূপে দৃষ্টি ফেরানই হল অন্ধের দৃষ্টি লাভ। তলায় তলায় এই রূপ দর্শন করতে করতেই আমরা যাই। আমার অব্যক্ত অংশ থেকে ব্যক্ত বিশ্বময় অংশ পর্য্যন্ত ভগবতী যে আত্মার রাশি বিধৃত করে রেখেছেন, সেই আত্মার রাশির কূটস্থরূপেই উনি

অবস্থান করছেন ত? এবং সর্ব্বত্র উনি ঈক্ষণময়? আচ্ছা, এ ঈক্ষণের—দর্শনের শেষ আছে? ব্যক্তে অব্যক্তে আমার যেখানে যা কিছু আছে, এই দর্শন-প্রভাবে সে সব বিধৃত হয়ে আছে? খালি এই জীবনের তিনটা বৃত্তি নয়, অনাদি স্রোতের সমস্তই। এই যে অহং—এই অহংটি অনন্ত এবং এ বহু আত্মত্বের আবাসস্থল হয়ে রয়েছে? দোদুল্যমান, তরঙ্গায়িত আমার এই অহংতত্ত্ব চূর্ণ চূর্ণ অনন্ত নিজবোধের দ্বারা দিগ্‌দিগন্তে বিধৃত? আমার মৃত্যু বলে যে অবস্থান আছে, তারও ভিতর এ দৃষ্টিময়? তা হলে মৃত্যু বা জন্মে এই অভয়া ভগবতীকে অবলম্বন করে যেতে আমার কোনও কষ্ট হবে না? স্বচ্ছন্দে যেতে পারব? তা হলে এই দর্শন ফুটলে মৃত্যু আর এই জীবন-শীলতা, এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে?

আচ্ছা, আত্মত্বকে চূর্ণে চূর্ণে বিধারণ করে রেখেছেন কেন বললুম? আমার এই অহংতত্ত্বের যে সংস্থান, তাকে নিজবোধ-রূপে চূর্ণ চূর্ণ করে ধরে রেখেছেন কেন বললুম? ইনি প্রতি জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং প্রতি জ্ঞান-ক্রিয়াই বৈচিত্র্যময়। প্রতি আত্মতত্ত্বই হল আশ্লেষ-তত্ত্ব; যদি আশ্লেষ না হত, তবে একসঙ্গে রাঙ্গা সাদাকে আলাদা আলাদা ভোগ করতে পারতুম না। অপরা প্রকৃতি হল সংশ্লিষ্ট-তত্ত্ব। অহংনামীয় যে অংশ, যা থেকে শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি ফুটেছে, সে হল সংশ্লেষতত্ত্ব; সে জড়িয়ে জড়িয়ে যায় না? এই যে এত চূর্ণ আত্মা এত অনন্ত অনন্তরূপে বিম্বিত হয়ে রয়েছে, এদের

একত্ব কোন্‌খান দিয়ে দেখতে পাব ? নিজত্ব নামে মায়ের যে মূর্ত্তি, সেইখান দিয়ে ? দেখ, এ একই ক্ষণে নিজে, অথচ বহু। তা হলে ইহাই হল ভগবতীতত্ত্বে প্রধান দ্রষ্টব্য। আমরা যখন নিজত্ব দেখি, তখন ঢাল-তলোয়ার জড়িয়ে নিয়ে দেখি। কিন্তু যদি খালি নিজকে দেখি, তখন আর কিছু দেখি না। তা হলে 'নিজ' বলে চেতনায় ঢুকলে আমার মৃত্যু ও জীবন একই নিজত্বের দ্বারা বিধৃত পেয়ে যাই। যদি পরাশক্তির দিকে জোর দিই, একত্ব দেখি। আর এই নিজে এক হয়ে বহু হচ্ছেন, এই দুই মূর্ত্তি ভগবতীতে দেখতে পাই। এইরূপ বোধে যে ভগবতীকে উপাসনা করবে, সে কি ফল লাভ করবে ? 'স একধা ভবতি, দ্বিধা ভবতি, বহুধা ভবতি।' নিজত্বেই এই ধর্ম্ম লাভ করবে, আপনাকে বহু করতে পারবে।

এই ভগবতী ! ভগবতী মানেই হল, একা থেকে আপনাকে বহু করতে পারেন। এই জন্য এই অংশটিতে জোর দিতে হবে। বৈচিত্র্যে ঢুকলে মালিন্যের ও বিমর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই দর্শন বজায় রেখে বর্ণতত্ত্বে যেতে হবে ; এ দর্শন ঢাকা পড়ে গেলে হবে না ; সেই জন্য এত করে বললুম। কেন না, গতি হচ্ছে মানে, একটা স্রোত চলেছে ; তার ভিতর তুমি দুটি রূপ দেখতে পার। একটি চূর্ণ গতি ; আর একটি, অপরা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তরঙ্গিত গতি। আত্মতত্ত্বের ধর্ম্মই এই, আপনাকে সর্ব্বত্র পূর্ণমাত্রায় নিয়ে চলেছেন ; আর উনি চলেছেন—সংশ্লেষে পূর্ণ, জুড়ে জুড়ে। আত্মা কূটস্থ মানে এ নয়;

যে, কতকগুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ অণ্ডে অণ্ডে জড় করে ইনি কূটস্থ, রাশিস্থ ; এ দৃষ্টি বহিরঙ্গ মাত্র। নিজাত্মক বোধের দ্বারা যে রাশি হয়, তিনিই হলেন কূটস্থ। সমস্তের সমষ্টি নারায়ণ নন। এটি ঈশ্বরের অঙ্গমাত্র। কূটস্থ অক্ষর পুরুষ হলেন তিনি, যাঁতে ক্ষরত্ব আর নজরে পড়ে না, খালি একত্ব হয়ে যায়। রাশি রাশি আত্মার স্তূপ বা ক্ষরের স্তূপ, এ অক্ষর নন ; অক্ষর তিনিই, যিনি বিশুদ্ধ নিজত্ব। সেই জন্য সমষ্টিজ্ঞানে ঈশ্বরজ্ঞান নিতে পারবে না। নিজত্বের সমষ্টিতে সমষ্টিত্ব দেখলে ক্ষরকেই দেখা হল। আত্মারও আত্মা যে বলি, সে এই হিসাবে বলি। রাশিস্থ হল ক্ষরত্ব ; আর ক্ষরসমষ্টির মধ্যে যে একত্ব, সেই হল অক্ষরত্ব। পুরুষোত্তমকে বুঝিয়ে দিলেই তিনটির বিশেষ পার্থক্য বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এই যে অক্ষরের কথা বললুম, এ কথা, আর এঁর ভূমামূর্ত্তির কথা, এ উভয়ই এক কথা নয় কি ? এর ভিতর মস্ত বিজ্ঞান আছে। প্রকৃতিতত্ত্বে যেমন 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' বুঝিয়েছি, তেমনি পুরুষতত্ত্বে এই বিজ্ঞানটি বোঝাচ্ছি।

তা হলে ভগবতীতে যখন গেলাম, তখন অক্ষর আত্মকে লক্ষ্য করা উচিত, না ক্ষরতত্ত্বে লক্ষ্য করা উচিত ? তার মানে কি এ নয় যে, আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আর আমি থাকব না, ভগবতীই দাঁড়িয়ে যাবেন ? আমার বসে থাকা মানেই 'ভগবতী' এই শব্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি। এখানে 'আমি' বলে আর কেউ বসে আছে ? আমি ত বহু আত্মার দ্বারা ঢালাই-করা, পুঞ্জীভূত একটি সমষ্টি। কিন্তু আমাকেও ধরে-বসে আছে

কে ? ভূমা বলতে বাইরের জগৎ বলছি না। বাহ্য জগতের অসীম বিস্তার নিলেও সে'ও ত জ্ঞানরাজ্য। শরীরটা ৩।০ হাত হলে কি হয়—এর ভিতরে জ্ঞানই সব ধরে বসে আছেন না ? এই ভগবতীর দ্বারা বিধৃত হয়ে চন্দ্র সূর্য্য বসে আছেন না ? একজনই চূর্ণে চূর্ণে অনন্ত আত্মা হয়ে বসে আছেন। একটা স্নায়ু, শিরা, উপশিরা, অণু পরমাণু, সবই নিজত্বের প্রভাবের দ্বারা ফুটিয়েছেন। গাছে ফুল ফোটা, যেমন পূর্ণমাত্রায় গাছের রস তাকে ভরে রেখেছে, তেমনি আত্মার চূর্ণে চূর্ণে নিজত্ব দিয়ে ধরে ভগবতীই এতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। আর কেউ নয়, ভগবতীই। অহং ব্রহ্মাস্মি।

২৬এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার।

আমরা যে ভগবান্‌কে পাই না, তার কারণ, তাঁকে পাবার আমাদের ইচ্ছা নাই ; আর সেই জন্য আমাদের বুলি হল—ভগবান্ একান্ত 'দুর্ল্লভ। 'ভগবতী' বলে তাঁকে দেখ্ ; তবেই তাঁকে একেবারে পেয়ে যাবি। এ কথার ভিতর কোনও অত্যুক্তি নাই, একেবারে ছাঁকা সত্য। আর তোরা মাথা ঘামাস না ; গুরু অবলম্বনে, নিঃসংশয়চিত্তে, সংশয়শূন্য হয়ে একেবারে মায়ের কোলে বসে যা। আমার এই কথার দ্বারা উৎপন্ন ভাব হয় ত পরে তোদের থাকবে না, কিন্তু যতটুকু থাকে, তাতে

এর বিজ্ঞান ত পেয়ে গেলি। সেই বিজ্ঞান পেয়ে, মা বলে একেবারে মায়ের কোলে বসে পড়িস। আগে যা দেখিয়েছি, আর এখন যা দেখাচ্ছি, এ দুয়ের পার্থক্য কি? আগেও ত আত্মত্বই দেখেছিস, তাতে আর এই ভগবতীতে তফাৎ আছে? আগে কিছু কিছু আন্দাজ করে নিতে হচ্ছিল। এখন কোন্ দিকে চোখ দিবি? এমন কিছু বলতে বাকী রইল কি, যা না বললে ভগবতী ফুটবেন না? সুতরাং আর শেখবার কিছু বাকী রইল কি? যদি আমার এই ক্ষমতা হয়ে থাকে যে, আমি জ্ঞানভূমিতে দাঁড়াতে শিখেছি, আর যদি ধারণা থাকে, আর ইচ্ছা থাকে, তা হলে কি কিছু বাকী রইল? আহাহা, আমার মা! মা! মা! আমার মা!

এই হল ওড়বার মন্ত্র; জীবত্বকে ম্যাজিকের মত উড়িয়ে দেবার মন্ত্র; জীবত্বকে নাস্তি করে দেবার মত ভগবতী আমার! এত সহজে, এত সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া কোথাও আছে কি? কাকে ভগবতী বলছি? এই এঁকে? এই যিনি আমার ভিতর এই শরীরকে আলো করে রয়েছেন, এঁকেই? নমস্তে!

"তোমার কাছে আমি সর্ব্বতোভাবে ঋণী," এ হল ভাবের কথা—কবির কথা। তবু যতক্ষণ জীব-ভাবে পড়ে আছি, ততক্ষণ বলতে হয়, টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ী, রূপ রস গন্ধ, সর্ব্বত্র আমরা তোমার নিকট ঋণী। মা গো, এখন আবার দেখছি, তোমার এই গুরুত্বের কাছে আমরা কি ঋণী! জীবনে তুমি কি গুরুত্ব

এনে দিলে। এঁকে যদি সজাগ করে বুকে রাখতে পারি, তবে মরণকে আর মরণ বলে দেখতে হবে না। "রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।" তোমরাও দেখতে পাচ্ছ, চন্দ্রের মধ্যে সূর্য্যের তাপ শোষিত হয়ে আলো থেকে যায়। কিন্তু সোমমধ্যে হুতাশন? অগ্নির একটি নাম হুতাশন; উনি সমস্ত অন্ন-সংহরণের কর্ত্তা। যা কিছু হুত, যা কিছু নিবেদিত হবে, ওঁর দ্বারাই সে সব সংহৃত হবে। অন্ন-সংহরণরূপ একটি শক্তি অগ্নিতে রয়েছে, এই জন্য আমরা আগুন জ্বেলে হোম করি। সোম হল সেই রস, যে রস অবলম্বন করে বীজ-সকল অঙ্কুরিত হয়, লোক থেকে লোকান্তরে গতিশক্তি পায় ও যায়, এবং সেখানে পুষ্ট হয়ে তদন্তর্গত যে বীজ, তাকে ফুটিয়ে তোলে। সোমরসের দ্বারা পুষ্ট ও পরিচালিত হয়ে, তার ভিতর একটি শক্তি এমন ভাবে পুষ্ট হলেই, সে অঙ্কুরিত হবে। মাটিতে বীজ ও অন্ন পেলে। হুত অশন করবার শক্তি অগ্নির ভিতর রয়েছে, তাই সে বৃক্ষের মধ্য দিয়ে মাটির রস শন্-শন্ করে টেনে নিতে লাগল। তা হলে অগ্নিকে যে অশন দেওয়া হচ্ছে, সে অশন অগ্নি সংহরণ করে চলেছে। তোমার ভিতর অগ্নি রয়েছে; সে ভাত সংহরণ করে শন্-শন্ করে যেখানে যাকে যা দেবার, তা দিলে। বীজ, শরীর গড়বার উপাদান, লম্বা হবার উপাদান, ইত্যাদি যে যে দেবতাকে যা যা দেবার, তা দিলে। হুত অশনকে সংহরণ করে পরিশোষণ করার শক্তিই হল হুতাশন। চন্দ্রের ভিতর থেকে রস এসে ঐ সব করে দেখেছি; সুতরাং

চন্দ্রের ভিতর হুতাশন রয়েছে দেখছিস? যা হুত হয়েছে, তা আহুত হল, নিবেদিতকে সংহরণ করলে। কি চক্ষুই আমাদের চলে গিয়েছিল!

Conductive বা পরিচালনশীল গতি হল hormos। উত্তাপ, গতি ও আলো, Thermos, Hormos, Luminous। বাকের ভিতর অগ্নির কোন অংশ বিশেষভাবে দেখতে পাও? তিন অংশই পাওয়া উচিত, তবেই 'বাক্ বৈ অগ্নিঃ।' সাধারণ মানুষের কথায় কোন্ জিনিষ দেখতে পাচ্ছ? বাক্ একটি জিনিষ। সে কিসে ভরপূর হয়ে বেরিয়ে আসছে? একটা ভাব বা বোধকে পেটে ভরেই ত বেরিয়ে আসছে? হুত ভাবকে গ্রহণ করেই কথা বেরিয়ে আসছে। তা হলে বাক্যের ভিতর হুতাশনত্ব রয়েছে; সোমত্ব ত রয়েইছে। একটা ভাব না জ্বেলে কথা আসে কি? একটা তেজ কথার মূর্ত্তি নিয়েছে, একটা আলো ফুটিয়ে ফুটিয়ে সে আসছে, এ ও দেখতে পাচ্ছি। আবার সে বিকীর্ণ হচ্ছে। শুধু আমাতেই সে পরিচালনশীল হয়নি, যাতে প্রযুক্ত হচ্ছে, সেখানেও ক্রিয়া করছে। একটা স্তুতিবাক্য তোমাতেও ভাব তুলবে। সুতরাং বিকিরণ বা radiation, পরিচালন বা Conduction আর দ্যোতন বা lumination, সবই বাক্যে আছে। হুতাশন থেকেই সোম বেরোয়, সোম থেকেই সূর্য্য বেরোয়। বাক্ একটা না একটা ভাবের বীজ নিয়ে বেরোচ্ছে। সহস্রারে তিনি শুধু প্রেরক; সেখানে তিনি সুখী দুঃখী হলেন না। কিন্তু যা প্রেরণ করলেন, তাতে সুখ দুঃখ জন্মাবার শক্তি

দিয়ে তাকে বার করলেন—যা প্রযোজ্য হল, তাতেও, যাতে প্রেরণ করলেন, তাতেও। বেদন ফোটাতে ফোটাতে, আলো জ্বালতে জ্ব'লতে তেজ বেবোচ্ছেন। বেদনেব আলো জ্বালতে জ্বালতে, অপরকে আঘাত করবার বেগ নিয়ে. তেজ নিয়ে অব্যক্ত তেজ আসছে। সূর্য্যের ধর্ম্ম হল তাপ-প্রধান, ঘর্ষণ প্রধান, সংঘাত-প্রধান বিকিরণ। বেদন হল তরঙ্গগতি-প্রধান, আপনাকে জ্বেলে জ্বেলে, আলো বার করে করে দুলে দুলে চলেছে।

খালি কথা আর জ্ঞানভূমি, এই ত আমাদের পুঁজি ? বাস্! এর দ্বারাই জগৎ রচিত হয়, ভাঙ্গা হয়, ভোগ হয়। আমার সমস্ত সার্থকতা এর উপর নির্ভর করছে। আত্মত্ব সকল বস্তুর আদি, তেমনি আত্মত্ব থেকে যে প্রথম শব্দটি বেরোয়, সেই হল আত্মত্বের প্রথম গতি। কথা কয়েছি মানে, নিজেই যাচ্ছি। শক্তিত্বের বীজরূপে মূলাধারে মা নিহিত রয়েছেন। এখান থেকে যে বেদন উঠবে, মূলাধার থেকে সেই পরিমাণে "সেই" জাতীয় শক্তি না বেরোলে কোন কিছু ভাব বা কোন কিছু শক্তি-প্রকাশ হবে না। অগ্নিস্থান হল মূলাধার-কেন্দ্র। পৃথিবীর তেজ হল অগ্নি, অন্তরীক্ষের তেজ চন্দ্রমা, দ্যুলোকের তেজ সূর্য্য। সত্তা এই জ্ঞানই, প্রকাশই হল তেজোময়। কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ল মানেই—তার থাকাটাই প্রধান ভাবে ফুটে উঠল।

কুণ্ডলিনী সর্ব্বদাই জাগ্রত হচ্ছেন। তাঁকে জাগ্রত কর বলা মানে, তাঁর ঐ জাগরণ লক্ষ্য করা। জ্ঞানেতেই সমস্ত আছে ;

তুমি খালি আবিষ্কার করলেই তোমার দৃষ্টি ভঙ্গিমা বদ্‌লাল, অন্তর ও বাহ্যদৃষ্টি পাল্টাতে থাকল। তখন তুমি কখন দেখলে —আমি ক্ষর, কখন একেবারে অক্ষর; কখন নিজেকে দেখলে শিব-শক্তিময়; কখন অন্ধকারে ভূত প্রেত খেলা করছে। ইহাই ত জ্ঞানতত্ত্বের সুবিধা। কোন কিছুর জন্যই দু চার ক্রোশ দূরে যেতে হবে না; সবই একেবারে স্বস্থ, অথচ হারান। আমি আমার বাইরে, এ কি কখনও হয়? এ অসম্বদ্ধ প্রলাপ, অথচ এইটি হবার সামর্থ্য তাঁতে রয়েছে। এমন যুক্তি-বিরুদ্ধ, নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটাবার সামর্থ্য ওঁতে আছে। কি অবাধ এ শক্তির গতি, বাধা মোটেই নেই। এই জন্যই এঁর নাম ভগবতী— সব করতে পারেন। ভগবৎতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে 'এইটি তাঁতে হয় না', এমন কথা বলতে পারবে না। আশ্রয় নেবার মা বটে, নিশ্চিন্তে নিঃসংশয়ে আশ্রয় নেবার মানুষ বটে!

২৭এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার।

আমি যে উদ্ধার পেয়েছি, সে শুধু মায়ে লেগে ছিলুম বলে। আমি কোনও বাহ্যানুষ্ঠানের কঠোর অনুশাসনের ভিতর দিয়ে যাইনি। যদি কিছু পেতে হয়, তোমারই ভিতর দিয়ে পাব, এই বলে মাকে ধরে ছিলুম, মায়েতে লেগে ছিলুম। কঠোরতায় শ্লথ হওয়া উচিত, তা আমি বলছি না; কিন্তু তোমাকে পাওয়া

ছাড়া জীবনের আর কোনও সার্থকতা নেই, এই জ্ঞানে তোমরা নিজেকে টেনে রাখ। এইখানে জোর দিতে হয়। আমার জীবনে এই জিনিষের বড় বেশী মূল্য পেয়েছি। ধোপার কাপড় বা এটা-ওটা প্রভৃতিতে সাময়িক ভাবে নজর দিতে হয়; কিন্তু আসল জিনিষ হল ঐ কথা। এ বড় কম তপস্যা নয়। এই যে তোমরা নিত্য ছুটে ছুটে আসছ, তাঁর কথা শোনবার চেষ্টা করছ, এতে যারা ভগবৎ-মন নিয়ে আসে, ঠাকুর-ঘরে বসে ডাকার চাইতেও তাদের এই তপস্যা বড়।

গাছের যে চেতনা এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া আছে, এ কথা মহাভারতের শান্তিপর্বে ভাল করে বলা আছে। মনুসংহিতাতেও আছে যে, "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" আমি 'আমার বহিঃ' বোঝাচ্ছিলুম না? এ তত্ত্ব কি অদ্ভুত তত্ত্ব, কি অবাধ স্বাধীনতা! 'বহিঃ' এই শব্দে যখন জোর দিলাম, তখন 'আমি' 'আমার' এসব ঢাকা পড়ে গেল। বহিঃতে মন্ত্রচৈতন্য হল; সেখানে বাস্তবিক 'বহিঃ'-রূপ ভূতি হল। তখন 'বহিঃ' আর শুকনো রইল না, আত্মরসের হার্দ্দ হাওয়ায় মাখা হয়ে গেল। আমার 'বহিঃ'তে বহিঃ বজায় রইল; কিন্তু নিজের সঙ্গে হার্দ্দ রসের তরঙ্গায়িত খেলা চলতে লাগল। হৃদয় খেলান মানেই 'আমার' বলা, মমত্ব লাগিয়ে বলা; এর কমে 'আমার' বলা হয় না। তার পরে বললাম,—'আমিই বহিঃ'; সেখানে 'আমি'কে চালিত করলাম। দেখ, যাকে একেবারে 'বহিঃ' বলে দেখেছি, তাকেই একেবারে 'আমি' বলে দেখলাম—চেতন-

তত্ত্ব এমন! এদিক্‌কার তত্ত্বে যেটা সাদা, সেটা সাদাই থাকে, কালো কালোই থাকে, তার অন্যথা কখন হয় না। কিন্তু চেতনার বলা মানে, তাই হয়ে যাওয়া; সুতরাং বহিঃ না হয়েও বহিঃ হয়ে গেলেন। আমার 'বহিঃ'তে আর আত্মত্বের 'বহিঃ'তে একটা রাস্তা তৈরি হল। তার পরে 'আমি বহিঃ,' যুগপৎ বিপরীত মেরুতে বিধৃত হলেন। আমি যেমন শরীরকে নিয়ে খেলা করি, তিনি বহিঃকে নিয়ে তেমনি খেলা করতে লাগলেন। দুই বিরুদ্ধ জিনিষকে একত্র সমাবেশ করে সমান-ভাবে দুইকে এক সঙ্গে পাওয়া—বিরুদ্ধ পর্য্যন্ত যখন আমার অন্তর্গত হয়ে গেল, তখন সেটা অসীম হয়ে গেল। এ কি শক্তি! কি অপূর্ব্ব! তোরা খালি দেখ্, অন্য তৃষ্ণাশূন্য হয়ে যাবি। কি আশ্চর্য্য পুরুষ এই ভগবতী! একমাত্র এঁতে ঢুকে যাওয়া ছাড়া, এঁকে কোন রকমে, কোন দিক্ দিয়ে বিজ্ঞাত জিনিষ বলে দেখার উপায় নেই, বিষয়াধিকারের মত পাবার উপায় নেই। একমাত্র আত্মমার্গ দিয়ে যদি না যাও ত খালি স্তব্ধ, বিমূঢ়, বিচূর্ণ হয়ে যাবে; নিজের অস্তিত্ব খুঁজে বার করতে পারবে না। শুধু প্রত্যক্ষারগম অংশটুকু ধরে ওঁতে ঢোকা, আর কোনও দিক্ দিয়ে রাস্তা পাবার জো নেই। তাই এই রাস্তাটি এত সহজ স্বচ্ছ করে রেখেছেন। বিশিষ্টভাবে তাঁর কোন ধর্ম্ম নেই; তা না হলে আমার ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে বাধা উপস্থিত হত। তাই তিনি একেবারে নির্লেপ, নির্গুণ। সেই নির্লেপ নির্গুণ ভাবে সেতু হয়ে আমাকে আর ভগবান্‌কে,

যুক্ত করে রেখেছেন। আমার চক্ষু তাঁর রূপে, আমার শ্রোত্র তাঁর শব্দে, আমার নিজত্ব তাঁর নিজত্বে যুক্ত। আহা! আয় মা! এইখানে যুক্ত না থাকলে অন্য জোড়ায় কোন লাভ হত? এ রকম যোগ হত? এ একেবারে আদি-নাড়ীতে, আসলে যোগ।

জ্ঞান—এই কথা বলতে গিয়ে কি একেবারে জড় ভূত-জ্ঞানের বাইরে পড়? ভূতের বাইরে যেতে পার, কিন্তু ভূত-জ্ঞানের বাইরে যাওয়া শক্ত। ততটা দরকার হয় না। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য—ভূতে ভূতে আত্মাকে দেখলেই যথেষ্ট হল; এর বেশী যেতে হয় না।

যখন তোমরা বল—এখানে আত্মা রয়েছেন, এখানে জ্ঞান-স্বরূপ রয়েছেন, তখন তাঁর এই রকম আশ্চর্য্য মহিমময় রূপের জ্ঞান নিয়ে বল, না অমনি অমনি বল? মনের তৈরি সাপ আর হার্দ্দ সাপ—যাতে হার্দ্দ সংস্কার ফুটে উঠেছে, এ উভয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আত্মাকে জুড়লে ত সত্য সত্য হয়েই গেল। যখনই তোমরা জ্ঞান শব্দ উচ্চারণ করবে, তখনই মন, হৃদয় ও আত্মা, এই তিন প্রকার আলোর একটিকে ছেড়েও তাঁকে দেখবে না। একেবারে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হলে যে রকম স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার জেগে ওঠে, সেই রকম সত্য ব্যবহার জেগে ওঠা চাই। ভগবতি! আহা!

এই যে রূপ রস ইত্যাদি আকারে জগতের প্রকাশ, এতে তাঁর থাকা উপলব্ধি আপনাকে কত ঘনীভূত করতে পারে, তাঁর

থাকার প্রান্তদেশ কোথায়, তাই দেখা যাচ্ছে: 'আমি আছি', এই থাকার উপলব্ধি একেবারে পঞ্চ তত্ত্ব পর্য্যন্ত নেমে আসে, যার নাম হয়েছে জড়; জ্ঞানক্রিয়াই ঐ জড় আকারে একেবারে নিধন প্রাপ্ত হয়। জড় তৈরি হল মানে, উপলব্ধি এত দূর নেমে এসেছে যে, ক্রিয়াটা একেবারে স্থাণুত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি ত আছেনই। একদিকে তাঁর এই থাকাকে তিনি বিশেষ করে কখন উপলব্ধি করেন, আর একদিকে আছি না আছি, এ প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না, এমন আনন্দ-স্বরূপতায় থাকেন। থাকাকে উপলব্ধিতে আনাই হল জগদ্বৈচিত্র্য রচনা। 'আমি আছি' নামে থাকা নূতন করে তৈরি হল না; থাকা ছিলই। তবে একটা জ্ঞানপ্রকাশকে নূতন করে গড়ে তুললাম। 'থাকা' জিনিষ উপলব্ধি করতে হলে তাকে এতটা নিধন প্রাপ্ত করান চাই। উপলব্ধি এত জোরে যতক্ষণ বাহ্য ভাব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ বুঝতে হয়, সে উপলব্ধি দুর্ব্বল উপলব্ধি। 'আছি' বলে প্রথমে থাকার একটা তেজ আনলে, তার পরে সেই থাকায় একটা রস এসে গেল; এই রস হল প্রাণ। সেই রস তখন থাকাকে পুনর্গঠন করলে, চেহারা দিলে, মূর্ত্ত করলে, দৃশ্য রচনা করলে; তাতে মন তৈরি হল। থাকার যে তেজ ও রস, এ উভয়ের একটা সীমা, আয়তন, ছবি বা মূর্ত্তি তৈরি হল। তার মানে, ভিতরে জগৎ তৈরি হল। এখানেও কিন্তু থাকা নিরস্ত হল না। ঐ আলোকচিত্র যেখানে শেষ হল, সেখানে প্রান্ত-সীমা রচনা করলে। একটা শ্মশানভূমি জ্ঞানের ঐখানে রচনা হল, যেন

জ্ঞান ওখানে থেমে গেল, একটা মহাশূন্য রচনা হল। থাকার সীমা যদি নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল, তার পরে কি রচনা হল? সে শূন্য নয় কি? মন পর্য্যন্ত গিয়ে আমি যদি বলি, এর পরে অস্বামিক ভূমি অর্থাৎ আমি আর এর পরে নেই, তবেই মহাশূন্য রচনা হল না? এইখান থেকে পঞ্চীকরণ আরম্ভ হল। আমার থাকাকে আমি যে ভাবে নিলুম, তাতে তার ভিতর শব্দ-স্পর্শাদি সব জ্ঞান আছে, পঞ্চতান্মাত্রিক জ্ঞান আমার ঐ থাকার ভিতর তৈরি হয়ে গেছে; তবেই না মন তৈরি হয়েছে। পঞ্চ-তন্মাত্রা যতক্ষণ না আমিত্বের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, ততক্ষণ আমিত্বকে দেখা ঠিক হয় না। 'থাকা' নিজবোধে আশ্রয় নিয়ে, পঞ্চ তন্মাত্রার ময়ূরের লেজ পরে এই যে তার অবস্থিতি, এর নাম 'আমি'।

আমার ভিতর যখন আমার এইরকম 'থাকা' মূর্ত্তি তৈরি হয়, তখন তার নাম হয়—বাক্ প্রাণ মন। আমার যে শূন্যতা অর্থাৎ এই প্রান্তের পর যে বহির্ভূমি, সেই ভূমিতে জীব আমরা নিজেকে দেখতে পাই না; কেন না, আমরা আদি ও অন্ত-যুক্ত জীব। কিন্তু যিনি অনাদি জীব, তিনি জানেন যে, ঐ বাহ্য শূন্য-মূর্ত্তিও আমি, আমিই আমার বহিঃ হয়েছি, শূন্য হয়েছি। তা হলে ভিতরে রইল তন্মাত্রা। আর তন্মাত্রা 'বহিঃ'তে প্রক্ষিপ্ত হলে "আমার বহিঃ" বলতে পার না। তিনি তন্মাত্রাকে অতিক্রম করেও বহিঃকে প্রসার দিলেন। তা হলে তন্মাত্রার বাহ্যে প্রক্ষিপ্ত যে রূপ, তার নাম হল পঞ্চ তত্ত্ব। শব্দ ও রসাদি-

রূপে যে তন্মাত্রাকে ভোগ করছিলাম, আমিত্বের লেজ বাড়িয়ে সেগুলিকে যদি আত্মগত করে নেওয়া যায়, তা হলে সেগুলি তত্ত্ব নামে অভিহিত বা প্রসৃত হয়। বহির্জ্ঞানে পড়ে, সেখানে পঞ্চ তন্মাত্রা প্রক্ষিপ্ত হলে, তবে তার নাম হল পঞ্চ তত্ত্ব। থাকাটি কেন অত জড়ত্ব পেলে, ঘন হয়ে গেল, বল দেখি? সে ছিল ত জ্ঞানস্বরূপ; তবে অত জড়-শক্তি-মূর্ত্তি কেমন করে পেয়ে গেল? আমি বহিঃ হলেও বহির্ম্মূর্ত্তি বাহ্যমূর্ত্তি। আমি চেতনময়, আমার বাহ্য; সুতরাং জড়ত্বকেই বেশী জোরাল করা হল। আমার বাইরে মানে, চেতনার বাইরে। যদিও সে আমিই, কিন্তু আমার বহিঃ নামে চেতনত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও চেতনত্ব তার ভিতরে ঢাকা পড়ে গেল, অপ্রধান হল; জড়ত্ব বলশালী হল। এখানে জড়ত্ব মানে—জড়-শক্তিত্ব জড়াকারীয় শক্তিত্ব। শক্তিত্ব এইরূপে বহির্জ্ঞান আশ্রয় করে সঞ্জাত হয়। আমার থাকা এত মজবুৎ। কিন্তু যতক্ষণ সে আমার চেতনতার অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার শক্তিত্ব দেখাই যায় না। গায়ের জোর আছে ত আছে; কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাকে দেখান যায়। থাকাটি ভিতরে থাকলে তার শক্তিমূর্ত্তি দেখা যায় না। কিন্তু ডাকাত তাড়াবার দরকার হলে সে বেরোয়। তেমনি ইনি যখন থাকার উপলব্ধি করতে চান না, তখন নিজবোধে আছেন। যখন নিজবোধ 'থাকা' বলে উপলব্ধি করলেন, তখন দেখলেন—থাকা মানে, অন্তর নামে থাকা, বহিঃ নামেও থাকা; তাতে বিপরীত মেরুদ্বয় রচিত হয়ে গেল।

শক্তির খেলা করলেই তুটো মেরু রচনা করতে হবে। বহিঃ রচনা না করলে একান্ত-বিরুদ্ধ মেরু রচনা হয় না। 'আমার অন্তর' বললেই সে আতুরে তুলালের মত আমার সঙ্গে মিশে থাকে। বহিঃ না করলে অন্তঃস্বরূপ আত্মার বিপরীত মেরু তৈরি হয় না। তা না করলে শক্তির খেলা ফোটান যায় না; তাই নিজেই নিজের আলো ঢাকবার মত পুল রচনা করলেন। তখন সেই থাকার কত তেজ! আমার 'বহিঃ আমি' হল পঞ্চ তন্মাত্রাময় জিনিষ। আমাব 'বহিঃ' বললেও এই পঞ্চ তন্মাত্রা দেখা চাই; অথচ তাব স্থান হল ভিতরে। সে বাহির পর্য্যন্ত যখন বিস্তৃত হয়, তখন বহিঃর ভিতর পঞ্চ তন্মাত্রা ঢুকল। বহিঃ মানে—জ্ঞানত্বের বহিঃ, ন জ্ঞানং। বহিঃ রচনার কৌশল থাকবে—জ্ঞানকে অ-জ্ঞান করাব কৌশল। তাই এই বহিঃতে রয়ে গেল পঞ্চ জড়শক্তি। কিন্তু অন্তর ও বহিঃ তুই-ই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তলা দিয়ে চেতনাতে ধবা রইল। এই জন্য থাকাকে উপলব্ধি করে ঐ থাকাব নাম দিলুম অচিৎজ্ঞান। 'থাকা' মানে, স্বতঃসিদ্ধ যে নিজ-প্রাপ্তি আছে, তা থেকে একটু অন্য হয়ে গেল; কাজেই নাম দিলুম অচেতন। কিন্তু পরমার্থতঃ চেতনাই রইল। মা যেন বলেন,—"তুই আমাকে নিজের নিজত্ব দিয়ে আদর না করলে আমি মরে যাব।" জাগতিক মা ছেলেকে বলে,—"তুই আমায় মা বলে ডাক, তবে তোর কথা শুনব।" এ মা বলেন,—"আমায় নিজে বলে ডাক্, নয় ত আমি অচিৎ। নিজে বলে ডাক, নয় ত আমি সাড়া দেব না।" হর হর!

নিজত্ব ভিন্ন আর সবই হবে জ্ঞানক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া কিন্তু শুদ্ধ চেতন নয়; ও তরঙ্গিত—বিক্ষুব্ধ হয়েছে, অচিদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়েছে। দোদুল্যমান ভূমি থেকে যে দেখা, সে দেখা একবার হবে, একবার হবে না। সে দেখা চাই না।

২৮এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

এই যে ঘর দ্বার দেখতে পাচ্ছিস, এ তোর বাইরে দেখছিস, না ভিতরে দেখছিস? প্রথম ধারণা হল বহিঃ। তার পর বললি, "না না, গুরুদেব বলে দিয়েছেন, আমার জ্ঞানই এই মূর্ত্তি ধরেছে, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি।" সুতরাং এ আমার 'বহিঃ' হল। কথাটার দুরকম মানে। এক, আমারই বহির্ম্মূর্ত্তি, আর এক, আমার বাহিরে। কথাটা বুঝতে কটমট লাগছে? আত্মা যেখানে, সেখানে জ্ঞানক্রিয়া হয় না। বহিঃ যদি অন্তর হয়, আমার বলে উপলব্ধি হয়, তবে তাতে আত্মসংযোগ আছে। আত্মারই শক্তি হচ্ছেন জ্ঞানশক্তি; সুতরাং 'আমার বহিঃ' এই কথাটা ভাল করে গভীর ভাবে ধরলে 'আমি বহিঃ' ধরতে পারবে। তোমাদের বার বার অভ্যাস করিয়েছি,—আত্মা বা নিজবোধরূপে আমি চন্দ্রের তলায়, সূর্য্যের তলায় এবং সকলের তলায়ই আছি। সুতরাং এ কথা বুঝা তোমাদের পক্ষে কিছু শক্ত হওয়া উচিত নয়। তা হলে জ্ঞানস্বরূপ 'নিজে' ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। এঁকে

সকলের তলায় তলায় ছুটিয়ে দেওয়া, ইহাই হল সাধনতত্ত্বে এগোবার প্রথম জিনিষ। একে হারালেই সব হারাবে। আর বলে দিয়েছি, বাক্ হল বহ্নি; বহ্নিতত্ত্ব আর বাক্ এক জিনিষ। কেন? "বহতি হুতম্ ইতি বহ্নিঃ।" যে দেবতাকে যা দেওয়া হল, তা ইনি সেই দেবতার নিকট বহন করে নিয়ে গেলেন। 'বৃক্ষ' কথাটির ভিতর কি আছে? বৃক্ষ জ্ঞান। আমি ঐ জ্ঞান তোমার ভিতর পূরে দিলাম। আমার জ্ঞানতত্ত্ব থেকে 'বৃক্ষ' এই নাম-রূপটি তোমার জন্য আহূত হল। আমার জ্ঞান দ্বারা তোমার জ্ঞানে উদ্দীপনা দিলাম। সুতরাং আমার কথা কওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে, আমার এই কথাটি হল আমার জ্ঞানের spirito-magnetic বা আধ্যাত্মিক চুম্বক-শক্তিময় গতি। কথা কওয়া কত বড় কাজ! এ একটা আধ্যাত্মিক বিকিরণ বা radiation। আমার জ্ঞান যদি তোমার বুকে ধাক্কা মেরে থাকে ত তার মানে, আমার আত্মাই গিয়ে সে ধাক্কা মেরেছে। জ্ঞান হল অদৃশ্য শক্তি—এখন বুঝলে?

এই যে প্রবহমাণ জ্ঞান, এই যে বহ্নির জ্বলন, এই হল প্রকাশের দিকে আদি-শক্তি। এটি ভাল করে ধারণায় না রাখলে আমার পরবর্তী উপদেশ ধরতে পারবে না। কথা বলছি মানে, জ্ঞানবিস্তৃতি এবং সেই জ্ঞান-বিস্তৃতিতে আত্মস্থিতি হচ্ছে। জ্ঞান, পদার্থের মত দৃশ্য নয়, কিন্তু সে প্রচণ্ড শক্তি; এই কথাটি সিদ্ধ হলে জগৎক্রিয়া যে প্রধানতঃ জ্ঞানক্রিয়া, তা বুঝতে আর কোন ধাঁধা থাকে না। স্নায়ু যেমন একদিকে অধ্যাত্ম

এবং একদিকে শারীর সংযোগ বিধান করে, তেমনি যে শক্তি মন থেকে বিকীর্ণ হয়ে জড়কে জড়িয়ে নিচ্ছে, এই পরিচালিনী শক্তিও অধ্যাত্ম ও জড়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

এই বিশ্বটা হচ্ছে—অধ্যাত্ম চুম্বক-শক্তির মহাসমুদ্র বা spirito-magnetic ocean। এর ঢেউয়েব শক্তি তোমার দেহেও আছে। এর রাস্তা কোনরূপে ব্যাহত নয়, একেবারে অব্যাহত। সুতরাং কথা কইলে তার তরঙ্গ উঠবেই, এবং ওরই স্রোতের আর একটু জড়-প্রকাশ হচ্ছে রেডিও, যাতে তোমরা এক জায়গায় বসে আর এক জায়গার গান শুনছ। আকাশ থেকে বায়ু, তা থেকে অগ্নি ইত্যাদি হয়েছে। এতে অধ্যাত্ম চুম্বকশক্তি-তরঙ্গের নানা আয়তন—দীর্ঘ, হ্রস্ব ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেল। আকাশতত্ত্ব বিপুল, বায়ুতত্ত্ব তার চেয়ে একটু কম, অগ্নিতত্ত্ব তার চেয়ে একটু কম, ক্ষিতিতত্ত্ব তার চেয়ে কম। কিন্তু সব ঐ এক তরঙ্গেরই—একেবারে বাক্য বা বাকেরই আয়তন। বাঙ্ময় পুরুষের মূলটা এখন বুঝে নাও। যেখানে যে দেবতা আছেন, বহ্নি তাঁদের খোরাক যোগাবেই; হয় শুদ্ধ সেই জিনিষ, কিম্বা একটা মিশ্রণ। যদি বলি, আকাশে ফুল ফুটেছে, তবে দুই দেবতার সংমিশ্রণ হয়ে সে বাক্য ছুটল। ভিতরের দর্শনে দেবতা ফোটে, বাইরের দর্শনে দেবতা ফোটে না। আকাশ অভিমানী দেবতা ও পুষ্প-অভিমানী দেবতার উদ্দেশে বাক্য হুত হল, তবেই আকাশে কুসুমের অভিজ্ঞতা হল; যদিও বাইরের পক্ষে এটি মিথ্যা। আবার বাইরেও সত্য হতে পারে; কিন্তু সেটা বাকের মাত্রার উপর

নির্ভর করে। স্বপ্নে যা জীবন্তভাবে তৈরি হয়, সেইরূপ তোরা জাগ্রৎকালে সজ্ঞানে চাচ্ছিস ; এ হলেই তোদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। বাক্‌প্রভাবে তা কেমন করে হয়, বুঝিয়ে দিচ্ছি। খালি দৃষ্টি রাখতে ও শিখতে হবে। জড়শক্তিতে আস্থাশীল ব্যক্তি ২০০ ডাইলিউশনের হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন কাজ হয় বলে মনে করে না, অথচ বিজ্ঞান-মতে ঐ ঔষধ জড়েও ক্রিয়া করতে পারে। তেমনি এই শব্দ-তরঙ্গ, বাক্‌তরঙ্গ, অধ্যাত্ম চুম্বক-শক্তিতরঙ্গ। তোমরা এখন সেই লোকে প্রবেশ কর, তোমাদের আর কিছু এখন করণীয় নেই। জীবত্ব ভুলে ঠিক সেই জ্ঞানে উপনীত হও, যে জ্ঞানে আমি আর সেই লোক ছাড়া আর কিছু নেই। সর্ব্বদা যদি তোমাদের পিছু পিছু কাপড় ধরে ভূতে টানতে থাকে, তা হলে কিছু হবে না। তাই বলছি, বাক্‌তত্ত্ব ভাল করে বোঝ। এ অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিষ! কেন না, মা আমাকে দিয়ে আর কিছু করাবেন না।

বাক্‌তন্ত্রের গোড়ার তত্ত্ব হল ওম্। বাক্‌তন্ত্রের বিজ্ঞান 'ওম্' এই শব্দের ভিতর নিহিত আছে। এই হল সর্ব্ব-বাক্‌তন্ত্রের মূল উপাদান। বিপুল বাক্‌শক্তি যখন ছুটছেন, তখন তাঁর আকার ওম্। যা হয়েছে, যা হচ্ছে, যা হবে, তৎ সর্ব্বং ওঙ্কার এব। প্রত্যেক বাক্যেই 'ওম্' আছে। সেই জন্য মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ পুটিত করে এঁকে বলা হয়। এই বাক্‌প্রকাশ আর কেউ নয়—স্বয়ং ওঙ্কার বেরোচ্ছেন। একটা আম কাঁঠাল, মানুষ, স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞান তোমার ভিতর ফুটল। একে ত্রিধা বিভাগ কর, এর ত্রিবৃৎ

দেখ। যেমন পুত্র বলেছ, অমনি একটি পুত্রাকারীয় ভাতি, দীপ্তি খানিকক্ষণ রয়েছে, আবার গলে যাবার মত হয়েছে, আবার গলিত হচ্ছে। এই তিন ক্রিয়া প্রতি জ্ঞানের ভিতর দেখছি। বাক্যই যদি জ্ঞান হয়েছে, সে ও ঐ ত্রিধাভাবে যাবে। নিধন রচনা হয়ে, পরিমিত হয়ে হয়ে, সসীমতা নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, না হলে সে এগোতে পারে না। পজেটিভ মেরুতে উৎপন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ নেগেটিভ মেরুতে ফিরে আসে; নয় ত গতিচক্র সম্পূর্ণ হয় না। এক পাশে নিধন, এক পাশে ফোটা—দুয়ের মাঝে এক ক্ষেত্র পেলুম, যার মানে—থাকা, স্থিতি; তার ফলে পরিমিত হয়ে হয়ে বেরোচ্ছে। তাই প্রত্যেক পদার্থ সীমাময়, আয়তনবিশিষ্ট। পরিমিত না হলে সে থাকে না, অনন্তে চলে যায়।

আমার কথা বড় ছোট তরঙ্গায়তন তৈরি করে; কেন না, আমি আদিশীল জীব। সাধারণ মানুষের মনে হয়, অমুক দিন জন্মেছি, এত দিন থাকব; তাই তার বলাটা বলতে বলতে একদিন নিধন হবে। কিন্তু অনাদিবান্ পুরুষের কথার তরঙ্গের আয়তন কত দূর হবে? এক তরঙ্গের আয়তন এই ধরে নেবে যে, আমি অনাদি, তত্ত্ব অনাদি। সুতরাং তার হওয়াটাই লম্বা হয়ে রইল। আর আদিবানের নশ্বরতা অধিক হবে, বিকাশ ম্লান এবং কম হবে। আদিহীনের বিনাশ কম, ভাস্বরতা বেশী। আদিবান্ মানুষের আলো জ্বলবে না; ধূম্রগতি, মানে—কৃষ্ণা গতি প্রাপ্ত হবে। তাই মন্ত্র এক শ বার, দু শ বার, লক্ষ বার বলতে হয়। ধাক্কা দিতে

দিতে, ঘষতে ঘষতে জ্বলে। কিন্তু যে অনাদিমান্ পুরুষ, তার ভাষা বা বাক্যের দৈর্ঘ্য হবে বড় ; ছোট ঢেউ নয়, লম্বা ঢেউ হবে। তা হলে 'ওম্' এই উচ্চারণ কোন্ জ্ঞানে বসে করলে ঠিক হবে ? অনাদি-জ্ঞান, সনাতনত্ব বা Eternity, এই জ্ঞানে বসে। ওঁ ছুটেছে—যে পরিমাণে দ্রুত ছুটবে, অব্যক্ত বা negative শক্তি ঐ পরিমাণে ভিতরে টানবে ; মাঝখানে বলবে—"দাঁড়া"। "দাঁড়া" বলে একটা সাম্যাবস্থা কষে ধরে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। তা না হলে সৃষ্টিও এগোবে না, মরণও দ্রুত হবে। জন্ম ও মৃত্যু, এই সীমাদ্বয়ের মাঝখানে যিনি ক্রিয়া করেন, তাঁর নাম হল প্রাণ। আকর্ষণীশক্তি, চুম্বক-শক্তি দুজনকেই টানতে চেষ্টা করছে। মাঝে ওঁ-নামীয় শক্তি ক্রিয়া করছে বলে পৃথিবী সূর্য্যের বাইরে ঘুরে ঘুরে চলছে। সূর্য্য টানছে, পৃথিবী পালাচ্ছে ; মাঝের চুম্বক-শক্তি পৃথিবীকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দুই মেরুর দুমুখী বিরুদ্ধ গতি মধ্যে একটা চক্রাকার গতি রচনা করছে। এই ব্যাপারকে নিজের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও। বলেছি, কথাই হল শক্তি। আমার কথা স্বল্পায়তন হয়, মরে যায় বলেছি। কিন্তু যদি আমি অনাদি-জ্ঞান থেকে 'ভগবতি!' উচ্চারণ করি, তবে আমার সৃষ্টি, স্থিতি ও ফিরে এপাশে আসা—এ সব দীর্ঘায়তন তরঙ্গে বা long waveএ বেরোবে ত ? সুতরাং ঐ তিনই নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে বিকশিত হয়ে পূর্ণভাবে ক্রিয়া করতে থাকবে। মৃত্যুও ক্রিয়া করবে ? মন্ত্র ঠিক ত ? আমার গোড়ায় সঙ্কল্প আছে। আমি কামময় পুরুষ হয়ে সঙ্কল্প

করেছি। একটা তেজ বা 'আমি' ফুটিয়ে রাখা চাই। মরণ চাই না বলে মরণকে ছোট করে দিলুম, স্থিতিকে বড় করলুম। সুতরাং বাক্য সঙ্কল্পময় হওয়া চাই। আগে সঙ্কল্প করে বাক্য উচ্চারণ করবে। কামময় পুরুষ, কামনা অনুসারে বাক্যের ফল পেতে অবশ্যই বাধ্য।

তা হলে কামনা মাঝের ওঁকারকে পরিচালিত করছে। মধ্যস্থান বড় করে, কামনাকে তেজের ভিতর চালিয়ে সৃষ্টি ও স্থিতিকে দ্বিগুণ শক্তি দিচ্ছে, আর মৃত্যুকে অল্প শক্তি দিচ্ছে। "যৎ কাময়তি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ করোতি, যৎ করোতি তৎ আপ্নোতি।" 'তৎক্রতুর্ভবতি' মানে, ভিতরে যজ্ঞশীল হওয়া, 'তৎ করোতি' মানে, বাইরের কর্ম্ম করা।

কামনা, প্রাপ্তব্যকে স্থূল বা বস্তু আকারে পরিণত করে রাখতে চাচ্ছে। এঁর নাম হল কামকলা দেবী। জড় ও অধ্যাত্মশক্তিকে গতিশীল করা, নিয়ন্ত্রিত করা—তারা কোথায় যাবে না যাবে, তা নিয়ন্ত্রিত করা, এ সমস্ত হল কামকলার বিধৃতি। যে কামময় পুরুষ আমার সহস্রারের ভিতর বসে আছেন, তিনি কামসুধা ঢেলে দিচ্ছেন। সেই পুঞ্জীভূত' কামসুধার নাম মহাশক্তি। কামই যাঁর অঙ্গ, তিনি মূলাধারে নেমে আসছেন। অসঙ্গের ভিতর দিয়ে আসছেন এবং হৃদয় দিয়ে ঢেউ খেলে দিচ্ছেন। সহস্রার থেকে রস নিয়ে মূলাধার-ভাণ্ডারে নামছেন, সেখানের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে হৃদয়ে ভোগ দিতে উঠছেন।

একটা কথা উচ্চারণ করবার আগে সঙ্কল্প করতে হবে;

আমায় সঙ্কল্পময় হতে হবে, কামময় হতে হবে, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হবে। এর নাম ভৈরবী—এর রব অতি ভীষণ, ভীতিপ্রদ! তোমরা কথার দ্বারা কি ভয়ানক জঞ্জাল রচনা করেছ দেখ। এ ভীষণ না? এখান থেকে ঠেলে কথাকে উপরে চালাতে পারলে আর ভয় হয় না। কিন্তু আমাদের বুক দিয়ে বক্-বক্ করে কথা বেরোয়; তাই এ ভীষণ। আমরা জগদ্ব্যবহারে, জড়ব্যবহারে অন্ধকার রচনা করছি, তাতেই এই বিভীষণত্ব। এর পরবর্ত্তী মূর্ত্তি হল ছিন্নমস্তা। হৃদয়ে ঢুকে মাথাকাটা হয়ে যাচ্ছি; আদি অন্ত জ্ঞান নেই। আত্মত্ব এই-রকম করে ঢুকছে না? ক্ষর পুরুষের হৃদিস্থিত চেতনার যে কামনা হচ্ছে, খপ্ করে তাতে ঢুকে যাচ্ছি। জ্ঞানবিমূঢ়তা যত বাড়বে, তমঃ তত তেজাল হয়ে বেরোবে, তত মূঢ়-যোনিতে পশু বা পশুবৎ জন্ম হবে। চালাকি করবার জো নেই। পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি খালি বর্দ্ধিত করবে; স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচিত্ত, স্বেচ্ছাচার—পশু এইরূপ হবে। তোমরা যে এই-সব জ্ঞান শ্রবণ করলে, এর দ্বারা পশু হবার হাত থেকে উদ্ধার পেলে। বাতাস জলে ঢুকলেই যেমন বুদ্বুদ খেলা করবেই, তেমনি জ্ঞান ঢুকলেই তোমার ভিতর আলোড়ন রচনা করবেই। আর জ্ঞানের সেবাপরায়ণ হলে ত কথাই নেই। যদি সত্ত্বাত্মক জ্ঞান হয়, তা হলে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদির যে লোকে বাস, তাই তোমাদের লাভ হবে।

জিনিষ হল মাত্র বাক্, এই কথা; কিন্তু তার ভিতরটা কি

অনন্ত দেখ। ইহা কল্পনা মাত্র নহে, ইহাই প্রকৃত সত্য—এই হল বিজ্ঞান; সুতরাং একে পরিহার করার উপায় নেই। অত্যন্ত মোটা মন যাদের, তারা এর তত মূল্য দিতে পারবে না। কিন্তু যারা জানে, জ্ঞানই আমার নিজত্ব, আমি নিজে জ্ঞান এবং জ্ঞানেরই বিলাস, তারই অদ্ভুত অদল-বদল হবে, সে জ্ঞানের অদ্ভুত লীলা দেখবে। আর যার জড়বৎ মন, সে একে অগ্রাহ্য করবে। যে যত নিজেকে জ্ঞানময় বলে দেখে নিয়েছে, তার কাছে এর তত দাম।

ঐ যে বহ্নির কথা বললাম, আধ্যাত্মিক আলো না নিয়ে সে কি বেরোয়? ও ত বয়ে যাবে; ও কি এমন কিছু না নিয়ে বেরোবে, যাতে আধ্যাত্মিক আলো থাকবে না? এই বহ্নিশক্তিই হল মূল জিনিষ। ও রাস্তা আলো করে যাচ্ছে, একটা তেজ নিয়ে যাচ্ছে, একটা তাপ, একটা বেগ, একটা তপস্যা নিয়ে ছুটছে—যার উদ্দেশ্যে বাক্য বলছি। এখন দেখ, আগে পেলে বহ্নি, পরে সোম এবং পূর্ণ প্রকাশ হলে, বস্তু ফুটে তৈরি হলে, সে হল সূর্য্য।

আমা থেকে একটা আলো বেরোল, বেরিয়ে তোমাতে স্থাপিত হল। সে সূর্য্যের মত একটা সৌরমণ্ডল তৈরি করে নিলে। এখন সে বৃক্ষত্ব ছাড়া আর কোন জ্ঞান ফুটতে দিচ্ছে না। সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আর যত-কিছু ধারণা গঠিত হবে। বৃক্ষনামীয় জ্ঞানের যে সূর্য্য উদিত হল, ওর দ্বারা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হবে। বাক্‌বহ্নি কি ভয়ানক জিনিষ! বহ্নি, সোম, সূর্য্য জ্বালতে জ্বালতে চলে যায়। না কি? আহা!

আমি এখন বাহ্য বস্তু চাই না ; চাই—ভগবতীকে, মাকে। আপনি সেই রাস্তা বলে দিন। রাস্তা একই। তখন শুধু হৃদয়স্থিতলোচন না হয়ে সহস্রারস্থিতলোচন হতে হবে। . হৃদয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—কামনার কেন্দ্র হৃদয়কে ভেদ করে যেতে হবে। বাক্ হৃদয়ের ভিতর দিয়ে চন্দ্রমা ফুটিয়ে সহস্রারে যাচ্ছে. যিনি সনাতনভাবে সেখানে উদয়াস্তহীন সূর্য্যরূপে ফুটে আছেন, তাঁর কাছে যাচ্ছে। আমার কামনা যদি ঐখানে চলে, তা হলে আমার বাক্ ঐ সূর্য্যকেই জ্যোৎস্না দেবে—ভূতকে দেবে না। তখন পৃথিবীর চেহারা কি হবে ? সূর্য্য যখন সোমপান করেন, তখন পৃথিবী অন্ধকার হয়—সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্যমণ্ডল জ্যোৎস্না পান করতে লাগলেন। সূর্য্য যেন চাঁদের দ্বারা অন্ধকারে ঢাকা রয়েছেন। আমরা সোমরসকে বুকের ভিতর দিয়ে জগতে ঢালি ;. তাই সে রস আমি পান করি ; আর উপরের দিকে ঢাললে তিনি পান করেন।

তাপাংশ হল radiation বা বিকিরণ, ছুটে যাওয়া। Conduction বা পরিচালন অংশ হল আপনার ভিতরে ধরে রাখা। বহ্নি ছুটে বেরোতে গেলেই আলো হবে। কথা বললেই আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকীর্ণ হবে। তাকে নিজের ভিতর যতক্ষণ ধরে রাখব, ততক্ষণ সে আমার প্রভাবে রইল। আলো বাইরে নিয়ে গেলেই তাপময় হল। আমা থেকে ঠিকরে বেরোলে ঘর্ষণ হল ; তাপযুক্ত আলো কর্ম্মপ্রধান সূর্য্য হল ; ভিতরে সে ছিল ভাবপ্রধান। তা হলে আমরা বসে আছি, আর এই

বিজ্ঞানটি দ্রুত খেলা করছে। তোমাদের বলেছি, তোমরা কখন জ্যোতিষ্মান্‌কে না দেখে জ্যোতি দেখিও না। দেখলে এমন দ্রুত খেলা, যা ফরফর ফরফর করে হচ্ছে, তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু যিনি জ্যোতিষ্মান্, স্থিতিশীল, তাঁকে ধরতে পারবে।

তুমি কি? তুমিও বহ্নিময়, সোমময় ও সূর্য্যময়। তুমি বাঙ্ময়। বাক্‌ই rabiation। তার মানে, ভাব ও কর্ম্ম, এ-সবের তুমিই একমাত্র কেন্দ্র। তুমি শুধু আত্মা শব্দের দ্বারা লক্ষিত নও; তুমি ভগবতী, অনন্ত শক্তির আধার।

Microcosm বা অণুজগৎ হিসাবে এই খেলা আমাতেও হচ্ছে। তোমার অঙ্গের সঙ্গে আমাব সর্ব্বাঙ্গ খাপ খেয়ে যাবে। তোমার আত্মা থেকে আরম্ভ করে স্থুল শরীর পর্য্যন্ত একেবারে খাপ খেয়ে যাবে। তুমি একেবারে ভগবতী; তুমি বহু সেজে বসে আছ। একেবারে তুমি! তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। কোটিসূর্য্যসমপ্রভাং কোটিচন্দ্রসমশীতলাং। হর হর, শিব শিব!

৩০এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার।

চিন্ময়ী মায়ের 'ত্রিগুণ', 'ত্রিগুণ' কথাটা তোমরা আজন্মকাল শুনে আসছ। ওর মানেও হরেক-রকমের শুনেছ—সৃষ্টি স্থিতি লয়, জ্ঞান ইচ্ছা প্রবৃত্তি, প্রখ্যা প্রক্ষেপ ইত্যাদি অনেক কথা আছে। কিন্তু এ সব কথায় তাঁকে ভাল করে বুঝা যায় না।

যে ভাবে হয় ত তোমরা ভাল করে বুঝবে, সেই রকম করে আজ তাঁর কথা বলছি।

চিন্ময়ী মায়ের 'আপনার দ্বারা আপনাকে জানা'-রূপ ধর্ম্ম বা সপ্রকাশ ধর্ম্ম—তাঁর এই স্বরূপ-ধর্ম্মের কখনও ব্যত্যয় হয় না। এই সপ্রকাশ ধর্ম্মের মহিমা তিনি নিজেই। তিনি নিজেই নিজের মহিমা বা শক্তি। আপনার দ্বারা তিনি আপনাকেই জানেন; এর ভিতর অন্য কোন শক্তি নেই, যার দ্বারা তিনি আপনাকে জানেন; সুতরাং এ শক্তি তিনি আপনিই হলেন। যে করণের দ্বারা জানা যায়, তাহাই শক্তি হল ত? সুতরাং তিনি আপনিই হলেন শক্তি। সেখানে আত্মার নিজবোধাত্মিকা মূর্ত্তিই শক্তি, নিজবোধরূপ নিজেই শক্তিমূর্ত্তি। এখানে শক্তি ও শক্তিমান্ এক, অভেদ; কোন পার্থক্য নেই। সেই জন্য এখানে শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে, জানা নামে একটা কার্য্য হচ্ছে, এরূপ বুঝা যায় না। আপনার দ্বারা আপনি বিজ্ঞাত হচ্ছেন, এতে তাঁর শক্তিত্ব বুঝা যায় না। এই যে জানা, আপনার দ্বারা আপনাকে আলো করে থাকা, এ থেকে পৃথক্ এঁর আর একটি বিশিষ্ট প্রকাশ আছে,—এ আমরা জগদাদি-রচনা দেখে বলি। তাঁর জগৎ-নামীয় খেলা প্রকাশ করবার কারণ কি হল?

নিজে আর কিছু জানুন বা না জানুন, তিনি নিজে একটি সত্তা ত? একটা অস্তিত্ব, 'থাকা' নামে একটা জিনিষ তাঁতে আছে ত? তাঁর এই 'থাকা' ভাবটিরই ব্যক্ততা ও বিলোপ হয়। কখন তিনি 'আমি রয়েছি' বলে এ 'থাকা' জিনিষটিকে নজরে

আনেন, ঈক্ষণ করেন, আবার কখন এই 'থাকা' ছেড়ে একটা আনন্দঘন সপ্রকাশরূপে বিরাজ করেন। তাঁর এই সপ্রকাশ-রূপে বিরাজ করা এক জিনিষ, আর 'থাকাত্ব'কে স্মরণ করা, ঈক্ষণ করা, প্রকাশ করা আর এক জিনিষ। একটা জিনিষ আছে মানে, সে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আছেই ; আবার সেই 'আছে'র একটা নতুন বা বিশেষ উপলব্ধিও আছে, যা নাকি স্বতঃসিদ্ধভাবে থাকাতে নেই। সুতরাং তাঁর সত্তা যখন তিনি উদ্বুদ্ধ করেন, তখন 'অস্মি' বা 'আছি' এই বোধটি ফুটে ওঠে, সে বোধ 'আছি' এই আকার নেয়। তিনি যখন 'জানন' বলে ক্রিয়াটির বিশিষ্ট ভাব জানতে চান, তখন সেই বিশিষ্ট ভাব বা জানাটি 'আছি' বলে উদিত হয়। জানাই হল থাকা। অস্তিত্ব-নামীয় উপলব্ধিটি তিনি যখন ফুটিয়ে তোলেন, তখন তা থেকেই যত কিছু জগদ্ব্যাপার ফোটে। তাঁর এই 'আছি' বলে জ্ঞান নূতন কোন পদার্থ নয়—একটি বিশিষ্ট উপলব্ধি, বোধ বা জ্ঞানক্রিয়া মাত্র। 'আমি আছি' এই বোধ, আর ঐ মাত্র আপনার দ্বারা আপনাকে জানছেন, এ উভয়ের কোন পার্থক্য আছে ? এখানে ক্রিয়া বলে কোন অনুভূতি নেই ; জানাতে ক্রিয়া বলে অনুভূতি আছে। ক্রিয়া বলে যদি অনুভূতি বেরোয়, তবে তার মূল হবে ঐ 'নিজের দ্বারা নিজেকে জানা'। 'নিজের দ্বারা নিজেকে জানা' এতে নিজত্বই ফোটে, এটা নিজেরই স্বধর্ম্ম। এই যে 'নিজে', যে নিজের দ্বারা 'নিজ'কে জানে, এই জানাটি হল পরাশক্তি। এ নিত্যই তাঁতে রয়েছে। আর এইটিকে অবলম্বন করে,

'থাকা' নামে একটি উপলব্ধি হয়। এ ঐ জিনিষই; ঐ 'থাকা' নামে স্তরটি অব্যক্ত ছিল, এখন ব্যক্ত হল। নিজত্বের ভিতর যে 'থাকা'-জ্ঞান লুকান ছিল, সেই জ্ঞান শুধু প্রকাশ হল; বস্তুর কোন পার্থক্য নেই। মূলতঃ বস্তু এক, শুধু উপলব্ধির তারতম্য —ফোটে আর ওঠে।

এই 'অস্মি' জ্ঞান আত্মাশ্রয়ী হলেও, আত্মারই রূপান্তর হলেও এর সীমা কত দূর? অনন্ত। 'নিজের দ্বারা নিজেকে জানা'-রূপ জ্ঞান, 'অস্মি' উপলব্ধির রূপটি ফুটিয়ে রেখে দিচ্ছে, আর এত জোরে সেইটিকে ফুটিয়ে রাখছে যে, যেমন আত্ম-উপলব্ধিতে 'অস্মি'-রূপ উপলব্ধি অপরিস্ফুট হয়ে যায়, তেমনি 'অস্মি' উপলব্ধির শেষ সীমা হল—'আত্মা' বলে উপলব্ধি যেখানে শেষ হয়ে যায়। 'অস্মি'র জন্ম হল; এখন এর জন্মে থাকার চরম প্রকাশ কিরূপ হবে? 'অস্মি' উপলব্ধিটি আত্মার ভিতর ঢুকলে যেমন সে আছে, কি না অছে দেখা যায় না, তেমনি এদিকে ঐ 'অস্মি'ও নিজবোধরূপ জিনিষটিকে এমন ভাবে গ্রাস করলে যে, নিজবোধ আছে, কি না আছে দেখা যায় না। 'অস্মি'র প্রথম নাম হল সত্ত্বগুণ, শেষ নাম হল তমোগুণ। এর কোন দৃষ্টান্ত আছে? নিদ্রাকালে জ্ঞান এমন ভাবে আপনাকে আপনি গ্রসিত করেছে যে, সেখানে সে আপনি আছে কি না, তা জানে না; এই হল জ্ঞানশক্তির তামসিকতা। আর জ্ঞান এমন ভাবে উজ্জ্বল হয়েছে যে, 'অস্মি'-জ্ঞান একেবারেই নেই, খালি আত্মজ্ঞান আছে। 'অস্মি' জ্ঞানটি আত্মজ্ঞানের স্বরূপও নয়,

বিরূপও নয়। তাই আমি 'আত্মা' থেকেই জাত হয়েছি বলে নিতে হবে, এই কথা গত রবিবারে বলেছি। ঐ 'আমি'র প্রথমে সত্ত্বগুণ, শেষে তমোগুণ। 'আমি' নিমীলিত হলে গুণের অব্যক্ত অবস্থা। আপনাকে আপনি জানছি, এ অবস্থায় এ তত্ত্ব হয়েছে অব্যক্ত-তত্ত্ব, প্রকৃতি-তত্ত্ব। 'অস্মি' হল—নিজবোধের 'নিজ' নামীয় উপলব্ধির আর একটা অংশ। এই 'অস্মি' 'নিজের' ভিতর ঢুকে গেল মানে—প্রকৃতি অব্যক্ত হল। প্রকৃতি শব্দের অর্থ হল—তিনি প্রকৃষ্টভাবে যা করেন। 'অস্মি' বলে তিনি যেমন বেরোলেন, এ অংশ একেবারে আত্মার নিকটস্থ ; আত্মসান্নিধ্য-বশতঃ এইখানে তিনি সত্ত্বশীল—প্রকাশভাব-সম্পন্ন। এই 'অস্মি' আবার প্রতিক্রিয়া করবে, দুই মেরু রচনা করবে ; এমনভাবে বেরোবে যে, তার মূলকে অব্যক্ত করবে। যেখানে আমি আছি, কি নেই, তা বুঝা যায় না—আমিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, সে হল আমিত্বের তমে অব্যক্ত হয়ে যাওয়া। আবার 'আমি' নিজজ্ঞানরূপ ধারণ করবে। 'অস্মি' এই জিনিষটি আত্মজ্ঞান উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সান্নিধ্যে অবস্থান করবে ; সেখানে সে সাত্ত্বিক 'আমি' হবে। আর যেখানে 'অস্মি'র থাকা না থাকা বুঝা যাচ্ছে না, সেখানে সে তামসিক। এক জায়গায় 'অস্মি' হারিয়ে যায়, এক জায়গায় 'আত্মা' হারিয়ে যায়। 'অস্মি' যেখানে ঠেকে পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে, সে সত্ত্বগুণ ; যেখানে অস্তিত্ব হারায়, সে তমোগুণ। নিজত্ব-নামীয় উপলব্ধি রয়েইছে—সে পরাশক্তি কখন অস্তিত্ব হারায় না। না হারালেও

যখন আমার 'অস্মি'-নামীয় শক্তি ঘুমে অব্যক্ত হয়, তখন সে একটি ঘোর তামসিক অবস্থা রচনা করেছে। একটি দ্বারা 'অস্মি' নিজেতে আত্মাকে প্রতিফলিত করে, একটি দ্বারা আত্মা-লোক তাতে ঠেকতে পারে না, এমনি মূর্ত্তি অবলম্বন করে; এ উভয়ের মধ্যাবস্থা হল রাজসিক। সত্ত্ব একটা সীমা, তমঃ একটা সীমা, আর যে ক্রিয়ার দ্বারা এক থেকে আরে যায়, সে হল রজঃ।

কিন্তু জ্ঞান এমনভাবে তামসিকতা নেয় যে, সে একেবারে বাহ্যিক শক্তি বা স্থূল শক্তি হয়ে যায়। স্থূল জগৎ ত জ্ঞানই হয়েছেন? যতক্ষণ থাকা নামে উপলব্ধি আছে, ততক্ষণ আদি-জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া আছে। চেতন-ক্রিয়ার দ্বারা স্নায়ুগুলি কাঁপছে, নড়ছে; তাতে রজোনামীয় শক্তি রয়েছে দেখতে পাই। এখন জ্ঞান ফুটে উঠল; উঠে একেবারে এমন তামসিক সীমা নিল যে, 'অস্মি'-জ্ঞান একেবারে এমনি হয়ে জড়ত্ব নিলে; আবার তা থেকে উঠে বিষয়ের দিকে চাইলেই দেখব যে, জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছি, একেবারে এমনি ভাবে দেখতে পাওয়া চাই। 'রয়েছি' বোধ মূলতঃ নিজবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু এতে ক্রিয়াগত সামর্থ্য থাকায় এর ভিতর ব্যক্তাব্যক্ত হবার শক্তি রয়েছে। 'আমি আছি' এর উপর ভর করে গাছ-পালা আছে, পশু পক্ষী আছে, চন্দ্র-সূর্য্য আছে; সে থাকা এমন হয়ে গেল যে, এত বড় জগৎ এত কঠিন সত্য বলে রয়েছে; কিন্তু ঐ জ্ঞান না জাগলে এর কোনই মূল্য নেই; কেন না, জড়-সত্তার

চেয়ে চেতন সত্তার মূল্য বেশী। কিন্তু চেতন-সত্তা আবার নিজেকে এমন ভাবে বিমূঢ় করতে পারে যে, তখন তাকে কোন মতেই আলোক বলতে পারা যায় না। এই বিমূঢ় হয়ে যাওয়া মানে, একেবারে তামসিক ঘন অন্ধকারবৎ অবস্থা রচনা করা; ঐ 'অস্মি'টি যাতে আত্মালোকে প্রবিষ্ট হতে না পারে। এই হল সীমাময় জড়ত্বের আরম্ভ—বহিঃসৃষ্টির জ্ঞান-ক্রিয়া এমন স্তরে চলে গেল, যেখানে সে জ্ঞানকে ধরতে পারলে না। এই ক্ষমতা যে জ্ঞানের আছে, তা স্পষ্ট দেখলুম। এই হল তামসিক ভূত-সৃষ্টির আরম্ভ। এ কার অবস্থা? আত্মারই। আমি যদি এইখানে বিমূঢ় থাকি, আর পরে যদি আমার জ্ঞানক্রিয়া হয়, তবে সেই বিমূঢ় থাকাকে 'আমার বার' বলব না? আমি শরীরী, আমার সীমা এই শরীর পর্য্যন্ত, এখানে আমার জ্ঞান তামসিকতা প্রাপ্ত হয়েছে। যেখানে জ্ঞান তামসিকতা প্রাপ্ত হল, সেখানে আপনাকে সে মৃত্যু-সীমায় নিয়ে গিয়ে ছাড়লে। তমোগুণ হল মৃত্যু; জ্ঞান বা নিজ জ্ঞানের 'আছি' বোধ সেখানে মরে গেছে। 'আছি' জ্ঞানের মৃত্যুর নামই তমঃ, প্রকাশের নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল হবার নাম রজঃ। এই শরীরের বাইরে যে আমার অস্তিত্ব আছে, সে থাকাটা আর এখন গৃহীত হচ্ছে না। দেহের বাইরে 'আছি' জানা হয়? যা উপলব্ধিতে না আসে, সে থাকার কোন মূল্য নেই। জ্ঞান না থাকলে শুধু থাকার দাম নেই। উপলব্ধি, জানা বা বেদনই হল ফলাফল দেবার কর্ত্তা। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ অনন্তে অনন্তে বিরাজ করছেন, এ বোধ আমার কখন কখন

জাগে মাত্র; কিন্তু আমার স্বভাবসিদ্ধ বৈরাজ অভিমান এই সাড়ে তিন হাত শরীরে সীমাবদ্ধ হয়ে ভূত রচনা করেছে। ভগবান্ যেমন অনন্তে অনন্তে ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ ভূত রচনা করেছেন, তেমনি আমার সীমা হয়েছে সান্ত একটি ভূমি, ইহাই আমার স্বভাবসিদ্ধ। এই সীমাকে আমি কত বার বাড়াচ্ছি,—এ থেকে বেরোচ্ছি। কিন্তু আবার 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি', আবার সাড়ে তিন হাতে ফিরে আসছি।

তমঃ হল মর্ত্তলোক। মৃত্যুময়, মূর্ত্ত, মাটি, মৃৎ—এসব এক কথা। জ্ঞান ঘোর তামসিকতা প্রাপ্ত হল। তা হলে দেখলাম, জ্ঞানের মর্ত্ত্য হবার, মৃত্যুময় হবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে। এই ত আমি এখানে সান্ত, সীমাবদ্ধ হয়ে মরেছি। কিন্তু যে পুরুষ অনন্ত অনন্ত উপলব্ধিময়, তিনি যখন মর্ত্ত্য সাজেন ও রচনা করেন, তখন তিনি কি আমার মত সীমাবদ্ধ? না, সে তাঁর একটা খেলা? আমার হল বাধ্যতামূলক মৃত্যু; তাঁর হল মৃত্যুর একটা খেলা; তিনি মরণের খেলা খেলতে লাগলেন। আমি আদিমান্ জ্ঞানে জাগ্রত, তিনি অনাদিমান্ সনাতনত্বে জাগ্রত। আমার কাছে মৃত্যু অন্তবান্ হয়ে আসে, তাঁর কাছে মৃত্যু অনন্তবান্ হয়ে আসে—সে হল মৃত্যুর অন্য অধ্যায়। তিনিও মৃত্যু সাজেন, কিন্তু হয়ে থাকেন মৃত্যুঞ্জয়। তাঁর বৈরাজ অভিমান, তাঁর রাজসিকতা, পরিচালিনী শক্তি বা একদিকে ডুবে যাওয়া ও একদিকে ফুটে ওঠার শক্তি তাঁর জ্ঞান থেকে, পাথর তৈরি করতে করতে চলে যাবে; কিন্তু তাতে তিনি

নিজে পাথর হবেন না। এই হল তাঁর বৈরাজ খেলা; জাগতিক বৈচিত্র্যের রচনা তাঁর কাছে বিরাম প্রাপ্ত হবে না। আদিমানের কাছে যা মৃত্যু, অনাদিমানের কাছে তা মৃত্যু হয়েও তাঁকে গ্রাস করে না; সে হয় তাঁর ক্রীড়নক।

তা হলে দেখলাম, অপরা জ্ঞানশক্তির ভিতরই সব কিছু হবার যোগ্যতা রয়েছে। অপরাজ্ঞান যখন আত্মজ্ঞানপ্রসূত, তখন তাতেই সব আছে। এখন আমরা 'ভগবতী' বলতে গেলে, সে ভগবতী কি একটুখানি মাত্র জ্বলে উঠবেন, অল্প হাওয়ায় নিভে যাবেন, না অনন্ত বিস্তারে অনন্ত কাল ধরে জ্বলে থাকবেন? 'অয়মাত্মা ভগবতী' বললে সে জ্ঞান একেবারে মাটি, কাঠ, পাথর হওয়া পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার শক্তি দেখাবে। এমনি একটা বীর্য্য জাগলে তখনই আমাদের ভগবতী বলা সার্থক হবে। জ্ঞানতত্ত্বকে এত দূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে না পারলে, ইনি বুদ্ধিমাত্র হয়ে থাকেন। জ্ঞানের এই মহিমা না দেখে যারা ভগবৎচর্চ্চা করে, তারা বুদ্ধিতেই থাকে। তারা অপরাজ্ঞান থেকে স্বয়ং-ভগবতীতে যায় না। তোদের আর মড়ার মত 'ভগবতী' বেরোবে? জয় গুরু! মড়াকে যতক্ষণ জাগিয়ে নেওয়া না হয়, ততক্ষণ মড়া ভগবতীই উঠবে। এ কথা একটা উপমা মাত্র নয়—সত্যিই ভগবতী জাগবেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতির চৈতন্যময় চৌম্বক তরঙ্গ জেগে উঠবে। এই ভাবে এঁকে জাগিয়ে রাখতে পারলে, গাছকে যদি তুমি চলতে বল ত গাছ চলবে। এঁর ভিতর দৌর্ব্বল্যের বিন্দুমাত্র থাকবে না। অভ্যুদয় ও বীর্য্য

নিয়ে ভগবতী জাগ্রত হন, তিনি কখন মড়ার মত জাগ্রত হন না।

এখন তিন গুণ বুঝলি? আগের চেয়ে পরিস্কার হল? এই জ্ঞান বজায় রেখে কথা বলছিস্ মানে—তোর ভিতর সত্ত্ব রজঃ তমের খেলা হচ্ছে। বেঁচে আছি মানে—চেতন-চক্ষু দেখছে। মরেছি মানে—চেতনচক্ষু দেখছে না। জ্ঞানতত্ত্ব নিজের অধিকার যদি জড়ত্ব পর্য্যন্ত বাড়ান, তবে সেই পর্য্যন্ত তাঁর অধিকার হয়ে যাবে।

তমোনামীয় বোধের প্রকাশ শরীর, ভৌতিক শক্তি ইত্যাদি। জ্ঞানের অধিকার কত দূর? জ্ঞানের অধিকারে আমি ভূতের অধিপতি ভূতনাথ হব। তখন ভূত আমার ঘাড়ে চড়বে না। মহাদেব কেন শ্মশানে থাকেন, ভূত প্রেত নিয়ে নৃত্য করেন, বুঝলি? এখন ভগবতী বলতে গেলেই তাঁকেই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা ভগবতী, এই পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে দেখবি। তিনি ভূত হয়েই রয়েছেন, এ দেখতে পাবি। পরাশক্তি কি অপূর্ব্ব জিনিষ। ইনি মরণের সাজ অনায়াসে বহন করেন। অনাত্মজ্ঞানে বা পরজ্ঞানে এই নিজত্বই মৃত্যু। সে মৃত্যু থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে সরবার জন্য কত চেষ্টা। আর এই আত্ম-জ্ঞান মরণের সাজ সেজেও কত খেলা করেন।

আমরা যখন মরব, তখন সেখানে এই জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে উঠলে আমার ভগবতীকেই ত পাব? আর একটা কথা বলব। এই যে তোমাদের বিমূঢ়তা, আর ঐ যে প্রকৃতির অব্যক্ত হয়ে

যাওয়া, এ উভয়ের পার্থক্য বলতে পার? এখানেও প্রকৃতি আপনাকে হারাল, আর ওখানেও তাই। যখন জীবের মৃত্যু হল, তখন 'স্বং অপীতো ভবতি'; তবে জীবত্বটি কোথায় রইল? তমোগুণে। পুরুষ প্রকৃতিময় হল না; তার প্রকৃতি-লয় হল তমোলয়। মরে গিয়ে প্রকৃতিতে মিশে গেলুম না, তামসিক বিমূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। যখন তিন গুণ সমভাবে খেলা করে, তখন ক্রিয়া হয়। তিন গুণের সমতা বদ্‌লালে বা একটা কেউ বড় হলে অপর দুইয়ের তাবতম্যও তাতে অভিভূত হবে। সত্ত্ব রজঃ অভিভূত হয়ে তমঃ প্রাধান্য লাভ করলে যে অবস্থা, তার নাম মৃত্যু। সাত্ত্বিক হব, কি রাজসিক হব বা তামসিক হব, এ ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হব।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, মঙ্গলবার।

জানাই ত দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। আর দর্শন ও শ্রবণাদি থেকে রূপ ও শব্দ প্রভৃতি তন্মাত্রা এবং তা থেকেই ত ভূত তৈরি হয়। তা হলে জানাই হল মূল বস্তু। এ কি রকম জানা? যে জানা থেকে চোখ, মুখ, নাক, কাণ প্রভৃতি জন্মায়। সুতরাং এই জানা থেকেই বিশ্ব উদ্ভূত হল। এ জানা সেই-রকম জানা, যে জানার স্থূল মূর্ত্তি এই বিশ্ব-প্রকাশ। কিন্তু আসলে এটি জানাই। জানা ক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে যখন তিনি গ্রহণ করেন, তখন তাঁর দুটি

রূপ প্রকাশ হয়। এক—নিজেকে জানছি, আর জ্ঞেয় বস্তুকে জানছি। এর মধ্যে নিজত্বের একটা জোর আসছে না? জ্ঞেয় পদার্থ জানলুম, এ যেমন স্ফুটতর, তেমনি নিজে জানলুম, এও স্ফুটতর। যে ভাবকে জানলুম, সে ফুটল, আবার নিজে জানলুম, এও ফুটল। জানবার শক্তি বা মহিমা তিনি আপনিই, নিজেই নিজের দ্বারা তিনি নিজেকে দ্রষ্টা করে তোলেন। সুতরাং 'অন' অংশ 'জ্ঞ'-পুরুষ থেকে ভিন্ন নন। এই অন শক্তির প্রভাবে (নিজেই সেই শক্তি) তিনি নিজেকে দুই ভাগে ফুটিয়ে তোলেন। অক্ষরে দেখলুম, তিনি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না, শোনেন না ইত্যাদি। ক্ষর আত্মা অক্ষর আত্মা থেকেই প্রকাশ পায়। আর এখানে দেখলুম, প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেই শক্তি। তাই "বদন্তি পরমাত্মেতি কেচিদ্ বা পরমেশ্বরীম্।" তত্ত্বতঃ দেখতে গেলে তিনি পরমাত্মা, আর শক্তিত্বে পরমেশ্বরী।

অক্ষর আত্মত্বে 'নিজে নির্ম্মল' এই বোধ জেগে ওঠা চাই; এ ভিন্ন নিজবোধ দেখতে গেলে অহং-আদির সঙ্গে জড়ান মলিন নিজবোধই জাগবে। তাই প্রথমেই নির্ম্মল আত্মত্বে ঢুকতে হবে। ঢুকে দেখি, ওঁরই ভিতর জাননশক্তি লুকান আছে, যার দ্বারা নিজেকে তিনি দুই রকম করেছেন। এক রকমে খালি নিজেকে নিজে জানছেন, আর এক রকমে আবার নিজেই নিজের শক্তি হয়েছেন। এক রকমে তিনি নিতান্ত নির্লেপ অক্ষরাত্মা; অন্য রকমে বহু ক্ষর আত্মা তাঁ থেকেই জন্মাচ্ছে।

নির্ম্মল আত্মত্বে ভূমি, জল ইত্যাদি কিছু নেই, কিছু নেই—সেখানে মাত্র আত্মজ্ঞান। কিন্তু এইখানেই আত্মত্বের শেষ বললে মস্ত দোষ হয়; জগৎ জড় বা আত্মা থেকে আলাদা থেকে যায়। আত্মাকে খালি অক্ষর পুরুষ বলে দেখলে জগদংশ বাদ থাকে। নির্ম্মল পুরুষ-তত্ত্বে প্রবেশ করতে প্রথমে ক্ষর থেকে অক্ষরে এবং অক্ষর থেকে পুরুষোত্তমে প্রবেশ হবে। আত্মত্বে গিয়ে 'আত্মাকে ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না' ইত্যাদি বোধে জগৎ-মীমাংসা হয় না—জগতের নিয়ন্তা কোথায়? অক্ষর আত্মত্বে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর নিয়ন্তৃত্ব দেখাই হল পরমাত্মত্ব দর্শন। আত্মত্ব এমন জিনিষ যে, সে নিজেতে ঢুকুক, আর প্রকৃতিতেই ঢুকুক, যখন যাতে ঢুকবে, একেবারে তাই হয়ে, আবার তা থেকে আলাদা থাকবে। ব্রহ্মজ্ঞানের 'অহংগ্রহ' সাধনায় 'আমিই ভগবান্,' ক্ষর আত্মা এইরূপ হাত-পাওয়ালা হয়ে যায়। এটা কিন্তু বেরাস্তা। ঐরূপ চোখ-মুখ, নাক-কাণ ফুলে উঠলেই ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হল না। যেখান দিয়ে ঢুকে সে তত্ত্বে যেতে হবে. সে পথে মোটেই গেলাম না—ঈশ্বরত্বে ঢুকে উপাসনা হল না। হাত-পা, চোখ-মুখ, এই সব জীব-ভাবীয় জিনিষ ফুলে উঠুক, ইহাই আমরা চাই। যেমন ছেলেপিলের অসুখ হলে আমরা বলি,—'ওরা সারুক, আমি মরে যাই।' 'নিজত্ব' ঈশ্বর হোক এ কথা আমরা বলি না—হাত-পা ইত্যাদি জীবত্বই ঈশ্বর হোক বলি।

ক্ষর থেকে অক্ষরে, অক্ষর থেকে নিয়ন্তায় ধীর ও শান্তভাবে

যেতে হবে। এ জ্ঞানস্বরূপকে দেখা যাচ্ছে ? এঁর সত্তা আমাদের বুকে নিত্য উদ্দীপ্ত ? সে বিষয়ে কোথাও ভ্রান্তি নেই ত ? আবার এই ক্ষর আত্মাকে ইনিই দেখছেন ? না, আর কেউ দেখছে ? যখন আমরা বলি—ইনিই দেখছেন, আর কেউ দ্রষ্টা নেই, তখন সে বলা অক্ষর আত্মত্বের দিক্ থেকেই হল। আর যখন বললুম,—এঁকেই দেখছি, তখন ক্ষর আত্মত্ব থেকে বলা হল। এঁ থেকেই সব জাত হচ্ছে ; আবার ইনি আপনাতে আপনি বিভোর, এ-ও দেখছি। ঐ যে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন-অভিমানী পুরুষ-সকল এঁ থেকে নিয়ত বেরোচ্ছে। 'আমি দেখছি', এ কথাটি কার ঘাড়ে আরোপ করতে হবে ? নিজত্বে—চক্ষেও নয়, দর্শন-শক্তিতেও নয়। যেখানে দর্শন শ্রবণ ক্রিয়া বেরোচ্ছে, সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা আছেনই ; তিনিই বেরিয়েছেন এবং ক্রমাগত চলেছেন। নমঃ! আবার চলেও ঠিক সমাসীন আছেন। নিজত্বই চলেছে, আবার নিজত্বই সমাসীন, স্বস্থ আছে। এই হল অনন্ত-তত্ত্বের পরিচয়। যা, তাই-ই থাকবে ; অথচ একটা রূপান্তর হয়ে যাবে, এই হল অনন্তের পরিচয়। অনাদি শক্তিপ্রবাহ তাই খালি সংশ্লিষ্ট হয়েই যায় ; সে ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকে তাঁতেই, যিনি 'আমি এই হলুম', 'আমি এই হলুম', এইরূপ দর্শন করেন ;—কিন্তু তাঁর হওয়াটি এত হয়েও ঠিক পড়ে থাকে। বীজ, অনন্ত বীজ প্রকাশ করেও বীজত্বে ঠিক থাকে। অনন্তের আইন ঠিক আছে ; কারণ, কার্য্যরূপে প্রকাশ পেয়ে সে ফুরোয় না। কারণ ঠিক কারণই

রয়েছে, তার উপর কার্য্য হয়েছে। যেখানে কার্য্য, তারই অন্তর্নিহিত ভাব তার কারণ। কারণ, কারণরূপে থেকেই কার্য্যরূপ ভাব প্রকাশ করে।

আদি অন্ত দেখতে গেলেই এ তত্ত্ব হারাবে ; এ তত্ত্ব অন্তবান্ নয় যে, এ হারিয়ে যাবে, একটুতেই ফুরিয়ে যাবে। তাই যতক্ষণ আদিমান্ তত্ত্বের দ্রষ্টা, ততক্ষণ জীব ; অনাদিমান্ তত্ত্বের দ্রষ্টা হলেন শিব। অনন্ত অনন্ত কাল ধরে তাঁর উপর প্লাবন হচ্ছে, অনন্ত অনন্ত কাল ধরে তিনি স্থির আছেন। আদিমান্ ভাব ঐ ডুবে গেল—একটু মাত্র বাকী রইল। নিজেকে দেখছি, অথচ যদি অন্তবান্ ভাবে থাকি, তা হলে সে আত্মবান্ দৃষ্টি হল না। অনাদির বুকে দাঁড়িয়ে এমন কত আমি জন্মাচ্ছি, ফুরোচ্ছি ; তাতে তিনি নির্লেপ, নির্গুণ—আহাহা! আর আমার এই সমস্ত খেলা, যত-রকম যা কিছু হচ্ছে, সমস্ত প্রকাশের দ্রষ্টা ইনি। শক্তি ও আত্মা একেবারে নির্বিশেষ ভাবে শান্ত আছেন। শান্ত থেকেও নিজেকে দুই-ভাগে বিভাগ করে আছেন। ওখানে দুজন একসঙ্গে একজনই—কোনও নামের দ্বারা পার্থক্য বর্ণনা করা যায় না। এখানে একজন ক্রিয়া করছে। ওখানে নিষ্ক্রিয় সক্রিয় কোনও অভ্যুদয় নেই, মাত্র আমি আমাকে জানছি, এই রকমের স্থিতি। সুতরাং শান্ত বলব, কি ক্রিয়াশীল বলব, তার জো নেই। গুণ ও গুণী, কোন্ কথা বলব? কোন ভাবই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যেখানে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন, সেখানে গুণ ও গুণী দেখা যাচ্ছে। আর

যেখানে ক্রিয়া চলছে, সেখানে দ্বন্দ্ব না হলে, স্বস্থ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে একসঙ্গে ক্রিয়াশীল কেমন করে হয়? ওখানে স্থিতিশীল হলেও এখানে একেবারে দ্বন্দ্বসমাহার।

এই সমস্ত আলোচনা আমার এই চিন্ময় দেবতারই ত? আর কারও নয়? এঁকে ছাড়া আর কাউকে কাটা-ছেঁড়া করছ না ত? এঁকে ঢেকে রেখে যেমনি আলোচনা করেছ, অমনি ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছ। ব্রহ্মকে আপনার ব্যক্তিত্বের ভিতর গ্রাস করলে—পূরে ফেললে। পাশ্চাত্যরা যেমন বলে, অধ্যাত্মকে জড়ে টেনে আনতে পারব; জড়কে কি করে অধ্যাত্মের ভিতর দ্রবীভূত করব, তা ওরা ভাবে না। জড়েই ওদের ভরন্তর—অধ্যাত্মকে তার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলেই যেন অধ্যাত্ম বেশী উজ্জ্বল হবে, এই ওদের ভাব। কিন্তু জলে নুন ঢাললে নুন জলই হয়ে গেল; আবার জল থেকে নুন বার করার প্রণালী অন্য রকম। এখানে তোমরা কোন সন্তোষ, শক্তি, সিদ্ধি পাবে না, ঐখানে গিয়ে সব পাবে। ভগবতীর আলোচনা হচ্ছে, এই জ্ঞান তোমরা ঠায় বজায় রাখ। মা! তোমাকে ভগবতী বললেই তুমি ঐশ্বর্য্যে ভরে দাও, নিজের ভিতর আমাকে পূরে নাও। আর ভগবতী বলে তোমায় না দেখলেই আমি হলুম কাঙ্গাল, দীন দরিদ্র, তৃষাতুর। আমি এ রাজ্যের লোক নই, তোমারই রাজ্যের লোক—এখানে খালি একটা পা ফেলেছি মাত্র। আমি দ্যুলোকের—বৈকুণ্ঠের—কৈলাসের লোক। বৈষ্ণবদের শাস্ত্রে আছে—ঘরে শাশুড়ী ননদ শুয়ে রয়েছে; চলতে গেলেই আমার

গায়ের গয়নাগুলি সব বেজে উঠছে; এখন আমি কেমন করে শ্যাম-দর্শনে যাই? অক্ষরে না ঢুকলে গায়ের গয়না খোলা হয় না। "ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি" এই কথা বলতে পারলেই গয়না খুলে গেল। ভগবতি! আমি ভূমি, জল, এই সব জ্ঞানের ভিতর আছি। 'ন ভূমিঃ' ইত্যাদির মানে যে কি, তা আর দেখছি না। আমিই ওদের টেনেটুনে প্রাণশক্তির দ্বারা বিধারণ করে আছি। তা না করার নামই হল গয়না খোলা। গয়না বেজে ওঠা বড় ভয়ানক বাধা; সে ঝন্ঝন্ করে বাজে। শাশুড়ী ননদ হল মায়া মোহ।

এই যে তোমার বুকের কামকলা দেবী, যাকে খুসী করবার জন্য তুমি কত রকম বসন-ভূষণ পরাচ্ছ—ওকে নিজের বধূরূপে গ্রহণ করে কত তৃপ্তি দিবার চেষ্টা করছ, একদিন তোমার নজরে পড়বে যে, ও তোমাকে চায় না, আত্মাকেই চায়। 'তোমার কামনা' বলে তুমি যে দেবীকে ভোগ কর, ও দেবী কার উপাসিকা? ও চুরি করে করে আত্মত্বের ঘরে যাচ্ছে। এই নাও ভাত, এই নাও ডাল, এই নাও সর্ব্বস্ব বলে তুমি ওর সেবা করছ; ও কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু" বলে সব তাঁকে ঢেলে দিচ্ছে। আয়ান ঘোষকে দেখলে? কামনা মানেই—সে আত্ম-কামী। এ সর্ব্বদা মূলাধার থেকে সহস্রারে গুপ্ত পথে পরমাত্মার অভিসারে যাতায়াত করছে। আর কাউকে এ চায় না; তোমায় শুধু দেখাচ্ছে যে, তোমার ঘরে—মূলাধারে বসে তোমার ঘরকন্না করছি। "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবতি,

আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ন্তবতি।" সকলেই ওঁকে কামনা করে। যার যে ধর্ম্ম, সে তাই নিয়েই ওঁর কাছে যাবে। তোমার আত্মা চাচ্ছে যে, ফুল দিয়ে গুরুর পূজা করব; তাই তুমি গুরুর পায়ে ফুল দিলে। কামকলা ওঁরই মুখাপেক্ষী, তাই যত কিছু বস্তু, ওঁতে অর্পিত হোক, ইহাই সে চায়। জীবত্ব, তাকে ধরবার জন্য, ভোগ্য করবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামনা আমার নয়—ওঁরই। এ তত্ত্ব দেখতে পেলে আমি এটা চাই, ওটা চাই, এ ভাবে আর ভোগ হত? যদি জানতুম, এ কামনা আমার নয়—ভগবানের, তবে কার ইচ্ছা আমাতে পূর্ণ হচ্ছে দেখতুম? ভগবানের; বাস্, তেমনি আমার কর্তৃত্ব, ইচ্ছাত্ব সব চলে গেল। কামকলা কোথায়? মূলাধারে। পরমেশ্বর কোথায়? সহস্রারে। কার আলোচনা করলে? কাকে দেখলে? এ সব উপদেশের খালি একটি অংশ লক্ষ্য করার জিনিষ—ভগবতী চোখে পড়ে যাচ্ছেন।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার।

তত্ত্ব-চক্ষু বড় মূল্যবান্ জিনিষ। "ন তত্র ভাসতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ" ইত্যাদি হচ্ছে পরমাত্মতত্ত্বের কথা। পূর্ণ চিন্ময়ী যে ভগবতী, যেখানে পূর্ণ চিন্ময় আত্মতত্ত্ব ভিন্ন দ্বিতীয়ের আভাস মাত্র নেই, সেখানে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি থাকবে না, এ কথা বলার সার্থকতা কি? সেখানে কাহারই ত অস্তিত্ব থাকবে

না। আত্মজ্ঞানে, যেখানে স্থূল জগতের কোনও সম্পর্ক নেই, সেখানে চন্দ্র সূর্য্য—এত বড় জ্যোতিষ্মানেরও জ্যোতি থাকে না, এ কথাটার বিন্দুমাত্রও সার্থকতা নেই। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি হল বাক্ প্রাণ মন। তিনি যখন জগৎ প্রকাশ করতে ত্রিবৃৎ হন অর্থাৎ গুণকে প্রকাশ করেন, অধ্যাত্ম হিসাবে তার নাম হল বাক্ প্রাণ মন, আর স্থূল হিসাবে সত্ত্ব রজঃ তমঃ। উপনিষদ্ বলেছেন,—"এতস্যা বাচঃ পৃথিবী শরীরং…জ্যোতীরূপম্ অগ্নিঃ" ইত্যাদি। এই বাক্যের শরীর পৃথিবী, অন্তর্গত জ্যোতীরূপ অগ্নি। "এতস্য মনসঃ জ্যোতীরূপম্ আদিত্যঃ"—এই মনের অন্তর্গত জ্যোতীরূপ আদিত্য। "এতস্য প্রাণস্য জ্যোতীরূপং চন্দ্রঃ,"—প্রাণের জ্যোতীরূপ বা ভিতরকার তেজ চন্দ্র। দেখা গেল, বাক্য অগ্নি, মন সূর্য্য এবং প্রাণ চন্দ্র নামে অভিহিত। এ ছাড়া বাক্ প্রাণ মন, উপনিষদ্ অতি সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন, অথচ দর্শনকারেরা এ কথা ভুলে গেল ; তাতে অর্থের কত তফাৎ হল! যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্ব স্ব মূর্ত্তি হারিয়ে একীভূত হচ্ছে, সেখানে তখন চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির সত্তা হারাণের বিশেষত্ব কি? প্রকৃত পক্ষে বাক্ প্রাণ মন স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে—এই হল কথা। আত্মতত্ত্বে পরমাত্মার, ভগবতীর ও আমার এই তিনটি হল জ্যোতি—বাক্‌শক্তি, মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি। অধ্যাত্ম-তত্ত্বের জন্য এ সবে চক্ষু থাকা নিতান্ত দরকার।

তা 'হলে যাঁকে তোমরা আত্মা, জ্ঞান, এই সব শব্দের দ্বারা নির্ণয় কর, তিনি যেখানে যেখানে প্রকাশমান আছেন; সেখানে

সেখানে বাঙ্ময়, প্রাণময়, মনোময় হয়ে আছেন। ইনিই ভগবান্। সুতরাং জীব যে-জাতীয় ঐশ্বর্য্য বা ভোগ নিয়ে জগতে বিচরণ করে, সে সমস্তই তাঁতে পাওয়া যায়। হৃদয় আছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন আছে, প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ আছে। তা হলে আমাদের ভিতর যত কিছু প্রকাশ, সে সমস্ত তাঁতে আছে। কিন্তু তিনি আমাদের মত বিষয়াধীন নন—তাঁর প্রাণ বাক্যকে অনুগমন করে, ভাব প্রাণকে এবং সকল সৃষ্টি মনকে অনুগমন করে। কি স্বাধীন! এই স্বাধীন ভগবতী এইখানে আমার ভিতর শুধু অবস্থিত নন, বাঙ্ময় প্রাণময় মনোময় হয়ে, একেবারে সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় হয়ে অবস্থান করছেন। যাঁর সম্বন্ধে তোমরা নালিশ কর—'তাঁকে কত খুঁজি, তবু পাই না', সেই তিনি সর্ব্ব-সম্পদের নিয়ন্তা হয়ে, আমাকে তাঁর দ্বারা জাত ও বিধারণ করে, তাঁর ব্যবহার নিয়ে বসে আছেন। যতক্ষণ না জীব এইরূপ কৃতনিশ্চয় হয়, ততক্ষণ তার যা কিছু সার্থকতা এসেছে, তার মূল্য কোথায়? তার যত জ্ঞান বিদ্যা থাক, সে সব তুচ্ছ হয়ে যায়—যতক্ষণ না সে 'মা' বলে, আত্মত্ব পর্য্যন্ত দিয়ে, তাঁতে মিশিয়ে বিলুণ্ঠিত হতে পারে। এর কমে তৃপ্তি কই, সুখ কই? আর দেখ, বুকের ভিতর যাঁকে দেখিয়ে দিয়েছি, তাঁতে চোখ না রেখে যদি এ-সব কথা বল, তবে এর মূল্যই পাবে না। আর চোখ রেখে যদি বল, তবে বলবে,—"এই যে রয়েছ! এই যে রয়েছ!" "এই যে রয়েছ," এ কি খালি আমাতে বাক্-প্রাণ-মনোময় হয়ে রয়েছ? অনন্ত বিশ্ব

ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে যা কিছু জন্মে রয়েছে, সে সমস্তের অভ্যন্তরস্থ অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তোমারই! প্রাণময়, বাঙ্ময়, মনোময় —এ জ্যোতির সীমা নেই। একদিকে তিনি তেজোময় হয়ে ফুটে উঠ্ছেন; ফুটেই রসময় হয়ে, সে রসরূপে অনন্ত বলে প্রকাশ পাচ্ছেন। সূর্য্য যেমন সর্ব্বরূপের আস্পদ, সেইরূপ রূপাত্মক জগৎকে বর্ণরূপে প্রকাশ করে ধরে রেখেছেন। যেমনি বললুম—আকাশ, সূর্য্য, ভগবান্, অমনি সেই সেই রূপে প্রকাশ হচ্ছেন—যখন যে কথা উচ্চারিত হচ্ছে, অমনি ঠিক তাই। এর কত বড় দাম, কত বড় মহিমা!

তোমরা এটাকে ছাড়। খালি জ্ঞানতত্ত্ব দেখ। মনে কর, ভূতজগৎ নেই; খালি জ্ঞানময়ই আছেন। তা হলে এই জ্ঞানের লহরকে প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে ধরে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা, আর বাক্যের দ্বারা অনুশাসিত করা সহজ হবে। শুধু কথা বলা আর সৃষ্টি করা। তাঁর বুকে বসে তোমাদের যে খেলা ফুটছে, সে-ও এই খেলা—অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য, বাক্য মন প্রাণ—এই খেলাই যথার্থ চলছে? এই জন্য বলে দিয়েছি, জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ এবং জ্ঞানকেই দেখছি শুনছি, এ কথার মূল্য তখনই হবে, যখন তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবে। জ্ঞান মানে—জ্ঞ+অন্। ভগবান্ কাল্পনিক নন—একেবারে জ্যান্ত। ভগবতী এইরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ ব্যবহারগম্যা। মা আমার! নমঃ! ওঁর দিকে সাক্ষাৎভাবে চেয়ে বল নমঃ! দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে! ইনি ভিন্ন আর কেউ প্রপন্নার্ত্তিহরা আছে? এই যে আমাদের ধরে বসে

রয়েছেন, ইনি ভিন্ন আর কেউ প্রপন্নার্ত্তিহরা হতে পারে? প্রসীদ প্রসীদ ভগবতি! এঁর চোক থেকে চোক তুলে কোথায় যাবি? পূর্ব্বসংস্কারবশে যদি কোথাও যেতে চাস, তবে এঁকে সঙ্গে নিয়ে চল্ না। এ কি আমি নতুন কথা বললুম? আমাদের বুকে করে ধরে তিনিই চলেছেন। আমি যখন এক লোক থেকে অন্য লোকে বিচরণ করছি, সে কি আমি বিচরণ করছি, না উনিই বিচরণ করছেন? উনিই আমাদের বুকে করে এক ক্ষেত্র থেকে আর এক ক্ষেত্রে চলেছেন এবং আমাদের দেখাচ্ছেন— আমিই চলেছি, আমিই কর্ত্তা। ওঁর গতি দর্শনে ব্যবহারশীল হওয়া ভিন্ন তোমরা কোন তৃপ্তি পাবে? সংসারে যদি বলি, "আমি কিছু জানি না, বাবাই কর্ত্তা," অথচ ব্যবহারের সময় বাবাকে গ্রাহ্য করি না, সেইরূপ "ভগবান্ কর্ত্তা, আমি কর্ত্তা নই," তাঁতে ব্যবহারশীল না হলে এ সব কথার কোন মূল্য নেই। এই ব্যবহারের দ্বারা তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। এই যে জ্যান্ত ভগবতী! আহাহা! আহা!

"মশায়, ভগবানের আবার গতি কি? যিনি বিশ্বব্যাপী, এক লোক থেকে লোকান্তরে তাঁর আবার গতি কি? যিনি শান্ত স্থির, যাঁর সীমা নেই, সব ব্যাপ্ত করে রয়েছেন, তাঁর আবার গতি কি?" যে পায়ে ইনি চলেন, সেই পায়ের নাম পরমেশ্বরী পা; যে পায়ে স্থির, সেই পাদের নাম পরমাত্মা। জীব চলছে মানেই—শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে। যাচ্ছে—মানে, শক্তির দ্বারা এখানে ওখানে চলেছে। আমরা দেখেছি, শক্তি মানেই

আত্মশক্তি। তিনি দেবতাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের কোন শক্তি নেই; মনে প্রাণে, জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ে, সব শক্তি আমারই। সুতরাং আমি চলেছি আর ভগবান্ স্থির আছেন, এ কথা বলবার উপায় আছে? তাঁর চলা কি রকম চলা? বাক্ চললেই তাঁর চলা হয়ে গেল। 'ঐখানে' বললেই এখান থেকে ঐখানে চলে গেলেন। "কলিকাতা" এই কথা বলার নামই কলিকাতায় চলে যাওয়া। এই কাণ্ডটাই ভিতরে সব সময় হচ্ছে। ভগবতী এমনি করে না চলেও সর্ব্বদা চলছেন, আর জীবত্বও তাতে পরিচালিত হচ্ছে। আমার কর্ম্মাধিকার নিয়ে তিনি যেখানে যাবার, সেখানে চলে গেলেন। লোকচক্ষে আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে তিনি খালি এই করছেন। আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে, আমাকে দিয়েই ফলভোগ করাচ্ছেন। অগ্নিমুখে দেবতারা খান অর্থাৎ বাক্‌মুখে আহার করেন; এই যে দেবতাদের আহার, এও ইনিই বাক্‌মুখে দেবতাদের খেতে দিয়ে পুষ্ট করেন। কি পবিত্র এবং কর্ম্মঠ এই বাক্! সকল কর্ম্ম, প্রতি পরিবর্ত্তন সংসাধন করছে এই বাক্। আর এই বিজ্ঞান না দেখে এই সম্পর্কে আমরা অনবরত অপব্যয় করছি। আমি জ্ঞানময়ী ভগবতীর কাছে বসে যদি তাঁর পূজা করতে চাই, তা হলে আমি খালি বাক্‌প্রকাশ করলেই তাঁর পূজা হবে ত? ওঃ! ভগবতি! সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি জ্বলে উঠল এই বাক্-উচ্চারণে! যেমন বললুম "ভগবতি," অমনি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি জ্বলে উঠল, অমনি প্রাণে ভাব রূপান্তরিত হতে লাগল, দীপ্তিশীল হতে লাগল এবং যতটুকু

আমার আয়ত্তের ভিতর, সূর্য্য ততটুকু ফোটালেন, কিরণ রচনা করলেন। এইরূপে অনবরত চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির লহর আমরা জ্বালছি? এই গতি যতক্ষণ না আমাদের জগতের মত স্থূলতম ভাবে ভোগ-সার্থকতা দেয়—সে ভোগ মুক্তিই হোক, আর যাই হোক, ততক্ষণ এ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সার্থকতায় পৌঁছচ্ছি না। ততক্ষণ এ তত্ত্বকে তত সমাদরের সহিত নিতে পারব না; কারণ, স্থূলত্বের যে অভিমান, তা থেকে আমরা অব্যাহতি পাইনি; কিন্তু এ দেখেছি যে, অনুভোগের জগৎ পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানমূর্ত্তি। দেখে নিয়েছি, কিন্তু ভাল করে তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। এখনও এমন অবস্থা পাইনি যে, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি একেবারে জ্বলে উঠবে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" ইনি বিষয় বা জ্ঞান, দুই রূপে লব্ধ হতে পারেন। যতক্ষণ এঁকে আমরা জ্ঞানরূপে না দেখি, অন্যরূপে দেখি, ততক্ষণ ইনিই আমাদের বিষয়-মূর্ত্তিতে বরণ করছেন। আবার যখন এঁকে আত্মারূপে চাই, তখন ইনি আত্মারূপে বরণ করেন। এঁর বর দেওয়ার সীমা নেই। যে কয়টা বর আমরা পেয়েছি, তাতে জড়িয়ে এতই মত্ত হয়েছি যে, আরও যে অনেক পাবার আছে, সে বিষয়ে কোন হুঁশ নেই;—যেন আর নেবার স্থান নাই, এতই বিমূঢ় ও মসগুল হয়ে আছি। আমরা বলতে সমর্থ হচ্ছি কি যে, আমাদের এই বিমূঢ়তা দূর করে দাও, তোমাকে পাবার তীব্র স্পৃহা জাগিয়ে দাও। জ্ঞান-ভূমিতে না বসে এঁর আস্বাদন পাবার উপায় নেই। ঋষি বললেন,—শুধু জ্ঞানভূমি নয়; এ সব ছেড়ে-ছুড়ে অসঙ্গ-ভূমিতে ঢোক।

ফিরিয়ে বসে যা, তবেই ঐ ঘর সুপরিস্ফুট হয়ে হঠবে।…"অসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥" এখন আমাদের সাধনাই হল—"ন ভূমিরাপঃ ··।" ভগবতি! আমার সঙ্গে আর কারও কোন সম্পর্ক নেই, এই চক্ষে চেয়ে থাকতে হবে। চন্দ্রমা জ্বলে উঠল মানে, আমি সঙ্গবান্ হলুম। বাক্য ছুটল, প্রাণে লহর খেলল, মন ক্রিয়া করল, এ সবই সঙ্গবান্ হওয়ার কথা। কিন্তু এখন আমি অসঙ্গ হলুম মানে,—আমি আর কিছু চাচ্ছি না। আমি তোমার শরণাগত হচ্ছি, এই ভাব নিয়ে ত অসঙ্গ হতে হবে। আমার কিছু নেই; এ সবই তোমার—তোমার; আমার সঙ্গে এ সবের কোনও সম্পর্ক নেই। এই যে তুমি, তোমাকেই আমি চাচ্ছি; তোমার বিষয়-সমূহ আমি চাইব না, যে তোমা থেকে এই-সব ফুটেছে, যে তুমি এই-সব বিস্তার করে বসে আছ, সেই তুমিই আমার বরণীয়; আর সেই তোমাকেই আত্মরূপে, নিজবোধরূপে দেখতে পাচ্ছি। এই শরীর ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে একেবারে ফুটিয়ে ইনিই বসে আছেন? ভগবতি! ভগবতি! ভগবতি!

ঋষি কেন বিধান করেছেন যে, আত্মার অসঙ্গত্ব দেখে তবে পরমেশ্বরকে দেখবে? এর মানে, জীবত্ব থেকে ভগবৎতত্ত্বে যেতে হলে তার রাস্তাই এই। "তোমাকে চাই" এই কথা বললেই অসঙ্গ থেকে তোমাকে যেতে হবে এবং শরণাগত হতে হবে। তোমাদের স্পৃহা এসেছে; নতুবা নিত্য আলোচনা

করবার অধিকার তিনি দিতেন না। কিন্তু এখন এমন ভাবে সব কিছু আমাতে আর ভয়ন্তর করে থাকবে না, আমার একেবারে মাকে পাওয়া চাই। মাকে পাওয়ার রাস্তা—অসঙ্গত্ব দিয়ে মায়ে ঢুকতে হবে। তাই ঋষি বলেছেন,—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ··· ।" হাত-পা ছড়িয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ে, "ওগো, এস গো, দাও গো" এ ভাবে ডাকলে হবে না। সূক্ষ্মভাবে যে সংযম, সেই ভাবে গর্ত্তে ঢোকার মত করেও যেতে পারি না। যে রাস্তা দিয়ে গেলে ঠিক হবে, তার জন্য আর বিলম্ব সয় না ;—তাই কৌশলীর মত ভগবান্‌কে পেতে আকুর-মাকুর করি,—আহা! এইখান দিয়ে তোমার বাড়ীর দরজা ; এই দিক্ দিয়ে যেতে হবে।

ভোগাচ্ছন্ন আত্মত্ব নিয়ে ভগবানে যাওয়া যায় না ; তাতে যাঁকে দেখতে যাচ্ছ, তাঁর রঙ্ তোমার কাচের রঙে ঢাকা পড়বে। তোমার নিজের স্বচ্ছতা না হলে, চিন্ময়ের স্বচ্ছতা দেখতে পাবে না। এই দিক্ দিয়ে রাস্তা। স্বচ্ছ জ্ঞান মানেই আত্মজ্ঞান। চেতনার ভিতর স্বচ্ছ চেতনা হল আত্মচেতনা। তাই দিয়েই ভগবতীকে দর্শন করব ; ফলে আমাকে সমাচ্ছন্ন করে যে সব ভূত আছে, তারাও ভগবতীরূপে জ্বলে উঠবে। এই হলেই ভূত-সকল দেবতা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন সেই দেবমণ্ডলী-বেষ্টিত পরমাত্মা দৃষ্ট হবেন। একেবারে জ্যান্ত জল, জ্যান্ত আকাশ, জ্যান্ত দেবতা সব লহরে লহরে খেলা করবেন। তখন আমার শরীরস্থ জল-বাতাস আর মড়া থাকবে না। "সূর্য্যমণ্ডলমধ্য-

বর্ত্তিন্যৈ নিত্য-চৈতন্যোদিতায়ৈ নমঃ"—সূর্য্য হল স্থূলদেহ, চন্দ্রমা হল প্রাণ—তস্যৈ নমঃ!

তা হলে আমাতেই ভগবতীকে দেখা হচ্ছে। পূরোদস্তুর না হোক, অংশতঃ দেখা হচ্ছে, তাতে কোন ভুল নেই। পাছে চেতনমার্গ থেকে জড়বিজ্ঞানে ঢুকে পড, তাই দু দিন বন্ধ দিয়ে চেতনাংশ ঝালিয়ে যাচ্ছি। কেন না, জড়ে চলে যাওয়াই আমাদের স্বভাব কি না। আমাদের পেতে হবে জ্ঞান, হতে হবে জ্ঞানময় এবং আমার ভগবান্‌ও জ্ঞানময়—এই ত চরম ব্যাপার। এবং সে জ্ঞানের বাক্‌নামীয় অংশের দ্বারাই যত কিছু কাণ্ড হবে।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার।

জীবের স্বাধীনতা ঈশ্বরাধীন। মা যেমন শিশুকে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়ে একদিন তাকে পূর্ণ স্বাধীন করেন, ঈশ্বরীও তেমনি তাঁর নিজত্ব কেটে জীবকে নিজত্ব দেন এবং ক্রমশঃ তাকে স্বাধীন করে তোলেন।

সুখপ্রাপ্তির উপায় হল সন্তোষ—সংগ্রহের দিকে সুখ পাওয়া যায় না। নিজত্বের ভিতর নিজের সন্তোষ, ইহাই প্রকৃত সুখ বা আত্মসুখ। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং।" মানুষ কিসের জন্য এখানে এসেছে, এখানে সে কি জাতীয় সুখ সঞ্চয় করবে? মুক্তরাজ্য ও সিদ্ধরাজ্য দেখ। সেখানে সকলেই আপ্তকাম, আপ্তকাম! সেই লোককে আদর্শ করতে হবে। যে লোকে

কর্ম্মফলানুসারে মনোময় সুখকর ভোগ-সকল পাওয়া যায়, সে স্বর্গলোক। স্বর্গ-সুখে সিদ্ধি সুখের খানিকটা মাত্র আছে। কিন্তু মনুষ্যের লক্ষ্য রাখতে হবে মুক্তক্ষেত্রে। সেই জন্য সাংখ্য হিরণ্যগর্ভাদিকেও মুক্ত পুরুষ বলেন না—সিদ্ধপুরুষ বলেন। চেতনার কি ঘোর ঘন নিবিড় প্রকাশ! জীবন ভিন্ন, প্রজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নেই, আর কারও স্থান সেখানে নেই। এই হল আদর্শ ভূমি। যা কিছু তৈরি হচ্ছে, সবই প্রজ্ঞান—প্রজ্ঞানই ঐ ঐ মূর্ত্তিতে ফুটে উঠছেন। এ কি সহজ কথা! এখানে কতটা রূপ, কতটা রস আছে? সে কতটুকু? মনুষ্যলোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে পিতৃলোকের একটি আনন্দ হয়। পিতৃলোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে গন্ধর্ববলোকের একটি আনন্দ হয়। গন্ধর্ববলোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে প্রজাপতিলোকের একটি আনন্দ হয়। প্রজাপতিলোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে আজানজ-লোকের একটি আনন্দ হয়। আজানজ-লোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে ব্রহ্মলোকের একটি আনন্দ হয়। ব্রহ্মলোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে পরমাত্মলোকের এক আনন্দ হয়। কি আদর্শ! কি চোখ! এই চোখ কতটুকু সময় উন্মীলিত রাখতে পারব? এতে আমার কি হল? ছয় মাস ধরে আমার যে সব সুখ-দুঃখ, জ্ঞানবিবর্ত্তন, সে সবটাই সুখস্বরূপ হয়ে গেল। যেমন ডাল, ভাত, তিত একসঙ্গে খেলে পাঁচমিশেলি ভোগ হল, তেমনি খানিকটা ভগবান্‌কে ডাকা, খানিকটা চুরি-ডাকাতি—এই ত হল আমাদের অন্ন। ইহাই ত

জিহ্বায় ভাল লাগল। এখন দেখ, পিতৃভূমি থেকে শাসিত করে কোন্ রস ঢালছে, সোমের কোন্ কণা ফুটছে? তোমরা যখন সোমদর্শী হলে, তখন তাতে বাহ্য জিহ্বার আস্বাদন পেলে না। পিতৃলোকবাসী হয়ে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী যে লেলিহান জিহ্বা, সেই জিহ্বা দিয়ে খেলে। সব রসকে একরস করে পিণ্ডীভূত করলে—ইহাই পিতৃলোকের সুখ। বুঝে দেখ, সেখানে কত আনন্দ। সেই পিতৃলোকস্থ আনন্দ গন্ধর্ব্বলোককে জাগ্রত করলে। যেমন আমার মনুষ্যত্ব, আমার প্রজ্ঞার উজ্জ্বলতা প্রভৃতি সমস্তই পরবর্ত্তী লোকের জন্য সঞ্চিত হচ্ছে, যেমন হিতাহিত-জ্ঞান-সম্পন্ন, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার সার্থকতা পরবর্ত্তী লোকেও প্রস্তুত হচ্ছে. তেমনি পিতৃলোকের সার্থকতা গন্ধর্ব্বলোকে। গন্ধর্ব্বলোক হল প্রাণ-জাতীয় শক্তিময়। পিতৃলোকের ঐ আনন্দের দ্বারা প্রাণ-জাতীয় সেই শক্তি, যেখানে আপনা হতে ছন্দিত হয়ে উল্লাস বেরোচ্ছে, সে উদ্বুদ্ধ হল। পিতৃলোক পর্য্যন্ত হল রস-সঞ্চয়-প্রধান ক্ষেত্র, আর গন্ধর্ব্বলোক হল শক্তি-সম্পন্ন রসোল্লাস-ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে আপনা হতে ফেটে খালি রস-প্রকাশ হচ্ছে। তাই গন্ধর্ব্বলোক গীতিময় লোক, ওজস্বী প্রাণের রসাল লোক। গন্ধর্ব্বলোকের সে আনন্দ থেকে জেগে উঠল প্রজাপতি-লোক—যেখানে আত্মা থেকে দশ জনকে বার করা-রূপ প্রজনন-শক্তি পরিস্ফুট। মর্ত্তলোকে নিজেকে ভাগ করে ছেলের জন্য এক টুকরা, স্ত্রীর জন্য এক টুকরা, অন্যের জন্য এক টুকরা করে কি সুখ পাবে? প্রজননভূমি বা প্রজাপতিলোকের সুখ তাই মিথুন-

সুখের সঙ্গে তুলনীয় হল। এইখানকার সুখের তুলনা নিয়েই ব্রহ্মানন্দের বিচার আরম্ভ হল। খালি আলো, আলো! এ ছাড়া এখানে চেতনার আর কি পরিচয় আছে? মিথুন-শক্তি হল এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত করে দেবার শক্তি। তার পরে আজানজ-দেবতা—শক্তি প্রয়োগকারী কর্ম্মময় দেবতা, যাঁদের কর্ম্মে ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়। দেখ ত, আকাশ-দেবতা, বরুণ-দেবতার কত কর্ম্ম! এঁরা এক এক দিক্‌পাল হয়ে বসে আছেন। আত্মার এই বিস্তার একবার ধর ত। কি ব্যাপার! আজানজ-দেবতার সহস্র আনন্দ—ওঁদের ঐ আনন্দের সহস্রগুণ আনন্দ হল ব্রহ্মলোকস্থ জীবের। আজানজ দেবতারাও তাঁদের কাছে ম্লান। এ কি! তাঁরা যে ব্রহ্ম-সন্নিধিতে বর্ত্তমান! আর আজানজ-দেবতারা আপন আপন ভূমিতে বিভোর হয়ে রয়েছেন। এখানে দুটা পয়সাতেই আমরা আনন্দিত হই, ওখানে তার তুলনায় কত আনন্দ হবে? ব্রহ্মস্থ পুরুষ কিন্তু আনন্দে বিভোর হবে না। সে আনন্দকে খুঁজছে না; যাঁর আনন্দ, তাঁকে খুঁজছে। সর্ব্বত্র সে অসঙ্গতা বজায় রেখে চলেছে, মায়ের কাছে যাবে বলে—মা মা মা! তার সঙ্গে আর কেউ যাবে না। এখানকার হিসাব নিয়ে কি ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যায়? সেই ভূমি controlled বা আভাসিত মাত্র হয়ে এখানে একটু চিকির-মিকির করে! আহা! চতুর্দ্দশ ভুবন গণ্ডূষমাত্র জলের মত যাঁদের জ্ঞানে উদিত হয়, তাঁরা কি প্রজ্ঞায় বসে আছেন বল ত? তাঁদের কি অগাধ আত্মবোধ! আমাদের চতুর্দ্দশ ভুবন বলতে

গায়ে কাঁটা দেয়—তাকে অনন্ত বলে মনে হয়। আর তাঁরা বললেন কি না—আত্মত্বে এ গণ্ডূষমাত্র জলের ন্যায়। আমাদের মা বলা তাই কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢোকান। তবু পরম সৌভাগ্য! এ তত্ত্ব ভাষায় বলা যায় না! ভগবতি! ভগবতি! ভগবতি!

এই প্রজ্ঞালোক স্তরে স্তরে খেলা করছে; তাই দেখে ঋষি বললেন, "এই মর্ত্ত মানব, তুই এত দূর অবধি যেতে পারিস।" ভাবিস না যে, এই সব লোকে একবার একবার করে মরে, তবে যেতে হবে। এই ভূমিতেই, এইখান থেকেই এই সব আনন্দ ভেদ করে যেতে পারবি বৎস! কেন না, মা এইখানে—এই মানুষ-ভূমিতে আত্মবোধে ধরা পড়েছেন। যেমন আঙ্গুলের ডগা দিয়ে এতটুকু তড়িৎ ছুলেই মৃত্যু, সেইরূপ তড়িৎময়ী মাকে তোরা আত্মবোধে ধরে ফেলেছিস—এ সহজ কথা মনে করিসনি! বুকের ভিতর যে আলো জ্বলছে, যার দ্বারা চোখ, মুখ, নাক, কাণ সব ক্রিয়াশীল রয়েছে, তার ভিতর ছুঁয়ে দেখ—এরই নাম আত্মজ্ঞানে প্রবেশ। তড়িৎপ্রবাহ তখন কোথায় বইবে? বুকের ভিতর দহরাকাশে। এই আকাশের ভিতর তখন গোটা প্রাণ-ক্রিয়া দেখতে পাবি। এ ইনি ছাড়া আর কেউ নয়! আমার জীবন গো! আমার প্রাণ গো! আমার চোখে, মুখে, নাকে, কাণে, হাতে পায়ে কে দাঁড়িয়ে? ভগবতী। বাইরে নয়—ভিতরে ভিতরে আমার সমস্ত অস্তিত্বে—আমার ভূত থেকে আত্মা পর্য্যন্ত আগাগোড়া মা-ই রয়েছেন। মা! মা! মা! সত্যি মা? দেখে বল্। এখানে দেখতে পাচ্ছিস, এই সাড়ে তিন

হাত শরীরে বসে আছি—তোর শরীরও তাই। আসলে কিন্তু দ্যু ভূ অন্তরীক্ষ, এই তিনে বিস্তৃত হয়ে বসে আছিস—এ দেখতে পাস? কোথায় আপনাকে খুঁজছিস? সে কতটুকু? বেটা, চোখ যখন জ্বেলে দেব, তখন দেখবি। আহাহা! ভগবতি! বাহ্যে দ্যুলোক কাকে বলে? যেখানে সূর্য্যের মত স্থির গ্রহ-সকল অবস্থান করছে। যেখানে চঞ্চল গ্রহ ঘুরছে, সে হল অন্তরীক্ষলোক, আর মাটি হল ভূলোক। তাঁর সঙ্গে এই তিনেরই সাক্ষাৎ সংযোগ কি রকম?

"এতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপং সূর্য্যঃ"—বাহ্যে মন দ্যুলোক পর্য্যন্ত আয়তন নিয়ে বসে আছে। আর প্রাণ? "আপঃ শরীরং জ্যোতীরূপম্ অসৌ চন্দ্রঃ।" "আপঃ শরীরং" বলতে শুধু এখানকার জলই নয়। এর উপর পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত স্থূল জলের সূক্ষ্ম আবর্ত্তন, তার পর চন্দ্রমার আবর্ত্তন। এই হল তোর প্রাণের বিস্তার--প্রাণ-শরীরের এই বিপুল ঢেউ। "এতস্যা বাচঃ ভূঃ শরীরং জ্যোতীরূপম্ অগ্নিঃ।" এই ত্রিবৃৎ হয়ে মা বসে আছেন। ত্রিবৃৎরূপিণী মায়ের এই স্থূল ভৌতিক শরীর। মা তোমরই মত ভৌতিক-শরীরী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতি-সম্পন্ন। এর ভিতর শক্তিস্রোত খেলা করছে। তোমার যেমন পিলে যকৃৎ ইত্যাদি, এঁরও তেমনি শক্তিময় শরীর। এর নাম শিরা, এর নাম ধমনী, এই মাংসপেশী, ইত্যাদিরূপে এ-সকলের নামকরণ করা যায়। মায়ের ঐ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামকরণের অনুসরণে এই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামকরণ

হয়েছে। কত তোদের শেখাব? এই শরীর এবার চলল ত্রিবৃৎ হয়ে। কিরূপ? পৃথিবীস্থ যে অগ্নি, তা থেকে সোম নির্গত হয়ে অন্ন, উদ্ভিদ্, গাছপালা তৈরি হচ্ছে। এখানে তুমি মায়ের আদরের ছেলে। তোমার নাভিতে বৈশ্বানর। আদিত্যের তেজের দ্বারা বিধৃত ভূত—কঠিন জড়ত্ব—সূর্য্যত্বের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঐখান থেকে সোম নির্গত হয়ে তোমার শরীরে বৈশ্বানর তৈরি হচ্ছে, উনি সূর্য্যের শক্তিকে পরিপাক করছেন। পৃথিবীর মাটিত্ব বলে যে বৈশিষ্ট্য, তার যোগান হচ্ছে সূর্য্যের দ্বারা, তার পরে সোমরসে চালিত হচ্ছি। মায়ের পেট থেকে পড়া মাত্রই বৈশ্বানরের তাড়নায় 'কি খাই' বলে হাঁ করেছ। যা খেলে, বৈশ্বানরের দ্বারা তা পরিপাক হল। ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্ম অংশ মন, জলের সূক্ষ্ম অংশ প্রাণ, তেজের সূক্ষ্ম অংশ থেকে বাক্ তৈরি হল। ত্রিবৃৎ আবার ঘুরে এল। তখন এই জীবত্বকে খেলে—একটা জ্ঞানময় সত্তা জেগে উঠল। এইরূপে তোমায় এই ত্রিবৃতের পাকের ভিতরে একটি মানুষ করে ধরেছি। কত বড় বিশাল বিশ্বের আবর্ত্তনে তুমি ঘুরছ দেখ। এ দেখে রোমহর্ষণ হচ্ছে? এইবার এই মূর্ত্তিকে বল ত—আমার আত্মা! কাকে আত্মা বলা হচ্ছে, বুঝে দেখ ত? এ ছবি যদি বুকে না খেলা করে, এর ধারণা যদি না হয়, তা হলে মাতৃত্বের কোনও চেতনা হবে? ঐ ভাতি রঞ্জয়তি গচ্ছতি—পূজার সময় এই ছবি তোদের দেখতে বলছিলাম। এই চেতনাকে জ্বেলে দেখ ত, ভগবান্ সামনে দাঁড়ান কি না। তোমরা এতে শ্রদ্ধা-

সম্পন্ন হও। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" এই চোখ রাখতে হবে। এখনই চল, ঐ শরীরে ঢুকে পড়ি। জ্ঞানে এঁকে ধারণা কর, তা হলেই সংশয় দূর হবে, বুদ্ধি স্থির হতে থাকবে, জ্ঞান পাকা হবে। যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে এই জীবনেই তুমি এঁর দর্শন লাভ করবে। এত বড় যাঁর দান, তিনি কি তোমায় তোমার দুটা আঁকা-বাঁকা কর্ম্মের জন্য কাণা করে ফেলে রেখে দেবেন? প্রাণ উৎফুল্ল হয়েছে মানে, অন্তরীক্ষ-লোক জেগে উঠেছে। রেডিও প্রভৃতি ভৌতিক জগতের আবিষ্ক্রিয়াগুলি যে ক্ষেত্র থেকে হচ্ছে, প্রায় সেই ক্ষেত্র পর্য্যন্ত এসে গিয়েছি। তাই ত, এই দিক্ থেকেই ত শক্তি রে! কাছা-কাছি এসে পড়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার! অক্ষরত্বকে অবলম্বন করেই আমি তোমার শরণাগত হলাম—এই কথা বলতে বলতে আমরা যাব। অক্ষরত্বে এলাম মানে, তাঁর শরণ নিলাম। থামতে কি ইচ্ছা করে? এই বলতে বলতে প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যাক না। ওঃ!

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার।

তিন গুণের সংমিশ্রণ ছাড়া কোন ক্রিয়া হয় না। কোন কাজ করতে গেলেই তিনটি গুণের প্রকাশ হবে অর্থাৎ একটি প্রকাশ-ভাব, একটি স্থিতি-ভাব ও একটি ক্রিয়া-ভাব আসবে। এই তিনটি ভাবের নামই তিন গুণ—স্থিতিভাব তমঃ, ক্রিয়াভাব

রজঃ—যাতে কর্ম্ম চলছে, প্রকাশ-ভাব সত্ত্ব। ক্রিয়া মানেই, এই তিনটি ভাব, কোনটি বেশী, কোনটি কম-রূপে পরস্পরের সঙ্গে মিলে আছে। আবার প্রকাশ, গতি এবং স্থিতি, এর প্রত্যেকটির মধ্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আছে। কোথাও প্রকাশ বেশী, কোথাও গতি বেশী, কোথাও থাকা বেশী—গুণ বলতে এই-ই বুঝতে হবে। পরমাত্মতত্ত্বে বা ভগবানের যত কাছাকাছি যাবে, প্রকাশ-গুণ তত অধিক হবে; মধ্য ভূমিতে ক্রিয়াশীল অবস্থা এবং শেষ প্রান্তে জড়ধর্ম্ম অধিক হবে। ভগবত্তার কাছে আলোকভাব, মধ্যস্থলে গতিভাব, আর থাকা-ভাবটি ডগের দিকে গৃহীত হয়। তা হলে এই সমস্ত বিশ্বপ্রকাশ-মূর্ত্তিই ভগবত্তার একটি বিপুল যজ্ঞ। "যজতে ইতি যজ্ঞঃ"—তিনি আপনি আপনার যজনা করছেন। য+জ্ঞ—য হল গতি, জ্ঞ হল স্থিতি; স্থিতিশীল 'জ্ঞ'-তত্ত্ব, আর গতিশীল 'যৎ'-তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেন, করে আপনি আপনাকে অর্চ্চিত, রশ্মিময়, জ্যোতির্ম্ময় করছেন। তাই তিনি আপনার দ্বারা আপনাকে যাজ্ঞিত করছেন; রশ্মিময়, প্রকাশময় করছেন। 'জ্ঞ' মানেই হল, অন্তর্নিগূঢ় ভগবান্‌কে অর্চ্চিময়, প্রকাশময় করছি; ফুটিয়ে তুলছি। বিশ্ব-সৃজনরূপ ক্রিয়াতে ভগবান্ আপনি আপনাকে অর্চ্চিময় করলেন, প্রকাশময় করলেন; সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপার একটি ব্রহ্মযজ্ঞ। এই যজ্ঞ যখন তিনি প্রকাশ করেন, তখন এ থেকে কি জাত হয়? এ অর্চ্চিপ্রকাশ কি? তিনি আপনি আপনাকে জানলেন; সেই জানা এত অর্চ্চিময়,

জ্যোতির্ম্ময় হল; সুতরাং সে জ্ঞান-প্রকাশ অন্য আর কিছুরই নয়; তাই তার নাম হল—ঈক্ষণ, দর্শন, স্বয়ম্প্রকাশ চোখের দৃষ্টি—প্রদীপ-জ্ঞানহীন প্রকাশ। তাই প্রথম অর্চ্চিই হল ঈক্ষণ। ঈক্ষণময় হওয়া মানে, যজ্ঞত্বের আগুন জ্বালা। আর সেই ঈক্ষণটি হল বাঙ্ময়। তার প্রথম মূর্ত্তি হল বাক্। সে ঈক্ষণটি বাক্যের আকারে পাকিয়ে উঠল, এতেই বহ্নি স্থাপন করা হল। তিনি বাঙ্ময় হলে তাঁ থেকে কি নির্গত হল? বেদন—নানারকমের ভাব। এ ভাব কিন্তু ছবির মত নয়—এ হল সাত্ত্বিক বোধক্রিয়া। তাঁর নিজত্ব যে ভাবে দুলতে লাগল, যে রস খেলতে লাগল, তারই নাম হল বেদ ও সোম। তাঁর বাক্য থেকে বেদের উৎপত্তি—কথা থেকে বেদ উপনিষদাদি তৈরি হল। আর সেই অপৌরুষেয় আত্মানুভূতি আরও বাইরে এসে কর্ম্মময়, ক্রিয়াময় হয়ে ফুটল। ভাব গভীরতর হলে ক্রিয়ার আকার নিয়ে নিজেকে সঞ্চালন করে; তখন সে স্থূল ক্রিয়ার আঁকার গ্রহণ করতে থাকে। এই স্থূল ক্রিয়াত্বই হল শক্তিত্ব। এই শক্তিত্ব গ্রহণ করার নামই বাহ্য বিকাশ। আগে বহ্নি বা বাক্রূপ বেদ, তার পরে ভাবরূপ সোম, তার পরে কর্ম্মরূপ সূর্য্য। আগে জ্বলে উঠলেন বাক্, তার পরে সোম, তার পরে সূর্য্য। এই ত্রিধা কর্ম্মময় প্রকাশ তাঁ থেকে এই ভাবে আসে বলে, আদি যজ্ঞ-কর্ত্তার প্রথমে হয় আত্মযজ্ঞ অর্থাৎ বাগগ্নি জ্বলে ওঠে; পরে বেদনক্রিয়া বা জ্ঞানযজ্ঞ, তার পরে স্থূল ক্রিয়ায় কর্ম্মযজ্ঞ—এই ত্রিধামূর্ত্তিতে এই বিশ্ব ফুটে রয়েছে। বহ্নিমুখে এই যে যজ্ঞ, এতে

আসতে গেলে, কর্ম্ম-সকল যেখানে বিধৃত হয়ে রয়েছে, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জেনে কর্ম্ম করতে পারলেই ঠিক করা হল না কি ? যে এইরূপ জানতে জানতে স্থূল কর্ম্ম করছে, সেখানে ব্রহ্ম স্থূলরূপে পুরুষ হয়ে প্রকাশ হয়েছেন ; এই পুরুষের নাম ব্রাহ্মণ। ঐ দর্শন পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত কাজই ব্রাহ্মণ করতে পারবে। অভিজ্ঞ লোক গোলাপের কুঁড়ি দেখেই ভাল-মন্দ জানতে পারে ; অনভিজ্ঞে পারে না। অব্রাহ্মণেরা তেমনি এই জগৎরূপ কুঁড়ি দেখে একে ব্রহ্মকোরক বলে চিনতে পারছে না। আর যে অভিজ্ঞ, সে দেখছে—বাঃ! বাঃ! এ সেই গোলাপ! যে পুরুষ ঠিক দেখছে, তার কাছে জগতের একটা ধূলা পর্য্যন্ত ব্রহ্মকোরক বলে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। তারই নাম ব্রাহ্মণ—তদিতর আর সব শূদ্র। এই জন্য ব্রাহ্মণের নাম ওঙ্কার। সৎ পুরুষের মহৎ প্রকাশের নাম ওঙ্কার ; কেন না, সে প্রকাশ ব্রহ্মত্বেরই প্রকাশ। 'আমি ব্রহ্ম', এই জ্ঞানের যে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ,—তাই দেখেই ব্রাহ্মণকে ওঙ্কার বলা হয়। অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ অঙ্গই ওঁ। ব্রাহ্মণ যে এই প্রকাশ-শক্তি-দর্শনময়—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

তা হলে ব্রাহ্মণের জগৎ দেখা কি শক্ত ?, গুরুর কৃপায় যার জ্ঞানতত্ত্ব ফুটেছে, প্রতি ক্রিয়ার তলায় যে ত্রিবৃৎ দেখছে,—তার এ দর্শন সহজেই হবে। সে দিন বলেছি, কর্ম্মমাত্রেই অগ্নি সোম সূর্য্য প্রকাশ হচ্ছে—আবার উল্টা দিকে সূর্য্য সোম অগ্নি ফুটছে। এ থেকে বোঝ, ব্রাহ্মণের এই যজ্ঞ-দর্শনটি কত বড়

জিনিষ। একরকমে না একরকমে এই ত্রিবৃৎ-দর্শনই ত ব্রাহ্মণের দর্শন? প্রতি ক্রিয়ায় এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণের নজরে পড়বেই। তার চোখে আর এই পৃথিবী জমাট মাটি বলে ঠেকবে না। তার চোখে ঠেকছে,—আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়েই এই জগৎ হয়েছে। মানুষ যদি ব্রাহ্মণ হতে পারে, তবেই এই তৃপ্তি পায়; নতুবা সে শূদ্র থেকেই মরবে। মাটির এই তামসিক মূর্ত্তি ভেঙ্গে-চুরে কি করে দিলে! ভাত খেতে খেতেও যজ্ঞ করা যায়? কথা কইতে কইতে, ঘুমুতে ঘুমুতে, সমস্ত কাজ করতে করতে যজ্ঞ করা যায়? যজ্ঞ পরমাত্মস্বরূপ, বেদ অক্ষর পুরুষস্বরূপ, ওঁকার ক্ষরপুরুষস্বরূপ। অক্ষরের প্রভাবে বেদন ফোটে; অক্ষরই ক্ষর হয়ে ভোক্তা পুরুষ হন; উনিই অব্যক্তকে চালিয়ে বেদন প্রকাশ করেন; উনিই অভোক্তা থেকেও ভোক্তা পুরুষ হন—ভোক্তা সাজতে হয় ওঁকেই—বেদন জাগাতে হয় ওঁকেই। ক্ষর হল পশু জীব। তিনি যখনই আগুন জ্বালালেন, তখনই পরমেশ্বর হলেন —তদৈক্ষত। আর না দেখলেই পরমাত্মা রইলেন। তা হলে যজ্ঞ, বেদ ও ব্রাহ্মণ—এ পরমাত্মারই ত্রিবৃৎ প্রকাশ। তা হলে ব্রাহ্মণের জ্ঞানেতে জগৎ পরিচালিত হওয়া উচিত নয়? এই ব্রহ্মপ্রবাহ কর্ম্ম পর্য্যন্ত কিরূপে বিস্তৃত হয়েছে, সেই চোখ রেখে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের ছবি আমরা কথায় কথায় জাগ্রত করি 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্রের দ্বারা। এই জন্যই এ মন্ত্রটি এত প্রচলিত—এই ছবিখানার স্মারক বলে। পরমাত্মতত্ত্বের ত্রিভঙ্গিমা—ওঁ তৎ সৎ। "সদেব সৌম্য

ইদমগ্র আসীৎ”—এই হল সৎতত্ত্ব। এখানে পরমাত্মতত্ত্বই সৎ-পদবাচ্য। তৎ—অক্ষরতত্ত্ব ; ঈক্ষণ—বেদন-ক্রিয়া আরম্ভের তত্ত্ব। তন্ ধাতু বিস্তারার্থক। যেখান থেকে উনি নিজের বিস্তার আরম্ভ করলেন, তার নাম তৎ। অনির্দ্দিষ্ট বিস্তার থেকে নির্দ্দিষ্ট বিস্তার গ্রহণ করলেন—যা থেকে সন্তান সন্ততি আরম্ভ হল। অক্ষর থেকে বিস্তার আরম্ভ হল। ওঁ হল সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ময় বিকাশ-তত্ত্ব। এরই নাম হল—ওঁ তৎ সৎ। ওঁ ক্ষর-পুরুষ। যেখানে বিশ্বপ্রকাশ, সেখানেই ক্ষরপ্রকাশ ; ব্রাহ্মণ তার প্রতীক। তৎ অক্ষর। সৎ পরমাত্মতত্ত্ব।

জড়ত্বকে সরিয়ে 'জ্ঞানস্বরূপ' এই তত্ত্বকে যে মাথায় ধরতে শিখেছে, সে এই সব কথা শুনতে শুনতেই ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। মাটিতে দাঁড়িয়ে নয়—'জ্ঞানস্বরূপ' এই কথায় দাঁড়িয়ে দেখ—এর ভিতর বিজ্ঞানের কত আলো নিহিত রয়েছে। সমগ্র বিজ্ঞানটিকে কুটিয়ে ধরে রেখেছেন এক মহাসত্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টি অতিক্রম করে আপনি আপনার দ্বারা চিরবিজ্ঞাত ও অনির্ব্বচনীয় হয়ে রয়েছেন ; তাঁতে না গিয়ে তাঁকে বোঝবার উপায় নেই। তিনিই বিস্তৃতি লাভ করেছেন ক্ষর হয়ে, যার আদি পুরুষ অক্ষর এবং পিতামহ পরমাত্মা। এতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নেই ; এখানে—এই জ্ঞানে সকলেই সমান। এঁকে দেখার নামই ব্রাহ্মণ হওয়া। এঁকে দেখলে হাড়ি মুচিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে, স্ব স্ব ভূমি থেকে উর্দ্ধে চলে যাবে। আর এঁকে দেখা না হলে পর পর জাতিত্ব, বর্ণত্ব লাভ করে করে

ক্রমবিকাশ ও বিবর্ত্তনের পথে অনেক জন্মে হবে। আর এই জন্মেই পেতে পার, যদি ওঁর দর্শন পাও।

'জ্ঞানস্বরূপ গুরু' এই কথাটি মনে এলেই এই ব্রহ্মাবয়ব চোখে পড়বেই। এই বিজ্ঞান যদি সত্য সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তবে ভূতে ভূতে ব্রহ্মদর্শন এসে যাবে। যেমন কলেজে যেতে হলে একটা বাগানের পাশ দিয়ে যেতে হয়, তাতে বাগানের কতকটা জ্ঞান হবেই, তেমনি ভগবানে যেতে হলে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের বিস্তার স্পর্শ করে যেতেই হবে। আবার আত্ম-তত্ত্বের এই তিন পুরুষের—সূর্য্য সোম বহ্নির ভিতর যে আত্ম-তত্ত্বেরই প্রকাশ, আত্মার সপ্রকাশত্ব দেখে তা বুঝে নিচ্ছ। 'নিজ' নামে এই যে জ্ঞান, এতেই বহ্নিত্ব, সূর্য্যত্ব ইত্যাদির উপাদান রয়েছে। 'নিজ' এই জ্ঞানে 'সর্ব্ব'জ্ঞান বাধিত হয়ে গেল; আর কোন জ্ঞানের লক্ষণ এখানে রইল না। তাঁর স্বভাবই হল এই স্বপরিণামী। এতেই ভাষ্যকারদের ভিতর এত মারামারি কাটাকাটি। এই নিজ-বোধই বহ্নি, সূর্য্য ও সোমরূপে ফুটে উঠবার উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। 'নিজ' নামে যিনি একেবারে নিষ্কল—যাঁতে আর কোন জ্ঞানমূর্ত্তি স্পষ্ট হয় না—যাঁকে ঈশ্বর, দয়াল, মহান্, কোন শব্দেই অভিহিত করা যায় না, করলেই সে হল অন্য জিনিষ, এমন যে বিশুদ্ধ তত্ত্ব, তিনিই হলেন বহ্নি, সোম ও সূর্য্যের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ। এত বড় কথা আজ পর্য্যন্ত জগতে প্রকাশ হয়নি, এমন ভাবে বিশ্লেষিত করে ফুটিয়ে বলা এ পর্য্যন্ত কারও সাধ্যে হয়নি। মহাশয়! কি দেখে

এত বড় শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলছেন ? শাস্ত্র বলে আজকাল যা চলছে এবং জগতে আধিপত্য করছে, এ কথা তার একান্ত বিরুদ্ধ ; অথচ ইহাই প্রকৃত ঔপনিষদিক জ্ঞান। কি করে ? ভাল করে দেখে নাও। তোমরা যাঁকে নির্গুণ পরমাত্মা বলছ, উনি হলেন এ দিক্ থেকে আত্মার দ্বিতীয় মূর্ত্তি। প্রথম মূর্ত্তি হল ক্ষরণশীল—সকলের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এ তোমরা নিজেই হও—বড় গরম, বড় কষ্ট, বড় দরিদ্র। তা হলে এই 'নিজত্বে'র গায়ে জড়িয়ে নেবার ক্ষমতা আছে। কপিলও বলেছেন,—"দৃশিঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" অতীব শুদ্ধ হলেও এঁর প্রত্যয়-গ্রহণ-ধর্ম্ম আছে। ইহাই আত্মত্বের বৈশিষ্ট্য —কিছু বুকে ঠেকলেই তিনি আত্মময় করে নেবেন। এ শক্তি ভগবতীতেও আছে। কাম, ক্রোধ, যা হয় তাঁতে ঠেকাতে পারলেই হল। এঁতে ঠেকেছে কি ইনি তাকে জড়িয়ে নিয়েছেন। এই অনুলিপ্ততা হল আত্মার ক্ষর-মূর্ত্তি। দ্বিতীয় মূর্ত্তি একান্ত নির্লেপ। ইনি কোন ধর্ম্মের ধার ধারেন না। তৃতীয় পরমাত্মত্ব। তাঁকে তোমরা দেখ নাই। ক্ষর ও অক্ষরত্বের উপর আধিপত্য—ঘটনা ঘটানর কর্ত্তৃত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, তাও পরমাত্মত্বে আছে। কি করে আছে ? সপ্রকাশ কথাটি স্মরণ কর। আপনি আপনার দ্বারা অপনাতেই প্রকাশিত। এই আত্মত্বের ভিতর এই ধর্ম্ম লুকান আছে। এটি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই লুকিয়ে থাকাটির জনকত্বভাবে—এই ক্রিয়া-প্রকাশের পিতৃত্ব ওঁর ভিতর লুকান আছে। আপনি অপনাকে আপনার

ভিতরে রেখেছেন, জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় একীভূত হয়ে রয়েছে। তা হলে তিনি আপনিই শক্তি—যদিও 'শক্তি' নামে কিছু থাকে না, আপনিই স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ—কিন্তু সে প্রকাশ থেকে শক্তি জন্মাতে পারে। আপনাকে প্রকাশ মানে, ক্ষর পুরুষকে প্রকাশ করা। ক্ষরত্ব মানেই অনুলিপ্ততা। আমি আমার দ্বারাই আমাকে আমাতে অনুলিপ্ত করে রেখেছি। যদি কেউ অনুলিপ্ততা মাখে ত সে এই তত্ত্ব। আবার অনুলিপ্ততা মাখা বা না মাখার নিয়ন্তৃত্ব তিনিই নেবেন। আর এই যে শক্তি, ইনিও তিনিই। তাই নিজের নিজত্বই শক্তিত্ব। তাই এ জগতের ত্রিবৃৎ—জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়—সবটাই জনকস্বরূপ আত্মত্বে নিহিত রয়েছে। তা হলে 'নিজ'-তত্ত্বটি এরূপ যে, সকলের সঙ্গে অনুলিপ্ত হতে পারি, আবার অনুলিপ্ত হয়েও আলাদা থাকতে পারি, আবার অনুলিপ্ত হওয়া বা না হওয়া আমার ইচ্ছাধীন—আর কারও ইচ্ছাধীন নয়। এই তিন স্বরূপই নিজের ভিতর নিহিত রয়েছে। সুতরাং 'জ্ঞ' হলেন অবাধ স্বাধীন, জানা হল পরাপ্রকৃতি, হওয়া হল অপরা প্রকৃতি। আত্মার এই তিনটি ধর্ম্ম যিনি একসঙ্গে পাবেন, তিনিই আত্মজ্ঞ পুরুষ। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য্য নিতে হবে। আত্মা, প্রকৃতি প্রভৃতিকে নিয়ে তবে ব্রহ্ম হন, এ সব কথা গোঁজামিলের কথা। যাঁর বুকে ছাড়া আমার বসবার, দাঁড়াবার, শোবার স্থান নেই, এই তিন ধর্ম্মই যখন তাঁতে দেখব—আমার সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে আছেন, আবার আমায়

ছেড়েও আছেন, আবার আপনি আপনাকে সব কিছু করে তুলছেন, তখনই আমার যথার্থ আত্মদর্শন হবে। আমি নিজেকে দেখতে যাচ্ছি, আপনাকে ভগবান্ করে তুলছি; এ করতে গিয়ে—'ভগবান্ আছেন' এই বোধে ঈক্ষণ করছি। নিজেই নিজেকে পূজা করতে পারে—আর কাউকে পারে না। নিজেই নিজেকে ভালবাসতে পারে—আর কাউকে নয়। বাইরে যে ভালবাসা, সে ভালবাসা এরই রশ্মি।

তা হলে এমন অনির্ব্বচনীয় ভাবে একজন রয়েছেন, যাঁতে অনির্লিপ্ততা বা নির্লিপ্ততা, বীজত্ব বা অবীজত্ব, কিছুই বলার উপায় নাই। আহা, এমন ব্রহ্ম আর পাব? যদি কেউ এসে আয়ু, ধন, ঐশ্বর্য্যের বর দিতে চায়, আর এই নিজেতে নিজে বিভোর হয়ে থাকা, যে নিজের ভিতর সব লুকিয়ে রয়েছে, এর কোন্‌টা তোরা নিবি? এ তত্ত্ব, এ দেবী আশ্চর্য্য নন? এই হুঁশটা প্রতিদিন তোদের দিচ্ছি। যেমন তোদের জড়ের দিকে মাথা ঢুকবে, অমনি 'শ্রীগুরবে নমঃ' বলে তাকে জ্ঞানের দিকে পাল্টে নিবি। যাঁর দ্বারা সমস্ত নির্দ্দিষ্ট হয়, তিনি 'আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম।' এই জ্ঞানের দাম আমি আদায় করে নেব। তোদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেব। তোদের ভালবাসা এতে ছাড়া আর কোথাও দাঁড়াতে দেব না।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার।

পরমাত্ম-প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে, আপনি আপনাকে আপনার দ্বারা জানছেন—এইরূপ স্বরূপধর্ম্ম যাঁর, তিনি পরমাত্মা। আমরা যাঁকে অন্বেষণ করছি, এই হল তাঁর মহিমা। এই মহিমা যেখানে ক্রিয়াশীল হয়, সেখানে বিশ্ব-প্রকাশ হয়। আর এই মহিমা ক্রিয়াশীল না হলে—অনির্ব্বচনীয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে আছে; তখন 'জানা' নামে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয় না। 'জানা' ব্যাপার যেমনি পরিস্ফুট হয়, অমনি 'আমি আমাকে জানছি' এই বোধ আসবে—'আমি'কে তৈরি করতে হবে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় 'আমি' বোধ নেই; যখনই বিশিষ্ট ভাবে নিজেকে জানলেন, তখনই 'আমাকে জানছি' এই বোধের উদয় হবে। তা হলে আমরা তাঁতেই জন্মে রয়েছি, যিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে রয়েছেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন চাঞ্চল্য যাঁতে নেই; সেই স্থিতিতেই আমি জন্মে আছি। 'আমি আমাকে জানছি' এই জ্ঞানে যেখানে যেখানে তিনি মূর্ত্ত—আয়তনযুক্ত হলেন, সেখানে সেখানে দেবতা বা পশু যে কেউ, ঠিক এই রকমে জন্মেছে। তিনি 'আমি আমাকে জানছি' বলছেন মানে, সেখানে একটি 'আমি' জাত হল। এই 'আমা'তে আর ঐ চেতনস্বরূপ ভগবতী —যাঁর দ্বারা আত্মশক্তির পরিচয় পাচ্ছি, এ উভয়ের মধ্যে দাঁড়াবার মত আর কেউ নেই—এ উভয়ে বিন্দুমাত্র ভেদ বা ব্যবধান নেই। তা হলে এই 'আমি' জিনিষটি কি? তাঁতে ও আমাতে পার্থক্যের প্রভেদ কি? 'তিনি' আর এই যে 'আমি',

এ উভয়ের কিসের প্রভেদ ? প্রভেদ একটি ক্রিয়ামাত্র। জিনিষ সেই একই। 'আমি' এই নামে কাকে অভিহিত করছি? তাঁকেই। আমি নামে তাঁরই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তাঁর আর আমার মধ্যে প্রভেদ নেই। প্রভেদ একটি ক্রিয়ামাত্র। যখনই ক্রিয়া হয়, তখনই দুটি জিনিষ আসে—নাম ও রূপ। ক্রিয়ার রকমটা, গতিটা হল রূপ, আর রকমটায় যে জ্ঞানতত্ত্ব আছে—জানতে পারা বলে একটি এবং হওয়া বলে একটি জিনিষ আছে, এই হল নাম, রূপ ও কর্ম্ম ; এই তিন আকারে নিজেকে প্রকাশ করার নাম 'আমি'। 'আমি' একটা নাম ; তার যে বৈশিষ্ট্য ফুটল, সে একটা রূপ, আর এই দুটিকে ফুটিয়ে যা হল, সে একটি ক্রিয়া। জ্ঞানতত্ত্বে যখনই কিছু প্রকাশ হয়, জ্ঞানরূপ একটি ক্রিয়া ফুটিয়েই সে হয়। নাম, রূপ ও ক্রিয়া কি জিনিষে গড়া ? চেতন ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। এই তিনটিই উপাদানতঃ তিনি। বরফের উপাদান কি ? তাতে কি এমন কোন একটা কণা আছে, যে জল ছাড়া আর কিছু ? তেমনি কাপড় আগাগোড়া সবই তুলা। তেমনি আমি কি ভগবান্ ছাড়া আর কিছু ? খালি উনি একটা ব্যবহার প্রকাশ করেছেন মাত্র। তবেই দেখ, আমরা জ্ঞানের অভাবে ভগবানের সঙ্গে কত পার্থক্য রচনা করেছি। ভগবতীই আমি ও তুমি সেজেছেন। তাঁ থেকে খালি একটা বোধক্রিয়া ফুটে উঠেছে—যেমন বরফ জলের উপরই ফুটেছে। ঠিক তেমনি বৎস, জগতে যত কিছু কার্য্য আছে—সে সব কারণের উপর ফুটে ওঠে এবং সে একটা নাম ও গতি

মাত্র। এই যে গতি, এই যে নাম-রূপ ফোটা-আকারীয় আমি, ইহাই তোমার আদি-মূর্ত্তি। ঐ তত্ত্ব যেমন আমির উপাদান, তেমনি আমির উপর যা কিছু ফুটেছে, 'আমি'ই তার উদ্ভবক্ষেত্র। তা হলে আমিত্ব একটা শক্তিত্ব; সে বোধ-শক্তি, জানা-শক্তি। লোহা গোল ছিল, লম্বা হল—এ-জাতীয় ক্রিয়া নয়; এটি হল বোধক্রিয়া; যাকে 'জানা' এই শব্দের দ্বারা গ্রহণ করলাম। জানা শব্দের সার্থকতা কত দূর, তা সে দিন বলেছি। আত্মজ্ঞান থেকে সমস্ত জগৎ পর্য্যন্ত সবই জানা; বিষয়াদি ভোগও জানা এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এ-ও জানা। তা হলে আত্মজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে স্থূলাদপি স্থূল পর্য্যন্ত সবই হল এই জানার মহিমা—'জানছি' এই-জাতীয় মহাশক্তির প্রকাশ। আত্মা থেকে স্থূল পর্য্যন্ত একেবারে নিজের ভিতর গ্রহণ করার নামই জানা। আর সেই 'জানা'র আদি 'জানা' হল 'আমি' এই মূর্ত্তি, আর শেষ মূর্ত্তি হল ভূত, হলুম—এই পর্য্যন্ত জানার বিস্তার। তা হলে 'অহং'এর পরে শব্দ স্পর্শ, রূপ রস ইত্যাদি যা জানা, সে সব অহং থেকেই হচ্ছে এবং আমার উপরে, আমি উপাদান হয়ে, অকার থেকে হকার পর্য্যন্ত দ্বারা যত রকম শব্দবিশ্ব রচনা করা যেতে পারে, সেই সমস্তের বিধৃতি 'আমি বাক্' এই অংশের উপর। সেই জন্য আমি-নামীয় বোধটির নাম অহং।

শব্দবিন্যাস মানে—জানাই ত? সেই জানাকে আমরা জগতে পাঁচ রকমে দেখতে পাই—রূপ জানা, শব্দ জানা, স্পর্শ জানা, গন্ধ জানা, রস জানা। এরই নাম হল—দেখা, শুনা,

স্পর্শ করা ইত্যাদি। তা হলে আমার জানাই হল—রূপময়, স্পর্শময়, শব্দময়, রসময়, গন্ধময়? এ যতক্ষণ না প্রকাশ হল, ততক্ষণ 'জানা'-নামীয় শক্তির সীমায় যেতে পারলুম না। যতক্ষণ না আমার 'জানা'য় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের লহর ফুটে উঠল, ততক্ষণ জানার পূর্ণতা হল না। ফুটে উঠলে—যিনি শব্দ-স্পর্শাদির লহর, তিনিই ত ভগবতী। তাই বলি—এই যে অপূর্ব্ব তত্ত্ব, আমরা যাঁর শরণাগত হয়েছি, ইনি যাকে জ্ঞানচক্ষু দিয়েছেন, সে-ই ধন্য হয়েছে।

বলেছি, ওঁর এই প্রকাশ দু-মুখো। একদিকে রূপ তৈরি হয়, একদিকে সেই রূপ গৃহীত হয়। রূপ-শূন্য গ্রহণ ও গ্রহণ-শূন্য রূপ কখন হয় না। 'জানা' হল সংজ্ঞা এবং 'হওয়া' হল রূপ। এই দুই মেরু একসঙ্গে তৈরি না করে এ মহাশক্তি খেলা করেন না। এই হল নিয়ম। কেন? মেঠাইওয়ালা পরের জন্য মেঠাই তৈরি করে। কিন্তু ইনি আপনার জন্য ভোগ তৈরি করছেন। তাই একদিকে তৈরি হবে, একদিকে ভোগ হবে, এই দুই উদ্দেশ্য সংসাধিত হলে তবেই এর সার্থকতা। জানা এবং তৈরি হওয়া—দুই কেন্দ্রের মত দুই পাশে অবস্থান করে। তাই জড়শক্তির ক্ষেত্রে পজিটিভ ও নেগেটিভ দুটো মেরু না নিয়ে কিছুই তৈরি হয় না। তা হলে মেরুতত্ত্ব চমৎকার বুঝলাম্। কি ভয়ানক ব্যাপার! দু-মুখো সাপ—এক মুখে তৈরি হবে, এক মুখে খাবে। জগতে এমন একটা ক্রিয়া দেখতে পাবে না, যাতে এই দুই ব্যাপার না আছে। ভগবতী

নিজে এইরূপ করছেন বলে প্রকৃতিতেও এই নিয়ম সুনির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তৈরি হবে ও গৃহীত হবে—যাকে ফাঁক করে দেখলে দেখা যায়—জন্মাব ও মরে যাব। কিন্তু ফাঁক করে দেখার কথা নয়—যুগপৎ দেখারই কথা। এমন কোন ব্যাপার নেই, যা একই ক্ষণে যে পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, সেই পরিমাণে আর একদিকে গৃহীত হচ্ছে না। তা হলে জন্মাল ও মরল, এই ভাবে দেখলে সে দেখা তামসিক ভাবেই হল। ভিতরের দর্শন ছাড়া স্থূলভাবে যা দৃষ্ট হয়, সে তামসিক দর্শন। এই মানুষটি বসে আছে। এর ভিতরে না ঢুকে খালি বসে আছে দেখা হল তামসিক দর্শন। আমরা রাজসিক বটে, কিন্তু রাজস বৃত্তি থেকে তামস ভাবেই ক্রিয়া করতে যাই। তোমায় অনিষ্টকর কিছু খাগ্ন দিলুম, তুমি খেয়ে বললে যে, চমৎকার। ঐ খাদ্যের অনিষ্টকারিতা জেনেও খাওয়ার সুখটুকু উপর উপর অবলম্বন করে যে আহার করলে, এই হল তামসিক আহার। ভিতর চাপা দিয়ে উপর উপর ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করা হল তামসিক ভাব। ভগবানের উপাসনা করতে গিয়ে সামনে রইল একটি মাটির ঠাকুর। তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলুম না, মন্ত্রের দ্বারা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে তাঁর বিশ্বরূপ দেখলুম না—একটুখানি ছোট দর্শনই ধরে রইলুম—রাজস অংশ ক্রিয়াশীল হল না—এর নাম তামস উপাসনা। আমি জন্মেছি ১২৮২ সালে—মরব অমুক দিনে, জীবনের এই দুই সীমা দেখলুম; কিন্তু ১২৮২ সাল থেকে অনবরত জন্মাচ্ছি ও মরছি, এটা আর দেখলুম না। জন্ম

ও মৃত্যু, এই দুই মেরু একসঙ্গে ১০০ বছর ধরে ক্রিয়া করতে করতে চলেছে, এই হল রাজস দর্শন। দুই মেরু একসাথে খেলা করতে করতে চলেছে, এটা পাঠ করবে রাজসিক চোখ দিয়ে। তেমনি বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস, জন্ম ও মৃত্যু এই ভাবে চলছে। বলে দিয়েছি, মৃত্যু আর কিছুই নয়, যাঁ থেকে জন্মেছি, তাঁতে ফিরে যাওয়া। ভগবতী আমায় তৈরি করলেন, আমি গৃহীত হলামও তাঁতেই। দক্ষিণ-মেরুতে তৈরি হওয়া, উত্তরমেরুতে গৃহীত হওয়া। আমি যদি যুগপৎ জন্ম ও মৃত্যু দেখতে পারি, তবে কালের ক্রিয়ার উপর আধিপত্য করতে পারব।

আমরা এমন বিজ্ঞানের কাছে এসে পড়লাম, যে বিজ্ঞান প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, কোথাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। জন্ম ও মৃত্যু, ওই দুই তত্ত্বে আমরা এসে পড়েছি; না? আরও শুনলে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হয়ে যাবে যে, এই বিশ্ব হল রজোগুণের প্রকাশ। এই স্থূল আকাশটা তৈরি করার নামই হল এই বিজ্ঞান। এই যে আকাশখানা তৈরি হয়ে রয়েছে, এ একটা বিপুল দিক্। কেমন করে আকাশ তৈরি হয়, এই দুটি কথাতে আজ সে বিজ্ঞানের সূচনা করলুম।

এখন ভগবতীকে কেমন করে আবির্ভূত করি, ইহাই আমাদের জ্ঞাতব্য। ভগবতীকে আমার দর্শনময় স্পর্শনময় করতে হলে ভগবতী-বিজ্ঞান জানতে হবে। আজকালকার এই ঘোর জড়-দৃষ্টি বিদীর্ণ করে, প্রহ্লাদের মত স্তম্ভ ভেঙ্গে নরসিংহ-

মূর্ত্তিতে মাকে বার করতে হবে। •বোধ, মানুষের ইন্দ্রিয়ে থাবা মেরে মেরে যায়। মানুষের ইন্দ্রিয় হল আধখানা নর, বাকী আধখানায় বিশাল ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বশক্তিত্বের অধিপতি-স্বরূপ বিরাজ করছেন। তিনি হলেন সিংহ। এই নরসিংহ-মূর্ত্তিকে স্তম্ভ ভেঙ্গে আবির্ভাব করার জন্য তোমাদের গুরু চেষ্টা করছেন। এর বাইবে যেটুকু স্বার্থে ভরা, ভগবতীর পায়ে সেটুকু ততক্ষণ ঢালতে পারব না—যতক্ষণ না সব স্বার্থ তাঁর পায়ে ঢেলে দিতে পারি। তাই আজকালকার এই কঠিন যুগে—ঐ দেবতাকে আনতে হবে ; সেই জন্য এ সব কথার আলোচনার প্রয়োজন।

এই যে জন্মমৃত্যুরূপ দুই সীমায় রচিত 'আমিত্বে'র একটি নাস্তিক্য-বোধময় স্তম্ভ, এর এক সীমায় মাটি, আর এক সীমায় আকাশ। আমিত্বের মাথায় আছে ফাঁক বা আকাশ, আর পায়ের তলায় মৃত্যু। এই নিয়ে তুমি দুর্বিনীত একটা স্তম্ভ হয়ে আছ। মৃত্যু ছাড়া আর কোথায় যাবে, তা তুমি জান না। জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই মেরু তোমার অস্তিত্ব। তুমি তাই দেখবে—না, স্তম্ভের ভিতরে কি আছে, তাই দেখবে ? স্তম্ভের ভিতর যিনি মহাশক্তিরূপে রয়েছেন, তাঁকে দেখলে মাটি হয়ে যাবে নিত্য ভগবান্, আর ঐ আকাশ হয়ে যাবে মহাকাশ বা চিদাকাশ। আর মর্ত্ত জগৎ হয়ে যাবে নিত্য বিশ্বেশ্বর-মূর্ত্তি, যদি ঐ স্তম্ভের ভিতর দিয়ে যিনি ক্রিয়া করছেন, তাঁকে দেখ। সুতরাং এ জ্ঞান আমাকে পেতেই হবে। আমি চরম পাওয়ার

কথাই বলছি। সে পাওয়া কাকে বলে ? 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। নিজেকে আর কিছু বলে দেখতে পাচ্ছি না। 'আমি তাই' বলে যে পাওয়া, তাহাই চরম পাওয়া।

তাই চরম উপদেশ এইটি এবং এই দুই মেরুর বিজ্ঞানই ভগবতী-বিজ্ঞান। তিনি নিজে এই বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করছেন। তিনি এক দিকে কর্ম্ম সম্পাদন, এক দিকে গ্রহণ করছেন বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন কোন কিছু হয় না। দুই তত্ত্ব একসঙ্গে খেলা করছে। আমরা জ্ঞান নামে যাঁকে চিনতে চলেছি, তাঁর এই দুই গতি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে লাগলাম। তৈরি হল এবং জ্ঞাত হল—এই ভাবে যে পড়তে শিখেছে, তার হল রাজসিক পড়া। বুঝেছ ? অতি সূক্ষ্ম হলেও সরল করে তোমাদের বোঝাচ্ছি।

"মশায়, আপনি বললেন—'তুই বললেই আম বেরিয়ে পড়বে।' কি বলব, সকালে ঘরে দ্বার বন্ধ করে বেলা দুটা অবধি 'আম, আম' বললাম ; আম বেরোল না।" কারণ, যে ভাবে বললে আম বেরোবে, সে ভাবে তুই বলতে পারিসনি। উপরে তামসিক স্থূল মূর্ত্তি খেলা করছে ; ভিতরে স্বভাব তৈরি হচ্ছে—সে দিকে তোর চোখ পড়েনি। তাই পেলি না। তৃষ্ণা পেলে আমি এ-ঘর থেকে বলছি,—"মা, একটু জল দাও।" তৃষ্ণায় অধীর হয়ে পড়েছি। খানিক বাদে পদ-শব্দ কাণে এল। তাই লক্ষ্য করে মা আসছেন জেনে তৃষ্ণা বিনিবৃত্ত হতে লাগল। তেমনি আমার ভগবতী প্রকট হবেন—তাঁর পায়ের দিকে আমার

লক্ষ্য থাকবে না? তিনি আসছেন—তাঁর পায়ের শব্দ হচ্ছে—কাপড় খস্‌-খস্‌ করছে; এ অবস্থায় দেখা, শুনা, স্পর্শ করা প্রভৃতি আমার সব জানাগুলি তাঁর অপেক্ষায় একেবারে ফণা ধরে উঠবে না? 'আমি'রূপ এই স্তম্ভটাতে যদি দেখা, শুনা প্রভৃতি পাঁচটা জিনিষ লুকান থাকে, আর আমি যদি ভগবতীকে চাই, তা হলে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম, গোটা আমিত্ব সজাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই পাঁচটা দাঁড়িয়ে উঠবে না? আমার জন্মের মূলে যিনি, তিনি আসছেন বললে, আমার আমিত্ব এ পাঁচটাকে নিয়ে জাগবে না? যে আপনাকে জ্ঞানস্বরূপে জেনেছে, জ্ঞানের চেহারা নিতে শিখেছে, 'আমি তোমাকে ডেকেছি ও দেখেছি' এ কথা সে কি করে বলবে?

ভগবতীকে দেখে যদি খালি আমার চোখ বা কাণ তৃপ্ত হয়, তা হলে কি আমার ভগবতী দেখা ঠিক হবে? যখন আমার আত্মত্ব থেকে আমার বর্ণ পর্য্যন্ত সবগুলি একেবারে ঝঙ্কারিত হয়ে বলে উঠবে—'তোমাকে পেয়েছি', তখনই ভগবতীকে ঠিক পাওয়া হবে। আমার উপদেশ এখন কোন্‌ দিকে ফিরেছে? ব্রহ্ম-প্রকাশের যে দিক্‌ সংজ্ঞাত্মক, তা ছেড়ে এখন ক্রিয়াত্মক, প্রকাশাত্মক দিকে চলেছি। প্রাপ্তির দিকে তিনি রস দিচ্ছেন? এখন আয়তনের দিকে পূর্ণমাত্রায় মূর্ত্ত হয়ে তিনি বর্ণময় হবেন। সেই দিক্‌ রচনা করবার জন্য তোমাদের শক্তিবিজ্ঞান বুঝাতে আরম্ভ করেছি।

আমার উপদেশের মর্ম্ম আবার শোন। জন্ম এবং মৃত্যুময়

জীব আমরা, যুগপৎ-দর্শনের অভাবগ্রস্ত আমরা খালি দুই সীমাই দেখি; তদভ্যন্তরস্থ শক্তি দেখি না। তাই 'আমার জ্ঞান' ও 'আমার শরীর' এই দুই ভাবে আমরা অবস্থান করছি। জ্ঞানই শরীর, এ আমরা দেখি না। যেমনি শরীর বলেছি, অমনি সে হয়ে গেছে একটা স্থূল জিনিষ; যেমনি বলি জ্ঞান, সে হয়ে গেল একটা আলোকবৎ জিনিষ। এ দুইকে একসঙ্গে নিতে পারি না। আলোকময় দিক্‌টা নিতে পারি—কিন্তু যে দিক্ স্থূল জড় হয়ে পড়ে আছে, সে দিক্‌কে আলোকের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি না। মাটির শরীরের সঙ্গে আর ভগবানের সঙ্গে সংযোগ করতে পারি না। অথচ জানি—'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'। যদিও আমি জানি যে, জ্ঞানই আসল জিনিষ, কিন্তু আমার ব্যবহারে মাটি কাঠই আসল জিনিষ হয়ে আছে। সুতরাং যদি বলি 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' আর সে ব্রহ্ম যদি বুদ্ধিতে মাত্র খেলা করেন, আর মাটি কাঠ সব বাদ পড়ে থাকে, তা হলে ঐ মহাবাক্য কি সার্থক হবে? আমার সমস্ত ভোগ, সমস্ত জীবন পর্য্যন্ত তাঁর বিভূতি না দেখলে তাঁকে দেখা কি সার্থক হবে? তাই যে বিজ্ঞানে তিনি হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছেন, তাই দেখা দরকার। আকাশ হল জড়ত্বের আদি-তত্ত্ব, যাকে 'ইথর' ইত্যাদি বলে। এই ব্যোমকে চিনতে গিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেখানে এনার্জ্জি বলে পরিসমাপ্ত হয়েছে, সেই এনার্জ্জি যেখানে জন্মাচ্ছে, গুরু সেই ভূমি দেখাচ্ছেন। এ ভূমি হল যেখানে জড় এবং অধ্যাত্মের ভিতর সংযোগ হয়েছে। গুরু তার নামকরণ করেছেন মেরুজ্ঞান।

এনার্জ্জির আদিতে সত্যই মেরু—মেরুদণ্ড। জ্ঞানক্রিয়াতেও সত্যি সত্যি মেরু—এক দিকে রচিত হওয়া, এক দিকে গৃহীত হওয়া রয়েছে। সুতরাং সব ক্রিয়ায়ই মেরু রয়েছে। তেমনি ভৌতিক জগতেও দুই মেরু রচনা না করে কোন ক্রিয়া হয় না। গুরু যা দিচ্ছেন, তাতে এই ভূমি বিকসিত করলে জগতের সমস্ত বিজ্ঞান উল্টে দিতে পারি। হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভ দেখতে পেলে? এর ইঙ্গিত কোথাও পেয়েছ? এ ছিল না, তা বলব না; তবে লুপ্ত হয়ে গেছে। কি ভয়ানক জ্ঞানরাজ্যে প্রতি দিন তোমাদের আনছি দেখতে পাচ্ছ? হিমবৎশিখরেই মেরু, মন্দার, কৈলাস অবস্থিত—"হিমবৎশিখরে গিরৌ।" ঐ হল শিবের জায়গা, তা বার করে দেব। কাকে বলে হিমালয় ইত্যাদি, এইবার তোমরা শিখবে। সকল শ্রী, সকল মূর্ত্ত ফল ফুটে উঠবার যে বৃক্ষ, সে ঐ উত্তর-মেরুতে অবস্থিত। এর নাম শ্রীফলবৃক্ষ। ঐখানেই কৈলাস অবস্থিত। আমি তোমাদের দিতে কত প্রস্তুত দেখ। বিন্দুমাত্র কার্পণ্য না রেখে নির্ব্বিচারে খুলে দিচ্ছি। তোরা এর অমর্য্যাদা করিস না। তোদের কাছে যোগ্যতা আশা করি না—তত্রাচ তোদের শক্তি অনুসারে তোরা মর্য্যাদাবান্ হতে থাক।

মেরু-জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হবে? "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" প্রতিপন্ন করতে গেলে মেরুজ্ঞান ভিন্ন হবে? হর-গৌরী-সম্বাদে এই নূতন পঞ্জিকা আরম্ভ করলাম। 'স্থূলে ভগবান্‌কে দেখ' শব্দ উচ্চারণ করতে কেউ সাহস করেনি। অথচ সকলে 'সবই

তুমি, সবই তুমি' বলে গেছে। আজ কে সারথ্য করছে, কে এমনি ভাবে তোদের গুরুত্ব করছে? দেখার পূর্ণ সার্থকতার মানে হল—স্থূলরূপে দেখা। জ্ঞাত হওয়ার পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতা হল স্থূলে। এই নিয়ে পণ্ডিত মশায়রা কত শাস্ত্র রচনা করে গেছেন। কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারেননি। তারা কি করবে? মেরুজ্ঞান নেই, সংযোগ-জ্ঞান নেই। তাই বাজে ভেবেছে, আর বাজে লিখেছে। অথচ 'সব ব্রহ্ম ব্রহ্ম' করেছে। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে দেখতে পাচ্ছ? জ্ঞান বটে! গুরু বটে! জয় গুরু! চোর, বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞের মুখ দেখলে সব কুঁচকে যায়, আর দিতে ইচ্ছা করে না। আমারও ভিতর দুই মেরু খেলা করছে। এই অকৃতজ্ঞতা দূর করবার জন্যই ত জ্ঞান দেওয়া। খোল্, খোল্! কোঁচকালে কি হবে।

২৭এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার, শিবরাত্রির পূর্ব্বদিন।

প্রায়ই দেখা যায়, জানালার কাচ দিয়ে মশা মাছি পালাতে চায়। তাকে তাড়িয়ে যত একটু খোলা জায়গা দিয়ে বার করে দিতে চাই, ততই সে কাচে গিয়ে ঠেকে। কাচে আলো বেশী প্রতিবিম্বিত হয়; তাই সে মনে করে, এইখানেই বেশী ফাঁক; আর আসল যেখানে ফাঁক, সেখানে তেমন কোন আলোর প্রতিবিম্ব দেখতে পায় না বলে ভাবে যে, সে স্থান বন্ধ। তোরাও এই রকমই। বুদ্ধিতে আত্মার যে আলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে,

তোরাও ঐখানে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিস। 'নিজে আছি, নিজে আছি' এই প্রতিবিম্বটা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে; তোরা মনে করিস, ঐখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে যাব। সব কাণাই এক-জাতীয়। আমরাও যা, পোকামাকড়ও তাই। ও দিক্ দিয়ে দেখলে চলবে না। দুটো দিক্ নিতে হবে। যতক্ষণ না তাঁর ধারণা আসবে, ততক্ষণ উপাসনা কর, তাঁকে ধারণা কর, করতে করতে চোঁ করে তাঁকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ধরে নাও। এ দ্বারা যে প্রতিবিম্ব তৈরি হল, সে ওঁতে পড়ার জন্য নয়—ওঁর দ্বারা ভাল করে নিজের বিধৃতি দেখবার জন্য। উপায়স্বরূপে খালি এতেই পড়ে থাকলে হবে না। যাঁকে অনুসন্ধান করছি,—ঐ প্রতিঘাত থেকে তাঁর দিকে ফিরতে হবে। যেখান থেকে প্রতিবিম্ব বেরিয়ে ওতে পড়ছে, ভগবান্‌কে সেইখানে খুঁজে বার করতে হবে। তিনি কি করছেন? এত চাঞ্চল্য, এত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ব্যাপার, এ ভগবান্‌ই করছেন। এ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি করবার ক্ষমতা হয়ে বসে আছেন, এক জায়গায় দুই মহিমাকে ফুটিয়ে বসে আছেন, এক জায়গায় তাই নিয়ে খেলা করছেন।

বামদেব মানে কি? বম্ ধাতুর মানে—বার করে দেওয়া। যে শক্তি উদ্গিরণ করে, তার নাম বামা শক্তি। সিদ্ধিমাত্রেই বার করে দেওয়া—একটা না একটা শক্তির বহির্বিকাশ। দক্ষ, যক্ষ, ঋক্ষ—এসব একার্থবাচক শব্দ। যার ভিতরে সমস্ত জিনিষ অবস্থান করে, সে দক্ষ বা যক্ষ। যে দিকে সমস্তটা আছে, সে দিক্ হল দক্ষ। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিলুম মানে, যেখানকার

জিনিষ, সেখানে রাখলুম—ঐ রকমে যজ্ঞ সমাপ্ত করলুম। যেখানকার জিনিষ, সেখানে প্রত্যাবর্ত্তন করল—এ হল দক্ষিণা-কালী। সিদ্ধিকালী, বামাকালী। যেখানে যত সিদ্ধি আছে, তা উদ্গিরণ করতে পারে। এই জন্য দক্ষাদিরূপে গতির নাম দক্ষিণ।

এই চিন্ময় তত্ত্ব এমন অপূর্ব্ব যে, এঁকে দেখে সুখ, ছুঁয়ে সুখ; এঁকে নিয়ে সুখ ছাড়া আর কিছু নেই। সমস্ত রহস্য এই চিন্ময়ে পরিসমাপ্ত। ভাষা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ক্রিয়া দিয়ে, চার দিক্ দিয়ে দেখ, এঁতে ছাড়া আর কোথাও কিছু জাত হয় না। ভগবান্‌কে ধরার চেষ্টা মানেই, তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া। তাঁর কৃপার বা করুণার বা শক্তির মুখাপেক্ষী হওয়াই আসল চেষ্টা; তদ্ভিন্ন যে চেষ্টা, সে হল তদ্বিপরীতমুখী। চেষ্টা মানে, একটা শক্তি-প্রকাশ; শক্তি মানে—ভগবৎশক্তি। চেষ্টা করছি মানে, ভগবৎশক্তি আমার ভিতর ঢুকে কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌কে দেখা, জানা, বোধ করা ছাড়া আর সাধনা নেই। 'তুমি রয়েছ' এই বলাটাই সাধনা। "তুমি" মানে, এই সমগ্রটা যিনি ফুটিয়ে রেখেছেন। এখানে শান্তভাবে বসে থাকতে পারলে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী তপস্বী হওয়া যায়। এই বসাই হল সাধনা, তপস্যা। বসা মানে, আমার ভিতর যিনি চেতনারূপে রয়েছেন, তাঁকে ফুটিয়ে রেখে দেওয়া। এই যে শক্তিবিলাস, এখানে কে খেলা করছে, এখানে কার জ্যোতি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে? ভগবতীর? তিনি কি ভাবে রয়েছেন? আমার

অস্তিত্বকে ফাঁকে ফেলে রেখে রয়েছেন ? তাঁকে যেমনি দেখতে যাই, অমনি এই আমিটি তিনি হয়ে যায়, কথা বলতে আর তর সয় না—কথা বলবার জন্য কেউ থাকে না ; এই ত হল ভীষণ সমস্যা। তিনি যদি খোঁজবার জিনিষ হতেন, আমা হতে চির-আলাদা একজন থাকতেন, তা হলে খোঁজাখুজির অবসর থাকত। কিন্তু এ যে দৃষ্টি পড়লেই, চোখোচোখি হলেই আর আলাদা থাকতে পারি না, এমনি ভাবে ইনি বিরাজ করছেন ; এর নামই ঈশ্বর। আর কোন জাতি ভগবান্‌কে এমন আপনরূপে নিতে পারেনি ; যে পেরেছে, সে অবতার বলে গণ্য হয়েছে। আমরা অন্য ভগবান্ জানি না।

আমি জগতের শক্তিতত্ত্ব দেখাতে গেলাম ; সেখানেও দেখি এই বিজ্ঞান। তার আসল কথা হল—একবার বেরিয়ে গেলেন, আবার ফিরে এলেন। খেলার ভিতর যতই বৈচিত্র্য প্রকাশ হোক না, এ ছাড়া আর কিছু খেলা হচ্ছে ? একটি মেরু রচনা করে এই যাওয়া আসা ভিন্ন আর কিছু ঘটছে না ; মেরু রচনা না হলে যে যেত, সে আর ফিরে আসত না ; যে আসত, সে আর ফিরে যেত না। বাহ্য শক্তিতত্ত্বে এই যা দেখলাম, অধ্যাত্মশক্তি-তত্ত্বেও তাই। অক্ষর আত্মা যেখানে কোন লীলায়নের জন্য গতি তৈরি করতে গেছেন, সেখানেই একটি মেরু তৈরি হয়েছে—একটি চুম্বিনীশক্তি বিস্তৃত হয়েছে—সে elasticএর মত ওকে টানছে, একেও টানছে। এই মেরুতত্ত্ব ছাড়িয়ে জগতে কেউ কোন শক্তি দেখতে পাবে না। জ্ঞানতত্ত্বেও এই একই মেরু-বিলাস।

এখানে আছেন কূটস্থ, ওখানে ক্ষর। কূটস্থ তিনি, যাঁর ভিতর সমস্ত দক্ষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। ওখানে ক্ষর বেরিয়ে যাচ্ছে। উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর মত সীমা গাঁথা আছে—এ-পাশে ও-পাশে পরস্পর পরস্পরকে টানছে, যত অনন্তপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত তার ভিতর তৈরি হচ্ছে। তাঁতের মাকুর মত এপাশ থেকে ওপাশে যাতায়াত হল এর মূল ক্রিয়া; তাতে রচনা হচ্ছে বিচিত্র কাপড় ও তার পাড়—মাকু এ-পাশ ও-পাশ যাতায়াত করছে। এখানে কূটস্থ অক্ষর—ওখানে ক্ষর। যার ভিতর দিয়ে যাকে ঘিরে নিয়ে যাতায়াত হচ্ছে, তাতে একটা চুম্বিনীশক্তির ব্যাপার চলছে—তার দ্বারা ঐ সকল বিধৃত রয়েছে; এরই ভিতর যে টানাটানির ভূমি, তার নাম হল হৃদয়। এ দিকের হৃদয়ে যেমন বাহ্য জিনিষকে নিজত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে আমার আমার বলে ধরেছি তেমন আমি ও আমার ভগবানের সঙ্গে যেখানে স্বাভাবিক সংযোগ ও টানাটানি, সে হল ও-দিক্কার হৃদয়। হৃদয়ের যে দিকে জগতের সঙ্গে আমি জড়িত হয়েছি, তাকে চিনেছি। কিন্তু ভগবান্ ও আমার মাঝে যে হৃদয়াকাশ, তা কখন দেখিনি। বুকের ভিতর ক্ষর পুরুষ হয়ে তোরা বসে আছিস, আর তিনি ললাটে অক্ষর পুরুষ সেজে বয়ে বসে কাজ করছেন। ওঁরও উর্দ্ধে যে হৃদয় আছে, তাও তোরা দেখিসনি। আমিও আত্মা, ভগবান্ও আত্মা; আমরা উভয়েই যে আর এক হৃদয়ে আবদ্ধ, তাও তোরা দেখিসনি। উর্দ্ধ হৃদয় হল সহস্রার; সে হৃদয় এত জড়াবার ভূমি—তাঁর আকর্ষণ এত তীব্র যে,

নঙ্গরের মত বা বালির বস্তা-ভরা বেলুনের মত এই ভৌতিক ভার যদি স্বরকে টেনে না রাখত, তবে এর দাঁড়াবার উপায় থাকত না, তাঁ থেকে পৃথক্ হয়ে এত দূরে থাকবার উপায় থাকত না। বালি-ভরা একটা বস্তা ছেলে, একটা টাকা, একটা পরিবার—এই সবই বালির বস্তা। এসব ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কোন রকমে ভগবান থেকে পৃথক্ হয়ে আছি। একবার দৃষ্টি দিয়েছ কি এ সব চলে গেছে।

এখন ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি—ভগবানের দিকে যখন যাচ্ছ, তখন বালি-বোঝাই বস্তায় ভরা গাধাবোট তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে কি না? এরাই তোমায় এগোতে দিচ্ছে না—এ ভাল করে দেখলেই দেখ্‌তে পাবে। এখন আত্মত্বে চোখ রেখে যদি একবার বলতে পার যে, "আমি আর কিছু চাই না," তবেই তোমার এসব খসে যাবে; এই কথা ঠিকমত বলতে পারলে একেবারে চুম্বকের মত তিনি তোমায় টেনে নেবেন—যেমন বিষয়ে নিয়েছেন। একটা বালির টুকরা চক্‌চক্ করলে অমনি তাতে চলে গেছ। এ তত্ত্বেও ঠিক তেমনি করে গেলেই যেতে পারবে। আমাদের আমিত্ব ওঁতে ঘর করতে দেয় না—নিজের কর্ত্তৃত্বটা ঠিক করে বজায় রাখবার জন্য কোন রকমে ওঁকে বার করতে দেয় না। যেমন দক্ষরাজা শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ে ঠিকই হবে, এ কথা জানলেও, নিজের মৃত্যু-ভয়ে তাতে অসম্মত ছিল, সেইরূপ তিনি এলেই আমিত্বের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী জেনে, আমিত্ব তাঁর আগমন চায় না। এই আমিত্ব এবং তার সঙ্গে যত কিছু

জড়ান আছে, তারা দেবতাকে দেখেও দেখতে দিচ্ছে না—তাঁর দিকে মুখ ফেরাতে দিচ্ছে না। আমি ঐ দিকে যাচ্ছি মানে, খালি তাঁকে দেখা ও জানা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই ঈশানকে আমি পূজা করলুম। আমি যত কথাই কইলুম, তাতে তাঁর নাম বেরোলেই তাঁকে একটু দেখা হচ্ছেই। এঁকে কে কত ভাল করে নিতে পারবে? যার বালির বস্তা যত খুলে গেছে, সে তত ভাল ভাবে, নিলেপ, অক্ষররূপে নিতে পারবে। লেপ মানেই হল ক্ষরণ; তাতে জড়িত হয়ে তদ্‌গ্রস্ত হয়ে বসে থাকা। যে যত অক্ষর হয়ে বসেছে, সে তত সহজে, তত দ্রুত ঈশানকে পাচ্ছে।

তবে এঁকে পাবার উপায় কি? আমার বস্তা খুলে পড়ছে না কেন? কেন সাংসারিক অনুরাগ, সাংসারিক সাধনা প্রভৃতি ভগবানের পথে যেতে আমায় বাধা দেয়? প্রকৃতির ধর্ম্মই এই, জ্ঞানশক্তির ধর্ম্মই হল সংশ্লিষ্টতা—যার সঙ্গে স্পর্শ হবে, সেটা বেড়ে বেড়ে যাওয়া। যেতে পারিস না এই জন্য যে, যিনি ঈশান, যাকে অক্ষর বললি, তিনি যে বামদেব, এই কথা জানিস না, এঁর অনুশীলন করিস না বলে। উদ্গিরণ করা, ধার করে দেওয়া হল বামদেবের ধর্ম্ম। আমি দিব্যি মানুষ বসে ছিলাম, একটা সেব্য বস্তু—টাকা, খাদ্য ইত্যাদি কিছু আমার সামনে এসে হাজির হল; অমনি আমা থেকে লোভ বেরোল। খালি লোভ বেরোল, না সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাতে গেছি? কেউ যদি তখনই বলে—আপনি নিন, তবে তা আমি খেয়ে বসে আছি না? আত্মার বুক

ছেড়ে কোনও জ্ঞানক্রিয়া হয় না। আমি তাতে ডুবেছি, তবেই লোভ বেরোল। একটি লুব্ধ পুরুষকে, কামময় পুরুষকে উদ্গিরণ করা—সুখময়, দুঃখময়, আনন্দময় পুরুষকে উদ্গিরণ করা আমার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। আমি দিবারাত্রি 'সুখী হলাম, দুঃখী হলাম' ইত্যাদি বলছি এবং এ শুধু বলা নয়, ঐ রকম করে আমায় সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে আমি কি দেখছি যে, আমি স্বয়ং বামদেব? এইরূপে আমি পুত্রময়, স্ত্রীময় পুরুষকে উদ্‌গিরণ করছি? যখনই স্ত্রীময়, পুত্রময় পুরুষকে উদ্‌গিরণ করলাম, অমনি দুই জনকে দেখলাম; এক—উদ্গিরিত পুরুষ, এক, যে আমি উদ্‌গিরণ করলাম, সে আমি ঠিক আছি। এই হল আমার বামদেব-মূর্ত্তি। এইরূপে যে পরিমাণে দেখতে পারব, সেই পরিমাণে অক্ষরের নির্লেপত্ব উজ্জ্বল হয়ে, বড় হয়ে আমাতে প্রকাশ হতে লাগল; আমিই, অথচ আমি নই। চেতনত্বের এই দুই লীলা—যুক্তিশাস্ত্রে যা খাপ খায় না, তা দেখতে পাচ্ছি। বামদেবের উদ্গিরণ যত দেখবে, অক্ষরত্ব তত উজ্জ্বল হবে। আবার এই বামদেবকে উজ্জ্বল করতে হলে সদ্যোজাতকে পূজা করতে হবে—তবেই বামদেব উজ্জ্বল হবেন। সদ্যোজাতের (এইমাত্র জাত হলাম) প্রকৃতি ছিল সংশ্লেষময়;—ইনি আত্মার টুকরা টুকরা হয়ে বেড়াবার স্বাধীনশক্তি প্রকাশ হতে দিচ্ছিলেন না। কুঁড়ির ভিতর অনন্ত পাঁপড়ি রচিত হয়েছে, উপরের সবুজ পাতাটি তাকে বেষ্টন করে আছে; তুমি তেমনি অনন্ত প্রকৃতির দ্বারা গ্রথিত হয়ে নিজেকে একটা মনে করছ—

তাল বেঁধে একটা হয়ে আছ। সদ্যোজাতকে দেখলে প্রকৃতির আধিপত্য চলে গেল। তখন ফুল দেখে বলবে—ফুলময় পুরুষকে দেখলুম। জল, আগুন দেখে বলবে—জলময়, অগ্নিময় পুরুষকে দেখলুম। আগে যা দেখতুম, তাতে প্রকৃতি-অংশই দৃষ্টিতে আসত; আজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করে পুরুষকে দেখা হচ্ছে। ক্রমে জলাভিমানী, অগ্নি-অভিমানী ইত্যাদি অভিমান আড়াল হয়ে যাচ্ছে, অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে—প্রধান হচ্ছে পুরুষ ভাব। অভিমান আড়াল হওয়া মানে, প্রকৃতি আড়াল হওয়া। এইরূপে সদ্যোজাতকে যত দেখতে পাবে, তত বামদেবকে পাবে। যত বামদেবকে পাবে, তত ঈশানকে পাবে। শিবপূজায় আগে মণ্ডা মেঠাই খাও—পরে শাকান্ন। জগদ্ব্যাপার দেখতে হবে ত? ঈশ্বরজ্ঞান গোড়ায় না থাকলে সাধনার সূত্রপাতই হবে না। আগে ঈশ্বর, তাঁর ভিতর অক্ষরত্ব, তাঁর ভিতর বামদেবত্ব, তাঁর ভিতর সদ্যোজাত। আগে ঈশ্বরে অভিভূত, আবিষ্ট হয়ে যাও, তার পরে এ সব দেখবে।

আত্মত্বের লীলাক্ষেত্র সুন্দর না? সদ্যোজাত হতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত দেখ ত, কত বড় দৃষ্টির সাহায্যে ঋষিরা দেখেছেন! ঈশ্বর কত ভঙ্গিমা রচনা করে যাচ্ছেন দেখ ত? এ জ্ঞানের দাম কে দেবে? যার জ্ঞানে বিশ্বাস ও নিজ-নামীয় আত্মত্বের বোধ সকলের তলায় তলায় রয়েছে, তার কাছেই এই জ্ঞান মূল্যবান্। এক থালা ছোট বড় সোনার গয়নার মধ্যে আগে যেমন বড় গয়নাগুলি ও পরে ছোট গয়নাগুলি তোল, তেমনি

ঈশানকে আগে তুলে নিয়ে তার পর ছোট বিষয়ের মধ্যেও ভগবান্‌কে তুললে। কোনও পুরুষের জামা-কাপড় দেখে আগে মুগ্ধ হতে, এখন পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছ।

কি সুন্দর! ঈশান পুরুষকে, ভগবান্‌কে যে এই চোখে দেখে, যে আত্ম-ছড়ান ও আত্ম-কুড়ান ভগবানকে দেখে, ভগবান্ শীঘ্র তাকে তুলে নেন। 'য এবং বেদ।' সমগ্র ভাবে এঁকে দেখলে কি হয়, ঈশানের ঈশানত্ব প্রবল হয়ে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না? আত্মাকে কি ভাবে ছড়াচ্ছে, আর কি ভাবে গুটোচ্ছে? ঈশানই বটে! যে ছিল আগে অব্যক্ত, গুরুর কথায় আজ সে হল বিশ্বময়। আর সে আত্মতত্ত্ব অব্যক্ত রইল? দেখ না। এই জিনিষ দু দিন ধরে তোমাদের বোঝালুম। কাল শিবরাত্রি—এর পরীক্ষা দেবে। আমি খালি মন্ত্র বলতে থাকব, তোমরা মন্ত্র অবলম্বন করে চলতে থাকবে। তাই এ কথা আজও আবার বললুম। বলাতে আরও উপকার হল। কাল সবাই দক্ষিণা নিয়ে পূজা করতে এস। হাসছ কেন? আমার আত্মার যত চূর্ণ আছে, সমস্ত ঈশানে স্থাপিত হোক। গঙ্গাস্নান করে আত্মাকে পবিত্র বিধৌত করে একেবারে ঈশানে স্থাপন। আহা-হা!

সব দূরে পড়ে রইল—মরে গেল, কি বাঁচল, জানি না। আমি এখন আত্মা নিয়ে ব্যস্ত—কে আছে, কে না আছে, কিছু জানি না। ভাল করে সব হৃদয়ঙ্গম হল? সরস, না কঠিন? বেশ রসময়! কেবল শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্ব নয়, এই জিনিষকে

রসময় বলে নেবার যে অধিকার তোমাদের ভিতর জন্মেছে; এই দেখে আমার আজ আনন্দ হল। এ বুঝতে পণ্ডিত মশায়দের জন্মের পর জন্ম কেটে যায়। তোমরা নজরে রেখ, উপনিষদ্ পুনঃ পুনঃ আত্মাকে বর্ণনা করতে গিয়ে 'তৎ এজতি তৎ নৈজতি' —'আসীনো দূরং ব্রজতি' এই দুই তত্ত্বকে খোলা ভাষায় বলে গেছেন। এই তত্ত্বের ভিতর যে এই নিগূঢ় রস আছে, তা একেবারে চাপা পড়ে গেছে। এ কত বড় বিদ্যার আভাস দিলুম, আরও পরে বুঝতে পারবে। এর প্রভাবে অক্রমবোধ আসবে, কাল বাইরে পড়ে থাকবে। আত্মত্বের এই সব প্রসার অতীব গুহ্য। কোন শাস্ত্রে এর উল্লেখ ছাড়া বিজ্ঞান দেওয়া নেই। 'স দ্বিধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি।' কত বড় জ্ঞান বললুম ? অথচ এ কঠিন নয়, সব চেয়ে বাহাদুরী এইখানে। এখানে মনের চেহারা নেই—মন চাঁদের মত অস্তমিত হচ্ছে। চতুর্দ্দশী শেষ হল, অমাবস্যায় নবকলার উদ্বোধন। মনের শেষ, আত্মত্বের উদ্ভব। আর মন দেখতে পাচ্ছ ? তার কোন দরকার হচ্ছে ? আসল বস্তু এই। উপরে একটু নাম রূপ ক্রিয়ার আকারে ওরা ভাসতে থাকবে, আসল ভরস্তর এখানে। মহান্, অপরিণামী আত্মায় সব ঢুকিয়ে দিলাম, উপরটা পর্য্যবসিত হয়ে গেল—একটা নামরূপে মাত্র। কত দূর নিয়ে এলাম ? "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং"—দেখ ত, এই রস যখন খেতে থাক, কামনা বাসনাগুলি তখন আপনা হতে স্তিমিত হয়ে যায় কি না। যেটা ছিল ফোটা, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না, রাত হয়ে গেছে;

যিনি ছিলেন একেবারে অব্যক্ত, তিনি একেবারে ব্যক্ত হলেন। তোদের আত্মাকে ফুটিয়ে ধরেছি। বেশ বুঝলি? খালি বুঝা? না, রসময় আস্বাদন?

২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার।

জিনিষের ধাতু ধরতে না পারলে যেমন সে জিনিষকে ফুটিয়ে তোলা যায় না, তেমনি শিষ্যের প্রকৃতি না ধরতে পারলে শিষ্যকেও ফুটিয়ে তোলা যায় না। ভগবানে প্রবেশ করা কত সহজ কথা, তা এখন তোমাদের চক্ষে পড়ছে ত? অথচ আগে তোমাদের কাছে এ কথা কত মারাত্মক ছিল। ভগবৎতত্ত্ব নতুন জিনিষ কিছুই নয়। এ তত্ত্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্রিয়া করছেন; খালি দেখতে পাওয়া আর না পাওয়া নিয়ে হল কথা। দেখলেই সে দিক্‌টা বিকশিত হল। তুমি একেবারে মানুষ; তোমার শরীরে যন্ত্রপাতি যা কিছু আছে, তার ভিতরে ভগবান্ আছেন, তাঁরই শক্তিতে সে সব চলছে—ইহা তুমি দেখেছ কি বেঁচে গেলে, আর না দেখেছ কি মরেছ। ভগবান্ একটা প্রহেলিকা নন, তিনি সর্ব্বত্রই সুপ্রকাশ; তাঁকে খুঁজতে হবে, অনুমান করতে হবে, বার করতে হবে, এ নয়। সে দিন তোমাদের 'স্বভাব' বুঝাচ্ছিলাম; কেমন করে প্রকৃতি থেকে স্বভাব গঠিত হয়, আর তা থেকে নতুন নতুন জীব রচিত হয়—কেউ পাপী, কেউ

পুণ্যবান্ ইত্যাদি, সে বিষয়ে সে দিন বলছিলাম। স্বভাবকে বদলাতে গেলে কি করতে হবে? তাকে ভগবানে মেলালেই, প্রকৃতি ও ভগবান্, এই দুইয়ের ঢেউয়ে মেলালেই তার পরিবর্ত্তন হবে। স্বভাবের পবিবর্ত্তন করতে হলে এইটুকুরই আবশ্যকতা। 'আমি জ্ঞানময়' এই কথায় ঢুকে পড়াই হল আমার সার্থকতা। তা হলেই সব সার্থকতা আমার গা-ময় এসে গেল। এই হলে সুখ, শান্তি আকারে জ্ঞানের যে বাহ্য প্রকাশ, সে সবের আর কোন মূল্য থাকে? জ্ঞানসমুদ্র পেলে তার উপরের ঢেউ বা কুয়াশার কিছু মূল্য থাকে না। ভূত ত জ্ঞানানুগামী। ভূতানুগামী জ্ঞান কখনই নয়। ভূত গেল ত আমি জ্যান্ত হলুম, ভূত ঘাড়ে চাপলে মরলুম। জীবনকে ছোট দেখা মানেই ভূতে আচ্ছন্ন হওয়া। জ্ঞানময়ের সামনে এলে আর এইটুকু গণ্ডীতে আমি দাঁড়াতে পারি? তখন এ গণ্ডী কেটে গেল, বদ্‌লে গেল। এই জন্য বলেছি, যখনই ভগবানের কথা মাথায় আনবে, তখন আর এ ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র জীবত্বকে ধরো না, তার ছোট হিসাব এঁর পাশে এনে রেখো না। এখনও স্বভাবের পাক চলছে। ভগবতীকে পেলাম, অথচ তাঁর শ্রী পেলাম না, এ জাতীয় ভগবৎচর্চ্চার মূল্য বড়ই কম; সে বায়বীয় আকারের একটা চিত্তবৃত্তিমাত্র হয়ে রইল। এই কি ভগবান্? এত বড় জগতের অনন্ত-শক্তিধর যিনি, তিনি কি এই? সুতরাং সমুদ্রই আসল জিনিষ। তার উপরে একটু ধোঁয়া-ধোঁয়া, এক হাত, কি কয় হাত উঁচু সেই কুয়াশাস্তূপের সামঞ্জস্য কোথায় পাবে?

সমুদ্রে। ইনিই স্বয়ং-শক্তি জ্ঞান। এখানে—কুয়াশার স্তূপে শক্তি নেই। ইনি ভিন্ন আর কেউ শক্তি নয়—একেবারেই নয়। এঁর সবটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ এঁকে অলৌকিক, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত বলে মনে হয়। জানতে পারলে মনে হয়, এ ত অতি সরল, সহজ! এই না? একটি রোগের জীবাণু বা একটি শুক্রজীবাণু দেখলে সহজ চক্ষে কি মনে হয় যে, এইটুকু অণু একটা মানুষকে মেরে ফেলবে বা এইটুকু অণু থেকে একজন পূর্ণাবয়ব মানুষ গড়ে উঠবে? এমন রোগ-বীজাণু আছে, যাকে মানুষের গায়ে ঢুকিয়ে দিলে, সে এক ঘণ্টার মধ্যে মানুষকে মেরে ফেলবে। এ দেখলেও বিশ্বাস হয় না। এ আবার হবে—যাকে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ধরা যায়, তার দ্বারা! সে এতটা আয়তনবান্ ও এমন হবে! তেমনি আমাদের এই কথা। এই কথা আমাকে তৈরি করছে—রচনা করছে; সে আবার যে-সে তৈরি করা নয়—একটা মুক্ত-পুরুষরূপে তৈরি করছে, ভগবৎসান্নিধ্যে আমায় নিয়ে যাচ্ছে এই কথার ঢেউ। সুতরাং শক্তির উপাদানগত সূক্ষ্মতায় চোখ পড়বে, না বাইরের ঢেউটায় চোখ পড়বে? আঃ, ঢেউয়ে প্রাণ যায় মশায়, হাবুডুবু খাচ্ছি, পারলুম কই—এ সব কথার কোন দাম আছে? কি পারলি না? যাকে ব্যর্থতা বলছিস, তার ভিতর চোখ দিয়ে দেখ না; তার ভিতর, সেই জ্বালার ভিতর ভগবান্ ছাড়া আর কেউ আছে? এইরূপে না দেখলে সে ব্যর্থতা একটা ভীষণ দাহন, প্লাবন আনবেই। যে জ্বালার চেহারা

ধরেছে, শোকমূর্ত্তি ধরেছে, তাকেই কি এই বলে ধরবি না যে, তুমি শোকমূর্ত্তি ছাড়, অশোকমূর্ত্তি ধর? "মশায়, ধর ধর বললুম, কিন্তু সে তা ধরল না।" ধরা কাকে বলে? 'ধর' বলছিস, আর চোখ চেয়ে আছিস বাহ্য চেহারায়, ভিতরে দৃষ্টি দিলি না। তাতে হবে? তাঁকে মনের দ্বারা ধর, আত্মত্বের দ্বারা জীবনময় কর—তা হলে দেখবি, সে কি করে অশোকমূর্ত্তি না ধরে থাকে? জ্ঞানাশ্রয়ী না হয়ে, ভূতাশ্রয়ী হয়ে যদি কাজ করা হয়, তাতে হাতে হাতে ফল আসে না। ভূত-মূর্ত্তির তলায় তলায় কেমন করে আত্মমূর্ত্তি রয়েছেন, তা তোদের বুঝিয়েছি। যে মুহূর্ত্তে শম্ভুতে চোখ দিয়েছ—সেই মুহূর্ত্তে তুমি চির-জাগ্রত। তুমি এঁতে চোখ দাও, এঁতে ভরম্ভর কর, এই পরমতত্ত্বকে স্বীকার করে নাও। মরণ আর ভগবান্, এই দুই তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। তার মধ্যে জানার নাম ভগবান্‌কে পাওয়া, না জানার নাম মৃত্যুকে পাওয়া। 'বেদ' আর 'ন বেদ'—এ ছাড়া ভগবান্ ও মৃত্যুতে আর কোন তফাৎ নেই। তাঁর এই জগৎরচনার কি কৌশল দেখছ? 'ভগবতী' এই যে শব্দটি উচ্চারণ করলুম, এতে স্বয়ং ভগবতী প্রকাশ হলেন—এ কথা ঠিক? আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি প্রকাশ হলেন। কত দূর ও কোন্ মাত্রায় প্রকাশ হলেন? খালি মনোময়, কি প্রাণময়, হৃদয়ময়? কি আত্মময়? যেখানে মনঃক্রিয়া দেখছি, সেখানে আত্মা না দাঁড়ালে সে ক্রিয়া হয় না। এই হাত-পা, চোখ-মুখ তোমার যা আছে, এ সব তোমার আত্মত্বে সংস্থিত। এইগুলোই কি ভগবতীর হাত-পা,

চোখ-মুখ? ভগবতি! ভগবতি! ত্বমেব শরণ্যং—ত্বমেকং শরণ্যং। ভগবতি, ত্বমেকং শরণ্যং! খালি তৃপ্তিতে—আহাহা করে থেমে যাবে না। ভগবতী ত—তিনি এখনি চলে যাবেন ত! ভগবতি, ভগবতি! আমার শরীর, মন, প্রাণ, এখনই অভ্যাসবশতঃ সেই ভূতের জন্য লালায়িত হবে, এরা সেইখানে আমায় টেনে নিয়ে যাবে; এই টেনে নিয়ে যাওয়া তোমারই ধর্ম্ম এবং তুমিই, অথচ এ তোমাকে না দেখারই দোষ। তা হলে 'অন্ন' বললে তুমিই এখানে ভাত নিয়ে আসবে। সবই ত তুমি—তাই আমার অন্নের দরকার হলে তুমিই অন্ন হয়ে আসবে। যাদের জন্য তোমরা কাঙ্গাল, তাদের ভিতর একটা জিনিষও কি দেখেছ যে, এই জ্ঞানার্ণবে জন্মাল না? শব্দ, রূপ, রস, ভালবাসা, প্রীতি অপ্রীতি, সূর্য্য চন্দ্র—এসবের জন্ম কোথায়? এইখানে? এ একেবারে সত্য কথা? এরা তাঁতে জন্মে ত আছেই। তোর প্রাণ বড় বিষয়লোলুপ—সর্ব্বদা টাকা টাকা করে, তাই তোর দ্বারা ভগবতীর উপাসনা হবে না, এ কথা আর বলা চলবে? এ কথা ততক্ষণ বলা চলে, যতক্ষণ চক্ষুষ্মান্ হওয়া না যায়। ও সবে দোষ নেই; দোষ খালি না জানায়—কাকে টাকা বলে ভোগ করছিস। কাকে তুই পুত্র ও টাকা বললি দেখে নে। এই হল গুরু-লাভ ও গুরুর অলাভ—যত তারতম্য এইখানে। তার পর তো'দের এক দুরন্ত স্বভাব আছে। ভাবের ঘরে ভগবান্ [illegible] কেঁদে আকুল হলি, কখন হেসে লুটোপুটি খেলি, একটা [illegible] করলি, চোখটা কুয়াশায় ভরে গেল।

গীতায় ভগবান্ একটি চমৎকার কথা বলেছেন,—"আমাতে পরাভক্তি উদয় হবার পর তখন মানুষ তত্ত্বতঃ আমায় জেনে আমাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।" ভগবান্ বলতে গিয়ে যদি এখনও দশ দিকে চোখ ছোটে, তা হলে তত্ত্বতঃ তাঁকে কখন জানবে ? সদ্যোজাত—এই দিক্ থেকে তাঁকে পাঠ করতে হবে। একটা জ্ঞান ফুটে গেল, এই আগে দেখবে, না ইনি এক পোষাক ধরে দাঁড়ালেন, এই দেখবে ? এই দিক্ থেকে পড়তে যাওয়া হল ভিতর থেকে পড়া, আর ওদিক্ থেকে ঠিক উল্টা রাস্তা। অণু আত্মাকে গ্রহণ করা কষ্টকর বলে ভগবান্ এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি সর্ব্বভূতস্থ মহান্ মহেশ্বর, এই ভাবে আমায় দেখ—তা হলে টপ্ করে আমায় ধরে ফেলবে। সব পরিহার করে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম করে দেখার যে রাস্তা, সে রাস্তায় যাবে না, এ কথা ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন। তিনি নিজে জগৎমূর্ত্তি ধরে রয়েছেন। চেতনা ভিন্ন, ইনি ভিন্ন আর কেউ জগৎমূর্ত্তি ধরে ? ইনি এত অপার রসময়—দিকে দিকে রসে গন্ধে স্পর্শে ফুটে রয়েছেন। তোমরা হাত বাড়াও, পা বাড়াও কোন্ দিকে ? ইনি সর্ব্বত্র, এ কথা যখন বললুম, তখন শব্দে স্পর্শে রূপে কে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এই দেখে তোমরা ভরপূর হও না। মুক্তি এখন থাক। এইটেতে বিশ্বাসবান্ হলে প্রাণটা আর এক মুহূর্ত্ত নিরানন্দ থাকবে ? সমস্ত দিন কর্ত্তা সেজে, জীবনে বোঝা চাপিয়ে, তার পর রাস্তার ধারে বসে "কে আছ ভাই, আমার এই বোঝাটা হাল্কা কর,"

বলে তোরা চীৎকার করিস। এই আত্মা ব্রীহি ও শ্যামাক-ধান্য থেকেও অণু, আবার ইনি এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোক হতেও মহান্। এই যে একটু ছোট আত্মার ভাব তোতে লুকিয়ে রয়েছে, এ সেই জ্যায়ানের বুকেই একটা রঞ্জনা ধরেছে। নমঃ শিবায়, নমো নমো নমঃ!

তার পর যে একটু ভাল করে শিখেছে, সে নিজের শরীরের ভিতর ঢুকে পড়ুক। তার হাত, পা, স্নায়ু প্রভৃতি বিস্তার করে কে বসে রয়েছে? এর ভিতর কোন্‌টা করা কঠিন? এই যে বাহ্য পৃথিবীকে ধরে সূর্য্যনারায়ণ তার কেন্দ্র হয়ে রয়েছেন—এ কি মহাতেজ! এমনি করে তোমার শরীরও ইনি ধরে রয়েছেন—এও কি মহাতেজ! এঁর দ্বারা তুমি একেবারে বিধৃত হয়ে আছ না? এই বিধৃতিতে কোথাও দড়ি-কাছি আছে? এতে তুমি দৃঢ়ভাবে বাঁধা রয়েছ না? সুখ কে দিলে? কে দুঃখ দিলে? ভগবতী সব দিচ্ছেন, এই দেখলে তুমি কর্ম্মফল থেকে অব্যাহতি পাবে। ওগো, তুমি দিলে, তুমি দিলে। নমো নমঃ!

নিজে আত্মত্বে প্রবিষ্ট না হয়ে আত্মবোধ বলা যায়? যতক্ষণ বলা যায়, ততক্ষণ বুঝতে হয়, একবার তুমিত্বে, একবার অহংএ ঢুকে ব্রহ্মভাব এল। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' ইনি ছাড়া আর কেউ দ্রষ্টা বা শ্রোতা নেই—জগতে যত কিছু গ্রহণীয়, করণীয়, দর্শনীয়, শ্রবণীয়, সবেরই আকার নিচ্ছেন ইনি। আমার ভিতরেও তাই? ইনি কে? প্রতি জনের তলায় তলায় নিজ-বোধ-রূপিণী যাঁকে প্রত্যক্ষ করছি? একেবারে ইনি? জগতে

কোথাও কি আছে যে, চোখ দেখছে, কাণ শুনছে? আমাতেও নেই? ব্রহ্মার্পণমস্তু। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" তিনি কি তোমার সব কেড়ে নিতে চাচ্ছেন? না, দেখাচ্ছেন যে, আমিই সব করছি? নমঃ! কোথায় এলুম? আমি কে? ভগবতী! নমঃ! 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং'—এখানে কি পেলে? "আমি কিছু জানি না দাদাঠাকুর, চোরাই মাল ঘরে এসে পড়েছে। আপনি নিন"—এরই নাম কি মদর্পণ? এমন প্রশস্ত রাজপথ থাকতে অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে কেঁদে-কেটে বলা কেন? আর এই বলায় কি আমি দাম্ভিক হয়ে পড়লুম? না, আমি নিঃশেষে সব তাঁকে দিয়ে দিলাম? তুই যেটা নানা কাণ্ড করেও পারলি না, আমি সেইটা একেবারে ছেড়ে দিলাম। জয় ভগবতি!

তা হলে 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং' এ সব বড় সুখে সম্পূর্ণভাবে করা যায়? রোজ দুই চার বার যদি এই রকম গঙ্গাস্নান হয়, তবে আর কিছু কি শেখাতে হয়? তখন সে আপনিই বুঝে নেয় যে, আমার কি হচ্ছে। তাই এ-রকম গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া আর ভাল লাগে না—তোরা আমার সঙ্গে বীর্য্যবান্ গতিতে চল। পায়ে একটু হোঁচট্ খেলে, রক্ত পড় পড় হল—এই রকম খালি কাপড়ের কাঁটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কত দিন চলবে? যেমন বামনদাস বা তারাকান্ত বললে তোমাদের পূর্ণ সত্তা বুঝিয়ে যায়, তেমনি ভগবতী বললে তোমার যা কিছু জানা আছে বা ওঁর ভিতরে আছে, সেই সব

নিয়ে একে গ্রহণ করতে হবে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই সমস্ত সৃষ্টির ভিতরে যা কিছু আছে, তার নাম ভগবতী। সেই সমস্তকে নিয়ে আমার 'ভগবতী' এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত হল। আত্মা বলতে কি তিনি মন, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, জল, আনন্দ ইত্যাদি-সমন্বিত—না খালি একটা ফাঁকা আওয়াজ? তা করো না বাবা, একদম গুলি করে দাও! "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥" তোরা প্রমত্ত হয়ে ভগবতী বলিস না। কোথায় লক্ষ্য, কাকে লক্ষ্য বলছিস, কাকে শররূপে ছুঁড়ছিস, তার ঠিক নেই। যিনি লক্ষ্য ও যাকে লক্ষ্যে ছুড়বি, এই দুই বেঠিক হয়ে গেলেই সে হল প্রমত্ত হওয়া। খালি—'মা গো, বাঁচাও গো' বলে নিজেকে—আত্মাকে ছুঁড়বি। ধ্রুব এমন তৈরি ছিল যে, তার জন্য ধ্রুবলোক রচনা করে তাকে আনতে তিনি রথ পাঠিয়েছেন। রথে উঠতে বেরিয়েই ধ্রুব দেখলে যে, একজন পুরুষ বসে আছেন। ধ্রুব জিজ্ঞাসা করলে,—"আপনি কে?" "আমি কালপুরুষ, আমায় ছুঁয়ে আপনাকে রথে উঠতে হবে। তাই আমার মাথায় পা দিয়ে আপনি রথে উঠুন।" এইরূপ মানুষ যে ধ্রুব, সে রথে পা দিয়েই বললে,—"আমি যাব না।" "কেন?" "আমার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কোথায় পড়ে থাকবেন, আর আমি ঊর্দ্ধলোকে গিয়ে কি করে বাস করব?" জীবত্বের মায়া তখনও ধ্রুবকে ছুঁয়ে আছে। দূত তখন বললে,—"তারা সবাই আগেই চলে গেছে। আপনি সেখানে গিয়ে তাদের

দেখবেন।” তোমরাও তেমনি ঊর্দ্ধে যেতে যেতে নানারকম বাঁধনের টানে পড়ছ। কিন্তু কিছু ভেব না। যেখানে তুমি যাচ্ছ, তোমার সমগ্র তৃপ্তি সেখানে পূর্ণমাত্রায় পাবে। যে সকল সংস্কার আগে থাকতে গড়া আছে, সে সব ত্যাগ করতে হবে। এই ভাল, এই মন্দ, এ আর থাকবে না। অজ্ঞানের অবস্থায় যত কিছু গণ্ডী ছিল—বাগানের বেড়া ছিল, এখন ভিতরে যাচ্ছ; এখন আর ফিরে ফিরে সে সব বেড়ার দিকে চেও না। ভিতরে অবাধ অনন্ত—বাইরের দিকে বেড়া বা সীমা। সমস্ত তৃপ্তির আগার যেখানে, সেখানে যাচ্ছ। এখানে যা কিছু পাচ্ছ, সে সব ঐখান থেকেই বেরিয়ে স্তূপাকার হয়ে ফুটে আস্‌ছে। ঐ সব যদি খেতে ইচ্ছা করে ত ঐখানে—আত্মবোধে বসে বসে খেও—বাইরে আর খেতে যেও না। ধন, যশ, স্ত্রী, পুত্র—এর জন্য এর দ্বারে, ওর দ্বারে যেও না। এই ঘরে ন্যাংটা ভিখারী আর রাজরাজেশ্বরী, দুজনে এক সঙ্গে বাস করে। যখন বলবে, কিছু চাই না, তখন ল্যাংটার গায়ে ঢলে পড়; যখন বাইরের সব কিছু চাইবে, তখন রাজরাজেশ্বরীর গায়ে ঢলে পড়। এমন ভগবতীকে জেনেও বাইরে চাইব?

আজকার কথা তোমাদের ভাল লাগল? কোন্ ঘরের কথা বলছিলুম? অব্যক্ত কূটস্থ আত্মা ও অব্যক্তা প্রকৃতি—এই জোড়ের ঘরটা বর্ণনা করেছি। এ তোমার ভিতরে আছে? জ্ঞানী হবি, না ভূত হ'বি? এখনও হেসে কথা বলছিস যে?

এই যে অব্যক্তা মহাদেবীর বর্ণনা করলাম, যিনি শিবের সঙ্গে

ঘর করছেন, ব্যবহারে এঁকে এই রকমে দেখতে হয়। এঁর সার মর্ম্ম প্রকাশ করলুম একটা কথায়—অব্যক্ত কূটস্থ বলে। ইনি এইখানে রয়েছেন ? এই শিবশক্তির মিথুনে তুই জাত হয়ে রয়েছিস ? তুই ত নস—এ শিবশক্তিই। এ সত্যি কথা, না খোষামোদ করে বলে নিচ্ছিস ? এই থেকে রেহাই পেতে হবে ত। তাই সত্যি কথা। এই কথা বললি। এর কিছু ফল হল ? কি ফল হল ? তুই তাই হয়ে গেলি ? ঠিক হয়েছিস ? খালি ছালের রং এখনও বদলায় নি—আর সব ঠিক হয়েছে। নমঃ শিবায় !

'নমঃ শিবায়' কোথায় বলছিস ? অনাহতে, না সহস্রারে ? এই ঘরে থাকবি, না ওখানে ঢুকবি ? বেরোতে চাস ত চল্। নমঃ শিবায় ! বাহ্য আবেষ্টনে ততক্ষণ আটকায়, যতক্ষণ না সহস্রারে যাওয়া যায়। ভিতরে ঠিক হচ্ছে, কিন্তু বাইরে ভূতের আচ্ছাদন ভুলছি না ; মানে—সহস্রারে যাচ্ছি না। বাইরের ছন্দ ভৌতিক নাড়ীপ্রবাহে ধরা আছে—যা একদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, একদিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় হয়েছে। এইটা ঢাকা পড়লে মাটির গড়া জগৎ ঢাকা পড়বে। ঐখান থেকে ব্রহ্মজাল দিক্‌দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং ঐখানে গিয়ে ডাকলে এ ছন্দ, এ আচ্ছাদন যাবে। চোখ মুখ, নাক কাণ কোথা থেকে বিস্তৃত হয়েছে ? শরীর এখান থেকেই বিস্তৃত—উপর থেকে নীচে ঝুলে রয়েছে। না, ওখানে দেখলুম, একটা শরীর-চক্র রয়েছে। সেই চক্রে দর্শন, স্পর্শন, গমন, গ্রহণ, উচ্চারণ, এ সব জাল রচিত হয়েছে।

এই আত্মরূপী কেন্দ্রে স্নায়ুচক্রের ঐ ব্যোমজাল—তার মধ্যে বসে আছেন ব্যোমকেশ! তোর চোখ মুখ, হাত কাণ কোথায়? মাথায়? ঐখান থেকে এ সব ঝুলে নেই? আগে মনে হচ্ছিল, এইগুলোতে ভরস্তর করে বসে আছিস। এখন দেখছিস, এগুলো শিবকে আশ্রয় করে কেশবৎ, রশ্মিবৎ প্রসারিত হচ্ছে, বাক্‌পাণিপাদ, মন, শরীর ইত্যাদি সমস্ত এইখান থেকে বিকীর্ণ হয়েছে। তা হলে মূল বস্তু কি? ঐ যিনি আত্মরূপা? হাত-পায়ে ভর দিয়ে, হাত-পা অবলম্বন করে তুমি বেঁচে আছ? না, বেঁচে থাকাকে অবলম্বন করে হাত-পা, এরা আছে? আর জলের পায়ে, টাকার পায়ে, পরিবারের পায়ে নেতিয়ে পড়বি? না, ওদের সব ভেদ করে চলে যাবি? ঐ যে স্বভাব স্বভাব করে বুঝাচ্ছিলুম, সেটা বুঝেছ ত? একটা তড়িৎশক্তি লোহার উপর দুই রকমে ক্রিয়া করে। একটা সমষ্টিগত বা massive ক্রিয়া—নিজে যে দিকে যাচ্ছে, তার সমস্তটাকে একটা বস্তুর মত সমগ্রভাবে নিয়ে যাওয়া—দশ মাইল ছুটলে দশ মাইল নিয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চুম্বিনীশক্তি তার ভিতরের আণবিক সত্তা পরিবর্ত্তন করছে, তাকে স্বভাব দিচ্ছে। এইরকম খানিকক্ষণ করলে তার ভিতর কাজ করবার শক্তি হয়ে গেল, লোহাটা স্বাধীন শক্তি পেয়ে গেল। এমনি করে তোমরা ভগবদধীনে স্বাধীনতা—স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছ। এইরকমে প্রকৃতির প্রবাহ আমাদের ভিতর গতি নির্ম্মাণ করছে। লম্বা, ছোট, স্থূল গতি চলেছে। এতে নিজে, স্বয়ং, এই জ্ঞানে আরূঢ়

হচ্ছি, কর্ত্তৃত্ববোধ আসছে—এই হল জীবত্ব, স্বভাব। এটা হল ধৃতিশক্তি—তার দ্বারা আণবিক পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তোমার ভিতর একটা জলাবর্ত্ত তোমায় ঘিরে ঘিরে চলেছে। তাতে তুমি স্বতন্ত্র জীব বা কর্ম্মী হয়ে পড়েছ। এর আর এক নাম ব্রজশক্তি, চুম্বিনীশক্তি। তোমার স্বভাবটি হল ব্রজভূমি, বৃন্দাবন। এতে ধ্বনিকৃষ্ণ নাচছে। সে মাখন চুরি করে নাচে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতের ভোগ সম্পাদন করছে, ব্রজলীলা হচ্ছে। তুমি এখানে থাকবে, না বজ্রলীলায় যাবে? ঐ যে মহাগতিশীলা সহস্রার থেকে ভীষণভাবে দিক্‌দিগন্তে ছুটেছে, ঐ হল বজ্রভূমি। এটার নাম হল ব্রজশক্তি, স্বভাব, ধৃতিশক্তি, চুম্বিনীশক্তি। যেখানে আত্মত্বের আণবিক পরিবর্ত্তন হচ্ছে, তার নাম ব্রজ। বলেছি, তিন রকম গতি আছে—সরল, পাকান এবং চক্রাকার। ক্ষুদ্র নিজকে অবলম্বন করে যে গতি, সে হল স্বভাব-গতি। কৃষ্ণ-চরিত্রের তিনটি অংশ—এক ব্রজলীলা, এক ভীষণ কালমূর্ত্তি, লোক-সংগ্রহ-মূর্ত্তি, আর এক দ্বারকায় যদুবংশ ধ্বংস করা। আগে লোক-সকল ধ্বংস করলুম, এ হল কুরুক্ষেত্র-লীলা, আর এক নিজেকে মারলুম। আত্মাকে দেখলে ব্রজলীলা; তার পরে কুরুক্ষেত্র—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমেত যত কিছু আছে, সব আমাতেই। এ কখন হল? কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ! এই যে অব্যক্ত প্রকৃতি-পুরুষকে দেখাচ্ছিলুম, এ নিজেতেই সমাহিত হচ্ছিল না? সব যখন নিজেতেই দেখলুম, তখন আর 'সব' বলে জিনিষ থাকবে না। সর্ব্বধর্ম্মান্

পরিত্যজ্য, খালি পরমাত্মা রইলেন—অদ্বিতীয়ে চলে গেলেন আত্মা ও আত্মশক্তি। পরমাত্মত্বই সব। ধর্ম্ম-আকারীয় আর কিছু রইল না, খালি ধর্ম্মী রইল—"একং মাং পরমাত্মানং শক্তি-সত্তাস্বরূপিণং।" প্রভাসে হল পরমাত্মত্ব। বৃন্দাবনে লোক নিয়ে বিহার করা। কুরুক্ষেত্রে লোক-সংগ্রহ করে নিজের ভিতর পোরা, নিজ ও পর ভেদ করে, লোপ করে পরমাত্মত্বে প্রবেশ করা। আত্মতত্ত্বের ত্রিবিধ বিকাশ এইরূপে কৃষ্ণলীলায় অঙ্কিত হয়েছে।

ভগবতীকে নিজেতে ঠেকাতে হবে কোথায়? সহস্রারে। হৃদয় থেকে স্পর্শ করে নিয়ে আজ্ঞাচক্রের ভিতর দিয়ে সহস্রারে যেতে হবে। আত্মা হৃদয়েও ব্যক্ত, সহস্রারেও ব্যক্ত, খালি আজ্ঞাচক্রে অব্যক্ত। ভগবান্ বলে হৃদয়েই তাঁকে গ্রহণ করে, তাঁর যে নিগূঢ় ব্যাপার, সে সমস্ত সহস্রারে, প্রাদেশ-পরিমিত ভূমিতে দেখতে হবে।

২৪এ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' শাস্ত্রকারেরা এ কথাটা বড় সত্য বলে গেছেন। ফল পাকলে যেমন সে নিজেই রসে ভরে যায়, তাকে আর গাছের গোড়া থেকে রস নিয়ে রসময় হতে হয় না, তেমনি পঞ্চাশের পর কর্ম্ম-সকল পেকে, রসে ভরে গেছে, তার আর রসের দরকার নেই। তবে যে বলেছেন, "কুর্ব্বন্নেবেহ

কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”—সে হল এই জ্ঞান, এই আত্মত্বকে আরও ঘনীভূত করবার জন্য বেঁচে থাকবার কথা।

‘ভগবান্’ এই নামের প্রধান তাৎপর্য্য হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য-দর্শনে। তাঁর সেই মাহাত্ম্য বজায় রেখে তাঁর সম্বন্ধে আর সব করণীয় করতে হবে। মাত্র প্রতীকেই ভগবৎজ্ঞান সমাপ্ত করবে না। কি অন্ধকারই এসে গেছে! যারা জ্ঞান পেয়েও তাঁকে টেনেটুনে ঐ ক্ষুদ্রতায় নিয়ে আসে, ‘স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ’। মানুষ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িকতার স্বভাবে এত বসে আছে যে, আসল জ্ঞান জেনেও তাঁকে ঐ ক্ষুদ্রত্বে পাকিয়ে আনার প্রচেষ্টা করছে। মূর্খ মানুষে জ্ঞান ধারণা করতে পারলে না—সে আলাদা কথা, তার ক্ষমা আছে। স্বভাবের কি প্রাবল্য! একে ত জগৎ-সংসারে নিছক ধর্ম্মশাস্ত্র খুঁজে পাবার জো নেই, সকল ধর্ম্মই কল্পিত উপাখ্যানে ঢাকা। খালি উপনিষদ্ই ধর্ম্মের সনাতনত্ব জাগিয়ে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া আমাদের ধর্ম্মই বল বা অন্য ধর্ম্মই বল, সবই কতকটা নৈতিক উপদেশ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, আর কতকটা কল্পনা। নিছক জ্ঞানের আলো খালি উপনিষদেই আছে।

ভগবান্ চিন্ময়—এ কথাটা এখনই সব জল্পনা-কল্পনা সায় করে দিলে। ‘যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি’ এই যে কথাটা আমার সর্ব্বগ্রাসী হল, সে কথাটার মূল্য কেউ দিলে না। এ কথাকে বুক ভরে তুলে নিলাম না। তাঁর এই চিন্ময়তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গেলাম, এ হল না। প্রমাণ দাও, পুঁটলি

বাঁধ, এই সব করতে করতেই জন্ম বয়ে গেল। বড় জোর ঐ একটু আধটু আত্মতৃপ্তি—হ্যাঁ, ভগবান্! আহা তুমি! বড়-মানুষের ঘোড়া, সমস্ত দিন দলাই-মলাই চলছে, হয় ত দুদিন একদিন বাবু তাকে ফিটনে জুড়লেন। তোরাও তেমনি গুরুর কাছে একবার বসলি—টম্‌টম্ টানলি ; নয় ত সমস্ত দিন দলাই-মলাই করতেই কেটে গেল। কিন্তু যখন টানবার সময় হল, সে সময় তেজীয়ান্ বীরের মত টান ; তা না, সে সময়ও মাথা থেকে নেশা তাড়াতে জীবন বেরিয়ে গেল। যে মহান্ তত্ত্বের আলোচনা করতে মা আমাদের অবসর দিয়েছেন, এত বড় কাজও যদি কতকটা গুছিয়ে না করতে পারি, তা হলে কি আর অনুতাপের সীমা থাকবে ? ঘাটে এসে নৌকা-ডুবি হবে। তাই বলি, যেমন তোদের ভগবানের কথা মনে এল, অমনি তাঁর এই বিশ্বমূর্ত্তিতে একবার চড়-চড় করে পাক খেয়ে নিবি। সকলের তলায় তলায় আত্মমূর্ত্তিকে দেখবি। নাক টিপে, চোখ টিপে তাঁকে দেখতে গেলি, পণ্ডিতের মত ভাবতে বসে গেলি—এ আমি তোদের বলেছি ? তোদের যা চোখে পড়বে, তারই তলায় তলায় আত্মমূর্ত্তি ভগবতী! নমস্তে! নমস্তে! কত দুরন্ত হয়ে গেল দেখ। মস্তিষ্ক খাটিয়ে, নিজের সেই সময়কার ভাবের সঙ্গে কচলাকচলি করে হয় ত একটু কিছু বেরোল, না হয় কিছু বেরোল না ; তখন "হা ভগবান্! তুমি যা কর!" কিন্তু 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য'—এই কথা বলে গুরু একেবারে জলের মত করে ছেড়ে দিয়েছেন। জ্ঞানের আবেষ্টন তৈরি করে নেওয়া, এই ত কথা।

যখনি আত্মবোধকে ধরিয়ে দিয়েছি, তখনি—দূর থেকে পরেশনাথ-পাহাড়ের চূড়া দেখবার মত নির্দ্দিষ্ট খোঁটা পেয়েছিস। এখনও তাকে পাথর বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ঐ প্রত্যক্ষ আত্মত্ব ছাড়া জ্যান্তকে আর কোথাও খুঁজে পাবার জো নেই। যেখানে আত্মত্ব না পড়ে, সে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়; যেখানে পড়ে, সে জ্বলে ওঠে। তোরা 'আঃ' বলে ওঁকে ছেড়ে দিস কেন? উনি স্বয়ং-ভগবান্—ওঁতে বিরাজ কর, বিরাজ কর। চলে যা—চলে যা একেবারে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই ভূমিতে। 'জ্ঞান' এই কথা মাথায় এলেই ভূতরাজ্য শেষ করে দিলুম, আর আমার চোখে ভূতরাজ্য ঠেকবে না। এমন কোন্ জ্ঞান আছে, যার খোলসের মধ্যে আত্মমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু ভেসে উঠছে? ইনি ছাড়া আর কেউ নেই। স্তম্ভ ভেদ করে অন্ততঃ এত দূর গিয়ে পড়। আমি ব্যক্তিত্বময় ভগবানের সামনে এসে পড়েছি; আমার যে সংস্কারগুলি আছে, 'শরণাগতোঽহং' বলে তা আমি তাঁকে ঢেলে দিচ্ছি—অন্ততঃ এত দূর আসা চাই। ভূতের বোঝা টানতে টানতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ এই বোঝা একেবারে পড়ে না যায়, ততক্ষণ কি আমাদের আনন্দ করবার, দম ফেলে নিশ্চেষ্ট হবার জো আছে। ভূতের চাপের ভিতর থেকে আত্মত্বকে ডিমের মত ফাটিয়ে বার করতেই হবে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবান্, তুমিই ত সর্ব্বভূতে বিরাজ করছ।" এই কথা কি এই রকম করে বলা যায়? মূর্ত্তিই যাঁর বীর্য্য, বীর্য্যই যাঁর মূর্ত্তি, সেই শব্দ উচ্চারণ করছিস, অথচ তুই নির্জ্জীব!

ভগবতী বললেই ত চিন্ময় বললি। আর সেই চিতের বিস্তৃতি; বীর্য্য কত দূর? যাঁর শক্তির পরিসীমা নেই, অনন্ত অপার এই মহিমাই যার রূপ, তাঁকে ডাকা মানে, তিনি তোতে ফেটে পড়ছেন; তোর বাড়ীর ভিতরে তিনি ছিলেন, এখন ফর-ফর করে ফুটে বেরোচ্ছেন। ভগবতী বলছি তাঁকে, যিনি বাড়ীর ভিতর অব্যক্ত, অস্ফুট ভাবে ছিলেন, এখন ব্যক্ত হচ্ছেন। যিনি বেরোলেন, তিনি কি সান্ত, সীমাবদ্ধ, না অসীম অনন্তের মূর্ত্তি? যেমন একটি শুক্রকণা বা একটি রোগের বীজাণু। যে তার তত্ত্ব পড়েছে, সে জানে, তার ভিতর অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। তেমনি যে জানে, এ ভগবতী এত বড় শক্তিময়ী—সে এই বাক্‌রূপ মন্ত্র ঠেকাবে, আর হয়ে যাবে। এইরূপ দেখতে দেখতে মন্ত্র বলতে হবে—নতুবা মন্ত্রের কিছু দাম আছে? আর এই মন্ত্র ঠেকাবার জায়গা—আত্মা ভিন্ন, নিজবোধ ভিন্ন আর কোথাও আছে? আকাশ বাতাস, শব্দ স্পর্শ—এসব কি নিজবোধ থেকে ভিন্ন? তবে কেন এত সঙ্কীর্ণ পাপিষ্ঠ হয়ে রয়েছিস? এই ভগবতীর সংস্পর্শ আমার সমস্ত জীবনে সঞ্চারিত হবে না?

শম্ভুর বুকে ছাড়া ভগবতী আর কোথাও দাঁড়ান? তিনি আত্মসঞ্চারিণী। কোন্ অংশ শম্ভু, কোন্ অংশ অক্ষর নিজত্ব, এই দেখতে আত্মচক্ষুটি ঠায় বজায় রাখতে হবে। এ চক্ষু হারালেই সব পণ্ড হবে, অন্ধকার হয়ে যাবে। এই যে বুকের ভিতর আবেগ এল, একটা বিলাস এল, এর সবটা ভগবতীই ত? তা হলে এই অনুভূতির ভিতর কোন ব্যর্থতা আছে? এক জন

মানুষকে ঘরে ডেকে এনে, অভ্যর্থনা করা, সে যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য বলে প্রতীত হচ্ছে ? তোরা আকাশচারী জীব হ। যদি চিদাকাশচারী জীব হতে পারিস, তবে সঙ্গে সঙ্গে এর সার্থকতা দেখতে পাবি। মাটিতে বসে থাকলে হাতে হাতে সার্থকতা পাবি না। তাতে কর্ম্মটি তোলা রইল—একদিন ফল পাবি। মাটিতে বসা মানে, সাংসারিক ভাবে, ক্ষুদ্র ভাবে থেকে ভগবতী বলা। তোরা এ সংসারকে কত বার টুস্কি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিস। এখন আবার একে ধরে বসে থাকিস কেন ? বিমানে উড়ে চল। কর্দ্দম ঋষি যেমন জ্ঞানের বিমান গড়ে, তাতে চড়ে উড়ে বেড়াতেন। এ আজগুবি ব্যাপার নয়। আর তুই-ই বা কোথায় উড়ছিস ? বিমান ধরেই উড়ছিস, তবে তা জানতে পারছিস না। যদি জানতে পারতিস, বুঝতিস, তবে এ দিকের ভরস্তর আর থাকত না। জানিস না, তাই ভাবছিস, আর একজনে গড়েছে ; তাই মরছিস ! জ্ঞানের এক মানেই হল বিমান, মহাশক্তি। জ্ঞানের এই মানে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিবি। জ্ঞ ও অনের সংযোগ হল মহাশক্তি। এর বাইরে যদি শক্তি খুঁজতে বেরিয়েছিস ত মরেছিস।

দেখ, তোমরা যদি তৈরি থাকতে, তা হলে আমাকে আর এ কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হত না। তোমরা তৈরি নও। তাই আমাকে উল্টে পাল্টে আবার দেখাতে হচ্ছে। তোমাদের এ দর্শনে আমি মোটেই তৃপ্ত নই। খালি তোমাদের অনুরোধে শাকাম চিবুচ্ছি। যতক্ষণ না তিনি আমার চর্ম্ম-চক্ষুকে প্লাবিত

করবেন, ততক্ষণ আমি তৃপ্ত হব না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থময় এই জগৎ—এর সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে ভগবতীতে—এর সমস্ত রকম প্রকাশ নিয়েই বাঙ্ময়ী, হৃদয়ময়ী, মনোময়ী ভগবতী, এই আমি চাই। তবেই সমস্ত সংশয় দূর হবে; তখনই জানবে, এ বিশ্ব সত্য সত্যই ব্রহ্মময়; নইলে অবাধে বিচরণ করতে পারবে না। ঐ ধরবে ধরবে, ঐ ভূতে ধরবে বলে ভয় থাকবে—না কি? তোমাকে ত পাচ্ছি—রূপ পেলেও তোমাকে বা তোমার রূপকে পাচ্ছি, শব্দ ইত্যাদি পেলেও সেই সেই রূপে তোমাকেই পাচ্ছি—এ ত পাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাকে চাই সমাস-ভাবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, একজন—এই আমি চাচ্ছি ত? আর এরূপে পাওয়া কিছু কঠিন নয়—সে আমার কথার উপরই নির্ভর করে। আমি ভগবতী বলে সমগ্রভাবে যদি তাঁর ভিতর ঢুকি, তবেই সমগ্রভাবে ভগবতী আসবেন। সমগ্র আমি না ঢুকলে সমগ্র ভগবতী বেরোবেন না। ভগবতী বেরোচ্ছেন মানে কি? কথাই হল তাঁর বপু। সেই বপুর ভিতর তাঁর শিরা, স্নায়ু, প্রাণ, মন, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি সব আছে. ঐ কথার ভিতর সব আছে। সেই শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি সব গ্রহণের জন্য চতুর্দ্দশ করণ, হৃদয়, আত্মত্ব, এ সবও ঐ শব্দের ভিতর আছে? কথার ভিতর আত্মত্ব থেকে আরম্ভ করে হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়, সব আছে—না, এ একটা ফাঁকা কথা বলছি? ভূততত্ত্ব থেকে জ্ঞানতত্ত্বে কেমন করে গেলুম—রাস্তাটা সোজা হল না? মোট কথা, পরম-কল্যাণের জন্য তোমাদের জীবন এখনও আকাঙ্ক্ষাময় হয়নি।

তাই রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত দিন জোবড়া-মুখ হয়ে বসে রইলি ; ভগবানের সামনেও তাই থাকবি ? ভূত থেকে আত্মত্বে, আত্মা থেকে ভূমা আত্মত্বে যেতে কত মিনিট লাগে ? প্রতিদিন একবার করে অভ্যাস করলে কত মিনিট লাগে ? দুই চার পাঁচ মিনিট লাগুক। তোদের কারও গায়ে ডালভাত, কারও গায়ে টাকা, কেউ শত্রুত্বে পরিপূর্ণ, কেউ রোগ-সমাচ্ছন্ন ; —ডুব দে, ডুব দে,—একেবারে এ-সব ধুয়ে ফেল। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি. কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" এ করুণরসের বা কৃপা-প্রার্থীর কথা নয়। 'যৎ করোষি', এ কথা একেবারে মাথায় রেখে দিবি। শাস্ত্রকারদের টিপ্পনী শুনিস না—যাগ, যজ্ঞ, কর্ম্ম, এ ত বটেই। এ ছাড়া যৎ করোষি—যা কিছু করিস, সব দিবি। গঙ্গাস্নান করতে এসেছিস, দুর্য্যোধনের গল্প জানিস না ? মায়ের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে সে লজ্জা পেলে, শকুনির পরামর্শে বুদ্ধি খাটিয়ে কাপড় পরে গেল। হা হতোঽস্মি করে মা বললেন,—"আমার সামনে নিঃসঙ্কোচ ভাবে এলি না!" কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন,—"উলঙ্গ হয়েই যাবে। মায়ের কাছে লজ্জা কি ?" তাই মায়ের দৃষ্টিতে ভীমের সর্ব্বাঙ্গ অভেদ্য হল, দুর্য্যোধনের নিম্নদিক্ অভেদ্য হল না। তাই ঔ. আমরাও মায়ের কাছে নিঃসঙ্কোচে যাব। পাপ, ময়লা, এ দর্শনে থাকে, তা নিয়েই যাব। রাস্তা কত সিধে, ঝরঝরে হয়ে শাকায় চি 'নামের বলে' আমি বলেছি, "মা পতিত-পাবনী—আর মাটিতে পতিত।" ঐ কেন হয় ? মাকে অস্বীকার করার

জন্য। এই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা নয়? "তা কি হয় মশায়! এই সব কর্ম্মের পাক কি অমনি অমনি যাবে? আপনি ও-সব কথা ভাবের ঘোরে বলছেন।" এই কথা বলে তুমি আপনার মাথা আপনি খেলে! কারণ, যাকে তুমি ডাকছ, সে অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। তার ইচ্ছায় আজ সান্ত ভূত অনন্ত হয়ে গেল। এ তত্ত্বের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারই হল এই। যতক্ষণ না এ বীর্য্য উদ্বুদ্ধ হল, ততক্ষণ এ তত্ত্বকে মানাই হচ্ছে না। এর ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে সব উল্টে যায়। নিজত্বের কোন্ অন্তঃস্তরে গিয়ে হাজির হয়েছ দেখছ? এর ভিতর এত বড় বীর্য্য লুকান রয়েছে যে, ইচ্ছামাত্র দুনিয়া ভাঙ্গতে ও গড়তে পারে। এই ত বাঁদর সেজে বসে আছি; এইটুকুর সম্পর্কে যে নিজত্ব, তাকেই দেখব, আর মহানের সম্পর্কিত নিজত্ব দেখব না? তাতে বিশ্বাস নেই বলে দেখতেও প্রবৃত্তি হয় না।

এই সব কথা আমায় আবার বলতে হচ্ছে। তোমাদের জন্য দ্বিগুণ, তিনগুণ খাটুনি হচ্ছে—অগ্রসর হতে পারছি না। মা, উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, উদ্ধার কর! ছেলে বলছে—উদ্ধার কর; মা বলছে—উত্তিষ্ঠত, ওঠ! জয় ভগবতি!

মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো খাওয়া যাদের অভ্যাস, এই কৃত্রিম হাওয়া আলো তাদের কাছে বিষ; তেমনি এই সঙ্কীর্ণ জীবন বিষময় বোধ হবে। এই জ্ঞান না নিয়ে আর কালী, কৃষ্ণ, দুর্গার ভজনা করতে যাবি? যদি এই অন্ন-সম্ভার না থাকে, তবে খালি আলো চালের নৈবেদ্য-নিয়ে গেলে পূজা হবে? মা গো! কি

সাদা সরল গঙ্গাজলের মত রাস্তা! এতে সমস্ত কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রের যা সাক্ষাৎ মর্ম্ম, তাই তোমাদের সামনে ধরে দিচ্ছেন, এতে তোমাদের বুক খুলছে না? বললুম,—সবই জ্ঞান—কেবল জ্ঞান, জ্ঞান। চন্দ্রের দীপ্তি জ্ঞান, সূর্য্যের দীপ্তি জ্ঞান—তা হলে আমি কি অন্ধকার? অন্ধকারে আর থাকা যায়? আত্মা এই আলোকময়? নিজে এই আলোকময়? আহাহা! 'প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।' এই আলো, এই অন্তর্জ্যোতি তোদের ভাল করে ধরিয়ে দিতে হবে। সূর্য্য অস্ত গেলে যেমন ঘুম পায়, তেমনি এই আলো তোদের ভিতর ভাল করে জ্বলেনি বলে তোদের অত নিশ্চেষ্টতা, অত চাঞ্চল্য।

২৫এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, শুক্রবার।

এ তত্ত্বের দিকে আমার গতি হচ্ছে কি না, তা দুই দিক্ থেকে ঠাওর পাওয়া যায়। এক, ওঁর দিকে আমার আকর্ষণ বাড়বে, আর এক, এদিকের আকর্ষণ কমে যাবে। আকর্ষণ মানে—ধৃতি-শক্তি, চুম্বিনী-শক্তি। আমার অবস্থা কি রকম দাঁড়াচ্ছে, তা দুই দিক্ থেকে উপলব্ধি করতে হবে। সারা রাত্রি নৌকা বেয়ে মরলুম; সকালে দেখি যে, নোঙর তুলতে ভুলে গেছি। এই দুর্দ্দশা যেন আমাদের না হয়। নোঙর হল পঞ্চ ভূতের ভীষণ আকর্ষণ। জিনিষ ভোগ করায় তত দোষ নেই; কিন্তু ভোগে

জড়িয়ে থাকাই দোষ। ঐ যে 'আবার খাই, আবার খাই" ভাব—এই হল সাংঘাতিক!

তোর চেতনা আছে? কোথায় আছে? চেতনা তোরও আছে, আমারও আছে, সকলেরই আছে। কখন তালে তালে, আবার কখন চূর্ণে চূর্ণে এই যে জগৎ এল ও গেল, এ সব চেতনার দ্বারা গৃহীত না হলে এদের কোনও মূল্য আছে? তোর জীবনের সার জিনিষ কি, এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে তুই কি বলবি? চেতনা। ঘাড়ে পাহাড় চাপালে, আর ফুলের বিছানায় শুইয়ে রাখলে, এ উভয়ের কোনই মূল্য নেই, যদি চেতনা না থাকে। তা হলে জীবনে সার্থকতা আনতে হলে কোন্-খানটা উজ্জ্বল করতে হবে? চেতনা। চেতনার অপলাপ করলে কি হবে? মৃত্যু।

রাবণের মা ছিল নিকষা রাক্ষসী। রাবণ মরে গেলে রাম-চন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন,—"লক্ষ্মণ, রাবণের মা জীবিত আছে। সেই বৃদ্ধাকে একবার দেখা না দিলে ভাল হয় না।" রামচন্দ্র নিকষার নিকট উপস্থিত হলে সে বললে,—"কে বাবা? আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছি, তোমায় চিনতে পারছি না।" রাম বলিলেন,—"মা, আমি রামচন্দ্র। তুমি বড় আহত হয়েছ—কিছু বর চাও।" নিকষা চিন্তা করে বললে,—"তুমি আমার জীবন, সত্যই দুর্ব্বহ করেছ। কিন্তু আবার তুমিই এসে বলছ—'বর চাও।' আমি ফ্যাসাদে পড়লুম। দেখছি, জগৎটা বড় অদ্ভুত। যারা ইন্দ্রাদি দেবতাদের রাজ্যচ্যুত করেছিল, তাদের

মারলে কি না—একটা মানুষ ও দুটো বাঁদর! এ স্বপ্নেরও অগোচর! এ মনে পড়লে বোধ হয়, জগৎ বড় আশ্চর্য্য! তাই আমায় বর দাও, আরও কিছু দিন বেঁচে থাকি, আরও আশ্চর্য্য দেখি।" কথাটা ঠিক। এই জগতের বৈচিত্র্য-দর্শনই হয় মানুষের উদ্ধারের সূত্রপাত। এর দ্বারা চেতনা উদ্দীপিত হয়—চেতনার জাগরণ হয়। দুঃখ আছে, তত্রাচ তার ভিতর মধু পাই। মরতে মরতে, বাঁচতে বাঁচতে, শেষে যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় এক দেবতা এই বাঁচা ও মরার তলায় তলায় অবস্থান করছেন, তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়। তিনি হলেন এই চেতনা—যাঁর কথা বলছি। কারণ, এই চেতনাই আমায় সুখী করছে, দুঃখী করছে, স্বর্গ নরক ভোগ করাচ্ছে, উর্দ্ধে বা নীচে নিয়ে যাচ্ছে; সুতরাং আমার সমস্তই এই চিন্ময়তত্ত্ব, আর আমার সব প্রাপ্তির ব্যবস্থা এঁতেই রয়েছে। এই চেতন তত্ত্ব, আর জ্যান্ত আমি, এতে কোন তফাৎ আছে? এর নীচে কোথাও যাবার জো'আছে? চেতন রয়েছেন—এই হল প্রাণবন্ত হবার একমাত্র মূল। যাঁকে চেতনা চেতনা বলছি, তিনি আপাদ-মস্তক জ্যান্ত নয় কি? যেমন আমি, যেমন গাছ-পালা কাদা-জলে ঢাকা জ্যান্ত, সেরূপ নয়; একেবারে স্বচ্ছ, একেবারে নির্ম্মল। যাঁর অস্তিত্বই হল প্রাণ! প্রাণ এঁরই নাম ত? চিন্ময় তা হলে প্রকৃতপক্ষে একজন? জ্যান্ত বলতে যত কিছু ধর্ম্ম বা তার চেয়ে আরও উজ্জ্বল যদি কিছু থাকে ত সে সমস্তই ওঁতে নিহিত। তা হলে যাঁকে একটু ক্ষুদ্র আলো বা বিচার-বুদ্ধি-স্বরূপ মনে করে

অবহেলা করছিলাম, ইনি জাগ্রত ও মৃত্যুহীন একজন। চির-জাগ্রত হয়ে ইনি এইখানে আমাতে অবস্থান করছেন? চেতনা বলতে এঁকেই বলছি? ইনি না থাকলে আমি মরে যাই, ইনি থাকলে আমি বাঁচি। তা হলে ইনি আমার প্রাণের প্রাণ? তা হলে একে নিয়েই আমার সমস্ত সার্থকতা? তা হলে একে হিসাব করে, কষে মেজে, ভগবান্ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলুম না। আমার সমস্ত অস্তিত্ব যদি এর বুকে হয়, তা হলে আমার ঈশ্বর, আমার আত্মা, আমার ভগবান্ ছাড়া আর কোনও ভাষা এঁতে ব্যবহার হতে পারে? যদি বুঝি, আমার জীবন বলতে যা, তা ইনিই—এই যদি ইনিই হন, তবে কেন জীবন বলে পুত্রে, পিতায়, অর্থে, টাকায় ছুটি? যদি জানি, প্রত্যক্ষ-ভাবে ইনিই আমার জীবন।

তা হলে দেখছি, এই চেতনাকে আমি এখনও জানিনি, এই জগতের মত প্রত্যক্ষতায় এঁকে এনে ফেলতে পারছি না। এখানকার মত সার্থকতা পেলে তবে এতে ডুব দেওয়া সহজ হয়। এই যে বিশ্বমূর্ত্তি, যাতে পাগল হয়ে আছিস, সে যে এরই মূর্ত্তি, তা এখনও দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারিসনি। চেতনা হল—কিছু মাথায় এল; মানে—তিনিই প্রকাশ হলেন। যা কিছু প্রকাশ হচ্ছে, এখন আর তার স্থূল অংশ দেখব না; যিনি প্রকাশ হলেন, তাঁকে দেখব। যে আমায় ভোগের সার্থকতা দিলে, তাকে দেখতে আমার ইচ্ছা হবে না? কি করে ভোগ-সম্পাদন হচ্ছে? আমার ভগবতী এইরূপ মূর্ত্তি ধরেছেন, এ

যদি আমার বুকে না ফোটে, তবে ভোগের কোন সার্থকতা হবে? যতক্ষণ না জ্ঞান-দেবতার সম্বন্ধে জ্ঞান বুককে আলো করে তোলে, ততক্ষণ কোন সার্থকতা হবে না। সেই আলোর জন্য আমরা বিধিবদ্ধ ভাবে চলেছি। আকাশের ভিতর, জলের ভিতর, মাথার ভিতর, পেটের ভিতর কে তুমি? নবীন রসে এঁর সর্ব্বাপেক্ষা ভাস্বর মূর্ত্তি গুরু ফুটিয়ে দিলেন। নানারকম ভোগ্য মূর্ত্তি ধরা ও নিয়ন্ত্রণ করা, আর তার তলায় তলায় ইনিই দাঁড়িয়ে আছেন; সে এঁর আর এক মহিমা। নিজে নিজে, নিজে নিজে, এই ভাষায় কেবল ঐ মূর্ত্তি বিধৃত হয়ে রয়েছে। তাই দেখিয়ে দিয়ে, প্রত্যক্ষ ভগবান্‌কে গুরু সামনে হাজির করে দিয়েছেন। আকাশে পাতালে আমি এঁকেই খুঁজছিলাম। এঁকে খোঁজা ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম হতে পারে না। আমি কার তৃপ্তি অন্বেষণ করছি? নিজের। এটি কি ভয়ঙ্কর শব্দ! একেবারে খাঁটি আমাকে বুঝিয়ে গেল। অথচ সে খাঁটি আমি এই ব্যবহারশীল আমি থেকে কত দূরে। তাঁকে যখন দেখি, তখন এ আমি সেখানে গ্রাহ্য নয়। সে আমি ভূমা। প্রতি অণুতে অণুতে তিনি একজন হয়ে বিরাজ করছেন। এই একজনকে পেলে যে 'আমি' দূরে সরে গেলুম, তাতে বিন্দুমাত্র শোক হয় না। এক পরম মহিমময়, পরম ঐশ্বর্য্যময়ের সঙ্গে আমি একসা হয়ে গেছি—তখন আর এই তুই, এই মাটি তোর চক্ষে কোনও মূল্য ধরতে পারে? এই যে আমি অনায়াসে বেরিয়ে গেল, এবং অনায়াসে ভগবানে একীভূত হল, সে যদি তখন কথা বলে তো

কোন্ বাক্য উচ্চারণ করবে ? 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এ ছাড়া আর কোনও ছোট পরিচয় সে দিতে পারে ? এই যে কোন্ নরক থেকে কোন্ স্বর্গে এরই ভিতর গেলাম—এ কোথায় একজন দাসানুদাস ভিখারী, আর কোথায় একজন অনন্ত শক্তির একচ্ছত্র সম্রাট্! "অত্র মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" অত্র—এই নিজেতে! ইস্! এঁকে পেয়ে তবে উপলব্ধিতে এল—আহা, চিন্ময়, চির-সুন্দর! সকল শক্তির চির-ধর্ত্তা, পাতা। তা হলে যে মাত্র চক্ষু ছিল, সে অনন্ত দর্শনাভিমানী দেবতা হয়ে গেল। কাণ অনন্ত শ্রবণাভিমানী দেবতা হয়ে গেল। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় নিজেকে অনন্তত্বের আধার বলে উপলব্ধি করতে লাগল। এই পরমাত্মা তখন প্রাণশরীরী হয়ে গেলেন। চেতনাই যাঁর সম্পদ্, তাঁর ভাঙ্গাগড়া যা কিছু সম্পন্ন হচ্ছে, সব এইখানে—এই প্রাণশরীরে। এখন দেখলি, চতুর্দ্দশ ভুবন এইখানেই রচনা করি। এই পুরুষের তখন নাম হল—সহস্রশীর্ষ পুরুষ, সহস্রার-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। তখন সমস্ত বিশ্ব-ভুবন এই মহীয়সী চিন্ময়ী শক্তির খালি জ্যোতির প্লাবন হয়ে গেল। এই প্লাবন—যত কিছু ছটা বেরিয়েছে, তার অন্তরে অন্তরে, মূলে মূলে ইনি কাকে দেখছেন ? নিজেকে। বর্ণ-আকারীয় ছটা বললে আমিই সর্ব্ব-বর্ণময়। আমিই সর্ব্ব-শব্দ-স্পর্শ-মনোগন্ধময়, সর্ব্বগন্ধময়, সর্ব্বস্বপ্নময়, সর্ব্বমনোময়, সর্ব্ব-প্রাণময়, আনন্দময় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এই হল ভাষা! জগতের ধূলা-কাদা, হাড়-মাংস নিংড়ে যে আনন্দ, তার সঙ্গে এই

আনন্দের তুলনা হয়? তেমনি করে কাদা-ছেঁচা জল খেতে আর ইচ্ছা হবে? ইচ্ছা না হবার জন্য একটা তপস্যা করতে হয়—না, স্বতঃসিদ্ধভাবে এ ইচ্ছা জাগে? এমন সুপেয় জল—আর আগে কি খাচ্ছিলুম? আর যদি এই চিন্ময়রূপ পরমসম্পদ্ জ্ঞানকে অর্জ্জন না করি—আগে যেমন ছিলুম, তেমনি থাকি, তা হলে বুঝা যায়, একটা দৈন্যের নিকট জীবনটাকে বিকিয়ে দিচ্ছি। আমি এ-দিকের দুর্দ্দশা আর ওদিকের সম্পদ্ দেখতে পাচ্ছি। তবু এখনও তোমাতে প্রবিষ্ট হয়ে থাকতে পারছি না—কিন্তু দুই রাজ্যই দেখতে পাচ্ছি। তাই ভগবান্ বললেন,—"এই জ্ঞানের উদয়ে পরাভক্তির প্রকাশ হয় এবং তার পরে সে আমাতে প্রবিষ্ট হয়।" আমাদের তা হলে অভাব হচ্ছে পরাভক্তির। পরাভক্তি পূর্ণমাত্রায় জাগছে না, তাই এখনও ভগবতী জাগছেন না।

পরাভক্তি কাকে বলে? পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অবলম্বন করে যে ভক্তির উদয় হয়, তাই পরাভক্তি। এই নিজত্বে আমার নিজত্ব ঢেলে দিলাম। এই নিজস্বরূপতাই আমার খাবার, বসবার একমাত্র স্থান, একমাত্র উপাস্য। এই জীবন্তের ভিন্ন আর কোনও মৃতের সংস্পর্শ আমি চাই না। এইখানে যে সুখ, যে তৃপ্তি পাই, সেই সুখ ও তৃপ্তি ঐখানে পাইয়ে দিন, এই বলবি। তোদের তৃপ্তির ভরন্তর পড়ে আছে—ডালে, ভাতে, চচ্চড়িতে; একটু শব্দ, একটু রস, একটু স্পর্শের তোরা কাঙ্গাল। এ সব তোমারই ধর্ম্ম—তাই এখানে দেখা দিয়ে, এ সব সঙ্গে করে

তোমারই কাছে নিয়ে যাও। আমায় আর গাড়ী ভাড়া করে কেন যেতে বলছ? তুমি এস। এমনি করে তুমি নামবে না? খেতে গেলুম অন্ন—পেয়ে গেলুম অন্নপূর্ণা। খেতে গেলুম রস—পেয়ে গেলুম রসময়ী। এমনি করে আমার ইন্দ্রিয়বর্গের পূর্ণ সার্থকতা দিতে তুমি নামবে না? তুমি আমাকে চারি দিক্ থেকে বেষ্টন করছ, এ দেখাবে না? হে জীবন আমার, প্রত্যক্ষ আত্মা আমার, সর্ব্বস্ব আমার! মা উত্তর দিলেন,—"দেখা দিব বলেই ত তোদের কাছে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। তোরা খালি এক একবার বল্ না যে, 'মা, তুমিই সব করছ। সুতরাং তুমিই আমাকে তুলে নেবে।' এই স্বীকৃতি আমায় একবার দে না। তোদের এই স্বীকৃতির অভাবে আমি পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারছি না। আমি তোদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি; তোরা তাই স্বাধীন ভাবে বল না—তুমিই করছ, তুমিই করছ।"

আমাদের কি সৌভাগ্যের দিন আসছে, যে দিন পূর্ণমাত্রায় আমরা এই কথা মেনে নিতে, উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। তোমায় পেয়ে গেছি, তোমায় পেয়ে গেছি; তোমাতে এনেছ, তোমাতে এনেছ!

এই যিনি ভগবতী, যাঁকে আমরা এইরূপে আঁকলাম, দেখলাম, যিনি এই আকারে দেখা দিলেন, এর দিকে যখন চাইলি, তখন সে চাওয়া খালি চোখে-চোখে হল, না প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, না ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঠেকাঠেকি হয়ে এই কথা হল? খালি প্রাণ বা হৃদয় বা মন নয়, যদি সব নিজত্ব, সব

চেতনা তাঁতে ঠেকে থাকে, তা হলে সম্পূর্ণ মিলন হবে। আমার নিজত্বে আমি যত দূর প্রস্থত আছি, তত দূর যদি ঠেকে, তবে সেই হবে চরম ঠেকা। তোমার প্রাণে প্রাণ, চোখে চোখ, হাতে হাত! তিনি এখান পর্য্যন্ত পা বাড়িয়ে না এলে পূর্ণ সার্থকতা পাবে না। নিজে বলতে এখন যতটা মাটিতে, জলেতে জড়িয়ে থাকে, তোমাতে মিলতে গিয়ে এই সব তখন তোমাতেই খুঁজে বেড়াব। যদিও গুরুকৃপায় জেনেছি যে, চেতন ছাড়া তার কেউ ই কোন কিছু হয় না, তবু আমার স্বভাব এই-সবেতেই লেগে আছে, তাই বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা তোমাকে পেলেও একেবারে আশ্রয় বলে তোমাকে মানতে অনেক দেরি হবে। এই ভূমিতে দাঁড়াবার জন্য তোদের উপদেশ দিতে দিতে মেরুজ্ঞানে নিয়ে গেছি। জগতের কোথাও শক্তিতত্ত্ব খেলা করতে গেলে পজিটিভ ও নেগেটিভ, এই দুই অংশ রচনা না করে তা হয় না। তেমনি চিন্ময়তত্ত্বও মেরু রচনা করে আমাকে বিধারণ করে আছেন। তিনি নিজে হয়েছেন এক প্রান্ত, আমায় করেছেন আর এক প্রান্ত। তাতে আমি হয়েছি সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের ভিখারী—অথচ তাঁতেই যুক্ত হয়ে আছি। এখন এই নিজত্ব দেখতে গেলেই সেই বিপরীত প্রান্তে চোখ পড়ে যায়। এক দিকে আমি অনন্ত ভূতময় বিশ্ব ঘিরে রয়েছি, আর এক দিকে তাঁতে ধৃত রয়েছি—ঐ পরম ঈশান আত্মত্বের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছি। ঐ যে অক্ষর পুরুষ, আর এই যে ক্ষর পুরুষ—এ দুই-ই ত আমার নিজত্ব। এখানে আমি একেবারে চোখ, মুখ, কাণ, মাটি, জল, কাঠে

সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, আর ওখানে আমি সমগ্রের ধর্ত্তা, করণহীন, চিন্ময়—মেরুপ্রান্তে অবস্থান করছি। টপ করে চোখ পড়ল আর উল্টে গেল। আমি যখন অক্ষরে, তখন আমার চারি দিকের দৃশ্য কি থাকবে? আমি কি দেখব? খালি নিজেকেই। নিজনামীয় চিন্ময়ের এক পরমশক্তি, পরমা প্রকৃতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর নিজনামীয় অক্ষর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই দুই দর্শন সুপ্রকাশ হলে আর কি কিছু বাকী থাকে? আর কি পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ অধঃ নামে দিক্‌চক্র রচিত হবে, না নিজ নামে এক ভূমা অস্তিত্ব রচনা করবে—যে আপনাতে আপনি বিভোর? যেখানে যত ক্ষর আত্মা ছিল, তখন তারা কি কেউ ক্ষরত্বের পরিচয় দেবে, না এক অক্ষরেই বিলীন হবে? আর রূপাভিমানী, রসাভিমানী কেউ থাকবে? না সকলে উদ্ধার হয়ে যাবে। আমার যে খণ্ড-বিখণ্ড নিজগুলিকে দিক্‌দিগন্তে বিলিয়ে দিয়েছি, তারা সব একসঙ্গে জড় হয়ে জ্যান্ত একজন হবে। এর নাম হল—শিবদর্শন, শম্ভুদর্শন। আর যেখানে যেখানে এই সব শিবলিঙ্গ লুকিয়ে ছিল, তারা সবাই ত এই-রকম হয়ে গেল; কিন্তু যাতে যাতে তারা লুকিয়ে ছিল, সে সব আয়তনগুলি কোথায় গেল? অব্যক্ত হল। তাদের আর ব্যক্ততার পরিচয় পাওয়া গেল না। নিজেকে ছাড়া আর কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং তারা তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এইরূপে সব আয়তনকে রাত্রিতে পর্য্যবসিত করে শিবজ্ঞানে বসে থাকা মানে, শিবরাত্রির ব্রত করা।

"মহাশয়, এত দূর ত আমরা যেতে পারি না। ক্ষুদ্র আত্মত্বের অনুগামী আমরা ক্ষুদ্র। কূটস্থ আত্মা বলে যে অক্ষর পুরুষকে আপনি দেখালেন—আমাদের বহু-বহু-রূপে ব্যাপ্ত অংশ-সকলকে যে জীবন্ত একজন করে দেখালেন, তা দেখতে পেলাম। এতে অক্ষর পুরুষ আমাদের কাছে আর একজন দ্বিতীয় রূপে প্রতিভাত হলেন এবং এই 'নিজে' তাঁর উপাসক বলে মনে হল। আমরা তাঁতে পূর্ণমাত্রায় ডুবলাম না। এখনও ক্ষরত্বেরই প্রাধান্য রইল—অক্ষরত্ব দ্বিতীয়-রূপে রইলেন। অনন্ত অনন্ত রাশি নিয়ে শিবপূজা করিতে পারি। কিন্তু এই অনন্ত অনন্ত রাশি নিয়ে যিনি আত্মময়, সেই ভূমা অক্ষরত্বে দাঁড়াতে পারছি না। আপনার শিক্ষার প্রভাবে দেখছি, ভূতে ভূতে অনন্ত আত্মার রাশি ঘিরে রয়েছে। "যতক্ষণ ক্ষরত্ব হারিয়ে অক্ষরত্ব না দেখতে পারি, ততক্ষণ ইনিই আমাদের উপাস্য।" দিক্‌দিগন্তে অক্ষর আত্মাকে দেখতে দেখতে তাঁতে লয় হবার মানে হল, আত্মার দ্বারা আত্মার পূজা করা। এখনও তোমরা অক্ষর তত্ত্ব থেকে নীচে পড়ে আছ। এখানে দিক্, দেশ ও কালকে অন্ধকার করে শম্ভু দাঁড়িয়েছেন। নিজবোধ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। জগদ্‌বোধ আড়াল হয়েছে। কিন্তু অক্ষরত্বে পূর্ণমাত্রায় নিজেকে তোমরা ভুলতে পারছ না। অক্ষরত্বের উপাসনা হল—আত্মা দিয়ে আত্মত্বের পূজা—গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গার পূজা।

শিবরাত্রির পূজায় ঋষি ব্যবস্থা দিলেন—ঈশান, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত, ওঁকে এই চার মূর্তিতে পূজা কর।

ঈশান মানে, তাঁকে ঈশ্বর-বোধে আগে দর্শন কর। যেখানটা এখন রাত্রি হয়ে গেছে, তুমি তার ভিতর ঢুকে তাকে দিন কর। তোমার দিকে দিকে দিকে ঈশ্বর বোধ জাগাও। তার পরে অঘোর। নিষ্কল শুভ্র নিরঞ্জন! আঃ—জুড়িয়ে গেলুম! ঈশান অথচ নিরীহ শান্ত। তার পর বামদেবের পূজা কর। সমগ্র সিদ্ধির, সমস্ত বামশক্তির, বাহ্যসিদ্ধির দাতা ইনি। ঐ রাত্রিকে দিবা করে ফুটিয়ে তোলাই হল বামাকালী দর্শন। বহির্ম্মুখের সিদ্ধি যে কালীর দ্বারা জাগ্রত হয়, তাঁকে জাগিয়ে তোলা। তোমার অনেক সংস্কার ঐ রাত্রির ভিতর ঢাকা আছে; তারা এখনও তোমাকে টানছে। এখন বলছ—যুদ্ধ করব না; কিন্তু পরক্ষণেই কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। সেই সব সংস্কারকে শুদ্ধ করতে হবে ত—সেইখানে সেইখানে তোমার ঈশানত্ব দেখতে হবে ত। সেই জন্য বামদেবের পূজার ব্যবস্থা। তার পরে সদ্যোজাত। তুমি খণ্ডে খণ্ডে ঢুকছ, আর সে সবকে আত্মজ্ঞানে জাগিয়ে তুলছ। এই চারি তত্ত্ব দেখলে তবে না শিব-পূজা ঠিক হল? এইরূপ জ্ঞান নিয়ে শিবপূজা করতে হবে। হঠাৎ তোমার বাড়ী থেকে টেলিফোন এল—তুমি ছুটলে। বহু আত্মা হয়ে—ঐ রাত্রিকে দিবা করে ছুটলে। তুমিই বহু আত্মা হয়ে বিশ্বকে জাগিয়ে তুলছ। এর নাম হল—তৎনামীয় পুরুষের দর্শন। শিবের এক নাম তৎপুরুষ। তনুতে, নিজের সন্তানে যিনি বিস্তৃত হন। ওঁ তৎ সৎ।

রাশি রাশি আত্মা-রূপে নিজ আত্মত্ব বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

একে পূজা করতে হবে। তার পরে তাঁকে পরমেশ্বর বলে দেখতে হবে। তার পরে তাঁকে শান্ত, নিরীহ দেখতে হবে। তার পরে তুমিই নির্লেপ হয়ে যাবে। তুমি বিশ্বকে রাত্রি কর, আবার ফুটিয়ে তোল। এ ধাপগুলি কঠিন হল ?

———

১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

এক স্থানে নানাদেশীয় জনকয়েক লোক মিলে গল্প হচ্ছিল। তার মধ্যে একজন বললে,—"দেখ, এক জায়গায় একটা পুকুর ছিল ও পুকুরের পাড়ে একটা গাছ ছিল। সে গাছের পাতার এমন গুণ ছিল যে, জলে পড়লেই সে পাতা কুমীর হয়ে যেত।" তার মধ্যে যে একজন বাঙ্গালী ছিল, সে বললে,—"যদি একটা পাতার আধখানা জলে, আধখানা ডাঙ্গায় পড়ে, তা হলে কি হবে ?" বক্তা বললে,—"তুম বাঙ্গালী হ্যায়।"

যখনই তোরা কোন বস্তুর জ্ঞানময়ত্ব দেখলি, তা থেকে অমনি আত্মত্বে প্রবেশ করলি—দেব-ভূমিতে চলে গেলি। আবার যখন নামলি, তখন যার জ্ঞানময়ত্ব ধরে উঠেছিলি, সে কি হল ? কীট হল। ধরলি একটা ফল বা নুড়ি; অমনি জ্ঞানময়কে মনে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-ভূমিতে—শক্তি-ভূমিতে চলে গেলি; অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন, আত্মবোধময় একজন মহান্ দেবতা প্রকাশ হলেন। তা হলে সেই নুড়ি বা ফলকে

মথিত করে এক মহান্ দেবতা বেরোলেন। ফল বা প্রস্তররূপ যে জ্ঞান, সে মথিত হল; এর নাম হল—মধুকৈটভ বধ। আর সে পাথর বা ফল তোকে মুগ্ধ করলে না। ও থেকে মধু ও কৈটভ তোতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তোকে মুগ্ধ করছিল; এখন তারা মরল। কোথায় মরল? ওঁরই বুকে।

এমন যে অপূর্ব্ব, অমৃতস্বরূপ জ্ঞানতত্ত্ব, এঁকে তোরা কি ভাবে সমাদর করেছিস? এই সর্ব্বানুভূত সর্ব্বদেবতা আত্মা-রূপে চিরজাগ্রত হয়ে এখানে আছেন? আর আমি তাঁর বুকে জন্মে রয়েছি? এতেই আমিত্ব-নামীয় একটা বৃত্তি 'আমি' হয়ে উঠেছি—একটা আয়তন ঘেরা হয়েছে? ইনি কি অনন্ত জ্ঞান-শক্তি, প্রকাশ-শক্তির আধার? এঁর কাছে সম্ভব অসম্ভব বিচার নেই—নানা দিকে নানা ভাবে এই সব লোক রচনা করে ইনি এইখানে রয়েছেন? তোতেই রয়েছেন? এ কথা কি করে বললি বল্ ত। এঁর কোন্ কোন্ দেবমূর্ত্তিকে পেলি, নাম কর। একজন একজন দেবতাকে দেখে দেখে নাম কর্। বরুণরূপে এঁকে পেলি? বরুণ তোর শরীরের ভিতর রয়েছেন? অনন্ত জলজ্ঞান—জল জল জল! কে এই রূপ ধরেছে? কার গায়ে এ জলের জামা পরা আছে? আত্মনামীয় ব্রহ্মের যে পরিচয়, যাঁকে দেখে আত্মা বা 'নিজে' এই পরিচয় ফুটে ওঠে, তিনি নিজেই জল? ইনি নিজেই জলমূর্ত্তি ধরেছেন, অথচ নিজে ঠিক আছেন। তুই তাঁর কে? তাঁর একটি অংশ? তোর মত দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, সবই তাঁর আছে? আর তার

প্রত্যেকটিই অনন্ত, চিন্ময়? তা হলে যার ভিতর খুঁজে নিজেকে বার করছিলাম, সেই একটা মাংসের ডেলাকে এখন পেলাম এক অনন্ত শক্তিময়, চিন্ময়রূপে। তাঁর ভিতর তুই মরলি? এইরূপ দেখা কি কঠিন হল?

পাপ কাকে বলে? ভগবৎজ্ঞানশূন্য কাজ করাই পাপ করা। কাকে বলে পাপ, কাকে বলে পুণ্য, কাকে বলে দেবতা, আমার উপদেশ ধরে ধরে এ সম্বন্ধে তোরা নতুন স্মৃতিশাস্ত্র লেখ। আত্মত্ব মানেই নিজত্ব। তার সার্থকতা তোরা কিসে দেখতে পাস? দুটি খাওয়া-পরাতে, না একেবারে জ্ঞানস্বরূপতায়? জ্ঞান-স্বরূপতায় সবটা উবে গিয়ে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াস না? হাত-পা, চোক-মুখ, নাক-কাণ, মাথা, সব গুটিয়ে নিজ-নামীয় তত্ত্বে ছাড়া, নিজত্বে ছাড়া আর কোথাও থাকে? উনিই ত এই-সব দেবতা হচ্ছেন? আর উনিই ত সাক্ষাৎ জীবন? তোর একেবারে সার্থকতা কোথায়? নিজত্বে? তোর চোখ কাণা করে দিলে "বাবা রে" বলে তুই কেঁদে উঠিস কেন? সর্ব্ব-ভোগ, সর্ব্বরস ওখানেই নিহিত, এ কথা জানিস না বলে। এটা সব পুড়ে গেল, ছাই হয়ে গেল, আকাশ হয়ে গেল, সব ফাঁক—কোথাও কিছু নেই—অথচ সব রয়ে গেল। হল মধু-কৈটভ বধ? আর যিনি দাঁড়ালেন, তিনি ভগবতী—ঐ অসুর-শোণিতোৎ-সবময়ী। তুই এ কি বাজী করলি? এ কি নতুন হয়ে তৈরি হল, না ভিতরে ছিল, তোর চোখে পড়ল মাত্র? এই হীরকখণ্ড পাতা-চাপা রয়েছে। উনিই 'আমি' হয়েছিলেন—এখন আমি

উনি হলুম না? এই দৃষ্টির ওলট্-পালটে, সাধনার প্রথম সুরুতে মনে হয়েছিল, আমি যেন আমার ভিতরে প্রবেশ করছি। আর এখন ঢুকে দেখলি, এইখান থেকেই 'বহিঃ' প্রসৃত হচ্ছে। আর যখন জীব ছিলি, তখন বহিঃ থেকে অন্তরে যাচ্ছিলি। এখন তোর দৃষ্টি হল—শ্রবণ, রস ইত্যাদি সব ভিতরেই আছে। সুতরাং আসল থাকা, আসল লীলা, আসল ভোগ, সব ঐ অন্তরে। অন্তর থেকে খালি একটা এজন বেরোয়—এ ছাড়া আর কিছু বেরোয় না। এখন এখানে কে বসে আছেন? মা। তাঁ থেকে তোর ব্যুত্থান এল—তুই বাইরে নামতে আরম্ভ করলি। তোর এই নামা কে দেখছে? ইনি দেখছেন—ইনিই দেখছেন! তার পর ঈশ্বর-সংযুক্ত জীব থেকে—ঈশ্বর থেকে অন্ধ জীব হলি। এ সব কোথায় হচ্ছে? এই জ্ঞানার্ণবে? এই লোকেই তুই বসবাস করছিস? এখন চণ্ডী পাঠ করতে বললে কি রকম চণ্ডী পাঠ করবি? এই এতক্ষণ গঙ্গার ও-পারে রক্ত-মাংসের ডেলা হয়ে ছিলি—এখন এখানে বসলি। বললি—মধুকৈটভ বধ হল—এ-সব ত বাক্যেরই অদল বদলমাত্র। জীব গেল ব্রহ্মে—ব্রহ্ম নেমে এলেন জীবে—এর মূলে বাক্তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু পেলি? এইরূপ দেখতে দেখতে চণ্ডীপাঠ করলে তবেই ঠিক হবে না? একজন মানুষ তোমার পকেট থেকে দুটো পয়সা চুরি করেছে—আজীবন তোমার সে জ্ঞান রইল। পরে সে সাধু হল, তবু তোমার মন থেকে সেই তুচ্ছ ঘটনার জ্ঞান কখন গেল না—তাকে দেখলেই তোমার মনে পড়বে—এ আমার

পকেট থেকে দুটো পয়সা চুরি করেছিল; আজ ভগবৎকৃপায় সাধু হয়েছে। এই তুচ্ছ উপলব্ধি যদি অত দূর স্থায়ী সত্য-মূর্ত্তিতে দাঁড়ায়, এই জ্ঞান তোর উপর আধিপত্য করছে, এ যদি সত্য হয়, তবে আমি এই যে 'মধুকৈটভ বধ করলুম' জ্ঞান—এ জ্ঞান তুই হারাবি? পয়সা চুরিও জ্ঞানে ঘটেছিল, এটাও জ্ঞানে ঘটেছে। তবে পয়সা চুরির সঙ্গে বুক জড়ান আছে, এর সঙ্গে বুক জড়ান নেই, তাই এতে শ্রদ্ধা হয় না। তুমি আমাকে চাও ত আমি আছি, না চাও ত নরকে যাও—এই ত ভগবানের উক্তি। তাই এখন আমরা ভগবান্‌কে চাই। পাপ করি, পুণ্য করি, একদিন তাঁতে পৌঁছব—এই নিয়ে বসে থাকবি? না, তাঁর জন্য আকুল তুফান ফুটে উঠবে—আজই চাই বলে। জীবনের সারবত্তা কোন্ দিকে ঠেকছে? খ্যাতি, ধন, মান, এই দিকে? "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" লোকে আমাকে বড় বলে জানুক; কিন্তু আসলে আমি পশুর সমান। যদি জীবনের সারবত্তা—শ্রদ্ধা এতে এখনও না জড়িয়ে থাকে, তবে তুই কোন্‌টার গর্ব্ব করবি—টাকার, না মানের? তোরা না চাইলে কে তোদের এদিকে টানবে? তার উপর গুরু সব তত্ত্ব খুলে তোদের কাছে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছেন। কাকে বলে আত্মা, কাকে বলে জ্ঞান, তা তোদের জানতে বাকী নেই; এতেও যদি তোরা শ্রদ্ধাবান্ না হস, তবে কি হবে? বিষয় টানে—বিষয়ে যা না; কিন্তু গুরুকে—জ্ঞানকে সঙ্গে না নিয়ে কেন যাবি? স্ত্রীতে, পুত্রে, উৎসবে—যেখানে যাস, জ্ঞান নিয়েই যাস; আর

গুরু যে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই জ্ঞানকেই ছেড়ে যাবি ? অন্য অন্য কর্ম্মের মধ্যে হঠাৎ মনে করবি না যে, এইখানে মধুকৈটভ বধ করি ? এ জ্ঞান যখন ফোটে, তখন সুখ পাস ? ভূতের বোঝায় এমন নির্ব্বীর্য্য, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিস—এমন ক্লীব, নিঃশক্তি, দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিস যে, উঠতে পারিস না। দশ বার দশ সেকেণ্ড ধরে মধুকৈটভ বধ করিস, এ নামটা স্মরণ করিস, আর এক একবার 'এমনি করে দাঁড়াস—এতে যতটুকু হয়। গণ্ডেপিণ্ডে খেলি, আজগুবের মত বক্‌বক্ করলি, আর এটা করতে পারলি না ? অথচ তোদের পাইয়ে দিতে হবে ! ব্রহ্মত্ব লাভ এক মুহূর্ত্তের ভিতর হয়ে যায়। ভগবতীতে দাঁড়িয়ে খালি একবার বললেই হয়ে যায়। তোকে মালা ঘুরাতে, কাপড় ছাড়তে, ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে বলিনি—শুধু একবার এইটুকু করবি, এ কথা বলেছি। তা-ও যদি না করিস ত কি বুঝব ? তোদের শ্রদ্ধা নেই, এই বুঝব। আর ব্রহ্মতত্ত্ব দেব ? ভগবান্‌কে এত সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি ; এই এখানেই তিনি রয়েছেন—চোখ দে ! হর হর হর—নমঃ !

পর পর একেবারে উঠে যা। একেবারে জীব থেকে আনন্ত্যে চলে যা। ভূত—ভূত থেকে আত্মায়—আত্মা থেকে আনন্ত্যে চল। তিনি অন্তর থেকে বহির্ম্মুখে দৃষ্টিশালী হয়ে রয়েছেন ? নিজে কতকটা ঐরূপ হয়ে তবে বললি ? তোকে ঐরূপ'কে করলে ? দেবী চণ্ডিকা, অম্বা ? এ কথা বিশ্বাস হয় না। এ আবার সত্যি কথা ! জামাজোড়া এঁটে বসে রইলুম

—ঠাকুর বললেন, আর ভগবতী দেখলুম? বিশ্বাস নেই। মধুকৈটভ বধ হল সব চেয়ে সোজা। তাই না করতে পারলে মহিষাসুর এবং তার চেয়েও শক্ত শুম্ভনিশুম্ভ বধ করবি কি করে? মধুকৈটভ কোথায় মরল? আত্মবোধ জাগ্রত হল, আর সেইখানে তিনি ওকে মারলেন না? মধুকৈটভ-বধ হল ভূতকে মারা। আর মহিষাসুর হল—রম্ভাসুরের সন্তান; সর্ব্বদা বহির্ম্মুখে গতিরূপ প্রচেষ্টা। সব সময়েই একটা কিছু করতে যাচ্ছি—না, না, দাঁড়াও, আমি করছি—এইরূপ কর্ম্মোদ্যম। ভূতের মধ্যে ঢুকে পড়ে মধুকৈটভকে বধ কর। সঙ্কল্প করে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিস—যার জন্য ভূতকে মেরে ভগবতীকে দাঁড় করালি, মহিষাসুরকেও তার জন্য মেরে ভগবতীকে দাঁড় করাবি। আরম্ভ—প্রচেষ্টা—অধ্যবসায়—গতি—এই হল মহিষাসুর।

দুপুরবেলা দিব্যি ঘুমিয়ে উঠে, হাঁই তুলে ভাবলি, অমুক জায়গা হয়ে আসি। কাজ নেই, খই ভাজ। প্রতি প্রচেষ্টায় তোরা বাপ্ রে, মা রে করিস। কেন, তোদের কি কেউ নেই? আর কেউ না থাকুক, ভগবতী ত আছেন। প্রথমে নিজের ইচ্ছা, তার পরে দেবীর ইচ্ছা, তার পরে ভগবদিচ্ছা।

ভগবান্ কি একটা কথার কথা? একটা শিকেয় টাঙ্গান জিনিষ? মাথা থেকে ঠেলে ঠেলে বার করার জিনিষ? একেবারেই নয়। এই জ্ঞানই যে পরমতত্ত্ব—সত্যিকার লাভ, এ তোরা কবে বুঝবি? আমাদের যদি কোনও লাভ হয়ে

থাকে, পুঁজি হয়ে থাকে, তবে সে ব্যাঙ্কে জমান টাকাও নয়, আর কিছুও নয়; খালি এই যে জ্ঞানের সঞ্চয়, তাই-ই হল আমাদের পুঁজি।

শুধু দেখ না—কোথা থেকে কথা বেরোচ্ছে? সহস্রার থেকে? স্ত্রী-পুত্র-ধন, বাড়ী-ঘর, ভগবতীতত্ত্ব—তা-ও বেরোচ্ছে সহস্রার থেকে? তোকে ঝর-ঝর করে নাইয়ে, তোকে প্লাবিত করে বিষয়চিন্তা ঢালছে? তোকে প্লাবিত করে ঢালছে, এই কথা রোজ একবার স্বীকার করলেই ভগবতী বাইরে এসে দাঁড়াবেন। এই মাটি, বাঘ-ছাল, ঐখান থেকেই সব দেখতে পাচ্ছিস? বাহ্য বিশ্বটা বেরোচ্ছে কোথা থেকে? ঐখান থেকে? মশার কামড় থেকে মাটি জল গাছ—সবই জ্ঞানবিস্তার? সহস্রারের যথার্থ মূর্ত্তি কি? ঈশান। তিনি অনন্তের মূর্ত্তি ধরছেন—অনন্ত ভোগ দিচ্ছেন। তাঁকে আমার ভগবান্, আমার আত্মা বলছিস না বলে সব ভোগ মড়া হয়ে বেরোচ্ছে। এখন একবার আমার ভগবান্ বল, দেখবি—সব ভোগ জ্যান্ত হয়ে বেরোবে। দেবীকে যদি বার করতে হয়, তবে ঐখান থেকেই হবে? এ বিদ্যা নিবি? "ত্রাহি গুরু! এই জ্ঞান দিন। সর্ব্বস্ব ছাড়তে হয় ত তাও ছাড়ব"—এই কথা বলবি না?

এই মড়া খেকো চেহারাটা ঐ সহস্রার থেকেই বেরিয়ে আছে? অন্নমাত্মা? চলে যা না, বুকের ভিতর থেকে উঠে যা। তুই কোথা? 'ওখানে' বলছিস কেন? সহস্রারে সত্যি সত্যি গেলে বলতিস—'এখানে' বসে আছি। কি শিখলি? বাহ্য

বিশ্বটা যদিও বিশ্ব, তবুও যিনি সর্ব্বতঃপাণিপাদ, তিনিই এর অন্তর, তিনিই এর বহিঃ। "তুমিই বহিঃ, তুমিই বহিঃ"—এইরূপে মন্ত্রচৈতন্য করে বল্। এই বৃক্ষ বহিঃ, আকাশ বহিঃ, জল বহিঃ—তুমিও বহিঃ—এখানে দাঁড়িয়ে আছ। নমস্তে!

আর একটু পরিষ্কার করে দেখাবার আছে। হিঙ্গুলেশ্বরীর কাঠ ভাঙ্গার গল্প করেছিলুম, মনে আছে? ভগবতী এসে বর দেবেন, সিদ্ধি দেবেন, কিন্তু গুরুকে এই রকমে হাড়ে হাড়ে না বসালে ব্রহ্মত্ব দেবেন না। তাই তোরা গুরুকে প্রতিষ্ঠা দে, তবে ফল পাবি। অন্তর্ব্বহিঃ আদি সর্ব্ববিধ জ্ঞান এক মহান্ তত্ত্বের উপর নির্ভর করছে দেখতে পাচ্ছিস? যাঁর আলোচনা করছি, ইনি এমন জিনিষ। গুরুপূজা করিস—'কেবলং জ্ঞান-মূর্ত্তিং' বলিস। জয় জগদীশ্বরি! জয় জগদীশ্বরি! জয় জগদীশ্বরি! এই সব তত্ত্ব সমেত মাকে দেখতে পেলে সব ঠিক হবে; নয় ত বাজী দেখা হবে—তোরা ঠকে যাবি।

আমার এমন ভগবান্ চাই, যাঁকে আমি চিরদিনের মত নিত্য আশ্রয়রূপে দেখব। একজন বিদেশীর মত, একদিনের জন্য এসে বলবে—"বর নাও," সে ভগবান্ আমি চাই না। আমার জীবনের পূর্ব্ব-ইতিহাস তোদের বলেছি। অসহায় জীবন—একটা ধাক্কা এল ত দাঁত ছরকুটে বসে পড়লি; এই রকম নিরাশ্রয় হয়ে অনন্তকাল থাকব, অথচ আমার ভগবতী থাকবেন? তিনি না থাকতেন ত বুঝতুম, কেউ কোথাও নেই। তুই এমন একটা কথা বলতে পারিস, যা ওঁর বুক থেকে উঠল না? এমন একটি

মুহূর্ত্ত আছে, যেটা ওঁর বুকে নয়? ভগবতী দৃষ্টিময়ী। তোমার একটি দৃষ্টি রূপ, একটি দৃষ্টি রস, একটি দৃষ্টি আত্মা ইত্যাদি। তুই এঁর বুকে বসে আছিস, না এই শরীরে বসে আছিস? তোর দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছিস? নমো নমো নমঃ!

দর্শন একপ্রকার জ্ঞান, মনন করা একপ্রকার জ্ঞান; আর জ্ঞান মানে কি? সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। আত্মজ্ঞানশূন্য কথা বলা যায়? বললে তাতে জানা হয়? কে জানছে? একজন। কে শুনছে, কে দেখছে? একজন। দেখা, শুনা নামে ক্রিয়া মাত্র দেখছিস, না একজন অনন্তে অনন্তে আমাতে, তোতে, ওতে শুনছেন, দেখছেন, মনন করছেন—ওরে বাবা রে! যেখানে যত দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য আছে—সব নিয়ে কে দাঁড়াল? তাঁর কতগুলি চোখ? তোর দিকে, আমার দিকে, সবার দিকে দেখছেন, শুনছেন? সত্যি সত্যি তিনি তোর দিকে চেয়ে আছেন? যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, তিনি তোকে দেখছেন, জল দেখছেন, আমাকে দেখছেন। তোকে দেখছেন? ওঠ! চলে যা ঐ দিকে। তাঁর চোখে তোর চোখ পড়ছে? মৃগেল মাছের মত এই মাংসপিণ্ড জড়িয়ে বসে থাকবি, গাঁট ছাড়বি না? উনি তোর দ্রষ্টা। দেখতে দেখতে হাত জোড় কর—নমস্কার কর। তিনি তোর হৃদয় দেখছেন, মন দেখছেন, পা দেখছেন, হাত দেখছেন? এই দর্শন বানিয়ে নিতে হচ্ছে—না, সত্যি সত্যি দেখছিস? মড়াখেকো ব্যাটারা সব এসেছিস—খালি মড়া চিবোবার জন্য ব্যতিব্যস্ত! কিসে জন্মে রয়েছিস? শরীরে আছিস, না জ্ঞানস্বরূপে,

চেতনায় আছিস ? এখন এঁতে বসলি, না বাড়ী থেকেই এঁতে বসে এসেছিলি ? নিজেকে ভগবতীতে দেখ্‌ছিস ? চেতনায় বসেছিস ? নমো ভগবতি ! কেন ভগবতী বলছিস ? তিনি তোর কি দেখছেন ? আগে চোখ মুখ, হাত পা, চামড়া ! নমো নমঃ ! খাপের ভিতর যেমন তলোয়ার থাকে, তেমনি তোদের আগাপাছতলা দখল করে তিনি এই শরীরের ভিতর আছেন ? একটা নমস্কার দে না। যখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলি, তখন সাহেব দেখলে দশটা সেলাম দিতিস। জীবনে এখনও সঙ্কল্প আসেনি যে, আর কিছু হোক আর না হোক, আমি এই তত্ত্ব চাই। তোদের খেতেও হবে, ঘর করতেও হবে। এঁকে নিয়ে যদি সে সব করিস, তবেই বাঁচবি—নয় ত পচা মড়া ঘেঁটে ঘেঁটেই সে সব করতে হবে। ধর্ম্ম একটা পোষাক নয়, ভগবান্ একটা পোষাক নন যে, তাঁকে গায়ে জড়িয়ে ভদ্র হয়ে বসলি। আমার জীবনের সার্থকতা—সর্ব্বস্ব নির্ভর করছে ঐখানে। তোদের জন্য কত আটকে থাকতে হচ্ছে দেখছিস ?

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

সে কালের লোকে যা করত, একেবারে চরমে। দান করবে ত সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেললে। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য স্ত্রী পুত্র সব দিয়ে দিলেন। বলি রাজা কল্পতরু হয়ে বসল—

যে যা চায়, তাই দেবে। বামন যখন এলেন, তখন শুক্রাচার্য্য তাঁর মনের ভাব বুঝে রাজাকে সাবধান করে দিলেন,—"মহারাজ, ভেবে চিন্তে কথা বলো।" বালক বামন, বিদ্যুতের মত জ্বলছেন। তিনি বললেন,—"আমার বেশী কিছু প্রার্থনা নেই—ত্রিপাদ ভূমি মাত্র।" তখনি হাতে কমণ্ডলু নিয়ে বলি দান করতে যাচ্ছে; শুক্রাচার্য্য একটা কীট হয়ে কমণ্ডলুতে প্রবিষ্ট হলেন, যাতে কমণ্ডলু থেকে জল না পড়ে। বলি জল ঢালবার চেষ্টা করছে—কিন্তু জল পড়ছে না। বামন বললেন,—"মহারাজ, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একগাছা কুশ দিয়ে আঘাত করুন।" বলি তাই করলে শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষু কাণা হয়ে গেল—হু হু করে জল বেরিয়ে পড়ল; রাজা ত্রিপাদ-ভূমি দান করলে। বামন তখন মাটিতে এক পা স্থাপন করলেন। বলি তখন যে দিকে চায়, সেই পা-ই দেখে। সে আনন্দে উল্লসিত হল—কি অপূর্ব্ব পুরুষ এসেছেন! বামন আর এক পা স্বর্গে চালিয়ে দিলেন। বলি দেখলে—এক পায়ে মর্ত্ত, এক পায়ে স্বর্গ ঢেকে গেল; পা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বামন বললেন,—"মহারাজ! তৃতীয় পাদ ভূমি দিন।" বলির রাজত্ব স্বর্গ আর মর্ত্তে; আর কোথাও রাজত্ব নেই। তৃতীয় পাদ ভূমি না দিতে পেরে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হচ্ছে জেনে ভয়ে সে বিত্রস্ত হল। পাশেই রাণী ছিলেন; তিনি বললেন,—"মহারাজ, ভাবছেন কেন? নিজেকে অর্পণ করুন।" উপায় পেয়ে বলি বাঁচল। স্বর্গে মর্ত্তে আর কিছু নাই; আছি শুধু আমি নিজে

—আমার মস্তকে তৃতীয় পা রাখুন। কিন্তু দাসকে চিরানুগৃহীত করতে হবে—এ পা আর তুলতে পারবেন না।

বুদ্ধির নামই শুক্রাচার্য্য। তাঁর কাজ হল দুই দিকে চক্ষু রাখা—বিশ্বের দিকে এক চক্ষু, আত্মত্বে এক চক্ষু। কিন্তু পরমতত্ত্বে যাবার সময়ে দুই চক্ষু রাখলে হবে না—একচক্ষু হতে হবে—একাগ্রচিত্ত হতে হবে—যা হয় হোক, আমি একেবারে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই ভাব না হলে মেপে-কষে এ জিনিষ হয় না। ঠকলুম, কি জিতলুম, তার হিসাব খতিয়ে এ সব কাজ হয় না। মর্ত্ত—ইহকাল, স্বর্গ—পরকাল, এতে ভগবান্ পা রাখুন। সঞ্চিত যত কিছু, প্রারব্ধ যত কিছু—এ দুয়েতে ভগবান্ পা রেখেছেন, আর আমার যে নিজত্ব, তাতেও পা রেখেছেন—এইরূপ বীর্য্যবান্ হয়ে বলি হতে হয়। শুনতে মনে হয়, যেন এ বেশ সহজ; কিন্তু করতে গেলে দেখা যায় যে, কত কঠিন! "মশায়, তিনি না দিলে কি হবে?" ও বাজে কথা! তিনি না দিলে কোন্‌টা হচ্ছে? মরা বাঁচা, ভাত খাওয়া, ওঠা বসা—সবই তিনি দিচ্ছেন। কিন্তু তোর সে অনুভব কই? সাহেবরা অসুরের জাত—দশটা পয়সা অম্লানবদনে দিতে পারে, কিন্তু মাথা সহজে হেঁট করে না। আমরা মাথা হেঁট করতে পারি, কিন্তু দুটা পয়সা দিতে পারি না। আমি বিষয়ের কাছে এত বিক্রীত হয়ে আছি যে, নিজেকে দিতে পারি, বিষয় দিতে পারি না। ভগবানের কথা যখন বলতে যাই, তখন নেতিয়ে, গলে, ভগবানের রসে যেন মজে

আছি, এইরূপ ভাব দেখাই; কিন্তু তা থেকে উঠেই দেখি, সে সব অন্তঃসারশূন্য—আত্মবিসর্জ্জন বলে একটা জিনিষ তাতে খুঁজে পাই না। ভগবান্ কেন দেবেন? বিশ্ব-শুদ্ধ সব জিনিষ তুই চাইছিস, আর ভগবান্‌কে চাইবার তোর ক্ষমতা নেই? আহা, আমি কিছু জানি না—ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি না! যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আমি সব পারি। ভগবান্‌কে যদি দিতে হয় ত তাঁর কাছে সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত—তোর এই ভাব হলে তবে না তিনি দেবেন। এই 'আমি'কে নিয়ে কত কি করে বেড়িয়েছিস, আর ভগবানের বেলাই ভদ্রলোক সাজলি—"আপনি যদি করেন!"—আত্মযজ্ঞ কর, তাঁকে দান করতে নিজেকে প্রস্তুত কর। যে আমায় সর্ব্বস্ব দিয়েছে, ও-বাড়ীতে সে এসেছে শুনলে কোন্ অকৃতজ্ঞ তাকে দেখতে না ছোটে? আমার আমিত্বকে যতক্ষণ চতুর্দ্দিকে কর্ত্তৃত্ব করতে দেখতে পাব, ততক্ষণ সে ভগবানের দিকে যাবার জন্যও এই-রকম কৃতসঙ্কল্প হয়ে মালকোঁচা মেরে বসুক। অকৃতজ্ঞের চিহ্নে চিহ্নিত নিজেকে একবার দেখ না। ও-সব ন্যাকামির ধর্ম্ম। বীর্য্যবান্, বিজ্ঞানবান্ সাধকের কাছে ওসব কথার কোন মূল্য নেই। বুকের স্তরের পর স্তরে সুস্পষ্টভাবে এত প্রখর ও তীব্র দর্শন নিয়ে আসছি, তত্রাচ তাতে যেতে চাচ্ছিস না—এ কত বড় অকৃতজ্ঞতা, দেখতে পাস না? আর এত বড় অকৃতজ্ঞতা ঘোচাবার জন্য পরতে পরতে তোদের গেলাতে হচ্ছে—এই দেখ তোর নাকে ভগবান্, এই দেখ তোর চোখে

ভগবান্, এই দেখ তোর হাড়-মাসে ভগবান্। পারা না পারার কথা বলছি না, প্রকৃতির দোষে, অভ্যাসে অকৃতকার্য্য হলাম, সে কথাও বলছি না। কিন্তু তোমার পাদপদ্মে নিজেকে ঢেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও মৌলিক সত্য বা মূল-নীতি আমার জীবনে নেই—তোদের আমি এইরূপ কোমর বাঁধা ভাব দেখতে চাই। তোরা কোমর বেঁধেছিস ? এই ভূমি আমাদের উদ্বোধন করতে হবে, এই ভূমি জাগাতে হবে। খেতে হয় খাচ্ছি; জলে পড়েছি, তাই হাত-পা ছুঁড়তে হয়, ছুড়ছি; এ সবই কর্ত্তব্যের খাতিরে করছি। কিন্তু আমার বুকখানা তোমাকে সব ঢেলে দেবার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে। তিনি কি কালা, না কাণা ? এই যে তোরই বুকে বসে তোকে সব দিচ্ছেন। এঁর কথা কইতে গেলেই একেবারে জ্ঞানভূমিতে ঢুকে যাবি। আমার জন্ম-মরণ, আয়ু, সুখ-দুঃখ, এ-সব কোথায় ? এই চিরজাগ্রত ভগবানে ? চিরজাগ্রত কে ?- দেখা শুনা ইত্যাদি চতুর্দ্দশ করণে ভরপূর এক মহান্ সত্তা ? এই-রকম দেখলে ভূতরাজ্য ছেড়ে এই চিন্ময়ে যেতে আর কোন কষ্ট থাকে ? শ্রৎ ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা। সত্যি সত্যি আমি তোমারই —একেবারে তোমারই নিজত্বে আমি গড়া। দেবি! দেবি! তোমাকে দিতে পারলুম না। এখনও ভূতে জড়িয়ে আছি। তাই 'কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,' এই কথাকে দিনের পর দিন মথিত করছি। সুখের তৃষা, স্পর্শের সুখ, রূপের সুখ, এ-সব বিষয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ?

ভগবান্ বলছেন,—"বৎস! ও-সব যে আমাতেই! একাগ্র-বুদ্ধি হয়ে একবার আমাতে দাঁড়া না—দুমুখো হয়ে কেন দাঁড়াস? আমাতে আসতে না আসতে তোদের চোখ পিছন দিকে চলে যায়। 'অয়ম্ আত্মা সর্ব্বরূপময়ঃ সর্ব্বগন্ধময়ঃ সর্ব্বরসময়ঃ সর্ব্ব-প্রাণময়ঃ,' এই কথা পুনঃ পুনঃ বল না। যখন গন্ধ এসে পড়ল, তখন আপনা থেকে তাকে ভূতগন্ধ থেকে জ্ঞানগন্ধে রূপান্তরিত করে নে, জ্ঞানগন্ধ থেকে আত্ম-গন্ধে তুলে নে।" জ্ঞান আর নিজত্ব, এই দুই জড়িয়েই ত ভগবান্? যখন বললি—জ্ঞানে, তখন কোন বেদন ওঠেনি—আত্মায় বলতে এখন বেদন উঠল। 'নিজ'—এর সঙ্গে সঙ্গেই বেদন জড়ান রয়েছে। পুনঃ পুনঃ বলছি যে, তোদের শিশুবৎ হতে হবে। অবিকুণ্ঠিতচিত্তে এইখানে গিয়ে সব ফেলে দাঁড়ালে, তবে শান্তি পাবি। তিনিই একজন আছেন—আর কেউ নেই। জয় মা! জয় ভগবতি!

তোদের আরও দোষ, পদে পদে তোরা যাচাই করতে যাস যে, এটা সত্য কি না। এই যে ভগবান্ বললুম—এর ফল কই? তাঁকে দেওয়া হয়েছে, এই আমার কৃতার্থতা—প্রতিদানে তিনি কি দেবেন, সে আমার দ্রষ্টব্য নয়। যেখানে নিজত্বেরই দান, সেখানে কোনও হিসাব থাকবে না। আত্মদান-জাতীয় ক্রিয়ার উদ্দীপনা তোদের বুকে আমি দেখতে চাই, তোদের মানসিক গঠন এই-জাতীয় দেখতে চাই। তোদের কত ত্রুটি। এই সব থেকে গুরু তোদের উদ্ধার করছেন। এখনও প্রাপ্তি এল না; এই-জাতীয় ভাব তোদের এসে পড়ে; তাই পার্থক্য দেখাতে হয়।

কাল মধুকৈটভ-বধ বলেছিলুম। তা এখন বুঝতে পারছিস? ব্রহ্মা কি স্তব পাঠ করলেন? "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা" ইত্যাদি বলে কার স্তব করা হল বল্ ত? বাকের। কার আরাধনা করলি? একেবারে বাক্‌দেবীর। এই যে বাঙ্ময়ী দেবী, এই মা কি ভাষা বলছেন? "আমি যা বলছি, পরমশিব তাই হয়ে যাচ্ছেন। শিব আমার কত আপন দেখছিস, আর আমার কত শক্তি?" এই কথাই ত সত্যি সত্যি সব হচ্ছে। সত্যি সত্যি সব হচ্ছে? প্রতি শব্দই সূর্য্য; চিদাকাশ বা নিজবোধ তার প্রতিষ্ঠা। ঐ শব্দ চেতনায় একটা গণ্ডী বাঁধল—তার প্রতিষ্ঠা হল আত্মা। ভগবতী, সূর্য্য, চন্দ্র, সব দেখারই নিয়ম এই। 'দুর্গা'—এই কথা বললি। এর মানে কি? ভগবতী বাঙ্ময়ী এই শব্দ নিয়ে স্বয়ং বেরোলেন। আগে জ্ঞানভূমিতে বসে, শিব-শক্তি ছাড়া আর কেউ নেই, এই বোধ ধরে নিলে তবে না দুর্গা বেরোবেন। কথা যদি কথামাত্র, আর আত্মা যদি একটা বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ামাত্র হয়, তবে ঐ দুর্গা বেরোবেন? কখনই না। সঙ্কল্প মানে কি? তাঁরই সঙ্কল্প আমাতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যিনি পরাশক্তি, তিনি পরমশিবত্বে বা আত্মত্বে "দুর্গা" এই কথা বলে বিস্তৃত হলেন। তাঁর এই কথা এমন জিনিষ যে, ইনি একবার মাত্র চেতনাবান্ হয়েই নিভে গেলেন না। ইনি একেবারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভূতমূর্ত্তি হতে সমর্থ। যদি এই রকমে দুর্গা বলিস, তবে তোর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুর্গাই আবির্ভূত হবেন। টাকা বলিস ত টাকাই বেরোবে।

"মশায়, এ হলে ত বড় সুবিধা হয়! আজ এক মণ চালের

দরকার, কাল টাকার দরকার। এই বিদ্যাটা আয়ত্ত হলে ত ভারি মজা। আমরা শত অভাবে জর্জ্জরিত, কুঁড়ে ঘরে বাস করি, পরদাসত্বে অভিভূত, চিন্তাগ্রস্ত, আর্ত্ত।—এ অবস্থায় এই বিদ্যালাভ করলে সব উল্টে যায়—একটা অনন্তত্ব এসে উপস্থিত হয়।" একবার করে দেখ না, দুঃখ দূর হয় কি না। এই বিদ্যা অনন্ত-প্রসারিণী বলে এখানে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। 'রূপং দেহি, যশো দেহি, ভার্য্যাং মনোরমাং' পর্য্যন্ত দেহি। তিনি বলছেন,—"তোরা যত নিতে পারিস নে। তবে আমাকে দেখে, তার পর নে।" কেন? এই বাহ্য আকাঙ্ক্ষা মারতে কতক্ষণ? ভৌতিক অন্নের দরকার হয়েছে? আমার কাছে চেয়ে নে না। আমার কাছে চাইতে চাইতে তখন মনে পড়ে যাবে যে, ভৌতিক অন্ন কেন নেব—অন্নপূর্ণাকেই নেব। তুমিই বীর্য্য, তুমিই শ্রী। নে না চেয়ে। জ্ঞানভূমি আর তাঁর ভিতরকার বিজ্ঞান, এই তত্ত্ব পরিষ্কার হচ্ছে? ব্রহ্মের দুই রূপ—জ্ঞ এবং অন। এঁরা কিরূপে কাজ করেন? একটা মোষ টেনে বলিদান দিলেই কি মহিষাসুর বধ হবে? দিব্যি খেয়ে-দেয়ে বসে ছিলি; খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে হল্ এণ্ডারসনের দোকানের জামা দেখে অমনি মহিষাসুরের গুঁতা খেয়ে উঠলি। কোনও রকমে টাকা জোগাড় করে, সেই জামা কিনে গায়ে দিয়ে, তবে নিশ্চিন্ত। তার পর আবার মধুকৈটভের কবলে পড়লি। মহিষাসুর বধ মানে—অনারম্ভ পুরুষ হওয়া। যা না করলে নয়, তাই মাত্র করে যাব—আর কিছুর জন্য ছুটব না। একে বলে অনারম্ভ পুরুষ হওয়া।

তোদের বিশ্বময় তাঁর স্বীকৃতি আসুক—পরে নিজেকে নিমিত্তরূপে দেখবি। আমিত্বের যা অন্তঃসার, তা ভগবানে চলে গেল, খালি বাইরের চেহারাটা রইল। এই হলে তখন ভগবান্ বলবেন,—'মামেকং শরণং ব্রজ।' এটা শেষ কথা। পরাভক্তির জন্য পরাপ্রকৃতিকে অবলম্বন কর। নিজবোধ অবলম্বন করে যে ভক্তি উদিত হয়, সেই-ই পরাভক্তি। আর অপরাপ্রকৃতি অবলম্বনে যে ভক্তি, তা হল অপরাভক্তি। তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখে দেখে তাঁতে যে ভক্তি, সে অপরাভক্তি। আর আত্মত্ব দেখে, এইখানে যে আত্মা, সে-ও তুমি—এই দেখে যে ভক্তি, সেই হল পরাভক্তি। তুমি এত মহান্—এত আলো, বায়ু দিচ্ছ, প্রাণ দিচ্ছ—এই দেখে যে ভক্তি, সে অপরাভক্তি। আর 'তৎ ত্বমসি' দেখে যে ভক্তি, সেই পরাভক্তি। নিজবোধ—এই জ্ঞানের বিশেষত্ব কি? নিজ—এইরূপ যে জ্ঞান-প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, তার বিশেষত্ব কি? নিজের দ্বারাই নিজে যিনি প্রকাশিত, এমন জ্ঞানস্বরূপ। এই কথাটা বার বার বলতে গিয়ে তুই নিজে তাই না হয়ে থাকতে পারিস? এ কথা কাকে বলছি? কি আশ্চর্য্য! আত্মা! আত্মা! 'স্বয়মেব আত্মনা আত্মানং বেত্থ।' এ কি রে—এ যে আমিই হয়ে গেলুম! এইরূপ করে ভূতভূমি থেকে জ্ঞানভূমিতে ঢুকে, তাঁকে আবির্ভূত করে নিতে হয় বা তিনি আবির্ভূত রয়েছেন দেখে নিতে হয়। 'কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।' 'ইয়মেব গুরুমূর্ত্তিঃ, ইয়মেব জ্ঞানমূর্ত্তিঃ, ইয়মেব আত্মমূর্ত্তিঃ'—এ ঠিক করে বলা মানেই—

অববোধ করতে করতে বলা। তা ভিন্ন বলা হয় না। নমো নমঃ! হে চিন্ময়! অয়মাত্মা চিন্ময়ঃ। এই ভাবে প্রথমে বাইরে বেরিয়ে যাবে। তার পরে তোর সমগ্র নিজত্বের ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পরিচয় থাকবে না। তার পরে ভগবতি! ভগবতি! —এই বাঙ্ময়ী বেরোবেন। আত্মনা আত্মানং—আপনিই জানন-শক্তিরূপে যিনি আছেন, তিনি বেরোলেন। আপনি মানে—এই আত্মতত্ত্বই—আত্মাই। এই রে ভগবতী! ইস্! আহাহা! মা! মা! কে কাকে জানছে? মা-ই মাকে জানছেন। নমো নমঃ! দুর্গা দুর্গা, হর হর! কে কাকে জানছে? মা-ই মাকে জানছেন। মাকে মূর্ত্ত দেখতে কতটা বাকী? কোথায় এসে পড়েছি? এ সেই ভূমিতে এসেছি, যেখান থেকে মা বেরোবেন। খালি অবিচলিত ভাবে দাঁড়াতে পারিস না, পা হড়কে যায়, এই যা দোষ। এ সব পাগল হবার অবস্থা! এ জায়গায় বিচারবুদ্ধি আর থাকে না। নিরালায় ছুটে যেতে হয়। ভগবতি!

আপনার দ্বারা আপনাকে জানছেন, এরই নাম—ভগবতী প্রকাশ হচ্ছেন। তোর আর হাত-পা রইল? এই জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় নেওয়া হল, এ-কথা কখন বলব—যখন আর নিজের হাত-পা কিছু দেখা যাবে না। যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনি আপনাকে পাচ্ছেন—সেখানে নিজ নামে স্বতন্ত্র আর কেউ একটা থাকবে?

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত শাখাগ্র ফলাস্বাদনমোদবৎ ॥

এই বিজ্ঞানটি অনুসরণ করতে হবে, খালি আত্মা আত্মা বললে হবে না। এ কি কঠিন? কিছু কষ্ট নেই। থাকতে পারিস না, সে পৃথক্ কথা। যদি লালায়িত হয়ে থাকিস, তবে যাওয়ায় কিছু কষ্ট নেই। তোদের একেবারে ব্রহ্মলোকে ঠেলে দিয়ে এসেছি—একেবারে প্রদীপ্ত হৃদয়। যখন আলস্য বোধ করবি, মেরুদণ্ড নিবি। একবার সুষুম্নার ভিতর দিয়ে চল্ না। বার-কতক মেরুদণ্ডে—ঐ ফাঁকটায় চল, ঝরঝরে হয়ে উঠবি। আত্মস্থ হতে হলে মেরুদণ্ডের ঐ ফাঁকে যাওয়া বড় দামী। ঐটে নিলেই আগে আকাশ আসে; তার পর জ্ঞানাকাশ এসে যায়, তার পর আত্মা—যিনি নিজের দ্বারা নিজে প্রকাশ হচ্ছেন, তিনি আসেন; তার পর দেখবি, তিনি তুই ই। এখানে ভগবান্ রয়েছেন? ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! তিনি সব জায়গায় আছেন, ভগবান্ বললে এই-ভাবের একটা খেলা ফুটে উঠবে ত?

ভক্তির দিক্ থেকে বলির নিজেকে দান প্রশংসনীয়। আর বিজ্ঞানের দিক্ থেকে নিজের দ্বারা নিজেকেই জানলাম—এই ভূমিতে জীবত্ব অব্যক্ত হয়েছে, আর নিজত্ব ব্যক্ত হয়েছে। জীবত্ব কূটস্থ আত্মায় অব্যক্ত হল। এঁ থেকে নেমেই জীব হয়। আর তন্ত্রের দিক্ থেকে দেখলে, কোন্ দেবী এখানে প্রকাশ হলেন? কালী। কালিকা জীবত্বকে গ্রাস করেছেন—জীবত্ব আর নেই—খালি শিবত্ব রয়েছে। এ কে করলেন? কালী? তিনি কেমন করে এ করলেন? তিনি শিব-সঙ্গমে

একীভূত হলেন ; কাজেই বাহ্য সব অব্যক্ত হল। এই যে সঙ্গম, এই যে একীভূতি—এর নাম আত্মরমণ—শিবশক্তির মিথুন। একটু আগে ইনিই ছিলেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। অস্মি, অহংবুদ্ধি, পঞ্চ তন্মাত্রা, সব নিয়ে জগৎবিলাসে দাঁড়িয়েছিলেন। আর এখন সব গুটিয়ে নিয়ে একীভূত হলেন। এই জ্ঞানাত্মিকা সূক্ষ্ম গতিটুকু যখন সমৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার হয়। এই ক্ষুদ্র বিদ্যুৎশিখা আত্মরূপে শিবত্বে ঢুকে গেল, এই তোর উপলব্ধি হল। আর এইটুকুই তোর স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি অনন্ত আয়তন নিয়ে বসেছিল, যে এখনি টুক করে শিবে মিশে গেল। এমন জগৎ গড়া আর জগৎ ভাঙ্গা, এ খেলা খেলতে তোদের ইচ্ছা করে না ?

২০এ মার্চ্চ, ১৯৩৮, রবিবার।

মধুকৈটভ বধ করছিস ? করতে পারিস ? এই ঘরের ভিতর বসে আছিস্ ; এ ঘর কিসে তৈরি ? জ্ঞানে ? ঘর জানছি মানে, আমার জ্ঞান ঘরের মত চেহারা নিচ্ছে ; এই জানার দ্বারা একটি গৃহ-আয়তন রচনা করে, তাতে আমি বসে আছি। এ জানা কি শুধু ঘরকেই জানা ? না, আমি যে বসে আছি, তাও জানছি ? এ জ্ঞানের দ্বারা ঘররূপ আয়তন তৈরি হচ্ছে, আর নিজেকে জানছি। স্বপ্রকাশ জ্ঞানমূর্ত্তি এক পিঠে আপনাকে, এক পিঠে ঘরকে জানছেন। এই ছবি, এই দর্শনের

দ্বারা কোন কাজ হল কি? ভূতত্ত্বের অপলাপ হল। ভূতকে মেরে জ্ঞানস্বরূপত্ব বা ভগবত্তা প্রকাশ হলেন।

তোরা পৈতা কাটা দেখেছিস? তুলার পাঁজ ধরে, তা থেকে সুতা পাকাতে লাগল। যখন সবটা তুলা সুতা হয়ে গেল, তখন আর পাঁজ নেই; এ-ও তেমনি। এর দ্বারা দুটা অসুর মরল। এক মধু, আর কৈটভ। কীট-ভাব ও সে কীটত্বে মোহ, দুই বিনাশ হল, কীট-জ্ঞান আর নেই। এই যে ভূতত্বকে ধ্বংস করা দেখলুম, এ থেকে জ্ঞানময়কে বার করে তাঁকে আত্মত্বে পর্য্যবসিত করলুম। পুনঃ পুনঃ যদি এইরূপ করতে পারি, তা হলে ভৌতিক কোষ আর আত্মার উপর আধিপত্য করবে না। তখন ইচ্ছা হবে যে, এটাকেও জ্ঞানময় করে ফেলি।

রামচন্দ্র পাদ-স্পর্শ দিয়ে পাথরকে চেতন করেছিলেন্। আমরা যা কিছু খাচ্ছি, সে সবও তাঁরই স্পর্শে চেতনা হয়ে যাচ্ছে। সেই-রকম তুলার পাঁজ উড়ে যাওয়ার মত যেমন বাইরে, তেমনি শরীরে—এ বিশ্বও উড়ে যাবে, জ্ঞান-প্রকাশই থাকবে। আমরা শরীর-নামীয় জ্ঞানেই ত বাস করছি। সেই জ্ঞান মাত্র শরীর-মূর্ত্তিই জানিয়ে দিচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও জানিয়ে দিচ্ছে। আমি আমাকে জানছি—এ হল আত্মজ্ঞানাংশ, শরীরকে জানছি—এটি হল অনাত্ম-জ্ঞানাংশ। প্রকৃতপক্ষে দুই-ই জ্ঞান। এখন শরীর-জ্ঞানকে যদি আমি আত্মত্বে পর্য্যবসিত করি, তা হলে যিনি রইলেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। এই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্; ইনি এখনই শরীর মারতে পারেন, আবার

এখনই শরীর ফোটাতে পারেন। এঁকে সুদৃঢ়ভাবে পেতে হলে, ভূতে ভূতে এঁকে দেখতে ও পেতে হবে। তখন ভূতমুখী বা বহির্ম্মুখী যে স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি বা প্রগতি, ঐ দিকে চলে যাওয়ার যে স্বভাব, তার উপর আধিপত্য আসবে। এখন ভূত হওয়ার গতিকে স্বভাবসিদ্ধ মনে হয়; তখন দেখব, ওটা স্বভাবসিদ্ধ নয়; যাচ্ছি—তাই হচ্ছি। ইনি তখন পরমা শক্তিরূপে আবির্ভূত হবেন এবং মহিষাসুর বধ করবেন। সেখানেও ঐ দুই জ্ঞান—নিজে ও বিশ্বমুখী প্রগতি। ভূতের দিকে আমি কেন ধাবিত হচ্ছি? আমার অনাদি-কর্ম্মসিদ্ধ ভূতসংস্কার রয়েছে বলে। আমার জ্ঞানে ভূতসকল আহৃত হয়েছে—স্ত্রী, ফুল, ফল—সবই ভূতভাবে আহৃত করে রেখেছি, জ্ঞানভাবে আহৃত করিনি। সেই-রকম ভাবে সব জড়ো করা রয়েছে বলে আমি তাদের দিকেই ছুটছি। কিন্তু ঐ ভাবে জড় করা থাকলেই তাদের দিকে ছুটতে হবে কেন? বাড়ীতে পাথর জমা করা আছে বলেই তাদের দিকে ছুটতে হবে কেন? আত্মসংযোগ রয়েছে বলে। আত্ম-সংযোগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই ফোটে না। ভূতের সঙ্গে 'আমি' সংযুক্ত রয়েছি বলেই ভূত ফোটে। আত্মার এই যে কামময়ত্ব—'বহু স্যাং প্রজায়েয়' এই যে প্রতিজ্ঞা, এর দ্বারাই তাঁর বহু আত্মা হওয়া হচ্ছে। আমিও কামময় হয়েছি, আমার ভিতরও কামময়ত্ব প্রবিষ্ট হয়েছে। আত্মার বহু হওয়া মানে, পুরুষত্ব গ্রহণ করা। পুরে পুরে তিনি আপনাকে খণ্ডিত করেছেন—তাই হল পুরুষত্ব। এই পুরুষত্ব হতেই হল পুরুষকার—ভগবানের

পুরুষকার হল 'বহু স্যাং প্রজায়েয়', এই ঠেলা আমাতেও এসে গেল। তাই পুরুষত্ব গ্রহণ করার জন্য আমিও একটা স্বতঃসিদ্ধ গতিময় হয়েছি; তারই নাম আমার পুরুষকার। তা হলে ছুটি জিনিষ হল। এক, আমার সঞ্চিত সংস্কার জড় করা আছে; আর এক, আমার নিজের পুরুষকার অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্ব থেকে খণ্ডিত হয়ে যাওয়া—আমাদের ভাষায় সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া। যাতে আমি টুক্‌রা টুক্‌রা হবে যাব, তাই হল পুরুষকার, আর সঞ্চিত কর্ম্ম হল অদৃষ্ট। মহিষাসুরকে বধ করতে হলে এই দুই জিনিষ—কর্ম্ম-সঞ্চয় ও পুরুষকারকে ধ্বংস করতে হবে। এর পর শুম্ভ নিশুম্ভ। তবেই মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভ, এই তিন জায়গায় ভগবতীকে দাঁড় করালে তৎনই আমি ব্রহ্মত্ব লাভ করব। আমরা সত্যই দেখি যে, এক দণ্ড আমরা চিন্তাশূন্য নই; কোনও প্রয়োজন নেই, অথচ আমরা চলেইছি চলেইছি—একটা একটা করে পুর রচনা করে চলেছি। এ থেকে আমাদের অব্যাহতি দাও মা, এই হবে আমাদের প্রার্থনা। একটা শান্ত নিশ্চিন্ত অবস্থায় আমরা কখনও নেই। বাইরের সবকে তিনি ভূত ইত্যাদি সাজিয়ে রেখেছেন, সে আলাদা কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখলে আমি একটা পাগল ছাড়া কিছু নই—ক্রমাগত আমি বক্‌-বক্‌ করছি। চিন্তাকে সংযমে বেঁধে হিসাব-মত ব্যবহার করা, এ যেন আমাতে নেই। এখন হয় ত কতকটা করতে পারি; কিন্তু যখনই ঠাকুর-ঘরে ঢুকি, তখনই নানা চিন্তা এসে পড়ে। বাইরের ব্যবহারে যখন চোখ রইল না, তুই যখন

ভিতরে ঢুকলি, তখন—ও বাবা, এ যে ভূতের নৃত্য! একে না ছাড়তে পারলে প্রলয়ান্তব্যাপী স্থিতিতে দাঁড়ান যাবে? মনকে ছেড়ে দিয়েছ কি সে চলল; পাগল আবার ক্ষেপে উঠবে। সুতরাং তিন জায়গায় সংযম অবলম্বন করতে হবে—ভূতে, অদৃষ্টে, পুরুষকারে।

শুম্ভ অসুরদের রাজা, নিশুম্ভ তার ছোট ভাই। শুম্ভের ঘরে সব আছে, দেবতাদের যত কিছু ঐশ্বর্য্য, সব সে কেড়ে নিয়ে ঘরে জড় করেছে। ওখানকার রাজা হল পুরুষকার। এখান থেকেই যদি ভূতে ভূতে দেবীকে বসান না যায়, তবে ওখানে দেবীকে বসান বড় কঠিন। দেবীকে ওখানে একবারমাত্র বসালেই প্রতি-রোধক ব্যবস্থা হবে না, আবার ওখান থেকে হুড়-হুড় করে বেরিয়ে আসতে হবে। তাই ঋষি বলেছেন,—"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" ভূতে ভূতে তাঁকে দেখায় অভ্যস্ত হলেই ভূত-দেখা লোক থেকে বেরিয়ে অমৃতত্ব লাভ হবে। প্রথম হল—ভূতকে মারা; দ্বিতীয়—অধ্যবসায় বা বিষয়ের দিকে প্রগতিকে মারা; তৃতীয়—পুরুষকারকে মারা। পুরুষকারকে আমি মারব বললেই হবে না—তাকে মারা দুই জনের উপর নির্ভর করে। প্রথম, আমার চেষ্টা; দ্বিতীয়, ভগবানের ইচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করে। 'আর আমি বড় হতে চাই না' তিনি এই কথা না বললে পুরুষকার মরে না।

মা যখন নিশুম্ভকে অষ্ট শক্তি দিয়ে ঘিরে ধরে মারলেন, শুম্ভ তখন বললে,—"একলা ত তুমি মারতে পারনি; অন্য সকলের

বল আশ্রয় করে, সবাই মিলে মেরেছ। একলা হয়ে মার ত বুঝি।" দেবী তখন বললেন,—"আমি ছাড়া আর কে আছে? ওরা সব ত আমারই বিভূতি।" তখন তিনি বহুত্ব সংহরণ করলেন, একেশ্বরী মূর্ত্তি ধারণ করলেন, অম্বা হলেন—তখনই বহু হবার প্রবৃত্তি মরল।

অমৃতলাভের জন্য আমরা যে ভাবে চলেছি, তাতে দেখছি,—একটু নাড়াচাড়া করলেই আগুন জ্বলে উঠবে। কেমন করে ভূত মরে, তা দেখেছি; প্রবৃত্তি কেমন করে মরে, তার পরে তার বীজের ঘরটা কেমন করে মরে, তা দেখে নিয়েছি। আরও দেখেছি, সকল শাস্ত্রের সার হল দুই জিনিষ—জ্ঞান ও ভক্তি। তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাঁর শরণাগতি। তাঁর সম্বন্ধে প্রজ্ঞা খোলা, আর তাঁকে ভক্তি করা বা শরণাগতির দ্বারা তাঁর আশ্রয় নেওয়া। এই দুই কথাই ছিল আমাদের পুঁজি। ঋষিরা কোন্ কাল থেকে বলে আসছেন,—তাঁকে জান, জান, জান। তাঁকে ভালবাস, আত্মদান কর, তাঁর আপনার হয়ে যাও, এ সব ঐ এক জানার উপরই নির্ভর করে। আরও নিগূঢ় কথা বললেন, যাঁকে জানতে বলছি, ইনি স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্ব্বাশ্রয়। একজন মানুষ জলে ডুবে থাকলে, জলেই সে যেমন ওতপ্রোত থাকে, তেমনি তোরাও ভগবতীতে ওতপ্রোতভাবে তদাশ্রিত হয়ে আছিস। আবার তুইও তাই-ই—তাঁরই একটি অংশবিশেষ—লহরবিশেষ মাত্র। তখন আর কি ভালবাসা, অশ্রু, এসব দেখাতে হয়? গুরুর বাড়ী গিয়ে শিক্ষা পেয়ে নয়—মা যেমন

স্বতঃসিদ্ধভাবেই ছেলেকে ভালবাসে, তেমনি যদি আমি জেনে ফেলি যে, আমার এই সত্তা স্বতঃসিদ্ধভাবে তাঁতেই রয়েছে, তবে কি এঁকে ধ্যান কর, জপ কর, এ-সব কথা বলতে হবে? আমি ভাত খেতে বা কোন কিছু করতে গেলেই তাঁকে দেখে ফেলব। তাই ঋষি বললেন—ভালবাসা, ভক্তি করা, এসব আপনি আপনি হবে; তুমি শুধু তাঁকে জান আর সেই-রূপ হও। উচ্ছ্বাস, হৃদয়-ব্যবহার, এসব দ্বিতীয়-সত্তাসাপেক্ষ। তিনি আছেন এবং তাঁর ভিতরে আমি আছি, এই জ্ঞান যত প্রকাশ হবে, তত আশ্রয়-আশ্রিত জ্ঞান ফুটে উঠবে। আমি তাঁকে জানলে, আমি যা বলব, তাই হবে। যে জেনেছে যে, এই চিন্ময়ী ছাড়া আর কিছু বা কেউ নেই, তার আমিত্ব আর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকবে না। যে পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য থাকবে, সেই পরিমাণে তাঁকে মা বলে ডাকা ও তাঁকে ভালবাসা চলবে। আর যেই দেখবে,—'আমিও তুমি,' 'আমিও তুমি,' অমনি তিনি বলবেন,—'কি চাস? যা চাস, তাই বল আর হ।' তখন বাক্ তার কন্যা হয়ে বেরোবে।

"বেশ আছি" এ কথা বলা খালি মৃত্যুকে ধামা-চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা বৈ ত নয়। ভিতর দিকে চাইলেই ও-সব কথা উড়ে যায়। কোন্ মুহূর্ত্তে বাণ ডেকে কুঁড়ে ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, বলতে পারি না; জানতেও দেবে না—এত অনিশ্চিত, অধ্রুব ভূমিতে বসবাস করছি। এই অবস্থা থেকে এমন এক পূর্ণ আশ্রয়ে ঢুকলাম, যেখানে গিয়ে দেখি যে, আমি ভগবৎসন্তান, অথবা তাঁতে একেবারে এমন ভাবে নিজত্ব এল যে, তাঁতে আর

আমাতে কোন পার্থক্য থাকছে না, একেবারে ব্রহ্মবিলাসে উপস্থিত হলুম—আমার মুখের কথাতেই সব হয়ে যাচ্ছে। কত দূর উন্নীত হলুম, নিরাশ্রয়তা থেকে পূর্ণ স্বাধীনতায় জাগ্রত হলুম। চিন্ময়কে ছাড়া এখন আর মাটি জল কিছুই দেখছি না। আমার কোন কথা কওয়া মানেই—সেই চিন্ময় ব্রহ্মাই হয়ে যাওয়া। দরিদ্রের ঘরে রত্ন বার করার এত-বড় চাবি-কাঠি আমি গ্রহণ করব না? অবশ্যই গ্রহণ করব। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এখন বিষয়ে ডুবে আছে, সুতরাং এ চাবি হাতে পড়লেই আমি ঐ দিকে ছুটে যাব। "প্রিয়তমা স্ত্রী, এ-সব তোমারই জন্য, আমার জন্য নয়," এই বলেই চাবিতে প্যাঁচ দিব। সুতরাং চিরদিনের অসুরতা যতক্ষণ বিনষ্ট না করতে পারি, বাইরের দিকে যতক্ষণ ব্যবহারমুখী থাকি, ততক্ষণ এ চাবি-কাঠিতে হাত দেওয়া উচিত? হিসাব করে দেখলুম যে, কিছুতেই উচিত নয়। অপরোক্ষভাবে দেখলে দেখব, এ চাবি-কাঠি আমার পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ মায়ের রাজ্য, বুক দিয়ে গড়া এ রাজ্যে অপার করুণা! বিষয় ভোগ করলে পাছে মাকে হারাই—এই যে তোর সংযম, এ প্রচেষ্টা সে স্নেহের সাগরকে আরও উথলিত করলে। "যা তোর অত প্রিয় ছিল, আমার জন্য তাকে ছাড়তে চাচ্ছিস্; নে নে, তোর যা খুসি নে।" মাতৃস্নেহের এত গভীরতা, এত গভীর তোমার মাতৃত্ব! তোমার জন্য এত প্রয়াস করছি জানতে পারলে, তোমার বুক স্থির থাকবে না। তাই ঋষি একেবারে রাশি রাশি বর চেয়ে ফেললেন—ভাত দাও, ডাল দাও, যশ দাও, জয় দাও। তাঁর

পেটে বৈশ্বানর অগ্নি সব হজম করবেন। যে এই তিন গ্রন্থিতে মাকে চিনেছে, সে আর মা হারাবে?

এই হল আমাদের গৌরবের জিনিষ। যা খুসি, তা করলেও মা হারায় না। যে দিকে ইচ্ছা চাও, কোথাও মা হারায় না। এই জন্য যেখানেই বাক্‌দেবীকে আহ্বান করা হয়েছে, সেখানেই প্রার্থনার অত স্তূপ। কেন না, আর ত সে সব ভূতের মত আসবে না, দেবতার মত আসবে। ভূতি-শক্তিসম্পন্ন ঋষির বাড়ীতে সূর্য্য সাবধানে রৌদ্র দেন,—তাঁর বাড়ীতে জলদেবতা সাবধানে চারি দিকে প্লাবন দেন। আহাহা! আমি মায়ের জন্য ভাবব, না মা আমার জন্য ভাববেন। বাক্‌শক্তি অবলম্বনে এই যে মায়ের দিকে যাওয়া এবং বাক্-চৈতন্য হওয়া, এ কত গভীর, এবং কত বড় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সব প্রজ্ঞান আমি তোদের কাছে আয়নার মত করে ধরেছি। তোরাও সৌভাগ্যবান্; ধরে থাকতে না পারলেও তা অনুধাবন করতে পারছিস, গ্রহণ করতে পারছিস। এঁর মূল্য তোরা এখনও দেখতে পাচ্ছিস না। যে দেখতে পেয়েছে, সে দেখতে পাচ্ছে, এঁরই প্রভাবে আমি এক জন্মে গোরু, এক জন্মে সাঁওতাল, এক জন্মে সাপ ও এই জন্মে এইরূপ হয়েছি। এই বাক্‌দেবীরই বিভিন্ন রূপ-পরিগ্রহণ-ক্ষমতা রয়েছে। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" ভগবানের কথাও তাই দেখ। এ বড় সহজ জিনিষ নয়। সাধন ভজনের কলকৌশল, টিকি ফোঁটা সব করতে পারি, কিন্তু এই যে শান্তভাবে, একটু একটু

কয়ে ক্রমশঃ সব ফুটে উঠছে—এ লাভের কাছে আর কোনও লাভকে লাভ বলে গণ্য করতে পারব না।

তোদের কোন চিন্তার অবসর দিচ্ছি না। একেবারে প্রাপ্তির পথে তোদের চালাচ্ছি। এ যে তোদের কত কল্যাণ করছি, তা বুঝিস ? জয় গুরু! জয় গুরু! মা আরও বলছেন,—"খাটাখাটির জন্য ভয় করিস না। যাকে বলে বেদ-দীক্ষা, তাই এবার তোদের দেব।" যে সব তত্ত্ব এখন সহজে বুঝতে পারিস, কিন্তু তাতে দাঁড়াতে পারছিস না, বেদদীক্ষার দ্বারা তাতে তোদের স্থিতিশীল করে দেব।

জ্ঞান এখানে জড় হয়ে গেছে। দেহজ্ঞান ও দেহ, এ দুয়ে কিছু তফাৎ দেখাচ্ছে ? যখন বলি—আমার শরীর, তখন জ্ঞানের শরীর ও মাটির শরীর, এ দুয়েতে কোন ভেদ দেখি ? উভয়কে নিয়েই ত একেবারে শরীর জানি। যেখানে মাটি ছিল, সে একেবারে জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, যেখানে জল ছিল, সে-জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। সব একেবারে গলিত হয়ে যাচ্ছে, না ? বন্ধনও যেমন সহজ, মুক্তিও তেমনি সহজ, এ কথা আমি গীতায় বলেছি। বেঁধে ফেলে ভূত সাজাও যেমন সহজ, বন্ধন খুলে শিব সাজাও তেমনি সহজ। কোথাও ছুটোপুটি করতে হবে না।

প্রায় এক মাস কাল নতুন নতুন করে আমি ঐ বিষয়ে পুনরালোচনা করছি। তাতে বিষয়টি আরও অধিকতরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তিন বেটা অসুর—তিন দল অসুর

কোথায় বসে আছে দেখ্ না? মধুকৈটভ অসুর এক-জাতীয়, মহিষাসুর এক-জাতীয় এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ এক-জাতীয় অসুর বসে আছে। এখন আর ওদের ভয় করিস্? যিনি ওদের সংহার করবেন, তিনি বসে আছেন—আর ভয় কি? তিন-জাতীয় অসুর তিন জায়গা অধিকার করে বসে আছে। কোথায় কে বসবাস করছে? হৃদয়ে মহিষাসুর, সহস্রারে শুম্ভ ও নিশুম্ভ, মূলাধারে মধু ও কৈটভ। "শেষ-নাগশয্যাশ্রিতাং কুণ্ডলিনীং বা ইতি।" বিষ্ণু স্বয়ং নাগ-শয্যায় শুয়ে আছেন, মহাকুণ্ডলিনী তাঁকে সহস্রারে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। এখন এঁকে মূলাধারে জাগিয়ে তুলতে হবে। যখন ঘুমোলে, এই মহাকুণ্ডলিনী কার শয্যা হল? ব্রহ্মা কার আরাধনা করবেন? যিনি ঘুম পাড়িয়েছেন—তাঁকে। তোমরা ভূতক্ষেত্রে যার পরিচয় ঘুমের আকারে পাও, চেতনক্ষেত্রে তারই পরিচয় হল সমাধি। তুয়েরই মানে হল—কুণ্ডলিনীর এঁকে সংস্পর্শ করা। ভূত-জ্ঞানীকে ওখানে তুললে তার নাম হবে ঘুম, আর প্রজ্ঞানবান্ পুরুষকে ওখানে তোলেন ত তার নাম হবে সমাধি। মা আমার এমনি ক'রে—"স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্য অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।" এখনি যদি তোদের বলি যে, কুণ্ডলিনী একটা সাপ; ফোঁস করে উঠেছে, তবে তা তোরা বুঝতে পারিস। কিন্তু যদি বলি, ভগবতী তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন ত বুঝিস না। ঋষিরা কুণ্ডলিনীকে সাপ বলে বর্ণনা করে এমন একটা সংস্কার জন্মে দিয়েছেন যে, তাকে তাড়াতে বহু কষ্ট হবে। এর স্থূল অংশ

ত্যাগ করে, সারাংশ বার করে, জ্ঞানে একীকরণ করতে অনেক দেরি হবে। অবিদ্যার চেয়ে বিদ্যার সংস্কার বেশী দুস্তর; শাস্ত্রীয় সংস্কার দূর করা বড় কঠিন। বুদ্ধি পাক খেয়ে গেলে, তার সেই মূর্ত্তি ভাঙ্গা বড় শক্ত। ভূতকে ভাঙ্গা সহজ—বুদ্ধিকে ভাঙ্গা বড় শক্ত। তোদের সাপ-টাপ জাগাতে হবে না—সে সব আমি বাদিয়া হয়ে জাগাব। বাদিয়া না হলে কেউ সাপ জাগাতে পারে না। তোরা খালি বুঝে নে।

২২এ মার্চ্চ, ১৯৩৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

সকল জ্ঞান-প্রকাশেই রূপ-রস, শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধ আছে। যে কোনও জ্ঞানক্রিয়া হউক, তা হওয়া মানেই, তাতে শব্দ-স্পর্শাদি সব আছে; শুধু বিভাগের তারতম্য মাত্র। কিন্তু আমরা অত সূক্ষ্মভাবে দেখতে পারি না। বাহ্য তত্ত্বে এক তত্ত্ব অর্দ্ধেক এবং অন্য চারি তত্ত্ব দুই ভাগ করে আছে। যে তত্ত্ব অর্দ্ধেক, সেই তত্ত্বই আমাদের কাছে ফুটে ওঠে; বাকী চারি তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। যেমন ক্ষিতিতত্ত্বে অর্দ্ধেক আছে ক্ষিতি, বাকী চারি তত্ত্বের প্রত্যেকটা দুই ভাগ করে আছে। তেমনি চেতন-প্রপঞ্চেও যে জ্ঞানটি হল, তাতে শব্দ-স্পর্শ, রূপ-রস, গন্ধ, সব আছে। জ্ঞান-প্রকাশ মানেই বাক্-প্রকাশ। যে আকারে বা যা লক্ষ্য করে বাক্‌প্রকাশ, সেইটিই হল শব্দ। চেতনায় যা ফুটবে, তার বোধ আছে; সেই বোধই হল স্পর্শ। শব্দ একটি

আয়তন ; সুতরাং তাতে রূপও আছে। বাক্‌প্রকাশ হলেই তাতে সুখ-দুঃখাদি বিশিষ্ট বোধ আছে, সেইটি হল রস। আর গন্ধ হল নিধনতত্ত্ব—একে ছাড়িয়ে আর সে যাবে না ; ঐখান থেকেই আবার সে উল্টা-মুখী হবে। জ্ঞানতত্ত্বে 'ফুল' এই বাক্‌-প্রকাশ ফুলত্বে নিধন প্রাপ্ত হল—সে আর কোনও জ্ঞান বা আকার নেবে না—এই হল গন্ধতত্ত্ব। এই যে ফিরে পড়া—বহির্ম্মুখে চলছিল, আবার অন্তর্ম্মুখে ফিরে পড়ল,—এইটি বড় দামী জিনিষ। মানুষ যেমন মাটিতে ভর করে, জোর দিয়ে দাঁড়ায়, সেইরূপ ফুলভূমি তৈরি হয়ে গেল। মাথার ভিতর ফুল-ভূমি তৈরি হয়ে গেছে ; এখন ঐখান থেকে ফুল গজাবে—চেতনা ঐখানে নিধন প্রাপ্ত হবে। ভগবান্ জ্ঞানের দ্বারাই ফুল তৈরি করেছেন, এ তুমি জানতে না। এখন জেনেছ ; তোমাতেই ফুল মূর্ত্ত হয়ে গেছে—আর তোমায় বাইরে থেকে ফুল নিতে হবে না। যখন জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন যাওয়া শেষ হল। নিধন মানে—তমঃস্থিতি ; চিরদিন ফুলের জ্ঞান দৃঢ় হয়ে রয়ে গেল। এই যে সীমা নির্দ্ধারিত হয়ে গেল,—আর সীমা অতিক্রম্ করে যেতে পারবে না ; এই বাঁধা সংস্কার হয়ে গেল। এবার থেকে 'ফুল' কথা বেরোলেই সামনে এসে একেবারে ফুল উপস্থিত হবে। একে ভূমি বললুম ; কেন না, এ ক্ষেত্রস্বরূপ হল। সকল জ্ঞানেরই এইরূপ ভূমি আছে। কেন না, জ্ঞান এতদপেক্ষা আর স্থূলত্ব নেবে না। ভগবতী-জ্ঞানেরও এই-রকম স্থূলত্ব আছে,—"দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং

বিশ্বতোমুখম্ ॥" এই যে স্থূলতার জ্ঞান, এই জ্ঞান বড় দামী জিনিষ। সাধকরাজ্যে বস্তু-স্থূলতা, জ্ঞানস্থূলতা ও ভগবৎ-স্থূলতা এক কথা। এই হল প্রাপ্তির চরম সীমা। বলেছি যে, বাক্ই তড়িৎ এবং তড়িৎই আলো ও শব্দ, উভয়ের বাহক। তার পর আবার দুই ভাগ হয়ে গিয়ে, দুটা যন্ত্রে ধরা পড়ে, শব্দও হচ্ছে, আকৃতিও নিচ্ছে। তেমনি বাক্ হল আত্মস্ফুটনের বেগ—চেতনা একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুত্ব-প্রাপ্তির অভিমুখে যাচ্ছেন। তাতে দুটি জিনিষ আছে—এক, সেই বস্তুত্ব-প্রাপ্তির রূপ, অপর—প্রাপ্তিত্বের পরিচয়—কথা কওয়া। আমার ক্রোধ হয়েছে, সে ক্রোধ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে, ফুটে বেরোচ্ছে—"মারো বেটাকে" এই-রকম আকারে। নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প-ভাবে আমি এ কথা বলছি না। আমার যত কিছু স্নায়ু আছে, তাদের টেনে নিয়ে বাক্ একটা মূর্ত্তি ধরছে। তারই পরিচয় কণ্ঠ থেকে শব্দাকারে বেরোচ্ছে,—"মারো বেটাকে" বলে। বৃক্ষ দেখছি, এও নির্ব্বিকল্প-ভাবে নয়। আমার জ্ঞান একদিকে বৃক্ষের আকার নিলে—'বৃক্ষ' নামে পরিচয় দিলে। এতে জ্ঞানের দুই চেহারা পাচ্ছি—এক গ্রহণাত্মক বা বিধৃতি-আত্মক; আর এক পরিচয়াত্মক বা সংজ্ঞাত্মক।

বাক্ হল একটা ক্রিয়া—নাম-রূপ সৃজন করাই যার কার্য্য। রূপ-সৃজন-করা-শক্তির নাম দিলুম motor বা সম্ভূতি-শক্তি, আর নাম-সৃজন-করা-শক্তির নাম দিলুম sensory বা অনুভূতি-শক্তি। অনুভূতি হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে রূপ ধরছে। নিখুঁত-ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বে বসতে পারলে আপনি তদ্রূপাত্মক হব এবং আপনিই

তার ভোক্তা হব। সৃজন ও ভোগ, এই দুই-ই আত্মতত্ত্বে হতে থাকবে। যে অংশে তিনি ভোগ করছেন, সে অংশে হচ্ছেন জীব, আবার যে অংশে সৃজন করছেন, সে অংশে ভগবান্। জীব সাজা ও জীবের ভোগ্য সাজা—এই দুই মিলে হলেন ঈশ্বর। সম্ভূতি ও অনুভূতি, দুই-ই একসঙ্গে খেলা করছে। জীব মানেই, তিনি একসঙ্গে সম্ভূতি ও অনুভূতি-অংশ পরিচালনা করছেন। সাপে, ব্যাঙে, তোমাতে, আমাতে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বঘটে, চিন্ময় ভগবান্ আর কোনও কাণ্ড করছেন? তিনি একে কেমন করে পড়ছেন? আমি সম্ভূতিময় হলাম, আমিই অনুভূতিময় হলাম, এই হল তাঁর দর্শন। 'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।' সম্ভূতি-শক্তি-প্রকাশ ও তার মধ্যে অনুভূতি। প্রতি কর্ম্ম করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে শক্তিত্ব উপলব্ধি হল সম্ভূতি ও তদাকারে নিজত্বকে দেখা হল অনুভূতি, এ দুই-ই তিনি করছেন। আমরা খাচ্ছি কেন? ভিতরে ভোগের লীলায়ন করবার ইচ্ছা হচ্ছে বলে তবে না খাচ্ছি। তাঁর ভিতরে জগদ্‌ভোগের ইচ্ছা হয়েছে বলে না তিনি জগৎ রচনা করেছেন। তুমি একেবারে নিখুঁৎ সাদা না হলে কি তাঁকে নিতে পারবে? চরাচর-ভোক্তা হতে হলেও তোমাকে ঐ-রকম সাদা হয়ে তবে সেরূপ হতে হবে। নির্গুণ-ভূমি তৈরি করাই হল—ভোগ-ক্ষেত্রকে তৈরি করবার ও ভোগ করবার সুস্পষ্ট উপায়স্বরূপ। তুমি আমায় বললে,—"ভাই, চল না, তাস খেলি।" আমার মন ম্লান থাকলে, তাতে প্যাঁচটা ভাঁজ থাকলে, আমি ভাল করে সে খেলায় মিশতে

পারব না। কিন্তু মন নিভাঁজ ও নির্ম্মল থাকলে একেবারে প্রাণ ভরে খেলায় লেগে যাব। যত চিন্তাশূন্য থাকবে, তত পূর্ণভাবে কোনও কাজে লাগতে পারবে। তেমনি পূর্ণমাত্রায় ভোগের জন্য পূর্ণমাত্রায় নির্লেপ থাকতে হবে; তবেই নিজের সঙ্গে সে ভোগের একেবারে একত্ব অনুভব করা, ভোগে ডুবে যাওয়া সম্ভব হবে। ফুলে ডুবলুম ত একেবারে আমিই ডুবলুম; এ ডোবা কত সাদা হলে তবে সম্ভব হবে। এই চেতনতত্ত্বকে খালি জ্ঞান বলে নিতে পারলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে অনায়াসে খেলা করা যায়। আমি যদি এক দিকে সম্ভূতি এবং এক দিকে অনুভূতি দেখতে পাই, তা হলেই আমি দশ জন, বিশ জন হতে পারি। হচ্ছিও তাই। কিন্তু প্রকৃতি এমন বাঁধন দিয়েছে যে, আমি মানুষ, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না; আমি অমুকচন্দ্র অমুক, এ গণ্ডী ছাড়িয়ে আর যেতে পারছি না। এ গ্রন্থি খোলা না হলে মুক্ত হতে পারছি না। ভগবান্ কেমন করে খেলা করছেন, বহু হচ্ছেন, ঋষিরা পূর্ব্বে কেমন করে বহু হতেন, গুরুকৃপায় এইটুকুমাত্র দেখতে পাচ্ছি। জ্ঞান-নামক জিনিষকে উপলব্ধি করে এই সম্ভাব্য ভাব পেয়ে গেলাম।

তড়িৎ তার পজিটিভিটি নিয়ে ক্রিয়া করে, আবার নিজের ভিতর ফিরে এসে নেগেটিভ হয়। তার এই নেগেটিভ হবার আশ্রয় হয় মাটি—ভূগর্ভ প্রাপ্ত হয়েই সে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আবার আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি; নিঃশ্বাস ফেললুম; ফেলার বেগ শেষ হলেই আবার সেখান থেকেই বাতাস টেনে

ভিতর দিকে নিলুম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-পরিচালিনী শক্তি যেমন বাতাস বার করে দেয়, আবার টেনে স্বমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তেমনি প্রতি চেতনক্রিয়াও বাহ্য-ভূমিতে গিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করে—বাহ্য ভূমিকে ছুঁয়ে—গ্রহণ করে, আবার নিজেতে ফিরে আসবার চেষ্টা করে। এই বাহ্য-ভূমির নাম ক্ষিতিতত্ত্ব, এবং তার উপাদান গন্ধতত্ত্ব। জলে পিচ্‌কিরি ডুবিয়ে জল টানলে—সেই টানার শক্তিতে জল উঠছে, নিজের শক্তিতে জল উঠছে না। এই যে টানার শক্তি, যে নিঃশ্বাস ফেলে আবার বায়ু টানলে, তড়িতেও এই শক্তি এবং আমার চেতনাতেও এই শক্তি কাজ করছে। এই তিনই এক সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে তবে প্রত্যাবর্ত্তন-ক্রিয়া করছে; তারই নাম ক্ষিতিতত্ত্ব—গন্ধ-তন্মাত্রা। এক সৃজনকেন্দ্র থেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে, আবার কিছু নিয়ে ফেরা; ক্ষিতিতত্ত্বে গিয়ে তার পর ফেরা, যার উপাদান গন্ধতন্মাত্রা। বাতাসে গন্ধ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বাতাস টানলুম, সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ এসে নাকে ঢুকে, গন্ধতত্ত্ব উদ্দীপিত করলে—আহা, গোলাপ-ফুল!

তিন ব্যাপারেই আমরা গন্ধতত্ত্ব পেলুম। তিন দিন বাদে হয় ত আমরা এমন তড়িৎশক্তি জ্বালতে পারব, যাঁতে এই ঘরটা গোলাপের গন্ধে ভর-পূর হয়ে যাবে। তড়িৎশক্তি আজ শব্দ ও আলো উৎপাদন করছে। কিছু দিন পরে হয় ত দেখব, সে গন্ধও প্রকাশ করছে। পশুদের গন্ধগ্রহণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। স্থৌল্যের নিবিড়তা যার যত বেশী হবে, তার ঘ্রাণশক্তি তত

প্রবল হবে। তার পর হয় ত জীবাণু-নিবারক ঔষধাদি তুলে দের; কেন না, জীবাণু-শক্তি গন্ধতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যদি জ্যান্ত তড়িৎ কিছু থাকে, তবে তার শক্তিতেই ঘায়ের দুর্গন্ধ নাশ এবং সুগন্ধ বার করব। মা-ই এ-সব করছেন; তাই দেখেই আমি বলছি—'আমি করব।' বিদ্যুন্ময়ী মা এখানে রয়েছেন! এঁকে আরও বিস্তৃত করে বলব।

এইটিই হচ্ছে এক অর্ণব—যাতে অহর্নিশ এই ক্রিয়া চলছে। এই স্থৌল্যই হল ভগবানের ব্যক্তিত্ব। যে সীমা পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখে ধাবিত হয়ে, পুনরায় অন্তর্ম্মুখে ফিরছেন, সেই সীমাই হল স্থূল। এই হল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁ থেকে যা কিছু গঠিত হয়, তাও এইরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়। ভগবান্ যদি গঠিত হন ত তাঁরও এই গতি হবে। এই জন্য মহাদেবকে বলে ব্যাঘ্রাম্বরধর—ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং। আমাদের ভিতরেও যারা অতিমাত্রায় ভাবুক মানুষ, তারা কাকেও আদর করতে গেলে তার শিরোঘ্রাণ করে থাকে। আমাদের দেশের প্রথাই ঐ। পশুদের মধ্যে এটি বড় সুন্দর দেখা যায়। সংস্কারকে ঐখান পর্য্যন্ত না পেলে ঠিক পাওয়া হয় না।

ভগবান্ নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রহ্লাদকে ভোগ করতে লাগলেন। মাও যদি আমাদের নিকট আবির্ভূত হন, তবে তেমনি করেই তিনি আমাদের আদর করবেন। আমার এ-সব উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য হল—আমরা যেমন স্থূল, ঠিক সেইরূপ একেবারে স্থূলরূপে মায়ের আবির্ভাবের বিজ্ঞান বর্ণনা করা।

তুমি নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে —"কি হে, কেমন খেলে?" তখন সেই নিমন্ত্রণ-ভোক্তা জীবকে তুমি উদ্‌গিরণ করলে এবং যে ঈশ্বর তাকে খাইয়েছিলেন, তিনি বললেন,—"বেশ খেয়েছি"। সেই নিমন্ত্রণ-ভোক্তা পুরুষকে তুমি স্বস্থ করেছিলে, পেটের ভিতর ঢুকিয়েছিলে, তাই তাকে বার করে বলতে পারলে,—"বেশ খেয়েছি"। প্রতি ক্ষেত্রে এই ভোগ-তৃপ্তির পরিপূর্ণতা নিয়ে তিনি বলেন,—'অহং ব্রহ্মাস্মি'। তিনি আমাকে শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি খাওয়ালেন এবং আপনি সেই গরিমায় বললেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

তুমি ভগবান্‌কে আপনাব ভিতর যতটা পেলে, তার দ্বারাই তাঁর পরিচয় দিলে। জীবত্ব তাই বড় জিনিষ। এই যে সন্তানকে প্রসব করা ও বুকে টেনে নেওয়া, বাইরে যাওয়া ও বাহির থেকে প্রত্যাবর্ত্তন, এই হল চিন্ময়ের চিৎলীলার বড় বিজ্ঞান। আমাদেরও মা বেশ নিমন্ত্রণ খাওয়াচ্ছেন—গুরুর হাত দিয়ে দিচ্ছেন। এ ভোজন পরিপূর্ণ হলে কোথায় ফিরবি? তাঁতে ফিরলে সেখানে তোর মা কি বলবেন? 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। তা হলে আমাদের মায়ে ফেরা অবশ্যম্ভাবী। যেমন প্রতি দিন ঘুমিয়ে প'ড়ে, সেই ঘুমকে এক জন্মের ঘুম বলে বুঝি, তেমনি প্রতি দিনের ঘটনায় আমরা মায়ে ফিরছি; পরে একদিন সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাব। এ সব কথা মায়ে বসে খাচ্ছিস? অত্যন্ত সাধারণ মাকে অবলম্বন করে অসাধারণ মাকে পাওয়া যায়। আপনার দ্বারা আপনাকে জানছি, এই চেতনা আমার প্রতি অংশে আছেন

—'প্রাণস্য প্রাণঃ' এই মূর্ত্তিকে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে পাচ্ছি। তা হলে অসাধারণ মূর্ত্তি ধরতে হলে ইনিই ত ধরবেন? আর কেউ নয়। দেবতারা যখন নিজেদের শক্তি নিয়ে গর্ব্ব করছিলেন, তখন বায়ু প্রভৃতি গিয়ে যক্ষের পরিচয় পেলেন না। শেষে 'তস্মিন্নেব আকাশে'—যে আকাশে ইন্দ্রিয়-সকল প্রতিষ্ঠিত—যেখান থেকে হাত-পা ইত্যাদিরূপে মা দশভুজা হয়ে ফুটে আছেন, সেখানে মা মূর্ত্তিমতী হয়ে বলে দিলেন যে, উনিই ব্রহ্ম। মা এলে আগে তাঁকে আমরা ইন্দ্রিয়ময়ী বলে দেখব—তার পর প্রাণময়ী, তার পর বাঙ্ময়ী।

২৩এ মার্চ্চ, ১৯৩৮, বুধবার, সন্ধ্যা।

একটা ভূত-জ্ঞান এল এবং সে জ্ঞান আত্মত্বের ভোগ্য হল। যে জ্ঞান ভূতের আকৃতি ধরেছে, সে জ্ঞান ত প্রকৃত কার্য্যকারী নয়—প্রকৃতপক্ষে নিজবোধই কার্য্যকারী—নিজবোধ সেই ভূতে না পড়লে সেখানে সে জ্ঞানের আকৃতি ফুটত না। নিজে যাতে পড়েছি, আমার জ্ঞানশক্তি সেই আকৃতি নিয়ে আছে। আকৃতির নীচে নীচে আত্মত্ব রয়েছে বলে সেইরূপ জ্ঞান হচ্ছে। খালি জ্ঞানশক্তি পড়েছে—আত্মত্ব সেখানে যায়নি, এমন হয় না। আত্মত্ব পড়েছে; আত্মত্বই প্রকাশ-শক্তি—সে নিজে তদন্তর্ভূত-রূপে তদাকার এবং তদ্‌ভোক্তারূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তবেই দেখলুম—এইরূপ জ্ঞান হল। সুতরাং আত্মত্বই হল মূল

পারমার্থিক তত্ত্ব। তা হলে উপরের জ্ঞান কেবল একটা ছোবড়ার মত হয়ে পড়ল। নিজে বলে নিজেই যত দেখছি, এই আত্মজ্ঞানময় তত্ত্ব ততই ভোগ হচ্ছে ত? আপনিই তাই হয়ে, তবে সেইরূপ ভোগ হচ্ছে। আপনি ভোক্তা হয়ে বিশ্বে ঢুকে, এই যে আত্মময় বিশ্বমূর্ত্তি, এই হল ব্রহ্মদর্শন। এই আত্মত্বই সব হয় রে! এই রোগ, শোক, জ্বালা যেমন আত্মত্বেই পাচ্ছ, তেমন এখন যা তোমার নেই—সেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, মহত্ত্ব প্রভৃতি—এ-ও তোমায় নিজত্বেই পেতে হবে। আহাহা! এই যে 'আহাহা,' এই হল পরাভক্তির প্রকাশ। নিজত্বে এইরূপ রসময় হওয়ার নামই পরাভক্তির উদয়। আত্মত্বই রসময় গন্ধময় হলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্রাহ্মণের চোখ। এই তত্ত্বে দৃঢ়ভাবে চোখ দিতে হবে। ভগবান্‌কে দেখ বা আর যা কিছু দেখ, এই তত্ত্ব কিছুতেই হারাবে না।

তা হলে তিনটি স্তর পেলাম। এক—ভূত, দ্বিতীয়—জ্ঞানময় ভূত, তৃতীয়—আত্মময় ভূত। ভূত দেখা মানে, এই তিনটি স্তর। কোন কিছু দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে না দেখলে 'জ্ঞান' শব্দটি অর্থহীন হয়ে যায়, জ্ঞানের পাদমাত্র দর্শন হয়; জ্ঞান দেখলুম বলা নিরর্থক হয়। তাই জ্ঞানময়কে দেখলুম বলতে গিয়ে আত্মময়ের উপর বেগ দিতে হবে। আমি যখন গীতার ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করি, তখন আমার গুরুদেব একদিন আমায় বলেছিলেন,—"হ্যাঁ রে, শুনলুম, তুই গীতার ব্যাখ্যা লিখছিস। গীতার ভিতর ব্রাহ্মণের শিক্ষণীয় কি আছে? হ্যাঁ, তবে একটি

শ্লোকে ব্রাহ্মণের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সে কোন্ শ্লোক, বল ত।" আমি বললুম,—"আপনি বোধ হয় 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা ॥' এই শ্লোকটির কথা বলছেন।" তিনি বললেন,—"হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছিস। বেঁচে থাক।"

আত্মতত্ত্ব-দর্শনহীন জ্ঞান হল অপরা প্রকৃতি। আর এ হল —"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" এখানে জগৎ হারাবার ভয় নেই, তোরা নির্ভীক হয়ে চলে যা। আপনি হারিয়ে যাব, জগৎ হারিয়ে যাবে, এ ভয় তলে তলে ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ আত্মবোধ, আত্মদর্শন নিয়ে এগোন না যায়। মাত্র অন্য জ্ঞান যারা দেখে, তারা দুই দিন পরে তা হারায়। ইনিই খালি বলেন—কখনও হারাবে না। আত্মবোধ ছাড়া যত কিছু জ্ঞান, সবই অপরাপ্রকৃতি—ভূমি, জল, অনল থেকে বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার পর্যান্ত। কি মরুভূমি থেকে গুরু কি গঙ্গায় নামিয়ে দিলেন! এই মাটি কাঠ চিবুতে চিবুতে যাচ্ছিলুম—সবই অসার, তুচ্ছ, বিষ বলে দেখছিলুম। গুরু একেবারে কি কাণ্ডই করলেন, কি রস ঢাললেন, তৃপ্তির আর অবধি নেই! এই কথাটা বড় নতুন কথা। এই যে তৃতীয় স্তরের কথা বললুম, এ কথা সমস্ত দর্শন, সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রকে একেবারে বসিয়ে দেয়। আর এ দর্শনে না বসলে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এ মহাবাক্য মাত্র একটা স্তুতিবাদ হয়ে যায়। আত্মা কাকে বলে? নিজেকে যেখানে নিজের দ্বারাই দেখা যাচ্ছে, সেইখানেই

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। ইনি রয়েছেন ত? আচ্ছা, দ্রষ্টব্যের আঘাতে যখন ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়া হল, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা হলেও, নির্গুণ আত্মা যিনি, তাঁর ত এই সব ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ আছে। কামময়ের দ্বারা তিনি ক্ষুধাতুর হয়ে আছেন। তাঁতে সব থাকলেও তিনি দর্শনের জন্য পরিচালিত হলেন। 'দর্শন' এইরূপ যে বোধ, তদাকারে জ্ঞানশক্তি পরিস্ফুট হয়ে চলল অর্থাৎ তিনি দ্রষ্টৃত্ব বা চক্ষুস্ত্ব গ্রহণ করলেন। 'শুনছি' বলে নয়, 'দেখছি' বলে জ্ঞানের আয়তন ফুটে উঠল। তার পর 'শুনছি' বলে অগ্রসর হলেন। এইরূপে জ্ঞানেরই পাঁচ-রকম মূর্ত্তি হল। আগে 'দেখা' বলে জিনিষ উদিত হয়ে চক্ষুর আকার হল। তেমনি 'শুনা' বলে ক্রিয়ার আরম্ভ হয়ে শ্রোত্র হল। কিন্তু শ্রোতব্য না থাকলে শোত্র হয়েও শুনা হয় না। চক্ষুতে রূপ না ঠেকলে চক্ষু থেকেও দেখা হয় না। তাই ভিতর ও বাইরের উদ্দীপনাতে আত্মতত্ত্বে তখন কি হয়েছে, তাই দেখছি। তাঁর জাননশক্তিরই দুইপ্রকার রূপ হল—এক দ্রষ্টব্য, আর দর্শন। এই জাননশক্তি জাগ্রত হলে তবেই রূপ দেখা, রস আস্বাদন, শব্দ শুনা ইত্যাদি হবে। সুতরাং জাননশক্তি জাগ্রত হওয়াই আগে দরকার। তিনি কামময় বলে চেতোমুখ হয়েই আছেন। এখন সেই জাননের ঢেউ এসে লাগবামাত্র তাঁতে গৃহীত হতে লাগল। যে-জাতীয় জানার ঢেউ এল, সে-জাতীয় ধরা পড়া সাব্যস্ত হতে লাগল। কোন্ দিক্ দিয়ে এটি সম্পন্ন হল? এই আত্মত্বে, না এই

ঢেউ এসে ঠেকাতে? আত্মত্বেই তার আরম্ভ। সেই পাশ থেকে ক্রিয়া না হলে অনন্ত উদ্দীপনা এলেও তা আমি নিতে পারব না। আমার এখানে ভগবান্ বা আত্মা যতটুকু অনুমোদন করেছেন, তার বেশী আমি নিতে পারি না। সুতরাং আমার যতটুকু ভোগ্য তাঁর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, সেইটুকু মাত্রেরই আত্মা উদ্দীপনা দিলেন। আত্মা জাগ্রত হলেন মানে, যে জাতীয় উদ্দীপনা আত্মা দিলেন, সেই জাতীয় বোধ জাগ্রত হল এবং তাতে আমার তৃপ্তি হল। ভগবান্ আমায় কোলের কাছে টেনে এনে এই সব দিয়ে বললেন,—কি এনেছি, এই দেখ, এই শোন, তবেই আমি দেখি ও শুনি। রূপ ও শব্দ প্রভৃতির তরঙ্গে আমরা ডুবে আছি। অথচ এই সমুদ্র থেকে বিশিষ্ট একটি শব্দ, স্পর্শ, রস, স্বতন্ত্রভাবে আমি গ্রহণ করতে পারছি না। যতটুকু ইনি পরিচালিত করছেন, মাত্র সেইটুকুই ভোগ করছি। তার মানে কি? আমি হুড়ং-হুড় করে পাগলের মত বেগে ঐ সমুদ্রে ঢুকছি না। তাই যখন যে নির্দ্দিষ্ট ভোগটি আমাকে দিবার সার্থকতা আছে, সেই মুহূর্ত্তে সেই ভোগটি তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যেমন, আমি যখন রস-ভোক্তা, তখন রূপভোক্তা নই। এক একটি কণা খুঁটে খুঁটে খাবার মত আমাকে সব পেতে হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে দ্রষ্টব্য অথবা শ্রোতব্য যা দিচ্ছেন, সেইটুকু পাচ্ছি। বাকী সবেতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। জিনিষটি বাইরে থেকে এনে আমার ইন্দ্রিয়ে ঠেকিয়ে তিনি বললেন,—"এই লাল রূপ গ্রহণ কর।" এই ভাবে

তিনি জিনিষটি ফুটিয়ে দিলে তবেই না আমি "আহা" বলে তা গ্রহণ করলুম। তার আগে তিনি দ্রষ্টা ও দর্শনযোগ্য জিনিষ হয়েছেন—দর্শন করে তবে চক্ষু প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তাঁর বিশ্ব দেখা মানেই নিজের জ্ঞান দেখা। এখানে যা কিছু আসছে, তা এইরূপ ভাবেই আসছে না? আত্মার জীবত্বে অনুপ্রবিষ্ট অংশ ও তার পাশ থেকে কূটস্থ ভগবান্ আগে দর্শন, শ্রবণ, মননাদি করে, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে, চক্ষু ও দ্রষ্টব্য প্রভৃতি হয়েছেন; তবেই চক্ষুতে লাল রং, স্ত্রী বা ধন প্রভৃতি পড়ছে। তিনি এই রকমে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা ইত্যাদি হয়ে, তবে ত্বক্ ইত্যাদি তৈরি করে, তাতে জীব বলে ধাক্কা গ্রহণ করছেন। আত্মার যে মহিমা ক্ষর পুরুষ, সে দেখছে না যে, আমার পিছনে ঈশান রয়েছেন। তিনি সব দর্শনাদি ক্রিয়া ফুটিয়ে তবে দর্শনাদি করছেন। তিনিই নিজে! কি ব্যাপার রে! আমরা কিছু নয়—সবই ওঁর হাতে। এ সবই তাঁর দর্শন, শ্রবণ, আলিঙ্গনের একটা ধাক্কামাত্র। তা হলে আসল ভোক্তা হল কে? ইনি সব ভোগ-ক্রিয়া সম্পাদন করে আমাকে বললেন—তুমি ভোক্তা হলে। এঁকে তোরা দেখতে যাচ্ছিস? যিনি নিজেকে নিজের দ্বারা নিজে জানছেন? আত্মত্বকে যে এইরূপ ক্রিয়াশীল করে দেখাচ্ছি, এটি বড় দামী জিনিষ। আত্মা বলতে এক জড়-ভরতের মত কেউ নেই। এঁর রসক্রিয়া ক্রমে দেখতে পাবি। তা হলে বাহ্য জগৎ কথাটা বড় ভুল কথা। কত গভীর ভূমিতে নেমেছি —যেখানে আর অন্য কাহাকেও আদর করা যায় না। আর

কেউ নেই, তা কাকে আদর করব? "অয়মাত্মা সর্ব্বরূপময়ঃ স্পার্শময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ তেজোময়ঃ অতেজোময়ঃ কামময়ঃ অকামময়ো বিজ্ঞানময়ঃ আনন্দময়ো হি এষ আত্মা।" এই সুর একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আত্মার ঈশ্বর-নামীয় মহিমা বুঝতে গেছেন, তাঁরা চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর—এই ভাবে এঁকে নিয়েছেন। কিন্তু আত্মত্ব নিজেই সব, আবার সমস্ত সৃষ্টির গোড়াতে তিনিই রূপ রস ইত্যাদি সর্ব্বতত্ত্ব, আবার তিনিই একতত্ত্ব, এই কথাটা কেউ সাহস করে গ্রহণ করেনি।

তা হলে আত্মা শুধু নির্গুণ নির্লেপ নন—একসঙ্গে ইনিই সব শক্তির পরিচালক এবং নির্গুণ। যেখানে ইনি এইরূপে একসঙ্গে পরিচালক, সেখানে ইনি ঈশ্বর; আর যেখানে একটি একটি—ক্ষণে ক্ষণে অনুপ্রবিষ্ট বলে মনে হচ্ছে, সেখানে জীব। তোরা মাথা ঘামাতে যাবি না। মাথা ঘামাবার রাস্তা এ নয়। এই তত্ত্বে চক্ষু পড়লেই হল। আমি আর কিছু জানি না, খালি দেখছি, একজন রয়েছেন—যিনি নিজের দ্বারা নিজেকে জানছেন। তিনিই আবার বলছেন,—"হন্তাহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ।" সে তিন দেবতা—অধিভূতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, অধ্যাত্মে বাক্ প্রাণ মন, অধিদৈবে নাম রূপ কর্ম্ম। তা হলে সত্যি সত্যিই "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম-হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।" তোমার আমার বলে আর কিছু নেই। এ সব যে স্বয়ং-ভগবান্—স্বয়ং-ভগবতী। এ সবকে স্বয়ং-ভগবতীরূপে দেখবি। ভগবতীকে পেয়ে ভগবতী দেখা নয়, তাঁকে খুঁজে বার করা নয়—'ভগবতী' দেখে ভগবতী-

প্রাপ্তি। এই পাওয়াকে একেবারে তামসিক ক্ষেত্র পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে, তবেই প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা হল। ওখানে গিয়ে পড়লুম—তার নামই ব্রাহ্মী স্থিতি। ভগবতীকে পেয়ে তবে খুঁজবি; তাই ঋষি আগে 'দ্রষ্টব্য' বলে, তার পরে শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য বলেছেন। ঋষি ভুল করে আগে 'দ্রষ্টব্য' কথাটা বলে ফেলেছেন, তা নয়। "আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" আত্মা আগে পতি-কামনা ফুটিয়েছেন, তবে পতি প্রিয় হয়েছে। বস্তু পেয়ে বস্তুকে জানার মত ব্রহ্মজ্ঞান নয়— "বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ।" বিজ্ঞাতা হয়ে চলে চলে ব্রহ্মকে জানতে হবে। সর্ব্বত্র বিজ্ঞাতার গতি নিতে হবে— বিজ্ঞেয়ের নয়। আমার মড়া মন বিজ্ঞাতাকে আড়াল করে নিজে এক বিজ্ঞাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মননের চেহারা মন ধরে, প্রাণনের চেহারা প্রাণ ধরে। এ-সবকে খালি বিজ্ঞাতার গতি বলে দেখতে হবে। এই বীর্য্যই হল আত্মবীর্য্য—আত্মবিক্রম। তোদের ব্রহ্মে প্লাবিত করে দেব; তোরা খালি শ্রদ্ধাবান্ হ। গভীর আন্তরিকতার সহিত বুঝে নে। একে না নিলে তোরা নিজের জীবনকেই অবহেলা করবি। এঁকে আদর করে নিলে, ফল ফুল প্রভৃতি তোদের যে সব সংস্কার, তার কোনটাই মড়া হয়ে আসবে না, সে সবের আকারে আত্মদেবতাই আসবেন। সহস্রার থেকে সুধা ঝরে বলে যোগশাস্ত্রে যে কথা আছে, সে এই আত্ম-বিদ্রাবণ-রস।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, মা কি ভাবে এক দিকে পশুকে

মারছেন, এক দিকে সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াচ্ছেন; দুই-ই সমান ভাবে করছেন। তোমরা দেখছ না, মা কেমন করে মর্দ্দন করছেন? এই যে সব প্রকাশ হচ্ছে, এতে তোমাদের জীবত্ব একেবারে মর্দ্দিত হচ্ছে না?

২৪এ মার্চ্চ, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার।

কালকে যে আত্মতত্ত্বের কথা বলছিলুম, সে কোন্ ভূমি? সে ভূমি পরমাত্মভূমি বা পরমেশ্বরভূমি। সে ভূমি ঈশ্বরভূমি নয়, রুদ্রভূমিও নয়। ঈশ্বর-ভূমি হল সেই ভূমি—যাতে সংস্কার ব্যক্তাব্যক্তভাবে আছে। চেতনাই চেতনাকে দেখছেন, এই হল পরমাত্মভূমি। আর যেখানে সংস্কার ব্যক্ত হচ্ছে, অব্যক্ত হচ্ছে, সে ঈশ্বর-ভূমি। শক্তি যেখানে আত্মত্বে পর্য্যবসিত, সে পরমাত্মভূমি। কার্য্য এবং কারণ, এই বৈশিষ্ট্য যেখানে ফুটেছে, সে ঈশ্বরভূমি। পরমাত্মদর্শনের দ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হয়, ঈশ্বর-দর্শনে মহিষাসুর বধ হয়, আর ক্ষর পুরুষ দর্শনে মধুকৈটভ বধ হয়। মধু-কৈটভকে মারলে ঈশ্বরে উঠলে। ঈশ্বরে উঠলে তখন মহিষাসুর বধ্য হল। সংস্কার বধ করলে পরমাত্মভূমিতে উঠলে।

তোমরা যদি জাগতিক স্বার্থের দিক্ থেকে চোখ সরাও, তবে নিঃস্বার্থ হয়ে আত্মবোধে থাকবার, তাঁকে ভাল করে

ফোটাবার জন্য যা শিখেছ, তাই-ই যথেষ্ট। চোখে, মুখে, নাকে, কাণে যিনি একান্ত প্রত্যক্ষ, তাঁকে যা বলে নিচ্ছ এবং যিনি বলে এখনও নিতে পারনি, আমার সমগ্র অস্তিত্বই ত তদন্তর্ভূত—এমনই তিনি। নিঃস্বার্থ ভাব হওয়া হল—মেরুদণ্ডে বা অস্মি-জ্ঞানে প্রবেশ করা; আত্মবোধে উন্নীত হবার এইটিই রাস্তা। আমি যে ভাবে জীব সেজে রয়েছি, সে একটা অনিত্য ভাব, বস্তুতঃ আমি কখনই এরূপ নই, আমি ঐরূপ, এই কথা বললেই বিষয়বুদ্ধি আপনা থেকে সরে পড়ে। আত্মা একান্ত নির্গুণ নির্গুণ, ইত্যাদি কথা বলে বলে সর্ব্বনাশ হয়েছে। ঐ চক্ষু দিয়ে তাঁকে কেউ দেখেনি—"ন তু তদ্‌দ্বিতীয়মস্তি।...ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ।" এই ভগবতীই প্রত্যেকের চিন্ময়ী আত্মরূপিণী, ইনিই দ্রষ্টা। কিন্তু ইনি যেখানে পরমরূপে অবস্থান করেন, সেখানে ইনি দেখেও দেখেন না। কেন না, সেখানে দেখা প্রতিফলিত হবার মত দ্বিতীয় কিছু থাকে না। দৃশ্য না থাকায় দর্শনক্রিয়া বন্ধ থাকতে পারে; কিন্তু তাতে দর্শন-শক্তির বিপরিলোপ হয় না।

দর্শন, শ্রবণ মনন ইত্যাদি শক্তি যাঁর স্বরূপ-ধর্ম্ম, তিনিই হলেন আত্মা। এই কথা তোমরা কখনও ভুলিও না। এখন তিনি দেখছেন না বলে তাঁতে দর্শন-শক্তি নেই, তা নয়। ভগবতী বলতে আরম্ভ করলেই ভগবতী এসে দাঁড়াবেন—ভাববার চিন্তা করবার আর অবসর নেই। ভগবতী মানে কি? দর্শন, শ্রবণ, বিজ্ঞানন, এই সমস্ত এবং আপনার দ্বারা আপনাকে জানা, এ

সকল তাঁতে নিত্য সুপ্রকাশ। খালি বিষয়-বিমূঢ়তার জন্য নিশ্চয়রূপে ভগবতী বলা সম্ভব হচ্ছে না। নতুবা গুরুর জ্ঞান লাভ করে ভগবতী-লাভ হল না, এ হয় না। বিষয়-লিপ্সা কথাটার মানে কি? আত্মবীর্য্য-লিপ্সা। আমার আত্মা সর্ব্ব-ব্যাপী—এই দেখবার লিপ্সা। সেটা ফুটতে পারছে না—তাই সেই বীর্য্য-সংগ্রহের, সেই বীর্য্য-প্রাপ্তির ইচ্ছাই বিষয়-লিপ্সা আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতং।" আত্মজ্ঞানই বীর্য্যময় জ্ঞান—এতে পরপদলেহনতা মোটেই থাকবে না। ইনিই যদি বরদা ধনদা, বিদ্যাদাত্রী হন, তবে আর অন্যের কাছে কেন যাব? এঁকে ভাল করে জানতে পারিনি বলে আমরা অন্যের কাছে দৌড়াদৌড়ি করি। আত্ম-জ্ঞানের লক্ষণ কি? নিজের দ্বারা নিজেকে যেখানে জানা যাচ্ছে। আমার ভিতর এমন কোন্ ভূমি আছে, যেখানে এই উপলব্ধি হচ্ছে? ইনি শ্রোতা—সুতরাং কর্ণমূলে ইনিই নিহিত। ইনিই স্প্রষ্টা—সুতরাং আমার সব স্পর্শ-শক্তির মূলেই ইনি নিহিত। ইনিই বলছেন,—"আমায় ভগবতী বলে দেখ—আমি খালি তোর বাড়ীর রাঁধুনী বামনী নয়।" এঁকে ছাড়া আর কাউকে ছুঁয়ে এই-রকম রস পাব? আহাহা! নমো নমঃ। আমি নামে জৈব জিনিষ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এঁকে "তুমি ভগবতী" বল। দেখবে—এক মুহূর্ত্তে তুমিই তাই হয়েছ। আহাহা! 'আমি'র ক্রন্দন আছে। 'আমি'র সারাংশ ভগবতী হলে এ 'আমি' ভূতের মত পড়ে থাকে কেন, ক্রন্দন করে কেন?

সংস্কার ও স্থিতিশীলতা থেকে কর্ম্ম ও স্থিতিশীলতা আসে। তাই এক মুহূর্ত্তে 'ভগবতী' বলে ডেকে, পর-মুহূর্ত্তে আবার কেঁদে মরি। সেই সময় বলবে,—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি"। রুদ্র অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সংস্কার, বসু-দেবতা অর্থাৎ বিশ্বের ভাব বা status এবং আদিত্যাদি বিশ্বদেবতা,—এই তিন-রূপে অর্থাৎ রুদ্ররূপে, বসুদেবতারূপে এবং কর্ম্মদেবতারূপে আমিই বিচরণ করছি—এই তিন-রূপে আমিই সেজেছি। যে ভাবে বা statusএ আমি অবস্থান করছি, তাই বসুত্ব। এ প্রতিষ্ঠা যদি দিতে পারি, তবে আর মড়া আমি বেরোবে? সেটা সহজেই উবে যাবে। এ খালি জ্ঞান-তত্ত্বের কথা নয়—সকল বাদেরই সার সাধন-তত্ত্ব। ভক্তির পরাকাষ্ঠা ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না ডাকতে গিয়ে তাই হয়ে যাবে। যতক্ষণ যুক্ততা এবং ঐক্য না হবে, ততক্ষণ যোগীর যোগ হবে না। আমাদের রাস্তা হল বাক্। কথা কইব, আর মায়ে চলে যাব। তাঁতে ভক্তি ও জ্ঞান থাকতে পারে; কিন্তু রাস্তা হল ঐ—কথা কইব আর তাঁতে পৌঁছব। এ ভিন্ন আর আমাদের সাধনা নেই। গুরু জ্ঞান দিয়েছেন অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান ও বাক্‌বিজ্ঞান বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই দুই বিজ্ঞানের দ্বারা সাধনা এত সহজ হয়ে গেছে। এই বাক্‌বিজ্ঞান কি শুধু বীর্য্য-প্রকাশ—না ভগবানে আত্মদান? এই হল প্রকৃত আত্মদান—আত্মবর্ণে বর্ণিত হয়ে যাওয়া। 'রুদ্রেভিঃ'—এখানে, 'বসুভিঃ' সমগ্র স্থূল শরীরে, 'বিশ্বদেবৈঃ' চক্রাণি তথা ইন্দ্রিয়াণি। আহাহা! "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" হর হর,

ভগবতি! আকাশে পাতালে যাস না। অধ্যাত্মভূমিতে চোখ দিয়ে রুদ্রভূমি, বসুভূমি ও বিশ্বদেবভূমি দেখ। ক্ষুধার কথা মনে পড়ে গেল? অহং অন্নপূর্ণা। রোগের কথা? অহং বৈদ্যনাথঃ। তৃষ্ণার কথা? অহমেব বরুণঃ। আহাহা!

এ রসে সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা উঠছে। ভাল জিনিষ, রুচিকর, এরই নাম হল পরাভক্তি। চেখে, খেয়ে যে ভক্তি, সে হল স্বতঃসিদ্ধ। এ তত্ত্ব কি নতুন তৈরি হল—না, ইনি আছেনই, শুধু তাঁতে আমার চোখ পড়ল, আর ভগবতীতে এসে পড়লাম। এই হল সার কথা। এই কয়টা কথায় চোখ রাখলে, তাকে আর গুরুর বাড়ী যেতে হয় না। তাই এই কয়টি কথা বড় দামী জিনিষ। তোমরা যখন তাঁকে ভাবতে যাও, তখন তার একটা না একটা জায়গায় দোষ থেকে যায়; তাই তাঁকে হারিয়ে ফেল। শরীরে ভগবতী বাস করছেন, না ভগবতীতে শরীর বিধৃত রয়েছে। ভগবতী আমার সর্ব্বস্ব। জয় মা! পূর্ণ হয়ে যা—তোরা সব পূর্ণ হয়ে যা। নিঃশঙ্কচিত্তে একাগ্র-ভূমিতে চল—একচক্ষু হয়ে চল। আমি আবার ভগবান্ হলাম, মনে এ সব সন্দেহ আসতে দিও না। একটা পাতলা খোলার মত ভগবানে এই জীবত্ব আটকে আছে। মুহূর্ত্তে খালি বাক্যের দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে ফেলা যায়। নমো ভগবতি, নমঃ।

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি"—এই হল গোটা চণ্ডীর প্রাণ। জ্ঞানে এই জিনিষ থাকলে তবে না মধুকৈটভ-বধ হবে। অধ্যাত্ম-, ব্রহ্মাণ্ডে আগে ভাল করে মায়েতে বসে নাও; পরে বাহ্য দিকে

যেও। এখনই বাইরে যেতে গেলে এ বিজ্ঞান হারিয়ে যাবে, কেটে যাবে। এর সঙ্গে রসবান্ না হলে পরাভক্তি হবে না। এ কি মাকে আস্বাদন করে করে যাওয়া, না কাণার মত যাওয়া? মাকে কত আড়ালে রাখবি রাখ না—কতক্ষণ আড়ালে রাখতে পারবি? অন্ততঃ আমার সামনে ত নয়। চোখে, মুখে, নাকে হাসি ফোটে? নমো নমঃ।

আমাদের অনেক মুদ্রা-দোষ আছে। যে সময় মাথা ঘুলিয়ে যায়, অমনি মাথা চুলকাতে আরম্ভ করি। যেই দেখবে—মাথা চুলকোচ্ছে, অমনি তোমরা জানবে—অস্থিরতার ঘরে ঢুকেছ—মাকে খোঁজাখুঁজি করতে আরম্ভ করেছ। আমি কি মাথা চুলকবার কিছু রাখলুম? তোরা খেতে পাচ্ছিস? বাইরে গিয়ে 'আমার কিছু হয়নি' এ কথা আর বলবি? এ জগতে মূল্যবান্ যদি কিছু থাকে ত সে চেতনা, ভূত নয়। সেই চেতনাতে যদি শ্রদ্ধা এসে থাকে, তবে ভগবতীর ঘরে ঢুকে গেছিস। যতক্ষণ ঢোকা না হয়, ততক্ষণ আজ্ঞে আজ্ঞে করিস, বাইরে থাকিস।

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" বিশ্বের যেখানে যাবে, সেখানে এই তত্ত্বই দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেখানে এই ভাষাই নির্গত হচ্ছে। ইস্! ওঁম্—আহাহা! চিন্ময়ীর এ কি পরম প্রকাশ? পরমেশ্বরী-প্রকাশ! ভগবতি, ভগবতি, প্রসীদ। মার মার—মধুকৈটভ মার। সে অতি সহজ। বিষ্ণু জাগলেই, আত্মার ব্যাপ্তিত্ব দেখলেই সে মরে গেল। মাকে নিজের হাতে কিছু করতে হয় না। বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গলেই হল।

বিষ্ণুর উদয়ে জীব কি ক্রন্দন তোলে, চণ্ডীতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনি বিষ্ণু উঠলেন, মধুকৈটভ বা জীবত্ব অমনি অব্যক্ত হতে চাইল। সে বললে,—"আমায় এমন জায়গায় মার, যেখানে জল নেই।" বিষ্ণু বললেন,—"আচ্ছা, আমার বুকে মর।" আত্মত্বের কোলেই মধুকৈটভের বিনাশ। গঙ্গা এমন পতিত-পাবনী—তৃষ্ণা যায় এবং মোক্ষ হয়। তেমনি মায়ের হাত থেকে খেলে ভুক্তি হবে, মুক্তিও হবে। এতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। যদি সর্ব্ববিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাস, তবে গুরুতে বিশ্বাসবান্ হ—শ্রদ্ধাবান্ হ। আমি বলছি না যে, শুধু পরকালের সুখ পাবি। এ কালেরও দড়ি খুলে দিয়েছি। "ভুক্তি-মুক্তি-প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" আহাহা! "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

স্বর্গ যদি ভগবতীর বাসস্থান হয় ত এ দেহ স্বর্গ—কৈলাস—বৈকুণ্ঠ—ব্রহ্মলোক নয়? "অত্র মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" মা দাঁড়াবেন—দাঁড়াবেন, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে দাঁড়াবেন।

আজ যথেষ্ট খাইয়েছি। আজ আর না—কেমন? খুব খেয়েছ। সবাইকে বামুন করে দিলাম। এই ব্রহ্মবীর্য্য—বাক্‌বীর্য্য লাভ করা—এই হল বামুন হওয়া। সত্য সত্যই ভগবতী সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, তোরা এ কথার পূর্ণ তাৎপর্য্য নিতে শেখ। "অর্ক-জ্যোতিরহং শিবঃ"—এই দর্শনটা ভাল করে ছিল না বলে বামুন হতে পারছিলি না। এই হল গায়ত্রীর শাপোদ্ধার-মন্ত্র। নিজত্বে

আবাহন না করলে কোনও দেবী আসবেন না, কেউ বর দেবেন না। আত্মা কিরূপ মহীয়ান্—তাঁর সেই পরমেশ্বরীত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

২৫এ মার্চ্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার, সন্ধ্যা।

কি অদ্ভুত তত্ত্ব। এই যে স্থূল জীবন, যা নিয়ে মানুষ ঘরকন্না করছে, তার পাশে যদি ঐ তত্ত্ব স্থাপন করা যায় ত কি প্রভেদ হয়ে যায়! ভগবান্ সঙ্গে আছেন, এই কথা ঠিক হলে সব বদলে যায়। অঘাসুর সর্পমূর্ত্তি ধরে যখন শ্রীকৃষ্ণকে মারতে গেল—সে সাপটার মুখ এত বড় যে, পর্ব্বত-গহ্বর মনে করে রাখাল-বালকেরা তার মধ্যে ঢুকে গেল। শ্রীকৃষ্ণও তাতে ঢুকেছেন জেনে সাপটা যখন মুখ বন্ধ করতে গিয়ে নড়ে-চড়ে উঠল, তখন ছেলেরা ভয় পেলে। তার মধ্যে একজন বললে,—"কৃষ্ণ রয়েছে —ভয় কি?" যতক্ষণ পর্য্যন্ত শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ কথা বলে ওঠা সম্ভব হয় না। একটা আধটা ঘটনায় হয় ত বলা হতে পারে, কিন্তু পূরামাত্রায় হয় না। মধুকৈটভের কোনও সৈন্য-সামন্ত বা সেনাপতি ছিল না—শুধু মধু আর কৈটভ। মহিষাসুরের সর্ব্ব-প্রথমেই সৈন্যবধ, তার পরে মহিষাসুর-বধ। শুম্ভ এবং নিশুম্ভের অনেক অনেক সেনা ও সেনাপতি ছিল। এক এক সেনাপতি এক এক দিন গিয়ে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের ভীষণতা

দেখিয়ে তবে মরেছে। কর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হলে পরও এমন কতকগুলি জিনিষ অবশিষ্ট থাকে, যেগুলি জীবত্বকে সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে রাখে; সেইগুলিকে মারাই হল শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি-বধ। "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" কাল তিনটি গ্রন্থির কথা বলছিলুম—এক রুদ্রগ্র ন্থি, এক হৃদয়গ্রন্থি, এক ব্রহ্মগ্রন্থি। জীব যখন সত্যই "অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরামি" এই জ্ঞানে উজ্জীবিত হয়, তখন তার ভিতর ঐ তিন গ্রন্থিই লুকান থাকে। কর্ম্মই হল হৃদয়গ্রন্থি। এ সব শিখে কি হবে? তোদের আর এ চক্রে ফিরতে হবে না। আত্মাদেবী হলেন আত্মার প্রকাশ; আত্মশক্তি বাক্ ছাড়া আর কিছু নয়। বাক্-শক্তিই একমাত্র শক্তি, যা এই বিশ্বের ভিতর সর্ব্বত্র লীলায়িত। আমাদের চেতনভূমি শুধু কথা পরিচালনার দ্বারা বদলে যাচ্ছে, সাময়িক ভাবে এ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা ভগবানের আরাম বা প্রকাশ-শক্তিই দেখছি—কিন্তু যাঁ থেকে প্রকাশ হচ্ছে, তাঁকে দেখছি না। যদি আমাদের ভৌতিক বাধা না থাকত, যদি জ্ঞানময়ত্বেরই আমরা ভোক্তা, এই কথা জানতুম, তা হলে এই দেবীর মহিমা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারতুম। কিন্তু আমরা ভৌতিক জীব বলে ব্যাবহারিক জীবনে এ দেবীর কার্য্যকারিতা অল্পই দেখি। অথচ দেখেছি, যারা এ জীবনকে তুচ্ছ করে, ভগবান্ নামে এক সার তত্ত্বে প্রবিষ্ট হতে চেয়েছে, তারা এঁতেই প্রবিষ্ট হতে চেয়েছে। কাজেই যথার্থ জ্ঞান-পিপাসু বা মুমুক্ষু পুরুষের এই চোখ ফোটা আর জীবনের সার্থকতা লাভ করা, এ

একই জিনিষ। সুতরাং আর জন্মাতে হবে না, এ কথা ঠিক ; যদি আবার জন্মান জীবনের কি ব্যর্থতা, না জন্মান কি সার্থকতা, এই বোধ বেশ জেগে থাকে।

ব্রহ্মের তিনটি অন্ন—বাক্, প্রাণ, মন। দেবতাদের দুটি অন্ন—বাক্ ও মন। জীবের একটি অন্ন—প্রাণ অর্থাৎ কর্ম্ম। আসল কর্ম্ম হল অনুভূতি। প্রকৃত কর্ম্ম হল অনুভূতি-ক্ষেত্রে। হৃদয়ের ভিতর যা চলাচল করে, যে ভাবে আলোড়ন চলে, তাই হল কর্ম্ম। কর্ম্মফল নির্ভর করে অনুভূতির উপর। যখন কর্ম্মে কর্ম্মে ভগবান্‌কে দেখছ—ভগবদনুবোধ হচ্ছে—সেই-ই হল প্রকৃত কর্ম্ম। ভিতরে ভগবদনুভূতি থাকলে বাহ্য কর্ম্ম ছাড় বা রাখ, তাতে কিছু আসে যায় না। আত্মা এবং আত্মার জ্ঞান-ক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে অন্তরে অনুভূত হচ্ছে। কর্ম্মের ভিত্তি কোথায় ? ভগবান্ কেন কর্ম্মকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলেছেন ? "যেখানে আমি জ্ঞানশক্তি ও আত্মশক্তিরূপে প্রকটিত হয়েছি, সেইখানেই জগৎ-প্রকাশ হয়েছে।" এই হল কর্ম্মভূমি, যজ্ঞ-ভূমি। প্রত্যেক কর্ম্ম ব্রহ্ম-দর্শনময় হওয়াই মুক্তি। ভাবে জাগ্রদ্‌বৎ, অভাবে সুপ্তবৎ, মুক্ত পুরুষের এই দুই লক্ষণ। মুক্তি মানে, বাহ্য কর্ম্মের বাইরে চলে যাওয়া নয়। সে মুক্তি যখন ঘুমাই, তখন রোজই হচ্ছে। এখন জ্ঞান ও কর্ম্মকে সমুচ্চিত করতে হবে। আত্মা ও জ্ঞানক্রিয়া একসঙ্গে যুগ্মভাবে হৃদয়ে ফুটে ওঠার নামই জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়। ঐখানে সকল কর্ম্মই ব্রহ্মযজ্ঞ—জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়ও ঐখানে।

জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়—এটি হল বিধি। নানা সময়ে নানা জনে এর নানারকম ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু এ বিধি কেন প্রতিষ্ঠিত হল, কোন্ আদর্শকে অনুধাবন করা এ বিধির উদ্দেশ্য—এই সব কথা কোথাও নেই। তোমরা দেখ, সব পুরাণই ভগবান্‌কে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছে—শিব-শক্তি, হরি-হর, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ। এই বিভাগ শুধু জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়কে পরিস্ফুট করে দেখাবার জন্য। এই রহস্যের আবিষ্কার—এ মায়ের কত বড় দান। আরও দেখ,—"অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন-সম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" কর্ম্ম কোথায়? যজ্ঞই যদি কর্ম্ম হয়, তবে 'যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ' এ কথার দাম কি? কোন্ কর্ম্মকে লক্ষ্য করে 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি' এ কথা বলা হয়েছে? ব্রহ্ম কাকে বলে? আত্মজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞান, এই দুই জ্ঞানকে দেখতে পেলেই বাহ্য বিশ্বকে ঠিক দেখলে। 'ব্রহ্ম অক্ষরোদ্ভব' এ কথায় কোথাকার কর্ম্মকে বুঝাল? কর্ম্মের ফলাফল নির্ভর করে অনুভূতির উপর—কর্ম্মের বাহ্য অংশের উপর নয়। সুতরাং কর্ম্ম হল অনুভূতিময় বা হৃদয়ময়। যেখানে আত্মজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞান, এই দুই জ্ঞানের মিথুন হচ্ছে, ফল-সকল হল তারই সন্তান-সন্ততি। বেদান্ত বা শ্রুতির ভাষ্যকারদের এ চক্ষু নেই।

ব্রহ্মজ্যোতি বা পরমাত্মজ্যোতি কি? বাক্। এ জ্ঞান নেই, অথচ চণ্ডীর ভাষ্য হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রকারেরা কোন্ তত্ত্বকে

লক্ষ্য করে ঐ সব শাস্ত্র করে গেছেন, সে তত্ত্বের দিকে চোখ পড়ল না, অথচ গ্রন্থপ্রচারে জগৎ ছেয়ে গেল! অধ্যাত্ম ভূমিতে তোমরা এখন এর গুরুত্ব দেখ।

মধু-কৈটভবধ দেখালুম। এতে তোমরা মধুরও পরিচয় পেলে না, কৈটভেরও নয়; যিনি এদের মেরেছেন, তাঁর ত নয়ই। তোমরা কত পুরোহিতকে ঘণ্টা বাজিয়ে চণ্ডী পাঠ করার জন্য টাকা দিয়ে এলে। কিন্তু আমি যে জ্ঞান দিলুম, এর মূল্য কোথায়? তোমাদের বুকের ভিতর থেকে, এদিকে যাব, ওদিকে যাব বলে যে সর্ব্বদা ছুটোছুটি করছে, তাকে মার। তার মানে, তাকে ভগবতীতে মিলিয়ে দাও—তাঁতে সমর্পিত করে ছেড়ে দাও। রূপের জন্য লালায়িত আমার চোখ, তার সমগ্র অস্তিত্ব গুটিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি রূপ দেখবার জন্য সজাগ হয়েছি। এমন সময় গুরু বললেন,—"যশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" যিনি চক্ষুর চক্ষু, তাঁর এত তেজোময় রূপ; এই রূপকে ছেড়ে আমি বাইরের সামান্য রূপ দেখতে যাচ্ছি? এতে কোন্ অসুর হত হল? মহিষাসুর। এইরকম রূপে, রসে, গন্ধে, কামে,—যে দিক্ থেকে দেখ, তাতে ভগবতীকে পাওয়া হল এবং মহিষাসুর বধ হল। "যশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ"—ইনি কে? এই যিনি নিজেকে নিজে জেনে 'অহং রুদ্রেভিঃ' বলে সহস্রপাদ, 'সহস্রশীর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর আমার রূপ দেখবার চেষ্টায় ফুলের দিকে, রস আস্বাদনের চেষ্টায় ফলের দিকে, ভালবাসার চেষ্টায় পুত্রের প্রতি ধাবমানতা থাকবে? তুমিই! ভগবতী তুমি! এর নাম

হল মহিষাসুর-বধ। এ তত্ত্ব কোথাও পেয়েছিলি? কোনও ব্রাহ্মণ তোর কাণে ঢুকিয়েছিল? এ শুধু শুনতেই বেশ নয়—এতে বাহান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে! তার পর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ পড়ে আছে। মধুকৈটভ ও মহিষকে যদি বশে এনে থাক, বিপদে পড়ে পড়ে দশ বিশ বারও যদি এদের বধ করে থাক, তবে গুরুর কৃপায় সংস্কার-ভূমিতে এসে পড়েছ—দুর্গা দাঁড়িয়েছেন।

এখন কে কে বধ্য আছে? সংস্কার। ও বাবা! অনাদি-কালের সঞ্চিত কি সব আছে, তাদের মারা—বাপ্ রে, সে কি ভয়ানক জিনিষ, ও গহ্বরের কি ব্যাপার! অন্য দুটোকে না হয় চেষ্টা করে মারলাম। কিন্তু ও কি ভয়ানক! আত্মা জ্ঞান-দানের জন্য ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছে—কাকে এ জ্ঞান দিয়ে প্রাণটা জুড়াই! বুকের বিনিময় ছাড়া কি এ জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়? আমাকে শ্রদ্ধা কর, এ কথা বলাও যা, আর যে শ্রদ্ধার উদয় হলে এ জ্ঞান ফলবান্ হবে, এ দুই-ই এক কথা।

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পথে চলতে গিয়ে প্রথমেই দেখলুম—সেনাপতি ধূম্রলোচনের বধ হল। ধূম্রলোচনের বধ, আর ধূমাবতীকে পরাভূত করা, এ দুই-ই এক কথা। মধুকৈটভ ও মহিষাসুর যে অবস্থায় মৃত হয়, সে অবস্থায় জীবের চোখ খুলে যায়। যখন দশভুজাকে দেখলুম, তখন কি চক্ষু খুলল? জ্ঞানচক্ষু। ভৌতিক জগৎ ও তন্মুখে আমার ধাবমানতা যখন বন্ধ হল, তখন আমি কোন্ সত্তায় দাঁড়ালাম? জ্ঞানময় সত্তায়। অন্তর এবং বাহ্য সত্তাতে পার্থক্য কি? জ্ঞানময়ত্ব এলেই অনন্তত্ব আসবে। তখন

ক্ষুদ্র দর্শন, জীবভাবীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বানুভূতি কাটিয়ে উঠে দেখব অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত। দেবী তখন দশভুজা নন, অনন্ত-ভুজা। অনন্ত রূপ রস গন্ধ এইখানেই সব প্রাপ্তব্য। এতে নিজ আত্মত্বের একটা আনন্ত্যের আভাস এল। তাতে ভৌতিক ধূম কেটে যায়, জ্ঞানাগ্নি দীপ্তিশালী হয়। মধুকৈটভ-বধে—মহিষাসুর-বধে যদি তুমি দুর্গাকে দেখে থাক, তবে তুমি জ্ঞানে আস্থাসম্পন্ন হয়েছ। জ্ঞানতত্ত্বেতে আস্থাসম্পন্ন হওয়ার প্রধান লক্ষণ কি হবে? কোন্ ভাব তখন প্রধান হয়ে খেলা করবে? অন্তর্বাহ্য-বোধ তিরোহিত হয়ে যাবে—অন্তর্বাহ্য-বিভেদ লোপ হবে—অন্তর্বহি বিভাগ কেটে যাবে। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হলে এই হবে না? স্বভাবতই হবে। গুরুর অপূর্ব্ব আরাধনা! তিনি এখানে মায়ের যে মূর্ত্তি দেখলেন—যে মূর্ত্তিতে অন্তর্বাহ্যের একীকরণ হল, তিনি হলেন—"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।" কি দর্শন! এ কার ধ্যান? চামুণ্ডার। "যস্মাৎ চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥" চণ্ডমুণ্ড বধ করে এসেছেন বলে চামুণ্ডা নাম হল। শক্তি ও আত্মতত্ত্ব দেখার কথা বলেছি। বাহ্য যখন গ্রসিত হয়ে অব্যক্ত হয়েছে—যখন শক্তিতত্ত্ব দিয়েই যেতে থাকবে, তখনই দেখবে, বাহ্যের প্রকৃত কি অবস্থা। আত্মা ত আছেনই—তিনি এখন তাঁর কোন্ মহিমা বিকাশ করে আছেন? সব জায়গায় আত্মা বললেই ত চলত। শক্তিত্বের কি বিপর্যায় হল না হল, তা দেখবার দরকার কি? দরকার এই জন্য যে, আত্মত্ব জীবের

ভিতর একরকম, দেবতার ভিতর আর একরকম। ধূমাবতীতে থেকে আত্মাকে দেখলে এইটুকুই পাবে। তোমার বুদ্ধি তখন আত্মস্থ অংশ ছাড়া অন্য অংশে আব কি মূর্ত্তি ধরে আছে? ধূমাবতী মূর্ত্তি। এই ত পাঁচ মিনিট আগে 'কি খাই, কি খাই' বলে ছুটেছিলে—এখন একটুক্ষণ নিরস্ত হয়েছমাত্র। এইরূপে প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তুমি যে উন্নীত হবে, সে কোন্ দেবশক্তির ক্রিয়া-প্রভাবে, তা না জানলে, সেখানকার আত্মা সেই-রকমে উজ্জ্বল হবে না। এখানে যদি ধূমাবতী হয় ত ওখানে তার উপর শক্তিত্বের যতটুকু প্রকাশ হবে, তা পাবে। "যশ্চক্ষুষচক্ষুঃ" ইত্যাদি দেখে, মহিষাসুরকে মেবে ফেলে, বাহ্য ও অন্তর একাকার হয়েছে। তার মানে, বাহ্যনামীয় সবটাই যে অন্তরে রয়েছে, এ তুমি দেখেছ। এর নামই "দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা"—বাঘছাল-পরা। দেবী বাহ্যকে গ্রাস করলেন; এখন সমস্ত বাহ্য তাঁর গায়েতেই আচ্ছাদনরূপে অবস্থান করছে। এর নাম হল—"দ্বীপিচর্ম্ম-পরীধানা।" রূপ রস ইত্যাদি বাইরে যা কিছু ছিল, এখন সে সব দেবীরই অঙ্গে সংস্থিত। এইরূপে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মহিষাসুর বধ করে দেখেছ যে, বাহ্য তাঁরই গায়ে রয়েছে। এখন দেবী করালবদনা হয়ে বাহ্য গ্রাস করেছেন। সবই তাঁতে পড়ে রয়েছে, কিন্তু এখনও সে সব ভোগ করতে পারছ না। তাই শুষ্ক মাংসই খাচ্ছ, কিন্তু তাতে রস পাচ্ছ না। সংস্কার পাল্টে গিয়ে যতক্ষণ না বলে উঠবে যে, এ-সব বাইরে নয়—জ্ঞানেই অবস্থিত, ততক্ষণ রস পাবে না। পূর্ণমাত্রায় যখন সংস্কার

বদলাবে, তখনই রস পাবে ; এখন শুকনো খাচ্ছ। এখানে শব্দ ছাড়া আর কিছু ফুটছে না, তাই দেবী "নাদাপূরিতদিঙ্-মুখা"। জ্ঞান মানে কি ? শব্দভূমি, নাদভূমি। তা হলে এ কোন্ শক্তি, যে অন্তর্বাহ্য গ্রাস করে আমায় এখানে এনেছে ? চামুণ্ডা-শক্তি। বাঘছাল-পরা কালী খাঁটি কালী নয়। কথার দ্বারা জ্ঞানের অদল-বদল হল ; তার মানে, জ্ঞানের ভিতর এক প্রচণ্ডা, অতি ভীষণা, চামুণ্ডা-শক্তির প্রকাশ হল—তবেই এই ঘটনা ঘটল। এই মারলুম, ঐ মারলুম, এরূপ শক্তি এ নয়। এ মাত্র কথা নয়। চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী এই উগ্রচণ্ডা কত বড় শক্তি! এক মহাশক্তি "নান্তর্ন বাহ্য" বলে তোমার বিশ্বকে গ্রাস করলে। তুমি যদি ভগবতীর দ্রষ্টা হতে ত এঁকে দেখতে পেতে। শুধু জ্ঞানভূমিতে দাঁড়ালে না বলে দেখতে পাচ্ছ না যে, এক মহাদেবী অন্তর্বাহ্য গ্রাস করে এইরূপে দাঁড়ালেন। অনেক কষ্টে চারিটি টাকা সংগ্রহ করে তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য একখানি কাপড় কিনলে। তোমার সেই কষ্ট ও আগ্রহ স্ত্রী দেখলে না। সে বললে,—"হ্যাঁ, কাপড় এনেছ বটে ; তা এ-রকম কাপড় ওদেরও আছে।" তেমনি ভগবতী যা করাচ্ছেন, তোদের যে উপদেশ দিচ্ছেন, এতে কত কি আলোড়ন করে, তবে এইটুকু ফুটছে, তা তোমরা ভাব না। 'একে বলে চামুণ্ডা', এই কথা বলে এক ঢোকে তোরা মেরে দিলি! কত জীবনের কত প্রচণ্ড চেষ্টায় আমি তোদের এতটা গেলাতে পারলুম, তা জানলে, তবে তোরা বুঝতিস যে, ভগবতীর মধুকৈটভ-বধ,

মহিষাসুর-বধ করা কি জিনিষ। মা কেমন চুপি চুপি সব করছেন—ভিতরে কি প্লাবন বইছে, তা আমাদের জানতেও দিচ্ছেন না। অথচ আমরা ভোগ করে যাচ্ছি। আধ্যাত্মিক জগৎকে পড়তে হলে এই-রকম করে দেখতে হয়, নয় ত আত্মতত্ত্বের গরিমা খুঁজে বার করতে পারবি না।

তা হলে গুরু কৃপায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, মা আমাদের ইচ্ছামাত্রে স্তরে স্তরে মধুকৈটভ, মহিষ, চণ্ডমুণ্ড—এ সবকে কথায় কথায় বধ করছেন। এর তলে একটা প্রকাণ্ড কল-কৌশল আছে। সে কল দেখবি? ময়দার কলে গম ঢালছে আর ময়দা বেরোচ্ছে। এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা যান্ত্রিক কৌশল করা আছে বলে আমরা চার পয়সা সের দরে ময়দা কিনে খাচ্ছি। সেই রকম মস্ত একটা কৌশল আছে বলে, গুরুর কৃপায় দেখছি বলে, এক জ্ঞানভূমি থেকে অন্য জ্ঞানভূমিতে এত সহজে চলে যাচ্ছিস।

যিনি এত বড় রূপান্তর নিচ্ছেন, সেই এই দেবীকে কারা দেখবে? যারা লেখা-পড়ার বুদ্ধি দিয়ে এই বিদ্যা শেখে, তারা —না, এই শক্তিত্ব যারা দেখে, তারা? ছিল ভূত—একটু চোখ পাল্টালেই দেখবে—অসুরের পর অসুর মরছে। এবার বুঝতে পারলে, কেন শক্তিত্ব দেখতে হবে? আত্মতত্ত্বের নীচে যিনি অলক্ষ্যে থাকেন আর কাজ করেন, তাঁকে না দেখে, দ্বীপি-চর্ম্ম-পরীধান জ্ঞানকে না দেখে, জ্ঞানতত্ত্বে দাঁড়িয়েছি, এ কথা বলা যায় কি? অন্তর্বহি হারিয়ে যায়নি, অথচ জ্ঞানে দাঁড়িয়েছি, এ

কথা বলা যায় কি ? না। এখনও দেবীর রসহীন শুষ্ক মাংস দেখতে পাচ্ছ, আর ইনি খালি নাদ-মুখরা, খালি শব্দময়ী। আর একটু ভিতরে ঢুকতে হবে—তখন মা রসাল হবেন। এই শুকন মা-ই রসে ভরে যাবেন। শক্তিকে দেখা যায় না, ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি পরিচিত হন। তাঁতে আত্মসংযোগ করলেই তিনি জ্যান্ত হন। এই শক্তি যদি তোমাদের ধরাতে পারি, একেবারে ঘাঁটিতে গিয়ে পড়ব। এখন শুধু নাদমুখরা—তখন 'ফল' বললেই 'ফল' পাব। একেবারে সর্ব্বসুখের আগার।

২৭এ মার্চ্চ, ১৯০৮, রবিবার।

দিনের পর দিন আমাদের এই সব আলোচনায় তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, মূলে এক জ্ঞানভূমি আছেন। যেমন ভূতসকলকে আমরা সুদৃঢ়ভাবে দেখতে পাই, তেমনি 'জ্ঞানভূমি' এই সত্তাকে দেখলে, আরও দৃঢ়ভাবে তাঁকে দেখা যায়। জড় এবং জ্ঞানশক্তি, এই দুইকে দেখবার পর দৃষ্টি যখন আরও খুলে যায়, তখন দেখি, আত্মা যে সকল জ্ঞানশক্তির দ্বারা ঘেরা আছেন, তাঁরা সব দেবশক্তি। তা হলে আমার ভিতরে পরমাত্মা রয়েছেন ও তাঁ থেকে অনন্ত দেবশক্তি ফুটে রয়েছে। সাধনা মানে, পরমাত্মা থেকে প্রস্ফুটিত সেই দেববৃন্দকে উপলব্ধি করা, তাঁদের তৈরি করা নয়। শুধু এই দেখা আর না দেখাতেই সব তফাৎ হয়ে যায়। আমার জ্ঞানে যে সব অদল-বদল হচ্ছে, তার মানে, আমি এক দেবভূমি থেকে আর এক দেবভূমিতে যাচ্ছি।

যেখানে শক্তিক্রিয়া হচ্ছে, সেখানেই একদিকে জাগরণ ও আর একদিকে মৃত্যু আছে। এক ভূমিকে অব্যক্ত করে আর এক ভূমিতে দেবতা প্রকাশ হন। "তলা" মানেই—সেখানে একটি নিধন রয়েছে। আমি যদি বলি—"পণ্ডিত," তবে পণ্ডিতের বিপরীত "মূর্খ" হল অসুর। যদি বলি "বলবান্," তবে অসুর হল "দুর্ব্বলতা"। বাক্যের সাহায্যে যে যে দেবতাকে আমি অবলম্বন করলুম, তদ্বিরুদ্ধ যে, সে মরে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তার মানে—আমি অন্ধ নই। আমাদের সকলের ভিতর, এমন কি, মাটি-জলের ভিতরও অপূর্ব্বভাবে আপনার বিরাট্ শক্তি-মূর্ত্তি প্রকাশ করে ভগবতী বিরাজ করছেন; তাঁর এই বিদ্যমানতাকে দেখাই হল পরম সাধনা। দেখা হল এমন এক জিনিষ, যে তদ্বিরুদ্ধ ভাবকে ধ্বংস না করে প্রকাশ হয় না।

মধুকৈটভকে বধ করা মানে, আত্মজ্ঞ হয়ে মাকে দেখা। মধুকৈটভকে মারবার জন্যই আত্মরূপী বিষ্ণু জাগ্রত হয়েছেন। মধুকৈটভকে মেরেই জীবভাব নিহত বা নিরস্ত হল। তার পরেই সেখানে অধ্যবসায়, কর্ম্ম বা প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে। জীব নিজে কীটবৎ ব্যবহারশীল ছিল। সেই ভাবটি হৃদয়ে আধিপত্য করায় সে দিকে তার ধাবমানতা ছিল। এই দুই ভাব বিনষ্ট হলেও চাকার বিঘূর্ণন তখনও চলে। চাকা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ইত্যাদি চাচ্ছে। সে জন্য মধু-কৈটভ-বধের পর অবলম্বন হল প্রবৃত্তি। কিন্তু উনি আত্মকাম এবং এ তৃষাতুর; তাই ওঁর বুকের ভিতরই সে সব প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা থাকবে। ইন্দ্রিয়াদি দিয়েই প্রবৃত্তির

প্রকাশ হয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে বাইরে বিষয় সংগ্রহ করে। সুতরাং মধুকৈটভ-বধের পর মাকে দশভুজারূপে দেখে, চতুর্দ্দশ করণের মূলে তুমিই রয়েছ বলে যেমন দেখলাম, অমনি জ্ঞান হল, আমার সমস্তই এইখানে আছে। এই তত্ত্বে দৃষ্টি পড়ল মানেই— মহিষাসুর-বধ হল। এ দৃষ্টি পড়া এত জোরে ও এমন ভাবে হওয়া চাই যে, বাহ্যের দিকে আর দৃষ্টি বা গতি থাকবে না। বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা যে ভাবে জগৎকে জানা এবং বুঝা ছিল, সে ভাব মরা চাই। ইহাই ধূম্রলোচন-বধ। ওকে যতক্ষণ বধ না করবে, বাহ্যদৃষ্টি যতক্ষণ রুদ্ধ না হবে, ততক্ষণ জৈব অজ্ঞানতা দূর হবে না। সুতরাং বাহ্য সম্বন্ধে যে সংস্কার, যে ভাবে জগদ্-বোধ আছে, তার বধ হওয়া চাই। কিন্তু দৃষ্টি বাঁধা আছে; গাছ, জল, সবই বাইরে প্রাপ্তব্য, এ সংস্কার দৃঢ় আছে। সুতরাং ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করে তাকে মারলে। এ আত্মদর্শন সাময়িকভাবে নয়, পাকা ব্যবহারের মত একেবারে দৃঢ় না হলে এর ফল পাওয়া যায় না। 'বাহ্য একেবারে সত্য সত্য অন্তরই', এমনি ভাবে যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ মহিষাসুর ও মধুকৈটভের আবার জেগে উঠবার আশঙ্কা থাকে।

বহির্জ্ঞান ও অন্তরজ্ঞান দুই জিনিষ। অন্তর ও বহিঃ, এই দুই জ্ঞানের নাম মুণ্ড ও চণ্ড। এখন অন্তর নামে একটা ও বহিঃ নামে একটা উপলব্ধি আসছে। এই অন্তর ও বহিঃ; উভয় দর্শন কিন্তু অন্তরেতেই হচ্ছে। অন্তরেতেই চণ্ডের প্রদীপ্ত দীপ্তিতে লাফালাফি করছ; সে কেতুর মত কোথা থেকে এল;

কেন এল, তা দেখছ না ; খালি বাহ্য, বাহ্য, বাহ্য করে ছুটছ। ওর একটা মুণ্ড আছে ; সে ও-থেকে আলাদা। এখন অন্তর যদি বহিঃ হয়, তবেই দেহটা মাথায় জুড়ে যায়। কিন্তু বাহ্য ভাবে লিপ্ত রয়েছ বলে রাহু প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে না। এখন আত্মতত্ত্ব অবলম্বন করলে তোমাব দৃষ্টি, দেহ বা বাহ্য ছেড়ে মাথার দিকে বা ভিতরে এল ; তখন দেখলে, ভিতর বলে যা মনে হচ্ছিল, ঐখানেই সমস্ত প্রাপ্তব্য রয়েছে। সুতরাং অন্তরই বাহির হয়ে গেল। এর নাম হল চণ্ড-মুণ্ড-বধ। অন্তরেই বাহ্য বিধৃত রয়েছে, এ দেখলে মায়ের বাম হস্তে মুণ্ডের মাথা জুড়ে গেল। অন্তব বল বা বাহির বল, এইখানেই সব। দেবী মুণ্ডের মাথা নিয়ে এলেন, চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন, তাই তাঁর নাম হল চামুণ্ডা। "যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥"

এখন সত্য সত্যই দেখলাম যে, আমার অন্তর ও বাহির, সমস্তই মায়ের দ্বারা, মাথার দ্বারা, সহস্রার দ্বারা বিধৃত। এই দেবীই সমস্ত বাহ্য বিশ্বের জ্ঞানকে অঙ্গের আবরণের মত ধারণ করছেন, গ্রসিত করছেন বলে তাঁর রং কালো এবং তিনি নিজে নাদমুখরা। এখানে এসে বিপুল বিশ্বকে খালি কথায় বিশ্বরূপে আমি পেয়ে গেলাম। এই ভূমিতে উঠলেই দেখবে যে, তোমার চামুণ্ডা দেবী আবির্ভূত হয়েছেন।

এইরূপে দৃষ্টি যখন পালটে গেল, তখন দেখলুম—বিশ্ব বাঙ্ময়, সবই বাঙ্ময়। তখন আমি আরও দেখি যে, অন্তরে কামনা-সকল

রয়েছে এবং তাদের জন্য অনুরাগও রয়েছে। সুতরাং অন্তরেই সেই সব ভোগ করতে বসে গেলাম। যা যা ভোগ করা অভ্যাস আছে, এইখানেই আমার সব চাই। এত সব করে এখনও ডাল চাই, ভাত চাই-ই বললাম ; পরমাত্মত্ব চাই, এ কথা বললাম না। কাম্য বস্তুরূপে চামুণ্ডার গায়ে যা যা লেগে আছে, সেই সব পাবার জন্যই চেষ্টা হল। সেই দৌর্ব্বল্য ফুটে উঠল। এ কার দ্বারা হল ? কামনা দ্বারা। সুতরাং কামনাকে না মারলে হবে না। খাবার ইচ্ছা হল—চলে যাও আবার ধূম্রে, আবার মহিষে, আবার মধুকৈটভে। আবার তাদের মারছ, আবার উঠছ। কিছু চাই না বলে গেরুয়া পরলে,—আবার নতুন সংসার তৈরি হল। এই হল রক্তবীজ। তখন মা বললেন,—"ও-রকম করে ওদের মারতে পারবি না।" একটা একটা করে পাথরে ঠুকে ছারপোকা মেরে নিঃশেষ করা সম্ভব হবে না। তাই মা তখন বললেন,—"দেবি চামুণ্ডে, তুমি বিশ্বব্যাপী করালবদনা হও। এমনি করে মুখ ব্যাদান কর, যাতে রক্তবীজের সমস্ত রক্ত তোমারই মুখে পড়ে।" ফুল ফল যা চাচ্ছে, কামনাসুর যেখানে যেখানে মাথা তুলছে, সেইখানেই দেবীর দ্বারা সে গ্রসিত হবে। রক্ত থেকেই ত আবার রক্তবীজ জন্মাবে ; তাই তুমি এমন করে হাঁ কর, যাতে সমস্ত কামনা বা রক্ত তোমারই মুখে পড়ে। ফল চাইতে গিয়ে দেখি, সেখানে মা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন ; খেতে গেলুম, পরতে গেলুম, শুতে গেলুম—দেখি যে, সেখানে সেখানেও মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি যাচ্ছি শুতে, দেখলাম—তুমি শুচ্ছ ; আমি যাচ্ছি খেতে, দেখলাম—তুমি খাচ্ছ। মা এইরূপ মূর্ত্তি ধরলে তবেই না তিনি বিশ্বগ্রাসিনী হলেন। পরমাত্মায় সব একসা হয়ে যায়। এখানে প্রতি ভূমিতে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক, এই দুই অবস্থিতি আছে। আধ্যাত্মিক হল অনুভূতি ; ভৌতিক

হল এই শক্তি-ক্রিয়া। আমি যখন "অহং ব্রহ্মাস্মি," এই বলে ভগবানের সঙ্গে একীভূত হই, তখন আমায় কে খেলে? এই মা। যে মাকে খুঁজতে গিয়েছিল, সে দেখলে যে, মা-ই আছেন; আর কেউ নেই। চণ্ড-মুণ্ড বধের পর মায়ের একটা প্রকাণ্ড হাঁ সব গ্রাস করেছে।

যদি সর্ব্বগ্রাসিনী মা তাঁর করাল মুখব্যাদানে আমায় গ্রসিত করে না নেন, তবে অন্তরেই খাব, পরব, এই লোভ আমার থাকবে; তা কখনই যাবে না। সিদ্ধির তাড়নায় আমি ভগবান্ বলতে চলেছিলুম, জৈব আত্মার তৃপ্তি অন্বেষণে ওখানে যাচ্ছিলুম। এই জীবত্বেরই একটা কৃতার্থতা-লাভের জন্য জৈব সার্থকতা অবলম্বনে যাচ্ছিলাম। গিয়ে যখন মায়েতে আমার সব গ্রসিত হয়ে গেল, তখন আমার আর কোন জৈব সার্থকতা আছে, কি না আছে, তা দৃষ্টিতে রইল না; দাঁড়ালেন শুধু বামাকালী। এখানেও সিদ্ধির সংস্কার আছে। সম্যক্ সিদ্ধি দিবার বাসনা বুকে আছে। যদিও পুত্রকে জীবত্বের বাসনার দ্বারা আর অভিভূত হতে দিব না বলে মা আমায় গ্রাস করলেন, কিন্তু তবুও মায়ের বুকে মাতৃত্ব আছে; পুত্র চাইছে, সুতরাং দিতে হবে বলে মায়ের বাসনাও আছে। এই ভূমি কোন্ ভূমির সঙ্গে তুলনীয়? যে ভূমিতে বামদেবরূপে আত্মা জাত হন। বুঝে নিয়েছি—বিষয় অন্তরেই, যা কিছু সব পেতে হবে অন্তরেই। কিন্তু এখন যে বিষয়, সে সকল মায়েতে মাতৃরূপেই পেতে হবে। জ্ঞানময় ভূমির তলায় তলায় আত্মাকে দেখে যদি বলি—আহাহা, বেশ ভোগ হল! আহাহা আত্মা! —এই জ্ঞানভূমিতে ভোগ নিহিত রয়েছে দেখে নিয়ে আত্মাকে ভোগময় বলাই যদি সীমা হয়, তা হলে তখনও জীবই রইলাম— 'বামদেব' আর বলতে পারলাম না। কিন্তু ভোগকে অপ্রধানরূপে দর্শন করে, আত্মত্বকে বা চিন্ময়ীকে-যদি আমি প্রধানরূপে দেখি,

আর ভোগের ভাব নিয়ে যদি ভোগে ডুবে না যাই, তা হলে অন্তর্বাহ্যশূন্য হয়ে যে ভূমি পেয়েছি, শুধু এই আত্মত্বেই নিমগ্ন হয়ে যাই। ভোগের পুনর্জ্জন্ম-ইচ্ছা যদি আবার ক্রিয়া করে, তা হলে বামদেব হতে পারবে না। মাকে তুমি পেলে ঠিক; কিন্তু মাকে দেখে সব ভোগ পাব, এই জ্ঞানেই তুমি রত রইলে। পক্ষান্তরে ভোগ আর চাই না—তুমিই থাক, এই বোধে যে রুচিময়, শ্রদ্ধাময়, আসক্তিময় পুরুষ জাগল, তাতে কামনার বহির্ম্মুখতা পরিবর্ত্তিত হল; এই অস্তিত্বে জীবত্বের আর বিন্দুমাত্র জাগরণ রইল না। এইরূপ ভাবে কামনাশূন্য হলে তখন মা বলবেন যে—"খা"। নিজের চাওয়া না হারালে, মা খাবার দেবেন না। এই হল এখানকার রহস্য। এই ভূমিতে কেমন করে বামদেব হওয়া যায়? বিশ্বের কোন কথাই এখানে মাথায় আসছে না—আহা, এই-ই আনন্দময়ীর সত্তা ফুটেছে যে! এই থাক্, এই থাক্, এই জ্ঞানে বিরাজ করি, এই জ্ঞানে বিরাজ করি—এইরূপ যখন হবে, তখন মা তোমায় বামদেব করবেন। আর যদি তুমি বল,—"আহা মা, তুমি এসেছ, এবার আমায় সব দাও," তখন তিনি বামদেবত্ব দেবেন না অর্থাৎ অজস্র ধারায় দেবেন না। দুটা একটা মাত্র দেবেন।

যাই থাকুন, চিত্তের যখন এইরূপ অবস্থার উদয় হল, তখনই পরাভক্তির আবির্ভাব হল—আত্মজ্ঞানে পরম শ্রদ্ধার উদয় হল; তা না হলে বামদেব দেখা হয় না। আর আমি কিছু চাই না, কোন কথাই আর আমার মাথায় নেই, খালি মা যেমন সন্তানকে আনবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করে, আমার আত্মাও এখন তেমনি করছে। মাকে এখন এই ভূমিতে কেমন করে ধরে রাখি, এতেই তখন আকুলি-ব্যাকুলি হবে। 'কিছু চাই না' বলে যত আমি নিজেকে মায়েতে মগ্ন করব, মা তত 'নে নে' বলে কেঁদে উঠবেন।

আর যতক্ষণ বলব—এই দাও, ঐ দাও, ততক্ষণ মা চলে যাবেন ও অল্প অল্প দেবেন। আর কিছু চাই না, শুধু তুমিই থাক, তুমিই থাক, এই কথা যখন বলবি, তখন মা অজস্র-ধারায় দেবেন। এই ভূমির উপরেই শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হবে। সব সংস্কাব ও বহির্ম্মুখী যত কিছু গতি একেবারে ধ্বংস হবে।

এই জ্ঞান বেশ প্রোজ্জ্বল ভাবে ফুটে থাকলেই পরাভক্তিব উদয় হবে; নয় ত এ ঘর থেকে বেবোলেই পরা-ভক্তি কেন, অপবা-ভক্তিও চলে যাবে। যখন নিজে নিজেই সঙ্কল্প আসবে যে, "হে দেবি! আজ থেকে আমার সব যাক্, খালি তুমিই থাক," তখনই চেতনার গতি মাতৃমুখে প্রধাবিত হবে। এই মূর্ত্তিতে ইনি রক্তবীজ বিনাশ করেছিলেন। আদ্যাশক্তির সঙ্গে এ মূর্ত্তির কি পার্থক্য? এখানে মায়ের এক পা শিবের বুকে এক পা সিংহপৃষ্ঠে সংন্যস্ত। এই হল সন্ধিস্থল। এ-পিঠ এবং ও-পিঠ, উভয় দিকেই যাবার ঝোক আছে। এইরূপ ভাবে কামনা যখন ফিবে গেল, মায়েব থাকাই আমার চেতনার সার্থকতা চিত্তের যখন এই অবস্থা হল, তখনও পূর্ব্বসঞ্চিত অদৃষ্ট-ভূমি এবং ব্রহ্ম তাডনায় পুরুষরূপে ফুটে ওঠবার ভূমি বর্ত্তমান রয়েছে। মা তখন কি করবেন? নিশুম্ভের সঙ্গে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, মা তখন অনন্ত অনন্ত দেবীমূর্ত্তিতে নিশুম্ভেব সামনে আবির্ভূত হলেন। শক্তির অনন্ত রূপ দিক্‌দিগন্ত ঘিরে যখন ফুটছে, তখন সে হল শক্তিব ভৌতিক প্রকাশ, আর তাকে খাওয়াচ্ছে, ভোগ করাচ্ছে অনন্ত-মূর্ত্তি জ্ঞান। যে কিছু সংস্কার ছিল, সেই সব সংস্কারই দেবতা-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হল। তখন সে দেখলে, আমার একদিকে ইন্দ্রাণী, একদিকে বারাহী, একদিকে বৈষ্ণবী, এক দিকে কৌমারী ইত্যাদি। মা যখন এত মূর্ত্তিতে এত দিকে তাকে ঘিরে নিলেন, তখনও সংস্কারের বীজ নিঃশেষ হয়ে গেল না। এখন আমার চেতনা যদি দিক্‌দিগন্তের ঐ শক্তিজ্ঞানে

ভরে যায়, তবে এই আত্মতত্ত্ব, যিনি পরাভক্তির দ্বারা একত্ব দেখিয়ে আমাকে তাঁর বুকের ভিতরে নিয়েছেন, সেই আত্মশক্তিই যে ঐ ঐ মূর্ত্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে আছেন, এই দর্শন আসবে না? যখনই আত্মা ও আত্মশক্তির এইরূপ একত্ব দর্শন করলে, তখনই ভিতরে যা কিছু সংস্কার সঞ্চিত ছিল, যা কিছু নিঃশেষ হতে বাকী ছিল, সে সব ঐতেই ফুটে উঠল। অনন্ত স্পর্শ-দেবতা, অনন্ত রূপ-দেবতা—দিক্‌দিগন্তে মা—মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে মা—এই চেতনায় সব ভরে গেল। এরই নাম নিশুম্ভবধ। আত্মাই যে সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্বদেবতা, এইরূপ দর্শনেরই নাম হল নিশুম্ভ-বধ। আর কোনও সংস্কার থাকবে না, সব সংস্কারই দেবী হয়ে গেছে; জীবরূপে জন্মাবার সংস্কার একেবারে উবে গেছে।

"মশায়, আপনি এ যা বললেন, তাতে বুঝলাম, এ যেন কত তেপান্তরের কথা।" তা নয়। স্তরের পর স্তর দেখে গেলে, এ সব আপনা হতে হয়ে যাবে। অন্তর্বাহ্য যেখানে একাকার হয়েছে, আমি যদি সেখানে বসি, আর যেখানে যা কিছু হচ্ছে, তাতে মাত্র মা-ই তৃপ্ত হচ্ছেন দেখি, যদি এইরূপে সমস্ত তৃপ্তিই আত্মতৃপ্তি—সব জীবকামনার তৃপ্তিই আত্মতৃপ্তি হয়ে যায়,—তখনই বলে উঠব,—"এই থাক, এই থাক, মা থাক—মা থাক।" আর তখনই নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি হয়ে মা ফুটে উঠবেন। ঠিক এইরূপ স্তরে স্তরে গেলে আমরা মধুকৈটভ থেকে নিশুম্ভ-ভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারি। এ-সব অসুর বার বার বেরোবে, এবং বার বার এদের মারতে হবে।

শুম্ভ হল পুরুষকার, বহু পুরুষ হওয়ার ইচ্ছা। তাই সে যুদ্ধ করতে এসেই মাকে বললে,—"তুমি গর্ব্ব করো না। অন্যের—বহু দেবশক্তির সহায়তায় আমার একা ভাইকে তুমি মেরেছ।" মা

বললেন,—"এ জগতে আমা থেকে দ্বিতীয় আর কেউই নেই, ওরা সব আমারই বিভূতি।" এই বললে তবেই অনন্ত পুরুষরূপে কেটে কেটে বহু হওয়া বন্ধ হবে এবং প্রকৃত বহু হওয়ার যে শক্তি, তার অভ্যুদয় হবে। এ সব হবে শুধু কথার দ্বারা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বিভূতি আছে, সে সব তুই আমাতেই প্রবিষ্ট দেখ। আহা, কবে তোরা এরকম করে মায়ে প্রবিষ্ট হবি?

এবার তোরা চণ্ডীপাঠ করতে পারবি? চণ্ডীর বই না খুলে প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত, উত্তর চরিত—মধুকৈটভ-বধ থেকে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ পর্য্যন্ত সব পাঠ করতে পারবি? এই জ্ঞান নিয়ে কথা কইলেই মা আবির্ভূত হবেন। এর আর ব্যর্থতা নেই।

মধুকৈটভ থেকে শুম্ভ পর্য্যন্ত মাই গ্রথিত হয়ে রয়েছেন, এ মায়েরই একটা শক্তি, এই চক্ষু থাকলে মাকে পূর্ণ আবির্ভূতা হতে দেখবি। এত দিন অসুররা ছিল, এখন ভূমিতে ভূমিতে পরমচৈতন্যশক্তি দেখলেই মধু, মহিষ, রক্তবীজ প্রভৃতি কাৎ হল।

তোদের যদি যথার্থ মুক্তির কামনা এসে থাকে, তবে এই জ্ঞান আসতে কতক্ষণ? আর মুক্তি-কামনা যদি না এসে থাকে, তবে এই জ্ঞান শুনতে শুনতে মুক্তি-কামনা আসতে কতক্ষণ? তোদের জীবনের সমস্ত অস্তিত্বটাই চণ্ডীতে ঢাকা। গীতার সাধনায় চেতনতত্ত্বে, জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়ে, চণ্ডীতে শক্তিতত্ত্বে আসবি। গীতার রহস্য না পেলে ব্রহ্ম-শক্তি দাঁড়াবেন না। তা হলে উপনিষদ্, চণ্ডী, সমস্ত খাপ খাইয়ে দিলাম। ঋষিরা এই জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ের ভিত্তি বেঁধে গেছেন। এইরূপে জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কে কেউ দেখেছে? জ্ঞানেতেই যে কর্ম্ম, তা কেউ দেখেছে? এখনও বলবার পাহাড় পড়ে রয়েছে। চণ্ডীর বই এই লিখতে মাত্র আরম্ভ করলাম। এখনও পূর্ণ করিনি।